আলোচনা-প্রসঙ্গে

সপ্তদশ খণ্ড

সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস্

আলোচনা-প্রসঙ্গে

(শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত কথোপকথন)

সপ্তদশ খণ্ড

SATSANG PUBLISHING HOUSE
SATSANG

সঙ্কলয়িতা—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, এম-এ

প্রকাশক ঃ
শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
সৎসঙ্গ পাব্‌লিশিং হাউস্‌
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর

প্রথম প্রকাশ ঃ ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০

বাইণ্ডার ঃ
কৌশিক বাইণ্ডিং ওয়ার্ক্‌স্‌
কলিকাতা—৭০০ ০১২

মুদ্রাকর ঃ
কাশীনাথ পাল
প্রিণ্টিং সেণ্টার
১৮বি ভুবন ধর লেন
কলিকাতা—৭০০ ০১২

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

ঈ

উ

বিষয় পৃষ্ঠা

ধ

ন

ব

ভ

স

আলোচনা-প্রসঙ্গে

৮ই বৈশাখ ১৩৫৬, বৃহস্পতিবার (ইং ২১ । ৪ । ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় উপবিষ্ট। পূজনীয় খেপুদা ও যতিবৃন্দ উপস্থিত। যতিদের পারিবারিক অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে কথা উঠল। তাতে শ্রীশ্রীঠাকুর অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বললেন—তোমরা তো যতি-সন্ন্যাসী। তোমরাও তো practically (বাস্তবে) নিজ-নিজ সংসারের কেউ নও। তোমরা তো ও-পাট চুকিয়ে ইষ্ট-কৃষ্টির সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করেছ। যে ম'রে যায় তার কি সংসারের কোন দায়িত্ব থাকে ? দরকার হয় তারা ভিক্ষা ক'রে থাক। তোমরা কি মনে কর তোমরা ইচ্ছা করলেই কাউকে বাঁচাতে পার ? পরমপিতার দয়া না থাকলে কেউ বাঁচে না। আবার, কেউ যদি ম'রেই যায়, সে-মৃত্যু ইচ্ছা করলে কি তুমি ঠেকাতে পার ? তোমরা যতদিন কর্তালি করবে ততদিন তাদের পরমপিতার অপার দয়া থেকে বঞ্চিত করবে। আদত কথা, ইষ্টের চাইতে সংসারের উপরে আনতি তোমাদের অত্যন্ত বেশী। তাই তোমরা নিজেরাও বঞ্চিত হ'চ্ছ, তাদেরও বঞ্চিত করছ। সংসারের লোকদের তোমাদের কাছে ক্রমাগত আসতে দাও কেন ? সেই তো মস্ত অপরাধ। তারা জানুক তোমরা বিলকুল ঠাকুরের এবং তারাও তাই। পরমপিতাকে কেউ যদি সবচেয়ে আপন ব'লে জানে এবং তাঁকেই একমাত্র আশ্রয় ব'লে মনে করে, তখন পরমপিতার দয়া তাকে শতহস্তে রক্ষা করে। নিজেরাও পার না পরমপিতার হ'তে, তাই সংসারের লোককেও পার না তেমনভাবে উদ্বুদ্ধ করতে। ওরা চ'টে গিয়ে তোমাদের গালাগালি করুক তখনও তোমাদের মন যদি বিচলিত না হয়, ঠাকুরকে নিয়ে মত্ত থাকতে পার, তখন সেই গালাগালিই হবে মস্ত আশীর্ব্বাদ। আমি বলি—কর তো ঠিকমত কর, নচেৎ যতির আদর্শকে খাটো ক'রো না। নিজের চরকায় তেল দাও। তোমরা তাদের কিছু করতে পারবে না এখন। আমি যা' বলেছি, সেইভাবে যদি সাধনারত থাক, তাহ'লে সাময়িক দুঃখকষ্ট সত্ত্বেও তারা সর্ব্বতোভাবে উপকৃত হবে। তবে তারা উপকৃত হবে এই আশায় কিছু করতে যেও না। অমনতর মনোভাব থাকলে তপস্যাই হয় না।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—গর্ব যদি থাকে, যতিই যদি হও, সেরা যতি হও—তাঁর চরণতলে দাঁড়াতে যাতে পার ; প্রত্যাশা যদি থাকে, এইরকম প্রত্যাশা রাখা কি ভাল নয় ? তোমরা কার খুশীর জন্য পৃথিবীতে বেঁচে আছ ভেবে দেখ ভাল ক'রে। ক্ষুদ্র মায়ায় আবদ্ধ হ'লে নিজেরাও ডুববে, আর যাদের প্রতি মায়া তাদেরও রসাতলে দেবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে একটা জিনিস লিখতে বলেছেন।

কেষ্টদা—Mood (ভাব) না আসলে লিখতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাবসিদ্ধ না হ'লে হয় না, যখন-তখন লেখা বেরোয় না। যে প্রয়োজনমত mood (ভাব) সৃষ্টি ক'রে নিতে পারে সেই পারে। সব সময় ইষ্টকে নিয়ে উঁচু সুরে মন বেঁধে রাখতে হয়, তখন লেখা, বলা, করা সবকিছুই মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে।

৯ই বৈশাখ ১৩৫৬, শুক্রবার (ইং ২২। ৪। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে ভূপেনদা (চক্রবর্তী)-কে বললেন—বড় একদল কর্ম্মী সৃষ্টি ক'রে ফেলতে হয়। নিজে তপ করা লাগে আর এমন মানুষ জোগাড় করা লাগে, তপস্যাপরায়ণ হ'য়ে চলার দিকে যাদের ঝোঁক আছে। নিজে তপের 'পর না থাকলে, এক ধাক্কায় যে কোথায় ছিটকে ফেলবে তার ঠিক নেই। কৃষ্টিকে ignore (উপেক্ষা) ক'রে চললে বিবেকও ভোঁতা হ'য়ে যায়।

এমন সময় চুনীদা (রায়চৌধুরী) আসলেন। চুনীদার একটা আলোচনা শুনে শিবদাসদা (কোঙার) খুব প্রীত হয়ে তাঁকে একটা মেডেল দিতে চেয়েছিলেন। চুনীদা তাতে বলেছিলেন—আমার মেডেল দিয়ে কাজ নেই, পার তো আমাকে একখানি কাপড় দিও। শিবদাসদা তাতে কাপড়ই কিনে দেন। সেই ঘটনার উল্লেখ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর চুনীদাকে এবং উপস্থিত সবাইকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—সে কাপড়খানা যখন দিতে নিয়ে যায়, এতখানি তৃপ্তি ও প্রীতির সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিল, যে মনে হচ্ছিল কাপড় দিতে পেরে সে যেন মহা খুশী। এইটাই হ'ল ঠিক-ঠিক বামনাই পাওয়া। রকমটা দেখে আমার খুব ভাল লেগেছিল।

দেশের লোকের মধ্যে সঞ্চারণা সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অবস্থা যা' ক'রে ফেলেছে তা' দুরূহ। এখন প্রত্যেক দিন, প্রত্যেক ব্যাপারের মধ্যে, প্রত্যেকের কাছে যাজন ক'রে-ক'রে ঢোকান লাগবে। এ ছাড়া সম্বর্দ্ধনার আর পথ আছে ব'লে মনে হয় না। Otherwise (অন্যথা) slave (ক্রীতদাস) হ'য়ে থাকতে হবে। তাতে জীবনে কোন সার্থকতা নেই। ইচ্ছা করে—মানুষ তৈরী ক'রে নিয়ে শ্রমণ জাতীয় দশ পনেরজন ক'রে এক-এক কলেজে ভর্ত্তি হয়ে পড়াশোনার মধ্য-দিয়ে দিনের পর দিন স্কুল কলেজগুলিতে যাজন চালাতে লাগুক। এইভাবে ছেয়ে ফেলতে হয়। তারা আবার অন্য ছেলেদের ইষ্ট-কৃষ্টির ভাবে ভাবিত ক'রে তুলবে। শ্রমণরা এক-এক অঞ্চলে থাকবে আচার্য্যের তত্ত্বাবধানে। তাদের দক্ষতার মাপকাঠি হ'ল তারা কতজনকে সক্রিয়ভাবে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করল। উপন্যাস লেখার জন্য একদল থাকবে। কাগজে-কাগজে রোজ ইষ্ট-কৃষ্টিমুখী লেখা বের হ'তে থাকবে। প্রত্যেকের মধ্যে মিষ্টি পরাক্রমী রকম থাকবে যাতে sweetly, vehemently and compassionately (মিষ্টি ক'রে প্রবলভাবে এবং সহানুভূতি সহকারে) বেচাল চলনকে resist (প্রতিরোধ) করতে পারে। সকলের মধ্যে একটা ধারা গজিয়ে তুলতে হয়, যাতে তাদের রকম দেখেই ঠিক পাওয়া যায় যে তারা দেবভাবে ভাবিত। সেই সঙ্গে সিনেমার মধ্যে-দিয়ে চালাতে হয়।

এইগুলি করতে গেলে টাকার দরকার। সেইজন্য বলেছি বিশিষ্ট দেড়লাখ দীক্ষার কথা। আর যেভাবে বলেছি বিয়ে-থাওয়া সেইভাবে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারলে, কুড়ি বছরের মধ্যেই কতকগুলি ভাল ছেলেমেয়ে জন্মাবে ব'লে আশা করা যায়। তারা আবার জোরদার ভাবে লাগবে। ভোল ফিরিয়ে দিতে হবে।

সুরেনদা (বিশ্বাস)—সব মানুষ তো দীক্ষিত হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাদেরও এমন ক'রে admirer (গুণগ্রহণমুখর) ক'রে তোলা লাগে, যাতে তারা তোমাদের লোক-কল্যাণকর প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে। প্রত্যেক পূর্ব্বতন মহাপুরুষকে যথাযথভাবে তুলে ধরা লাগে।

রাত্রি সাড়ে দশটার সময় প্রাণায়াম সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রবৃত্তিমুখী চিন্তা ও চলনের ভিতর-দিয়ে প্রাণনক্রিয়ায় আমরা বহু জঞ্জালের সৃষ্টি করি। ইষ্টানিরতির ভিতর-দিয়ে প্রবৃত্তিমুখিনতার বিরতি ঘটিয়ে সব রকম irregularity, deformity ও distortion এর (অনিয়ম, বিকার ও বিকৃতির) নিরসন ঘটিয়ে প্রাণন-প্রগতিকে সহজ ও সুষ্ঠুভাবে চালনা করাই প্রাণায়াম। নাক টিপে পূরক, রেচক করে প্রাণায়াম করার চাইতে নামনিরত হয়ে প্রাণনছন্দকে স্বচ্ছন্দ ক'রে তুললে সেইটাই হয় স্বাভাবিক প্রাণায়াম।

১০ই বৈশাখ ১৩৫৬, শনিবার (ইং ২৩। ৪। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে যতিবৃন্দের সঙ্গে সাধন-ভজন সম্পর্কে আলোচনা করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নাম করতে-করতে অনেক সময় চৈতন্য-সমাধি হয়। মন otherwise (অন্যভাবে) engaged ও absorbed (ব্যাপৃত ও নিবিষ্ট) হ'য়ে থাকে। তখন বাইরের জিনিস দেখেও যেন দেখি না। সে-সম্বন্ধে কোন বোধ যেন থাকে না, কিন্তু তবু চেতন থাকি। জড়-সমাধিতে শরীরের চেতনা থাকে না, বাইরের জ্ঞান থাকে না, চেতনা ভিতরে নিবিষ্ট হয়ে থাকে। সে অবস্থায় যে কথা-টথা বেরোয় তা যেন আপনা থেকে হয়। কোন বুদ্ধি বা চেতনা থাকে না।

কতটা ঘুমান দরকার সে-সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি এমনও দেখেছি যে দশ মিনিট ঘুমে যেন পাঁচ ঘণ্টা ঘুমের কাজ হয়ে যায়, কোন ক্লান্তি থাকে না—ever vitalised (সর্ব্বদা সঞ্জীবিত)। অবশ্য নাম-ধ্যান, যাজন যত বাড়ান যায়, ততটাই এই রকম হয়। একদিনে এটা হয় না, তবে ইচ্ছা করলেই ধীরে-ধীরে ঘুম কমান যায়।

আজ কৃষ্ণা একাদশী। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর মাঠে চেয়ারে উপবিষ্ট। চতুর্দ্দিকে কেমন যেন একটা স্তব্ধ ভাব। কি যেন রহস্য ঘিরে আছে এই আঁধারের মাঝে, মন আপনা থেকেই অন্তর্ম্মুখী হয়ে আসে। পূজনীয় বড়দা, ছোড়দা, খেপুদা এবং কেষ্টদা

(ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), স্মরজিৎদা (ঘোষ), সরোজিনীমা প্রভৃতি চুপচাপ ব'সে আছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর নীরবতা ভঙ্গ করে হঠাৎ বিস্ময়ের ভঙ্গীতে বললেন—আচ্ছা, এ-রকম হয় কেন ? এখন তো সচেতন একাগ্রতা কিছু নেই, দুলালীর অসুখের কথা ভাবছি, হঠাৎ এক মিনিট ধরে দেখলাম—একটা ডগমগ চাঁদ জ্বলজ্বল করছে আকাশে, তাতে সব আলো হ'য়ে গেছে। হঠাৎ পরিষ্কার দেখলাম, এখন কিন্তু ইচ্ছা করেও তার কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। এ-রকম কেন হয় ?

সরোজিনীমা বললেন—একদিন রাত্রিবেলায় বিরাজদার বাড়ির ওখানে অন্ধকারের মধ্যে, আপনার শরীর থেকে এমন জ্যোতির্ম্ময় আলো ঠিকরে বেরিয়েছিল যে, আমরা কাছে যারা ছিলাম সবাই একেবারে চমকে গিয়েছিলাম। কাছে যতজন ছিলাম, সবাই এক রকমই দেখেছিলাম।

কেষ্টদা—একাগ্রতার প্রয়াস যখন থাকে না, তখন সহজে অনেক কিছু বোধ করা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু পরে বললেন—এখন আবার সেই রকম দেখছি। অথচ এখন চারিদিকে ঘোর অন্ধকার।

১১ই বৈশাখ ১৩৫৬, রবিবার (ইং ২৪। ৪। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে ব'সে একটি বাণী দিলেন।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) মনুসংহিতা থেকে যতির করণীয় সম্পর্কে প'ড়ে শোনালেন। তারপর বললেন—তিনি যতি হিসাবে একক আচরণের কথা বলেছেন, কিন্তু যতিসঙ্ঘের কথা কিছু বলেননি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—One for others (একজন অপরের জন্যে), others for one (অন্যরা একের জন্যে)—এই ভাব থাকলে একত্বের ব্যত্যয় হয় না।

কেষ্টদা—যতি এবং শ্রমণে তফাৎ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যতিরাও সন্ন্যাসী, শ্রমণরাও সন্ন্যাসী। যতিদের জীবনে যেটা achieved (আয়ত্ত) হয়েছে, শ্রমণরা তা' achieve (আয়ত্ত) করতে যাচ্ছে।

জন্ দি ব্যাপটিস্ট সম্পর্কে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—জন্ দি ব্যাপটিস্ট বৌদ্ধ ছিলেন ব'লে শুনেছি।

পরে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আপনাদের একটা সুবিধা হয়েছে এই যে, আপনারা এমন একটা জায়গা পেয়েছেন—যেখান থেকে সবাইকে সহজভাবে আকর্ষণ করতে পারেন। সত্তার দাঁড়াটা সবারই দাঁড়া। নিজ সত্তাকে কেউই অস্বীকার করতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উত্তরাস্য হ'য়ে উপবিষ্ট।

কিরণদা (ব্যানার্জী), সুশীলদা (বসু), রাধাবিনোদদা (বসু) প্রভৃতি এবং মায়েদের মধ্যে কয়েকজন কাছে ব'সে আছেন।

সাধন-ভজন সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর কিরণদাকে বললেন—তুমি দ্রষ্টা-স্বরূপ, সাক্ষী-স্বরূপ আছ—মনের তরঙ্গগুলি দেখে যাচ্ছ,—পারম্পর্য্যে সেগুলি সংস্থ ক'রে তুলছ। বোধ করতে চেষ্টা করছ—কোন্‌টা খারাপ এবং কেন খারাপ, কোন্‌টা ভাল এবং কেন ভাল। প্রত্যেকটি জিনিসের স্বরূপ বিচার ও বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করছ। মনের মধ্যে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর যা'-কিছু ভাল-মন্দ ভেসে উঠছে, তার কোনটাতে উৎক্ষিপ্ত বা উল্লসিত না হয়ে তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে চেষ্টা করছ। তোমার ভিতরে যেন একটা দ্রষ্টা তুমি, তুমি-রূপ দ্রষ্টব্যকে দেখছে। এইভাবে নিজেকে নিজে দেখাটা যত স্তরের পর স্তর গভীর হ'তে গভীরতর দেশে এগুতে থাকে, তত তোমার ভিতর জাতিস্মরত্ব ফুটে ওঠে।

কিরণদা—অনেক সময় বোধ থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেখানে বোধ থাকল না সেখানে লয় আসতে পারে। সজাগ থেকে নিজের মনের চলন, আচার, ব্যবহার দেখে যেতে পারলে নিজেই নিজেকে দেখে অবাক হ'য়ে যাবে, আমরা বৃত্তির রাজ্যে থাকি, তার থেকে আলগা হয়ে ইষ্ট-সংস্থ হ'য়ে থাকতে হয়। এইটে বোধ করা চাই যে, বৃত্তিগুলি তোমার হাতিয়ার, কিন্তু তুমি বৃত্তির মালিক। দাসকে কখনও যদি মালিক ক'রে তোল তাহলে তুমি তো আর নিজেকে বোধ করতে পারলে না।

কিরণদা—নাম করলে হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাম করা মানে দই ঘোঁটা। তোমার ঘোঁটার দণ্ড অর্থাৎ অনুরাগ-রজ্জুতে আবদ্ধ আত্মবিচারের মাপকাঠি যদি ঠিক না থাকে, তাহলে হবে না। প্রত্যেকটা জিনিসের তিনটে দিক আছে—একটা নিয়ন্ত্রণ, তার মানে—কোন প্রবৃত্তির হাতে না গিয়ে তাকে নিজের হাতে আনা। তারপর হল সামঞ্জস্য, তার মানে—তাকে সপারিপার্শ্বিক নিজের সত্তা-সম্বর্দ্ধনার সহায়ক ক'রে তোলা। আর একটা জিনিস হল সমাধান, অর্থাৎ সম্যক ধারণা—এইগুলির কোন্‌টা কোন্‌ভাবে কেমন ক'রে করতে হবে, এই যে একটা সর্বাঙ্গীন বোধ ও সিদ্ধান্ত তার ভিতর-দিয়ে হয় প্রত্যয়। বৃত্তিগুলি অজ্ঞানের কারণ না হয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞানদৃষ্টির উন্মোচক হ'য়ে ওঠে। নিজেই ধাপগুলি পরপর ঠিক পাওয়া যায়। বাহ্যে পেলে যেমন ক'য়ে দেওয়া লাগে না, এও সেরকম। যে-কোন বৃত্তির উন্মেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তন্মুহূর্তেই তাকে ধ'রে ফেলে সেখান থেকেই কাবেজে আনার কায়দা নিজের ভিতরে সহজভাবে শুরু হয়ে যায়। কোন্‌ জন্য, কোন্‌ প্রবৃত্তি, কখন, কী আকারে প্রকাশ পায় তা' যখন আত্মসংস্থ থেকে বোধ ও বিন্যাস করা যায় তাকেই কয় সংস্কার সাক্ষাৎকার করা। তখন বুদ্ধদেবের মত বলতে পারবে—হে গৃহকারক, আমি তোমাকে দেখতে পেয়েছি, তুমি আমাকে দিয়ে আর গৃহ রচনা করতে পারবে না। নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাধানের আবার নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য

সমাধান আছে। Finer to finer (সূক্ষ্মতর থেকে সূক্ষ্মতর) অনেক স্তরপারম্পর্য্য আছে। এমনি ক'রে প্রবল ইষ্টনিষ্ঠ pursuit (অনুসরণ) যদি সজ্ঞানে চালিয়ে যাওয়া যায়, তবে কত জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতি যে ভেসে ওঠে তার ঠিক নেই। শুধু শুনলে হয় না, গালগল্প করলেও হয় না—নেশাখোরের মত ক্রমাগতি নিয়ে আজীবন লেগে থাকতে হয়। এখানে ফাঁকি-ফুকির কারবার নেই।

কিরণদা—যাঁরা ঈশ্বরতন্ময় পুরুষ সামাজিক জীবনে তাঁদের contribution (অবদান) কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁদের contribution (অবদান)-ই তো contribution (অবদান)। বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্ট, চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণদেব—এঁদের contribution-এ (অবদানে) তো জগৎ চলছে। মূলের সঙ্গে যাদের যোগ নেই তারা যত হোমরা-চোমরাই হোক না কেন, মানুষ তাদের কাছ থেকে সত্তা-সম্বর্দ্ধনার খোরাক পায় কমই।

১২ই বৈশাখ ১৩৫৬, সোমবার (ইং ২৫। ৪। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে ব'সে একটা দীর্ঘ বাণী দেওয়ার পর প্রায় পৌনে বারটার সময় বললেন—ধর্ম্ম করতে যাই, যাই-কিছু করতে যাই, বৃত্তিস্বার্থ্যের হাত থেকে রেহাই পাওয়া কঠিন। সে-রেহাই পাওয়া যায় যদি সত্তাটা একবার ইষ্টের সঙ্গে বেঁধে ফেলা যায়। কোন কায়দায় সত্তাটা যদি তাতে বেঁধে ফেলতে পারি তাহলে আর ভয় নেই, আপনিই সব হ'তে থাকে।

ভজনের সময় মন বিক্ষিপ্ত হ'লে তখন করণীয় কী সেই সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভজনের সময় যখন শব্দ অনুসরণ করি তখনও দেখা যায় নানা চিন্তার তরঙ্গ আসে। কিন্তু মন ইষ্টে বাঁধা থাকলে তাঁর দিকেই নজর বেশি থাকে, অন্য চিন্তাকে আমল দেওয়ার প্রবৃত্তি হয় না। ইষ্টের দিকে নেশা না থাকলে আজেবাজে চিন্তা মনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ভজন করছি, তখন হয়তো পায়েস খাওয়ার ইচ্ছা হ'ল। নিজের পায়েস খাওয়ার লোভ যখন জাগল তখন যদি মনে করি—এই লোভের পিছনে না ছুটে, যদি ঠাকুরকে পায়েস খাওয়াই সেই তো বরং ভাল। ঐ সিদ্ধান্ত-অনুযায়ী যদি ঠাকুরকে পায়েস খাওয়ানর জন্য যা' করণীয় তা' করি তাহ'লে নিজের লোভের ইষ্টানুগ নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাধান হয়—লোভরূপ প্রবৃত্তি জয়ের experience (অভিজ্ঞতা) ও adjustment (বিন্যাস) নিয়ে। তাঁর জন্য আমি এবং আমার যা-কিছু—এই বোধই যদি আমার চলনার নিয়ামক হয়, তাহ'লে কোন প্রবৃত্তি আমাকে আবদ্ধ ক'রে রাখতে পারে না। প্রবৃত্তিতে আবদ্ধ থাকলে আমরা বাস্তবে ইষ্ট থেকে অর্থাৎ সাত্বত স্বরূপ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ি। কষ্ট বলতে এই একটা অর্থাৎ ইষ্ট থেকে বিচ্যুত থাকা। যারা এই কষ্ট থেকে রেহাই পেয়েছে তারা শত কষ্টের মধ্যেও আনন্দলোকে বসবাস করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে যতিবৃন্দ ও ভুপেনদা (চক্রবর্তী)-কে গভীর আবেগের সঙ্গে বললেন—কতকগুলি leading pushing men (চালক ও উদ্দীপনা সঞ্চারকারী মানুষ) জোগাড় করা চাই, বিশিষ্ট দেড় লাখ দীক্ষা ও সাধারণভাবে দীক্ষা দ্রুতবেগে চালিয়ে যাওয়া চাই। তার সাথে-সাথে শ্রমণ সৃষ্টি ক'রে তাদের educate (শিক্ষিত) করা লাগবে। এ সব হ'লে কাগজে-কাগজে ভাবধারা প্রচার ক'রে, ছোট-ছোট পুস্তিকা লিখে, ভাল-ভাল সিনেমা চালু ক'রে, ব্যক্তিগত যাজন ও সভা-সমিতির মধ্য-দিয়ে প্রত্যেকের কানের কাছে বারবার ইষ্ট-কৃষ্টির গান গেয়ে-গেয়ে মানুষের বেচাল চলনকে ছাতু-ছাতু ক'রে দেওয়া যায়। তার মানে, প্রবৃত্তিমুখী চলনের পরিবর্ত্তে ঈশ্বরমুখী ও ইষ্টমুখী চিন্তা ও চলনকে প্রজ্জ্বলিত ক'রে তোলা যায়। তখন কিন্তু মেলা ফড়িং জুটবে লোকগুলিকে দিয়ে নিজেদের বৃত্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে। শ্যেন-দৃষ্টি রেখে সুকৌশলে তাদের সেই অপচেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দিতে হবে। যারা শয়তানকে শয়তান ব'লে ধরতে পারে না, তাদের ভিতরেও শয়তানির দখল থাকে। তোমাদের এতখানি তুখোড় হওয়া লাগবে, যাতে এক আঁচড়েই শয়তানের শয়তানিকে ধ'রে ফেলে এমন বেড়াজাল সৃষ্টি করতে পার যাতে সে এক পাও এগুতে না পারে।

আমি চাই United world (ঐক্যবদ্ধ জগৎ)। তার প্রাথমিক ধাপ হ'ল ভারত ও পাকিস্তানের মানুষগুলিকে পরস্পরের মঙ্গলের জন্য বদ্ধপরিকর ক'রে তোলা। ভারতই পারবে জগৎকে বাঁচাতে। হিংসার পথে যাবে না। কেউ যদি হিংসা বাধাতে চায় সমীচীন পন্থায় তা' ব্যাহত ক'রে দিতে হবে। আমি যদি নাও থাকি, আমার বইগুলিতে সব পাবে। সেই অনুযায়ী যেখানে যা' করণীয় তা' করবে। হাউড় তুলতে পারে, বক্তৃতা দিতে পারে, ব্যক্তিগুলির পিছনে লেগে থাকতে পারে এমনতর ইষ্টৈকপ্রাণ, নিরাশীনির্ম্মম, তপস্যাপরায়ণ লোক চাই, যাদের সংস্পর্শে মানুষগুলি concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'য়ে উঠবে। সব শ্রেণীর মধ্যে, সব সম্প্রদায়ের মধ্যে দীক্ষিতের সংখ্যা সমান তালে বাড়ান লাগবে। প্রত্যেকে যেন বোধ করতে পারে যে সৎসঙ্গের মধ্যে আছে তার fulfilment (পরিপূরণ)। যার যেখানে যে খাঁকতি আছে, তার নিরসন যেন হয় তোমাদের দিয়ে। তোমরা যেন মনুষ্যজাতির বাঁচাবাড়ার রসদদার হয়ে উঠতে পার। তখন দেখবে পরমপিতার নামে স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে কাতারে-কাতারে মানুষ unified (ঐক্যবদ্ধ) হয়ে উঠছে। হবে—হবে—হবে। একটা religious flood (ধর্ম্মের বন্যা) সৃষ্টি ক'রে ফেল--ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চতুর্বর্গ আপামর সাধারণকে আলিঙ্গন করবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর শেষের কথাগুলি এমন ক'রে উচ্চারণ করলেন যেন স্বর্গলোকের দৈববাণী ধরাধামে শরীরী হয়ে অবতরণ করল।

ভুপেনদা রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা বলেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাতে বললেন—সৎসঙ্গীদের ঠেলা দেখ না। এদের stamina ও sacrifice-এর (শক্তি এবং ত্যাগের) তুলনা হয় না। আমাদের এখন শুধু leading

man (নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি) চাই। যারা অন্য কোন ধান্ধায় না চ'লে শুধু আমার মুখের দিকে চেয়ে চলবে। পবিত্র চলন চাই। আমি যা' যা' বলেছি সেইভাবে চললে, আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ভারত দুনিয়ার উদ্ধাতা হয়ে দাঁড়াতে পারে। সৎসঙ্গের মধ্যে কত রকমের লোক আছে, তবু ইষ্ট-কৃষ্টির উপর নেশা থাকায় এরা কত united (ঐক্যবদ্ধ)। কত লোক আছে অপরাধ ক'রে এসে আমার কাছে confession (স্বীকারোক্তি) ক'রে বলে—ঠাকুর, আমাকে শাস্তি দেন। মনুষ্যত্বের কতখানি জাগরণ হচ্ছে তা' কি দেখতে পারছ না? এই আত্মশুদ্ধির সাধনা যদি চলতে থাকে, তাহলে সাত্বত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিয়ে নতুন ক'রে ভারতীয় সমাজতন্ত্র মূর্ত্ত হয়ে উঠবে দেশে।

শ্রমণ, যতির সংখ্যা বাড়াও। ঘরে-ঘরে গিয়ে হানা দাও। মানুষকে মহৎভাবে অনুপ্রাণিত ক'রে তোল। একটা মানুষও যেন কোনও ভাবে খাটো না থাকে। আর তা' করতে গেলে, দীক্ষিতের সংখ্যা এন্তার না বাড়ালেও তাদের ইষ্টানুগ চলনে চলন্ত ক'রে না তুললে, ঢিমে-তেতালা চলনে চললে কাজ হবে না।

১৩ই বৈশাখ ১৩৫৬, মঙ্গলবার (ইং ২৬।৪।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে এসে ব'সে ননীমাকে ডেকে দু'জন কর্ম্মীকে দেখিয়ে বললেন—এরা যতি-আশ্রমে খাবে।

তারপর তাদের দিকে চেয়ে বললেন—তোমরাও কিন্তু যতি-আশ্রমের জন্যে জোগাড় করবে। মানুষ যদি খুশি হয়ে না দেয়, নেবে না। তোমাদের ব্যবহারে যেন খুশি হয়, তৃপ্ত হয়। তোমরা চাইলে কেউ না দিতে পারলেও তার মনে যেন ক্ষোভ না থাকে, ব্যথা না থাকে। না দিতে পারার জন্য কারও মনে কষ্ট হ'লে তাও মুছে দিতে হয়। আবার, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ না দেয়, তাতেও অখুশি হয়ো না। তোমাদের যেন inferiority (হীনম্মন্যতা) না থাকে—অভিমান বা আক্রোশ মনে যেন না জাগে। তোমাদের উপজীব্য হল মানুষের প্রীতিপূর্ণ অবদান।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভুপেনদা (চক্রবর্ত্তী)-কে বললেন—শ্রমণ যা' সংগ্রহ করবে educated (শিক্ষিত) হলে ভাল হয়, তারা আবার খুব determined (সংকল্পবদ্ধ) হওয়া চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাঠে ব'সে বিভিন্ন বিষয়ে লেখা দিচ্ছিলেন।

পূজনীয় খেপুদা রাষ্ট্র সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কতকগুলি ব্যক্তি নিয়েই দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র, জাতি যা-কিছু। প্রত্যেকটা ব্যক্তি ভিতরে ও বাইরে যতটা adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হবে, ততই তারা যোগ্যতা অর্জ্জন ক'রে সর্ব্বাঙ্গীণ সত্তা-সম্বর্দ্ধনার লওয়াজিমা সংগ্রহ করতে পারবে। ভেতরটা adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে না পারলে বাইরের চাল-চলন ও কর্ম্মদক্ষতা স্ফুরিত হয় না। প্রত্যেকের adjustment of complex (বৃত্তির নিয়ন্ত্রণ)-এর

দিকে নজর দিয়ে, সঙ্গে-সঙ্গে তাকে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী কর্ম্মদক্ষতা অর্জ্জন ও সেবা-পরিবেশনে তৎপর ক'রে তুলতে হবে। একজন যদি মানুষ হওয়ার পথে চলে, তবে তার দেখাদেখি তার পরিবেশের আর দশজনও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু কোন ব্যক্তির চলন-চরিত্র যদি পাকাপোক্ত না হয়, সে যদি পরিবেশের মধ্যে প'ড়ে খেই হারিয়ে ফেলে, তাহলে কিন্তু তার সম্ভাব পরিবেশের মধ্যে চারায় কমই। আবার, আচরণ ও প্রচার দুই-ই লাগে। আচরণ-সমন্বিত যাজনে একটা আবহাওয়া সৃষ্টি হয়। এইরকম আবহাওয়া সৃষ্টি ক'রে একাদর্শে যুক্ত ক'রে মানুষগুলিকে যত দানা বেঁধে তোলা যায়, ততই শক্তিমান দেশ ও রাষ্ট্রের মূল বুনিয়াদ তৈরি হয়। চরিত্র যদি সংগঠিত না হয়, মানুষ যদি মানুষ না হয়, তাদের মধ্যে যদি সেবাবুদ্ধি না গজায়, তাহ'লে শুধু বাইরের হুজুগে একটা জাতি বড় হ'তে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে যতি-আশ্রমে এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশে প্রফুল্ল আজ সন্ধ্যায় প্রদত্ত একটি শিক্ষা-সম্বন্ধীয় বাণী পড়ে শোনাল।

তখন শরৎদা (হালদার) প্রশ্ন করলেন—বহু বৎসর ধ'রে তপোবন চলা সত্ত্বেও, সেখান থেকে আপনার চাহিদামত মানুষ গ'ড়ে উঠল না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, তপোবনের যারা শিক্ষক ছিল আমার ভাবধারা তাদের চরিত্রে ফুটে ওঠেনি। তারা ইষ্ট-কৃষ্টির কথা বিশেষ কইতও না। তাই, তাদের ভিতর-দিয়ে—আমি যা' চেয়েছি—তা সঞ্চারিত হতে পারেনি। আমি যে আপনাদের চরিত্র সাজাতে চাচ্ছি, তার জন্য কতকগুলি rigid law (অনমনীয় নিয়মনীতি) আপনাদের উপর চাপাতে চাই না। আমি চাই যে, আপনাদের চরিত্রই normally (স্বাভাবিকভাবে) সেই law (নীতি) হ'য়ে উঠুক out of love (ভালবাসা থেকে)। আমি চাই spontaneous life (স্বতঃ-উৎসারিত জীবন)। তাই ব'লে আমি যা ব'লে দিয়েছি, ছক কেটে দিয়েছি, তা থেকে deviation (ব্যতিক্রম) হওয়া ঠিক নয়। নীতিগুলি যদি ভালবাসার আগ্রহ থেকে follow (অনুসরণ) না ক'রে বাধ্যবাধকতায় করি, তবে তা rigidity (কঠোরতা) ব'লে মনে হবে এবং অনুরাগ-রঞ্জনা না থাকায় লোকের মধ্যে তা' সঞ্চারিত করতে পারব না। নীতিটা প্রাণবন্ত হওয়া চাই। দৃষ্টিশক্তিটা যেমন তোমার মধ্যে জীবন্ত আছে, তাই কিন্তু দেখতে পারছ। নচেৎ তোমার যদি শুধু চোখ থাকত এবং তা' তোমার জীবন্ত জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত না থাকত, তাহলেও চোখ থাকা সত্ত্বেও তুমি দেখতে পেতে না। তাই, ইষ্টকে যারা ভালবেসে অনুসরণ করে এবং ভালবাসার সম্বেগ নিয়ে প্রাণবন্তভাবে যারা তাঁকে পরিবেশন করে তাদের মাধ্যমেই অপরে ইষ্টের প্রতি অনুরক্ত হওয়ার প্রেরণা পায়।

এরপর কথা বলার রীতি সম্বন্ধে বললেন—কথা আমি যত ভাল ভাব নিয়ে বলি না কেন তা' অন্যের মনে কি রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তা ভেবে দেখতে হবে।

আমাদের অনেকের কথা বলার ভঙ্গীই থাকে খারাপ। তাই, আমরা ভাল কথা বললেও লোকে তা receive (গ্রহণ) করতে পারে না।

যতীনদা (দাস)—নিয়মনীতির কঠোরতা থাকাই তো ভাল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' কিছুর উদ্দেশ্য হ'ল ভগবৎ প্রেমকে পরিপুষ্ট ক'রে তোলা। সে প্রেম শুষ্ক ক'রে তোলার জন্যে কঠোরতার ব্যবস্থা নয়। প্রবৃত্তি যাতে ইষ্টপ্রেমের প্রবাহকে গোপনে আত্মসাৎ করতে না পারে সেই জন্যেই কঠোর নিষ্ঠা-সহকারে চলার বিধি-ব্যবস্থা। এতে আমাদের প্রীতিশক্তির অপচয় নিবারিত হয়। ভালবাসা একাগ্র, স্বচ্ছ ও সলিল-গতি সম্পন্ন হ'য়ে তাঁর সেবায় সার্থক হয়।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নীতি বা নিয়ম যদি চরিত্রগত না হ'য়ে ওঠে, জীবন্ত না হ'য়ে ওঠে, তাতে সুবিধা হয় না, বিরক্ত সন্ন্যাসীর মত হয়। জীবন্ত হয়ে উঠলে তা স্বতঃই চারিয়ে যায় আনন্দ উৎসারণায়।

আত্মবিশ্লেষণ এবং আত্মসংশোধন সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নিজেকে ধরার জন্য সর্ব্বদা উন্মুখ থাকতে হবে। দেখতে চাইলে যেমন চোখ খুলে ফেলি, খেতে গেলে যেমন ঠোঁট দুটো ফাঁকা ক'রে ফেলি তেমনি নিরন্তর সজাগ থেকে ভিতরের প্রবৃত্তির কারসাজিগুলি হাতে-হাতে ধরে ফেলতে হবে। হীনম্মন্যতায় বা অভিভূতিতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিজের ভুল সমর্থন করা চলবে না। কেউ যদি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও আক্রমণাত্মকভাবেও আমাকে আমার ভুল ধরিয়ে দেয়, তখন অহংকারের প্রশ্রয় দিতে গিয়ে ঐ ভুল justify (সমর্থন) করা চলবে না। তখনই সহজভাবে ভুলটাকে ভুল ব'লে স্বীকার করে নিতে হবে এবং ঐ ধরনের ভুল যাতে পুনরায় না ঘটতে পারে, তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে বা দণ্ড গ্রহণ করতে বিনীতভাবে রাজি থাকতে হবে। কোথায়, কখন, কেমনভাবে বিরত বা নিরত হওয়া লাগবে তা জানা চাই। ব্যক্তিগতভাবে আমাকে একজন হয়ত কান মলে দিল, ভেবে দেখলাম ঐ কান মলাতে আমার আত্মাভিমান আহত হ'লেও ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠা বা লোকমঙ্গলের ক্ষতি হল না, সেখানে আমি হয়ত তা' উপেক্ষাই করে গেলাম। আবার, আরেকজন হয়ত, তা আমাকে খুব খাতির দেখাতে গিয়ে আমারই সামনে আমার পাঁচজন সহকর্ম্মীকে খাটো করছে ও ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠার ব্যত্যয়ী মন্তব্য করছে, এমনতর ক্ষেত্রে আমি যদি রুখে না উঠি তাহলে কিন্তু নিজেরই ক্ষতি হবে, হীন প্রবৃত্তিকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে। কতকগুলি নীতি মেনে চলাটাই যথেষ্ট নয়। ইষ্টের প্রতি টান বাড়ান এবং তৎপরিপোষণী গুণ acquire (অর্জ্জন) করা ও তাকে living (জীবন্ত) ক'রে নেওয়ার জন্য serious (বিশেষ তৎপর) হওয়া চাই।

এরপর সংহতি সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোমরা সবাই যেমন আমার, তেমনি তোমরা পরস্পরের। তোমাদের স্বার্থ ও মর্য্যাদা এক সুতোয় গাঁথা। তোমাদের কেউ যদি down (খাটো) হয়, তাহলে সকলেই কিন্তু down (খাটো) হল। তোমাদের কেউ কখনও আরেকজনের

সাত্বত স্বার্থের বিরোধী হ'তে পার না। আবার, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে নিজের বা অপরের ক্ষতি করতে চায়, সেখানে তুমি ভাল মানুষটি সেজে ব'সে থাকতে পার না। কারণ, তার বা অপর কারও ক্ষতি হলে তাতে তোমার ক্ষতিও অবধারিত। আত্মসংশোধন যেমন অবশ্য করণীয়, ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠার্থে অপরের সংশোধনে তৎপর হওয়াও তেমনি তোমার কর্ত্তব্য। দোষদর্শনের বুদ্ধি নিয়ে এটা করতে হয় না। এটা করতে হয় ভালবেসে—যেখানে যেমনভাবে উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হতে পারে, তেমনই ক'রে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের হওয়ার মধ্যে অনেকখানি বুদ্ধি, বিবেচনা ও করণীয় থাকে। নিজ পরিবারের লোকদের সম্বন্ধে আমাদের কেমনতর feeling (বোধ) থাকে, সেইটে ভেবে দেখলেই হয়।

কালিদাসদা (মজুমদার)—অনেকে বলে, কথা কমান দরকার, কিন্তু যাজন ও অপরের সংশোধনমূলক কিছু করতে গেলে কথা বলা তো দরকার হ'য়ে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাজে কথা অবশ্যই কমান ভাল। নাম-ধ্যানে কথা কমেই, কিন্তু কথা কমিয়ে তলে-তলে কুচিন্তা ক'রে প্রবৃত্তিকে তা দেওয়া ভাল নয়। বরং ভিতরটা উথলিয়ে তুলে নিজের ভিতরের গুপ্ত প্রবৃত্তিগুলিকে আবিষ্কার ক'রে সেগুলি adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা ভাল। আমি অনেক সময় একজনকে এমন আর-একজনের সাথে যুতে দিই যারা পরস্পর একসাথে চলতে গেলে খটাখটি না বাধিয়েই পারে না। তারা উভয়েই যদি আত্মবিশ্লেষণপরায়ণ হয় তাহলে প্রত্যেকেই নিজের দোষ খুঁজে বের করতে ও তা সংশোধন করতে চেষ্টা করে। অনেকে নির্জ্জনে থেকে সাধনা করা পছন্দ করে। আমার কিন্তু মনে হয়, নির্জ্জন সাধন এবং জনসংসর্গে থেকে ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠামূলক বাস্তব কর্ম্ম—এই দুটো এক যোগে চালান এবং নিজের প্রতিটি ভুলত্রুটি নির্ম্মমভাবে ধরা ও কঠোরভাবে সেগুলির সংশোধনে লেগে থাকা সাধনার পক্ষে বেশী সহায়ক। তবে সুযোগ থাকলে এই সঙ্গে ইষ্ট ও ভক্ত সঙ্গ করা খুব দরকার।

১৪ই বৈশাখ ১৩৫৬, বুধবার (ইং ২৭।৪।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে প্রেরিত পুরুষদের চরিত্রগত লক্ষণ সম্বন্ধে বললেন —তাঁরা কখনও বৈশিষ্ট্য নষ্ট করেন না বরং তা' পোষণে বাড়িয়ে তোলেন। তাঁদের বাণী এমনতর, যাতে মানুষ প্রবৃত্তির ঊর্দ্ধে ওঠার প্রেরণা পায়। প্রবৃত্তির ঊর্দ্ধে ওঠা মানে কিন্তু প্রবৃত্তিগুলিকে খতম করে দেওয়া নয়, বরং তাদের উপর এমনতর আধিপত্য লাভ করা, যাতে সেগুলি সত্তাপোষণের সহায়ক হয়। তাঁরা প্রত্যেকটি সত্তাসংবর্দ্ধনী মতবাদের যুগোপযোগী পরিপূরণ দেখান। কোন একদেশদর্শী মতবাদ যদি থাকে, তারও পরিপূরণ ও সমাধান কিভাবে হ'তে পারে তার ইঙ্গিতও তাঁরা দিয়ে যান। অতীত ঐতিহ্য স্বীকার ক'রে নিয়ে বৈচিত্র্য-সমন্বিত ঐক্যের পথ দেখান তাঁরা। তাঁরা কিন্তু আসেন সব দেশের সব মানুষের জন্য।

পরে কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ইষ্টগোষ্ঠী বলতে তাঁর সন্তান-সন্ততি ও শিষ্যবর্গ দুই-ই বোঝায়। তাদের মধ্যে যারা যতটুকু তদনুগ চলনে চলে তাদের মধ্যে তিনি ততটুকু সঞ্জীবিত থাকেন।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি মৃত্যুকে অবলুপ্ত করার কথা বলেছেন, তা কি সম্ভব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না মরতে গেলে যা' করতে হয়, তা' যদি করা যায় তাহলে হয়ত এটা অনেকখানি সম্ভব হতে পারে। জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে স্মৃতিবাহী চেতনা যদি থাকে, তাহলে সেটাও প্রকারান্তরে একভাবে মৃত্যুকে জয় করা!

যামিনীদা (রায়চৌধুরী) জিজ্ঞাসা করলেন—বাঁধনে কতদিনে কাটে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক লহমায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে ব'সে যতিবৃন্দের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—সৎসঙ্গ-অধিবেশনগুলি এমন ক'রে করতে হয়, যাতে সেগুলি চিত্তাকর্ষক হয় এবং লোকের উপস্থিতি খুব হয়। সৎসঙ্গগুলি যদি আনন্দদায়ক ও বোধসন্দীপী হয়, তাতে অদীক্ষিত লোকেরাও যোগদান করতে আগ্রহশীল হয় এবং সৎসঙ্গে আসতে-আসতে আপনা থেকেই দীক্ষা নিতে চায়। যা'ই করতে চাই কতকগুলি pushing whole-time worker (উদ্দীপনা-সঞ্চারকারী পূর্ণকালীন কর্ম্মী) যোগাড় করা চাই to organise people (লোকগুলিকে সংগঠিত করার জন্য)। বইগুলি তাড়াতাড়ি ছাপান লাগবে। বইগুলি শিক্ষিত লোকগুলির মধ্যে চারিয়ে দিতে হয়। সর্ব-সাধারণের মধ্যে বইগুলি যদি ছড়িয়ে পড়ে তাতেও কিন্তু দেশের মধ্যে একটা healthy atmosphere (সুস্থ আবহাওয়া) সৃষ্টি হতে পারে। ছড়ার বইগুলি ও অন্যান্য বই যদি প্রত্যেকটি অধিবেশনে পাঠ ও আলোচনা হয়, তাতে কিন্তু সবাই অনেকখানি educated (শিক্ষিত) হতে পারে। বাইরে যাজন যেমন চালাবে, প্রত্যেকটি সৎসঙ্গী-পরিবারে তেমনি ইষ্ট-প্রসঙ্গের ধুনি জ্বালিয়ে রাখতে হয়। পাঁচজন সৎসঙ্গী একজায়গায় মিলিত হলে আজেবাজে কথা না ব'লে যাতে ইষ্টাস্বার্থপ্রতিষ্ঠা-মূলক আলোচনা করে তার ব্যবস্থা করতে হয়। ঋত্বিক ও অন্য পাঞ্জাধারী কর্ম্মীদের মধ্যে এটা যতখানি স্বভাবগত হয়ে ওঠে ততই এই ধরণটা অজ্ঞাতসারে চারিয়ে যায়। খুব খাটুনি চাই। আগে যা' করিনি এবং তার দরুন যে সব খাঁকতি আছে তা পূরণের জন্য খুব বেশী ক'রে খাটতে হবে। ভাল-ভাল কর্ম্মীদের যদি গাড়ী থাকে তাহলে তারা কিন্তু একজনে দশজনের কাজ করতে পারে। আবার, প্রত্যেকটি কর্ম্মীর চেষ্টা করা লাগে যাতে উপযুক্ত একদল সহকর্মীর সৃষ্টি হয়। স্থান, কাল, পাত্র অনুযায়ী যেখানে যেভাবে যা' করতে হবে, সেটা নিজেদের মাথা খাটিয়ে বের করতে হয়। কেমন ক'রে করতে হবে সেটা আবার নিজের ভিতর অনুধাবন না থাকলে বাইরে থেকে সব কয়ে দেওয়া যায় না। তাকেই বলা যায় কর্ম্মী-ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার ধান্দা যাকে সবসময় পেয়ে বসে থাকে। ঐরকম হলে অন্য কোন প্রবৃত্তি তাকে কাবু

করতে পারে কমই। তার চোখেমুখে দেবভাবের দ্যুতি ফুটে ওঠে। সে হয়ত পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, তাকে দেখামাত্র মানুষের মনে হবে—এ কি স্বর্গের দেবতা। সত্যিই ইষ্টপ্রাণ হলে পরিবেশের মধ্যে এমন প্রভাব হতে বাধ্য।

যতীনদা—আশানুরূপ কাজ হচ্ছে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের বেশীর ভাগের হয়েছে—কাজ হলে ভাল হয়; কিন্তু দায়িত্বটা যে নিজের, সেইভাবের urge (আকূতি) নেই। যতদিন আবেগ ছিল, ততদিন অসম্ভব হওয়া হয়েছে—একেবারে আমাদের হিসাবের বাইরে। একটা group (গুচ্ছ) থাকা লাগে, যারা সবসময় ঐ আগ্রহ ও ধাঁধা নিয়ে চলবে। অনেকের মাথায় করণীয় সম্বন্ধে আগ্রহ জাগছে, তাদের ইন্ধন যদি না যোগান, active (সক্রিয়) ক'রে যদি না তোলেন, ঐ ভাব উদয় হতে যেয়ে নিভে যাবে। আমাদের ভোগের দিকে লোভ গেছে, মানুষ পাওয়ার লোভ ক'মে গেছে এটা ভাল লক্ষণ নয়। আগে ছিল, একটা মানুষ পেলে যেন স্বর্গ পেলাম। এই ভালবাসার আওতায় এসে মানুষ-গুলিও নিজেদের মহালাভবান মনে করত। যেমনতর ভালবাসা কোথাও পাওয়া যায় না, তেমনতর ভালবাসার স্বাদ পেয়ে তারা মহা সুখী হত। মানুষের জন্য মানুষগুলি কত খাটত, কত করত। অর্থলোভীর যেমন অর্থের জন্য খাটুনিটা গায়ে লাগে না, তাদের তেমনি মানুষের উপর লোভ থাকায় তাদের সেবাযত্ন করার খাটুনিটা খাটুনি বলে মনে হত না।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু সময় চুপ করে থেকে খানিকটা ফিসফিস করে অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে বললেন—আমার মনে হয়, আমাকে ভালবাসায় ভুলিয়ে, মা'র অভাব টের পেতে না দিয়ে, যদি কেউ করিয়ে নেয় তাহলে আবার সব হতে পারে—প্রেসার মেশার কিছু থাকে না। আগে উদ্যম যখন ছিল তখন চোর, ধাউড়, গুণ্ডা প্রভৃতি লোকদের দিয়েও অসাধারণ কাজ করিয়ে নিয়েছি। একটা মাতাল নেশা নিয়ে চলা লাগে। ভাব নিয়ে কথা বলতে-বলতে যেমন ভাব আরও চেতে ওঠে, ভাল গোঁ নিয়ে চলতে লাগলেও তেমনি তা' ক্রমাগত চড়তে থাকে। আমার আবার গোঁ-টা কমতই না, সবসময় লেগেই থাকত। সামনে যাকে পেতাম তাকেই তাতিয়ে তুলতাম। সে কি দিনই গেছে! সৎসঙ্গের মত এমনতর মানুষ-সম্পদ আর কার আছে আমি ভেবে পাই না। এদের ঠিকভাবে চালনা করতে পারলে জগতে স্বর্গরাজ্য সংস্থাপিত হয়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। আলাপে-আলোচনায় শ্রীশ্রীঠাকুর যতিদিগকে ক্রমাগত তাদের মহৎ আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উদ্দীপ্ত করে তুলছেন।

কথায় কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যতি-আশ্রমে এসে এদের need (প্রয়োজন) কত ক'মে গেছে। বিড়ি, সিগারেট, পান, চা, মিষ্টি আরও কত জিনিস ছেড়ে গেছে, তবু সবার শরীর ভাল আছে।

পূজনীয় খেপুদা বললেন—অর্থনীতিতে বলে standard of life (জীবনের মান) যত উন্নত হয়, যোগ্যতাও তত বাড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভিতরে যদি higher urge (উচ্চতর আকূতি) থাকে, তাহলে standard of living (জীবনধারণের মান) plain (সাদাসিদে) হওয়া সত্ত্বেও higher efficiency (উচ্চতর দক্ষতা) লাভ হয়। এই হল সাত্বত জীবন-চলনের লক্ষণ।

খেপুদা—প্রয়োজন বাড়ালেই তো সেই প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে ক্ষমতা বাড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বুঝি প্রবৃত্তির প্রয়োজন যত বাড়াব, efficiency (যোগ্যতা) তত ঢিল হয়ে যাবে, প্রেষ্ঠকে পূরণ করার urge (আকূতি) যত বেড়ে যাবে এবং diet (খাদ্য) যত plain (সাদাসিদে) হবে, efficiency ও acquisition (যোগ্যতা এবং উপার্জন) তত বেড়ে যাবে ; আর সেটা all-round efficiency, all-round acquisition (সর্বতোমুখী যোগ্যতা, সর্বতোমুখী অর্জন)। তাতে শুধু টাকা-পয়সাই বাড়বে না—চরিত্র বাড়বে, সংযম বাড়বে, সেবাবুদ্ধি বাড়বে, মৌলিক চিন্তাশক্তি বাড়বে। এক-একজন মানুষকে দেখে শত শত মানুষের মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসবে।

পাশের বাড়িতে কয়েকজন স্থানীয় লোক তাড়ি খেয়ে হল্লা করছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে-হাসতে বললেন—নেশা করলে নাকি অমনি করতে ইচ্ছা হয়, যারা ঐ-রকম করতে আরম্ভ করে, তাদের আবার ঐ-রকম করাটাই পেয়ে বসে। ওতেই আরাম পায়। আপনাদেরও যদি মদের নেশার মত অনুরাগ থাকে, তাহলে ইষ্টকাজের মত্ততা ছাড়া কিছুই ভাল লাগবে না। ঐ আপনাদের পেয়ে বসবে।

রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা এমন কোন ব্যবস্থা চাই না, যেখানে সাত্বত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নাই। সুখে থাকার প্রলোভনে যদি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নষ্ট করি, তাহ'লে দেখতে পাব জীবনটা কি যন্ত্রণাময়। রাষ্ট্রের খেয়াল-খুশী তামিলের জন্য মানুষ জন্মগ্রহণ করেনি। মানুষের কাম্য হ'ল বৈশিষ্ট্যসম্মত সম্যক জীবনবৃদ্ধি। আর, রাষ্ট্রের কাজ হ'ল তারই পোষণ জোগান। রাষ্ট্র যেখানে মানুষকে তার দাস ক'রে তুলতে চায়, তেমনতর রাষ্ট্রের অধীনে থাকা মানে মনুষ্যত্বের অবমাননা করা। একবার ঐ ধরনের রাষ্ট্র কায়েম হ'লে, তার পরিবর্তন সাধনও প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হ'য়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভূপেনদাকে বললেন—আমরা ধর্ম্ম বলতে বুঝি—বাঁচাবাড়ার জন্য যা' যা' লাগে তার সবকিছু। তাই রাজনীতি ধর্ম্মেরই অঙ্গীভূত। রাজনীতি যদি ধর্ম্ম অর্থাৎ সত্তা-সম্বর্দ্ধনী নীতির অনুগত না হয়, তবে সে রাজনীতির দাম কি ?

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর যতিদের লক্ষ্য ক'রে বললেন—শুধু তত্ত্ব আলোচনাতে হবে না, চাই ইষ্টার্থে লোক সংগ্রহ। আমরা বুঝে-শুনেও ঠিক মত করিনি। আমি যদি এখান থেকে ত্রিকূট যেতে চাই—ভেবে নিতে হবে—আমি যেখানে আছি সেখান থেকে আমার গন্তব্যে কিভাবে, কেমন ক'রে যাব। ঠিকভাবে ভাবাও চাই, আবার ভাবা অনুযায়ী করাও চাই। আবেগ নিয়ে ঝাঁপ দেওয়া চাই। তোমরা করলেই পার।

তোমরাই এক এক টার্মে দশ-বার হাজার লোক দীক্ষা দিয়ে ফেল। তোমরা এ পর্য্যন্ত যত লোক সংগ্রহ করেছ, তাদের মাথায় যদি ঠিকভাবে ঢোকাতে পার, তাহ'লে অসম্ভব কাণ্ড হয়ে যায়। বক্তা, লেখক, সংগঠক, নেতা, নানা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের লোক চাই। তাদের দিয়ে আবার সমাজের সব স্তরের মধ্যে কাজ করতে পারে এমনতর কতকগুলি কর্ম্মীগুচ্ছ সৃষ্টি ক'রে তাদের উপর বিশেষ-বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে কাজে লাগিয়ে দিতে হয়। দেশের যে যেখানে আছে, সে সেখানে ব'সেই যেন তোমাদের স্পর্শ পেয়ে আশায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে। একটা মানুষকেও যেন বাদ দেওয়া না হয়। কাউকেও ignore (উপেক্ষা) করবে না। কাকে দিয়ে কি কাজ হতে পারে কে বলতে পারে ? আজ যারা রত্নাকর হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাল তারাই হয়ত তোমাদের স্পর্শে বাল্মীকি হ'য়ে উঠবে।

যতীনদা—আসল কথা তো চরিত্র।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Urge (আকূতি) না থাকলে শুধু চরিত্রে কিছু হবে না। Urge (আকূতি) থাকলেই চরিত্র জীবন্ত হয়। কারও ভাল-মন্দের কোন ধার ধারলাম না, নিজের মতো নিজে ভাল মানুষটি হয়ে থাকলাম তাতে কিছু হয় না। ইষ্টের ইচ্ছানু-যায়ী লোকের মঙ্গল সাধনের জন্য অদম্য আবেগ চাই। এর জন্য যে-কোন দুঃখ-কষ্ট আসুক তাকে সাদরে ও সানন্দে মাথা পেতে নিতে হবে। তাই ব'লে আমরা যেন অযথা দুঃখ-কষ্টকে ডেকে না আনি। আবার, দুঃখ-কষ্টকে এড়াবার জন্য যেন compromising (আপোসরফামূলক) চলনে না চলি। এক বগ্গা না হ'লে কোন বড় কাজ করা যায় না। মাতালের মত গোঁ রাখা লাগে। ভিতরটাকে ক্ষেপিয়ে তুলতে হয়। ঐ mood (ভাব) সৃষ্টি ক'রে নিয়ে চলতে হয়।

শরৎদা—অসুবিধা হ'য়ে পড়ে। যেমন সামনে উৎসব, তাতে এই কাজের ক্রমাগতি হয়ত কিছুটা ক্ষুণ্ন হ'য়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে একটা কিছু চাপান পড়লে ভুল হয়ে যায়। চাপানে যাতে দাবাতে না পারে, আগ্রহটাকে সেইভাবে বাড়িয়ে তুলতে হয়। মাথাভাঙ্গা হ'য়ে না লাগলে কি হয় ? মন্ত্রের সাধন কি শরীর পাতন। শরীর পাতন চাই না, মন্ত্রের সাধন চাই।

১৫ই বৈশাখ ১৩৫৬, বৃহস্পতিবার (ইং ২৮।৪।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে ব'সে কথায়-কথায় পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি-প্রসঙ্গে বললেন—পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি কিনা ঠিক বলতে পারি না, তবে বার-বার কতগুলি কথা মনে পড়ে এবং মনে হয় সেগুলি যেন আমার নিজের অতীত জীবনেরই কতকগুলি বাস্তব ঘটনা। মনে পড়ে—চারিদিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা, মাঝখানে যেন একটা উপত্যকা। সেখানে কত লতার ছাউনি, নীচে একখানা পাথর আছে, যে পাথরখানা

দেখলে এখনও চিনি। জায়গাটা খুব নিরালা, সামনে নদী, নদীটা আবার খুব গভীর। কর্ত্তামা আছে, আমি আছি, নৌকা ক'রে যাচ্ছি নদীতে। কত কাছিম সেই নদীতে। কাঠের ঘর, নীচে ফাঁকা। আমার এক স্ত্রী ছিল, মণিপুরী বলে মনে হয়। কাছে বিরাট মাঠ, তার পাশে বাজার। পাশ দিয়ে লাল সুড়কি দেওয়া রাস্তা। একটা ই'দারার মত খানিকটা দূরে। ঐ রাস্তা দিয়ে সেই বাড়িতে যাওয়া লাগে। বারবার হুবহু কতকগুলি বিভিন্ন রকমের দৃশ্যের স্মৃতি মনে পড়ে। সেগুলি আদৌ কল্পনার ব্যাপার নয়, বাস্তবে অনুভব করা পূর্ব্বস্মৃতির মতো মনে হয়। ঠিক ছবি দেখতে পাই—খুঁটিনাটি সবকিছু নিয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে বড়াল-বাংলোর মাঠে ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট।

অধ্যাপক মণি চক্রবর্ত্তীদার সঙ্গে কথা বলছেন। চারিদিকে অনেকেই উপস্থিত আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ম'রো না, মেরো না, পার-তো মৃত্যুকে অবলুপ্ত কর—এর চাইতে প্রিয় কথা আর কি আছে? জীবনটার প্রতি আমাদের যেমন ঘোর আগ্রহ, তাতে মৃত্যুকে অতিক্রম করার চেষ্টা আমাদের পক্ষে অতি স্বাভাবিক। মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে-ক'রে আমরা জীবনের ভূমিকে দৃঢ়তর ক'রে চলব—এই তো আমাদের তপস্যা। এই তপস্যাকে সফল করতে গেলে ভাবা চাই, কেমন ক'রে অন্যের বাঁচাটাকে সাবুদ ক'রে আমাদের বাঁচার ভিত্তি স্থায়ী হ'তে পারে। এই সংগ্রামে ব্রতী ক'রে তুলতে হবে সমগ্র মনুষ্যজাতিকে। অজ্ঞতা ও প্রবৃত্তি-পরায়ণতাকে যদি প্রশ্রয় দিই, আর সঙ্গে-সঙ্গে অন্য সব রকম চেষ্টা চালিয়ে যাই, তাহ'লে কিন্তু মরণের শক্তিকেই শক্তিমান ক'রে তোলা হবে। তাই সত্তাসম্বর্দ্ধনী আদর্শে নিষ্ঠা এবং প্রবৃত্তি জয়ের সাধনাকে এন্তার চারিয়ে দিতে হবে। ধর্ম্ম বলতে আমি বুঝি এই। এর মধ্যে দীক্ষা, শিক্ষা, বিবাহ, বিজ্ঞান, ব্যবসা, বাণিজ্য, উৎপাদন, গবেষণা, সহযোগিতা, অসৎনিরোধ হাত ধরাধরি ক'রে আসবে। ধর্ম্মের ভিত্তিতে গেঁথে তুলতে হবে আর যাবতীয় যা'-কিছুকে। আর, ইষ্ট বা আদর্শকে সঞ্চারিত করতে হবে সবকিছুর মধ্যে। প্রত্যেকটি মানুষ যদি প্রত্যেকটি মানুষের না হয়, প্রত্যেকটি সম্প্রদায় যদি প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের না হয়, প্রত্যেকটি সমাজ যদি প্রত্যেকটি সমাজের না হয়, প্রত্যেকটি দেশ যদি প্রত্যেকটি দেশের না হয়, আর সবকিছু যদি ভগবানের জন্য না হয় তাহ'লে কিন্তু mutual love ও creative effort-এর (পারস্পরিক ভালবাসা ও সৃজনী প্রচেষ্টার) প্লাবন জাগানো যাবে না। সেই ভাবের দ্যোতনা সঞ্চার করাই আমাদের ব্রত। ভারতে যখন জন্মগ্রহণ করেছ তখনই তোমার উপর অর্শেছে এই পূত ভাগবৎ দায়িত্ব।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু থেমে বললেন—লেখাপড়া জানি না, ভাষাও জানা নাই, কইতেও পারি না, তবু কই। আবার, মাঝে-মাঝে মনে হয় লেখাপড়া জানলে বোধহয় তার মধ্যে নানা মেশাল থাকত। এ সব জিনিস এমন খোলাখুলি বলতে পারতাম না। আর আমিই বা বলবার কে? মালও পরমপিতার, কওয়ানও তিনি।

এরপর মণিদা মন সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা বলি সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ। তাঁর থেকেই সব। জীবন্ত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ যখন আসেন, তখন তাঁর মধ্যেই দেখতে পাই জীবনের পূর্ণ রূপ। চিৎ-চেতনা, চিত্ত বা চৈতন্য না থাকলে মন থাকে না। মন বস্তুর সাড়া গ্রহণ করে। বস্তু মনের উপর তরঙ্গ তোলে, তাই মন কত বিচিত্র ভাবে ক্রিয়া করে। এই মন দিয়ে যখন মানুষ সচ্চিদানন্দের মনন করতে শুরু করে, তখন আসে মনের সার্থকতা। প্রথমে আসে চিন্তার মতো করে, তারপর আসে ছবির মতো হ'য়ে। তারপর ধীরে-ধীরে মনন সমাধিতে সার্থকতা লাভ করে. মানুষ বোধস্বরূপ হ'য়ে ওঠে। সমাধি লাভের পর যে জ্ঞান আসে, তার মধ্যে ঐক্যজ্ঞান ও বৈশিষ্ট্য-জ্ঞান দুই-ই থাকে। মানুষ যুগপৎ ঋষি ও বিজ্ঞানী হয়। তার বোধের জগৎকে সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করার জন্য সে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কার ক'রে বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে চরম উৎকর্ষের দিকে। এতে মানব কল্যাণের কত রকম পথ যে আবিষ্কৃত হতে পারে তার লেখাজোখা নেইকো। আমার মতো তোমরাও ভাব, লেগে থাক, কর, তাহলে দুনিয়াকে অনেক কিছু দিতে পারবে। তখন সারা পৃথিবী স্তম্ভিত বিস্ময়ে তোমাদের নতি জানাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে ব'সে যতিদের বললেন—আপনাদের খানিকটা এস্তামাল হ'লে আর পারার জো নেই, একেবারে মানুষের উদ্ধাতা হয়ে যাবেন।

পরে ভূপেনদাকে বললেন—মানুষ জোগাড় করবে দেখে দেখে। যেমন বলিয়ে-কইয়ে তেমনি হৃদয়বান, বিবেচক, তেমনি মিশুক—মানুষের একটা আকর্ষণী কেন্দ্রস্বরূপ। মানুষই আসল জিনিস। মানুষের মতো মানুষ পেলে—অবশ্য তাদের আসল গুণ চাই অকাট্য ইষ্টনিষ্ঠা—তাহ'লে তাদের দেখে কত মানুষ এসে জুটে যায়।

শরৎদা—অনেকে তো বলেন মোহমুদ্গর ভারতীয় কৃষ্টির একটা হতাশাব্যঞ্জক দিক এবং তাতে ভারতের সর্ব্বনাশ হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মোহমুদ্গরের জন্য ভারত নষ্ট হয়নি, ওটা প্রবৃত্তির বাঁধন থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য বলা। প্রধান কথা হচ্ছে, আমাদের সব কিছুই হওয়া চাই ইষ্টের জন্য। ইষ্টের চাইতে অন্যকিছু যদি বড় হয়, তাহ'লে সেইটেই হয়ে দাঁড়ায় আমাদের জীবনের প্রতিবন্ধক স্বরূপ। আমিও তো বলেছি—ইষ্টের চেয়ে থাকলে আপন, ছিন্নভিন্ন তার জীবন। আপনাদের এখানে এনে রেখেছি কেন? প্রবৃত্তিমুখী হ'য়ে সংসার তো ঢের করলেন, ওতে সংসারও ঠিক-ঠিক করতে পারেননি। আপনারা যদি অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ হন, তাহ'লে আপনাদের দেখে মানুষ ইষ্টার্থে সংসার ও যাবতীয় কর্ম্ম করতে শিখবে। তাতে তাদেরও মঙ্গল, তাদের সংসারেরও মঙ্গল, দেশের, দশেরও মঙ্গল। যে-সব মানুষ ইষ্টার্থে সংসার করে তাদের ঘরেই দেবতার মত মানুষ জন্মগ্রহণ করতে পারে। ঈশ্বরকোটি পুরুষ ছাড়া, দৈবী সংস্কার সম্পন্ন মানুষ ছাড়া আমার এই কাজ করা কঠিন। মানুষ সংসারী হওয়া সম্বন্ধে আমার

কোন আপত্তি নেই। কিন্তু সংসারের ভিতরে থেকেও তাদের থাকা চাই সংসারের ঊর্ধ্বে। প্রবল ইষ্টনিষ্ঠা ছাড়া তা' হওয়ার নয়। আমি জনক চাই, নিতাই চাই। কোন সাত্বত কৃষ্টি চায় না যে, মানুষ প্রবৃত্তির হাতে ক্রীড়নক হ'য়ে থাকুক। প্রবৃত্তির উপর আধিপত্য থাকুক এইটেই চায় সব কৃষ্টি। আমরা নিজেদের যদি control (সংযত) করতে না পারি, তাহ'লে মানুষের কিছু করতে পারব না।

১৬ই বৈশাখ ১৩৫৬, শুক্রবার (ইং ২৯। ৪। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে ব'সে শৈলেশদা (ব্যানাজ্জী)-র ঋত্বিক বই-এর পাতায় লিখে দিলেন—

যা' করবে তা'
পাকাপাকি—
নিষ্ঠায়-
সত্তা সম্বর্দ্ধনী ক'রে—
উপচয়ে।

তোমারই দীন
"আমি"

শৈলেশদা জিজ্ঞাসা করলেন—পাকাপাকি মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Thoroughly (পুরোপুরি)।

শৈলেশদা—Thoroughly (পুরোপুরি) ভাবতে পারি না যে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Thoroughly (পুরোপুরি) ভাবতে পারছ না তার কারণ, জিনিসটা সংঘটন হয়নি তোমার মাথায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন।

সেই প্রসঙ্গে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) বললেন—ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে প্রতিমুহূর্ত্তে ইষ্টকে বারবার জিজ্ঞাসা করতে গেলে হয় না। যা' করণীয় ভেবে-চিন্তে, বুদ্ধি-বিবেচনা ও দায়িত্ব সহকারে করতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, তাই তো!

প্রফুল্ল কথাপ্রসঙ্গে বলল—ভারতবাসীদের মধ্যে ত্যাগের নেশা আছে খুব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ত্যাগের নেশা আছে, কিন্তু সংহতির নেশা নাই।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

ত্যাগ মানেই—
সত্তা সম্বর্দ্ধনার অন্তরায়ী যা',
তা' হতে বিরত থাকা।

কেষ্টদা—নাম-ধ্যান করলে মনের মধ্যে একটা নির্লিপ্ত অর্থাৎ আলগা ভাব হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আলগা ভাব হয়েও চেতনা keen (তীব্র) হয়। চৈতন্য-সমাধির

মধ্যে থেকে কাজকর্ম্ম করার সুবিধাই হয়, তার পরে গেলে তখন পারা যায় না।

কেষ্টঠাকুরের সম্বন্ধে কথা আছে—অতি ছল, অতি খল, অতীব কুটিল। আবার, ঘৃণা-লজ্জার ভাবও থাকে না। বারবার চেষ্টা ক'রে প্রতিহত হ'লেও প্রতিনিবৃত্ত হয় না। রামকৃষ্ণদেব অমনি ছিলেন। নিজে থেকে সব জায়গায় গিয়ে উঠতেন, বারবার যেতেন। আবার কথার এমন একটা ঢঙ্ও ঢং ছিল যে, কেউ চটতে পারত না। প্রীতির সঙ্গে বলতেন, সকলেরই ভাল লাগত। আবার, কঠোর কথাও মিষ্টি ক'রে বলতে পারতেন, স্পষ্টবাদী মিষ্টভাষী মতো ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু থেমে বললেন—আরেকটা বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে, এক-একটা বিষয় ধ'রে নিজেদের মধ্যে তুখোড় তীক্ষ্ম সর্ব্বতোমুখী আলোচনা চালান। তখন কোন্‌টা কিভাবে utilise (প্রয়োগ) করা যাবে সেটা বোঝা যায়। সব বিষয়ের আলোচনা ক'রে এই জিনিসটা বোঝা লাগে। এতে কথা ও যুক্তির finer and finer (আরও আরও সূক্ষ্মতর) রকম বেরবে। রামকৃষ্ণঠাকুরের ওখানে দলে-দলে discussion (আলোচনা) চালাতই। আমার এখানেও আগে ছিল—হয় discussion (আলোচনা) করছে, না হয় ধ্যান, ধারণা, পাঠ, কীর্ত্তন এর যে-কোন একটা নিয়ে লেগে আছে। Discussion (আলোচনা) নিজেদের মধ্যে করতে হয়। আমি বই-এর মত হ'য়ে গেছি, আমার সঙ্গে discussion (আলোচনা) হ'লে হজম হবে না, নিজেদের চিন্তাশক্তি খুলবে না। তাই নিজেদের মধ্যে discussion (আলোচনা) চালান লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে গভীর আবেগের সাথে বললেন—আমার তহ্লার (তৃষ্ণার) নিবৃত্তি নাই। তেষ্টা তো আরও বেড়ে গেল—মানুষের তেষ্টা। আপনারা কে কেমন ক'রে চলেন, কিসে ভাল ক'রে দাঁড়াতে পারেন, কিসে বড় হ'তে পারেন, সব সময় আমার সেই চিন্তা। আমাকে শালা, বদমায়েশ ব'লে গালাগালি দিলেও আমার গায়ে লাগে না, কিন্তু যদি দেখি যে আপনারা আদৃত হচ্ছেন না, skilfully (সুকৌশলে) manage করতে (কাজ চালাতে) পারছেন না, কিংবা কেউ এসে আপনাদের বিরুদ্ধে slightingly (তাচ্ছিল্য সহকারে) কিছু বলছে, তখন আমার খচ্‌ ক'রে লেগে যায়। এত লাগে যে, মানুষের সঙ্গে সেই সময় কথাই কইতে পারি না। আপনাদের কোন দোষ শুনতেও ভাল লাগে না, দেখতেও ভাল লাগে না। মনে হ'তে থাকে আমি বুঝি খাটো হ'য়ে যাচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনতে-শুনতে যতিবৃন্দ এবং উপস্থিত সবার চোখমুখ ছলছল করতে লাগল।

শ্রীশ্রীঠাকুরও কিছু সময় আনমনাভাবে দূর আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন।

পূর্ব্ব সূত্র ধরে আবার বললেন—আলোচনাটা স্বাধ্যায়ের একটা অঙ্গ। আলোচনা মানে সম্যক দেখা। শুধু বই পড়লে হবে না—'বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্' চাই। বই পড়ার সঙ্গে আলোচনা, লেখা, বলা, অভ্যাস অর্থাৎ অনুশীলন এ-সব চালান লাগে।

লাগা-জোড়া এই নিয়ে থাকতে হয়—যাকে বলে অতন্দ্র সাধনা। এমন না হলে চরিত্রে রঙ ধরে না। চরিত্রে রঙ না ধরলে হাজার গুণ থাকলেও মানুষ কাছে এসে ইষ্টের ভাবে ভাবিত হ'য়ে ওঠে না।

এরপর বেলা আটটা পঞ্চাশ মিনিটে শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

আলোচনায় পর্য্যবেক্ষণ বাড়ে,
আর অভ্যাসে বাড়ে চরিত্র,
আলোচনায় ধী বাড়ে,
অভ্যাসে বাড়ে ধৃতি,
তাই আলোচনা ও অভ্যাসে
চরিত্র বাড়ে—
ধৃতি ও ধী নিয়ে ;—
আর, করায় বাড়ে পারা,
পারায় থাকে যোগ্যতা।

কেষ্টদা—নামধ্যান বেশী করলে কাজের থেকে মন উঠে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন আবার যে কাজ করা যায় তা accurate (নিখুঁত) হয়। ঐ ইষ্টমুখী মন নিয়ে নিজেকে কাজে লিপ্ত করতে পারলেই হয়।

কেষ্টদা—শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—তাঁর প্রেরণা না আসলে কোন কাজ করবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি প্রেরণা বলতে বুঝি—urge (আকূতি)। আর, তার বিবরণ তো দিয়েছি আপনাদের কাছে। তিনি যা' করতে বলেছেন তা' বাস্তবে করব—এমনতর একটা ঝোঁক রাখা লাগে। ও জিনিসটা স্বভাবতঃই আসে, আবার সেই সম্বেগ না আসলে তা' চেষ্টা করেও আনা লাগে।

কেষ্টদা—মনটা passive (নিষ্ক্রিয়) রাখলে কি প্রেরণা আসার সুবিধা হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—passive (নিষ্ক্রিয়) হ'য়ে থাকার converging reaction-এ (এককেন্দ্রিক প্রতিক্রিয়ায়) আসে ওটা। তন্মুখী হ'য়ে passive (নিষ্ক্রিয়) থাকতে হয়। তখন একটা চিন্তা আসল, তার খুঁটিনাটি সবদিক বিবেচনা করলাম, চিন্তার সর্ব্বাঙ্গীণ রূপটা বুঝে নিলাম। পরে তাকে আদর্শ পোষণী ক'রে materialise (বাস্তবায়িত) করলাম—নিজেকে ও আমার পারিপার্শ্বিক জগৎকে যথা প্রয়োজন নিয়ন্ত্রিত ক'রে। এ যেন একটা নূতন সৃষ্টিবিশেষ। এর ভিতর-দিয়ে সপারিপার্শ্বিক নিজেকে ইষ্টানুকূলে সংগঠিত করা হয়। এমনতর করার ভিতর-দিয়ে শুধু কার্য্যসিদ্ধিই হয় না, ইষ্টানুগ চারিত্রিক বিন্যাসও হ'তে থাকে। কে কতবড় কর্ম্মী তার পরখ হ'ল সে পারিপার্শ্বিকসহ নিজেকে কতখানি ইষ্টের মনোজ্ঞ চলন-চরিত্রে অভ্যস্ত ক'রে তুলতে পারছে। ইষ্টের মনোমত হয়ে ওঠাই মূল কাজ। বাইরের কাজগুলি তারই পোষক মাত্র। ওইভাবে যে কাজগুলি হয়, তাও আবার মানুষকে ভগবৎমুখী করার উদ্দেশ্যে অনেকখানি সফল হয়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর যীশুখ্রীষ্ট বাইবেলে শিষ্যদের যে অনুশাসন বাক্য বলেছিলেন তার ভাবানুবাদ স্বরূপ নিম্ন কথাগুলি বললেন—

শস্য অপর্য্যাপ্ত কিন্তু শ্রমিক অত্যল্প,
শস্যের কর্ত্তা যিনি তাঁর কাছে প্রার্থনা কর—
শ্রমিকদিগকে পাঠাতে শস্য সংগ্রহে ;
যাও, মানুষের কাছে বল—
স্বর্গরাজত্ব নিকটে,
পীড়িত যারা—নিরাময় কর তাদের,
মৃত যারা—তাদিগকে ওঠাও,
কুষ্ঠী যারা—তাদিগকে পরিস্রুত কর,
অভিভূত যারা—তাদিগকে মুক্ত কর,
দাও, না পেয়ে—
তুমি যেমন পাচ্ছ, না দিয়েই ;
কোমরবন্ধ থলিতে পয়সা কড়ি কিছু নিও না,
রাস্তায় পুঁটলি নিও না,
দুটো জামাও নিও না,
জুতোও নিও না,
লাঠিও নিও না ;
যে করে—
করাই তাদের খোরাক জোগায় ;
পল্লীতেই যাও আর শহরেই যাও,—
যোগ্য অধিবাসীকে খুঁজে বের কর,
আর তার সাথেই থাকো—
যতক্ষণ সেখানে থাকো,
যদি কেউ তোমাকে গ্রহণ না করে,
কিংবা কথায় কান না দেয়—
সে বাড়িতে থেকো না—
তোমাদের পায়ের ধূলি ঝেড়েই
চলে এস সেখান থেকে ;
তোমাদিগকে মেষের মত পাঠাচ্ছি—
নেকড়ে বাঘের ভিতর,
তাই সরীসৃপের মত তড়িৎপ্রজ্ঞ হও,
ঘুঘুর মত ছলনাশূণ্য হও ;
সেই মানুষ থেকে সাবধান থেকো—

শাসক এবং রাজার সামনে
যারা আমার জন্য তোমাদিগকে বেত মারবে,
তাদের কাছে এবং ভদ্র যারা তাদের কাছে
তোমাদের এই হবে পরিচয় ;
বিচারে উপস্থাপিত হ'লে বিভ্রান্ত হ'য়ো না—
কী বলতে হবে,
কেমন ক'রে বলতে হবে,—
তোমার কথা আপনিই বেরিয়ে আসবে
যথোচিতভাবে—যেমন প্রয়োজন—সেই মুহূর্ত্তে ;
কারণ, তুমি কথক নও,
এটা তোমাদের অন্তরস্থ পরমপিতারই প্রেরণা—
যা তোমাদের ভিতর থেকে কথায় উপচে উঠবে ;
ভাই ভাইকে বিশ্বাসঘাতকতায়
মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাবে,
পিতা তার সন্তানের প্রতি
বিশ্বাসঘাতক হবে,
সন্তান-সন্ততি পিতামাতার বিরুদ্ধে
বিদ্রোহী হ'য়ে উঠবে,
তাদের মৃত্যুতে অবসান করবে ;
তোমরা সমস্ত মানুষের দ্বারা ঘৃণিত হবে—
আমার বা আমার নামের জন্য ;
কিন্তু সেই বাঁচবে—
যে শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে অটলভাবে ;
যখন একটা শহরে নির্য্যাতিত হবে,
তখন অন্য নগরে পালিয়ে যেও ;
আমি ঠিক-ঠিক বলছি—
তথাগতের আবির্ভাবের পূর্ব্বে
ইস্রায়েলের শহরগুলিও
পরিক্রমা করতে পারবে না ;
ছাত্র কখনও শিক্ষকের উপরে হয় না,
সেবক তার প্রভুর উপরে হয় না ;
ছাত্রের পক্ষে তাই-ই যথেষ্ট—
যদি সে তার শিক্ষকের মত চলতে পারে,
সেবকের পক্ষে তার প্রভুর মত চলাই যথেষ্ট ;
মন্দমতিরা যদি গৃহকর্ত্তাকেই

মন্দ ব'লে থাকে,
সেবককে আরও কত বলতে পারে—
কিন্তু তা'দের ভয় ক'রো না ;
অবগুণ্ঠিত এমন কিছুই নেই—
যা প্রকাশিত হবে না,
লুক্কায়িত এমন কিছু থাকবে না—
যা' জানা যাবে না ;
যা' অন্ধকারে আমি তোমাদিগকে বলেছি—
তা' মুক্তস্থানে ব'লো,
ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে যা' বলেছি—
তা' চিৎকার ক'রে ব'লো—
বাড়ির ছাদে গিয়ে ;
যারা শরীরকে নিহত করে,
কিন্তু আত্মাকে নিহত ক'রে না—
তাদিগকে ভয় নেই,—
বরং তাদিগকেই ভয় ক'রো—
যারা আত্মা এবং শরীর উভয়কেই
নিহত করতে পারে ;
একটি মুদ্রায় কি দুটি চড়ুই পাখী পাওযা যায় না ?
তার একটাও মাটিতে পড়বে না—
যদি পরমপিতার ইচ্ছা না হয়,
তোমার মাথার চুলগুলি পর্য্যন্ত গোনা ;
তাই বলি—ভয় ক'রো না,
চড়াইদের থেকে তোমাদের দাম অনেক বেশী ;
যারাই আমাকে স্বীকার করবে মানুষের সামনে,
আমি তাদিগকে স্বীকার করব—
আমার স্বর্গীয় পিতার সম্মুখে ;
আমাকে যারা অস্বীকার করবে মানুষের সামনে,
আমি তাদিগকে অস্বীকার করব—
পিতার সামনে ;
ভেব না—আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে এসেছি,
শান্তি আনি নাই—এনেছি তরবারি ;
আমি এসেছি—
পিতাকে পুত্রের বিরুদ্ধে লাগাতে,

মেয়েকে মা'র বিরুদ্ধে লাগাতে,
পুত্রবধূকে শ্বাশুড়ির বিরুদ্ধে লাগাতে ;
হ্যাঁ, তাই বলি—নিজের পরিবারস্থ যা' কিছু
শত্রু হয়ে দাঁড়াবে ;
পিতামাতাকে যে আমার চাইতে বেশি ভালবাসে—
সে আমার উপযুক্ত নয়,
ছেলেমেয়েকে যারা আমার চাইতে বেশী ভালবাসে—
তারাও আমার উপযুক্ত নয়,
যারা দুঃখকষ্ট সহ্য ক'রে
আমার অনুসরণ ক'রে না—
তারাও আমার উপযুক্ত নয় ;
যে জীবনের জন্য ব্যস্ত থাকে —
সে তা হারায়,
যে আমার জন্য জীবন উৎসর্গ করে—
সে তা পায় ;
যারা তোমাদিগকে গ্রহণ করে—
তারা আমাকেও গ্রহণ করে,
যারা আমাকে গ্রহণ করে,
তারা তাঁকেই গ্রহণ ক'রে—
যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন ;
যারা প্রেরিতকে তথাগত ব'লে গ্রহণ করে,
তারা তথাগতেরই পুরস্কার পায়,
তথাগতকে যে ভাল মানুষ ব'লে ভাবে,
সে ভাল মানুষেরই পুরস্কার পাবে ;
এই নগণ্যদের কাউকে
এক বাটী ঠাণ্ডাজলও যে দেয়—
শিষ্য বলে—সে তার পুরস্কার হারাবে না।

এরপর কেষ্টদা জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি যীশুখ্রীষ্টের যে কথাগুলি তর্জ্জমা ক'রে বললেন, আমাদের কর্ম্মীদের ক্ষেত্রেও তো তা' প্রযোজ্য ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে যেখানেই কাজ ক'রে কৃতকার্য্য হয়, এইভাবেই করে। যতি না হ'লে কর্ম্মকুশল হ'তে পারে না।

এরপর খবরের কাগজ আসল। কাগজ পড়া হতে-হতে দেশের কথা উঠল।

মণি চক্রবর্তীদা বললেন—মার্কস্ বলেছেন—কম্যুনিজম্ আসে একটা স্বাভাবিক ঐতিহাসিক প্রয়োজন হিসাবে, চরম ধনতান্ত্রিকতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে শেষটা কম্যুনিজম আসতে বাধ্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কম্যুনিজম-এর পরে আবার আসে তেমনতর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, যা' সমাজ-কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গতিশীল। কম্যুনিজমের ফলে যখন প্রত্যেকটি মানুষ রাষ্ট্রের ক্রীতদাসের মত হ'য়ে যায়। ব্যক্তির নিঃশ্বাসটা পর্য্যন্ত যখন রাষ্ট্রের কাছে বাঁধা পড়ে, রাষ্ট্রের জোর-জবরদস্তি যখন এমন স্তরে পে'ছায় যে প্রত্যেকের চিন্তাধারা পর্য্যন্ত রাষ্ট্র তার নিজস্ব ছাঁদে গ'ড়ে তুলতে চায়, মানুষগুলি যে নিজের মত ক'রে ভাববে তারও উপায় থাকে না, তেমনতর বন্ধনজর্জ্জরিত শাসনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সমাজমঙ্গলমূলক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আসতে বাধ্য। আমাদের বর্ণাশ্রমের লক্ষ্যও তাই। আমি বলি না যে, বর্ণাশ্রমের মধ্যে গলদ ঢোকেনি। সে গলদগুলি দূর করাই দরকার। তা' দূর ক'রে মেজে-ঘষে যদি নেওয়া যায় তাহলে সবারই বৈশিষ্ট্যসম্মত বিকাশ ও বাঁচাবাড়া এবং সেইসঙ্গে এক আদর্শে আনতিপ্রসূত পারস্পরিকতা ও সংহতির পথ খুলে যেতে পারে।

মণিদা জড় বস্তু এবং চৈতন্যের পার্থক্য সম্পর্কে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় ফিজিক্সে যাকে energy (শক্তি) বলে তা' পরম চৈতন্যেরই অপেক্ষাকৃত স্থূল অভিব্যক্তি মাত্র। ঐ যে আছে $E = mc^2$, ও থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, energy (শক্তি) মানে ভর। শক্তিকে ভর-এ রূপান্তরিত করা যায়, আবার ভরকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। শক্তিরই পরিণাম হ'ল বস্তু। মূলে আছে শক্তি বা চৈতন্য। চৈতন্য বা শক্তি বা জড় বস্তু আলাদা নয়, সবই এক জিনিস। হয় বলতে হয় সব বস্তু, কিংবা বলতে হয় সবই চৈতন্য বা শক্তি। বস্তু যাকে বলি তা' স্থূল চৈতন্য বা শক্তি এবং চৈতন্য বা শক্তি যাকে বলি তা সূক্ষ্মতম চৈতন্য বা শক্তি। বস্তু কও তাতেও আমার আপত্তি নেই, চৈতন্য কও তাতেও আমার আপত্তি নেই। কতক এটা, কতক ওটা, আদিতে দুটো চরম উৎস আছে বললে তাতে আমার আপত্তি আছে। আমি যে একমেবাদ্বিতীয়ম্ বলি, সে আমার দেখা জিনিস। যা' আমি নিজে দেখেছি, বোধ করেছি সৃজন-প্রগতিতে আমি তাই-ই বলেছি। এটা fact (তথ্য)—বিজ্ঞান। বেদকে অপৌরুষেয় বলে, তার মানে এটা একটা universal fact (সর্ব্বজনীন সত্য)। যে-ই বিধিমত অনুশীলন করে সে-ই ঠিক পায়। আমি সৃজন-প্রগতি বা অনুভূতির বর্ণনার মধ্যে যা' যা' বলেছি তা' সবার পক্ষেই অনুভবগম্য। আমি এই জন্য বিশেষ কোন কৃতিত্বের দাবি করি না। It is attainable by anybody and everybody (এটা প্রতিপ্রত্যেকেরই অধিগম্য)—অবশ্য বিধিমাফিক করা চাই।

প্রতিলোম-সম্পর্কে কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Incompatible week sperm ও strong ovum (অসঙ্গতিশীল দুর্ব্বল শুক্রাণু এবং শক্তিমান ডিম্বাণু)-র মিলনে বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিক ভাষায় কিভাবে বলতে হয় তা আমি জানি না, কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে,—পুং বীজ যদি ডিম্বাণুর তুলনায় বিবর্ত্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে নিকৃষ্ট হয়, তাতে ফল ভাল হয় না। তাতে পুং বীজ ও ডিম্বাণু দুই-এর উপরেই একটা বিপর্য্যয়ী প্রভাব হয়, জন্মে একটা বাজে জিনিস।

পুরুষ ও নারীর বৈশিষ্ট্য—দুই-ই সেখানে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। টক, ছোট ন্যাংড়া আমকে ভাল করার উপায় আছে। কিন্তু বৈশিষ্ট্য নষ্ট হ'লে তার আর উৎকর্ষের উপায় থাকে না। তখন বিকৃতি-ই বাড়তে থাকে।

বাংলায় আজ কূটনীতিজ্ঞানসম্পন্ন সূক্ষ্মদর্শী কায়স্থ পাওয়ার জো নেই, তাহ'লে কি এই দুর্দ্দশা হয়? কুলীনের মেয়ে হামেশা মৌলিকের ঘরে যাচ্ছে। কয়েছি তো অনেক, তোমরা করলেও না, ধরলেও না, বুঝলেও না, তাই দেশশুদ্ধ মরতে বসেছে। বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা একটা মস্ত কথা। ন্যাংড়া আমকে ফজ্‌লি আম করা যাবে না, ফজ্‌লিকেও ন্যাংড়া করা যাবে না। ফজ্‌লিকে আরও ভাল ফজ্‌লি করতে হবে, ন্যাংড়াকে আরও ভাল ন্যাংড়া করতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে করুণকণ্ঠে বললেন—আমি একলা একটা পাখি এক কোণে ব'সে আপন মনে ডাকি, আপন সুরে গাই, যা' মনে আসে ক'ই। বুড়ো হয়ে গেলাম, জানি না আর কতদিনই বা থাকব, কতদিনই বা মানুষকে আমার কথা শোনাতে পারব, আর দেশ-দুনিয়ারই বা কি করতে পারব। অনেকটা লিখে রেখেছে ও লিখছে এরা, ভবিষ্যতে সেইগুলি দেখে, পড়ে, শুনে মানুষের যদি কিছু মাথা খোলে এবং তারা নিজেদের ভুল শুধরে শুভের আবাহনে তৎপর হয়। আমার বেদনার ভাগীদার আর কেউ নেই তাহ'লে এতদিনে দেশের ভোল বদলে যেত।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে বড়াল-বাংলোর মাঠে বসে কেষ্টদা, পূজনীয় খেপুদা, সুশীলদা (বসু), মণিদা (চক্রবর্তী) প্রভৃতির সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন—মানুষ স্বার্থপর হ'লে শেয়ালের মত ভীরু হয়ে যায়, কিন্তু ইষ্টের হ'লে সে-ই আবার সিংহের মত দাঁড়াতে পারে। যদি concentric (সুকেন্দ্রিক) হও তাহ'লে দুনিয়াকে কিছু দিতে পারবে। করার ভিতর-দিয়ে evolved (বিবর্ত্তিত) হতে হবে। আমরা ইচ্ছা ক'রে ছোট হয়ে আছি।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর উদ্দীপ্ত ভঙ্গীতে বললেন—সাধারণ সৎসঙ্গীদের দেখে বোঝা যায় দেশের কতখানি সম্পদ। এদের মতো ত্যাগবুদ্ধিসম্পন্ন লোক কমই পাওয়া যায়। চালিয়ে নেওয়ার মতো লোকের অভাব, তাহ'লে যে কি বিরাট শক্তি হ'ত তা' ভেবে পাই না। যদি-কে পাড়ি দিতে পারি না, করি না তাই হয় না।

জ্ঞানদা (চক্রবর্তী)—আপনি যা বলেন সারাদেশ সেইভাবে গড়ে তুলতে গেলে অনেক টাকা চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চাই টাকা, কিন্তু করি তাই—যাতে টাকা না আসে। টাকার খোষামোদ ক'রে টাকার পেছনে ছুটে, টাকার মান বাড়িয়ে দিলাম। টাকাকে ignore (উপেক্ষা) ক'রে, ইষ্টের জন্যে এমনভাবে পাগল হলাম না যাতে পায়ে হেঁটে টাকা আমাদের ঘরে এসে খোষামোদ ক'রে কৃতার্থ হয়—আমাকে গ্রহণ ক'রে ধন্য কর ব'লে।

মণিদা—টাকার প্রতি আপনার কী মনোভাব ছিল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ডাক্তারী ছিল আমার পেশা। মানুষকে relief (সোয়াস্তি) দেওয়া ছিল আমার interest (স্বার্থ)। ঐটা আমাকে পেয়ে বসেছিল। অনবরত ভাবতাম, বই দেখতাম কিসে প্রত্যেকের অসুখ তাড়াতাড়ি ভাল ক'রে সারে। এই নিয়ে absorbed (নিবিষ্ট) হয়ে থাকতাম। এইভাবে লোকের ভীড় জমতে লাগল। একজন রোগী হাতে নিলে তার বাড়ির পাশে গিয়ে ঘুরতাম, রোগীর জন্য অস্বস্তি লেগে থাকত। তাই তার বাড়ির কাছে-পিঠে ঘুরতাম যাতে বাড়ির লোক কেউ আমাকে দেখে ডাকে। রোগীর জন্য অস্বস্তি থাকলেও, নিজে থেকে বারবার যাওয়াটা শোভন নয় ব'লে ঐ রকম করতাম। টাকার প্রতি খেয়াল ছিল না। রোগীকে আরাম ক'রে তোলাই ছিল আমার বুদ্ধি। ভোরে উঠতে না উঠতেই দেখতাম, রোগীদের বাড়ি থেকে গাড়ী, পাল্কী এসে জুটে যেত। বাস্তব জীবনে ধর্ম্ম পরিপালন করার বুদ্ধি ছিল। ব্যক্তিগত সাধন-ভজন করণীয় যা' সেগুলি যেমন চালাতাম সঙ্গে-সঙ্গে লক্ষ্য থাকত পারিপার্শ্বিকের সেবার দিকে। হয়তো কুড়ি টাকা পেলাম, তার থেকে দশ/বার টাকা গরীব রোগীদের ওষুধপত্র ও পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা করতে ব্যয় হ'য়ে যেত। সকলেই আমাকে নিয়ে টানাটানি করত। রোগীরাই নিজেদের মধ্যে competition (প্রতিযোগিতা) ক'রে আমার ফি বাড়িয়ে দিতে লাগল। আমার সাধারণ visit (দর্শনী) ক'রে ফেলেছিল ষোল টাকা। টাকার পরে লক্ষ্য ছিল না, আবার কিছু না নিলে মান থাকে না, কদর থাকে না, তাই নিতাম। চাইনি কারও কাছে কিছু, টাকা তখন আমার পিছনে ছুটত। Monthly (মাসিক) হাজার দেড়েক টাকা আয় উঠেছিল। ওদিকে যখন সময় বেশী দিতে পারতাম না তখন ক'মে গিয়ে মাসে পাঁচ সাতশ টাকা, তারপর চারশ টাকা মতো পেতাম। ডাক্তারী করতে গিয়েও প্রথমে যথাসম্ভব টাকা নিতাম না, কিন্তু এদিকে মানুষ জুটে গেল বেশী, খেতের ধানে যখন কুলাত না তখন টাকা নেওয়ার দরকার হ'ত। আমার সব সময় মাকে সাধ্যমত কিছু-কিছু দেওয়ার লোভ ছিল। এখন আমার এত টাকা আসা সত্ত্বেও আমি কিন্তু নিঃস্ব। মানুষ ছাড়া টাকার বিশেষ কোন মূল্য আছে ব'লে আমি বুঝি না। মানুষ থাকলে তারাই টাকা যোগায়। টাকার জন্যে ঘুরলে টাকা পাওয়া যায় না।

এই বাজারে এত বিপর্য্যয়ের মধ্যেও যে বেঁচে আছি তা' সম্ভব হচ্ছে পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর ক'রে—inter-interested (পারস্পরিক স্বার্থান্বিত) সংহতির ভিতর-দিয়ে। পরস্পর পরস্পরের asset (সম্পদ) হয়েছি ব'লে তার উপরই বেঁচে আছি। এটা একটা ক্ষুদ্রতম নমুনা। আমি বিশ্বাস করি whole India (সারা ভারত) ও whole World (সারা পৃথিবী) এইভাবে বাঁচতে পারে।

রাষ্ট্র সম্বন্ধে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—রাষ্ট্রের অধীন প্রত্যেকটি মানুষ liberty (স্বাধীনতা) enjoy (উপভোগ) করুক—with his environment (তার পরিবেশ সহ)। কাউকে slave (দাস) ক'রে রাখা ভাল না। প্রত্যেকে তার ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য নিয়ে বেড়ে উঠুক। প্রত্যেকটি জীবের পক্ষেই তা' প্রয়োজন।

বৈশিষ্ট্য ভাঙা পড়েনি ব'লে কৰ্ম্ম ও অৰ্জ্জনের উল্লাস ব'য়ে যেত এক সময় আশ্রমে। আশ্রমটা হয়ে গেল miracle (অলৌকিক) ব্যাপারের মত। আকাঠ জঙ্গল থেকে অত অল্প দিনে যে ঐভাবে একটা শহর হ'য়ে যেতে পারে, তা' কল্পনাও করা যায় না। সবাই তা' দেখেছে। যার-যার সহজাত সংস্কারের উপর দাঁড়িয়ে একজনের খুশীর জন্যে, মনের আনন্দে কাজ করলে, এমনতর অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হ'য়ে ওঠে।

প্রফুল্ল—শুনেছি তো আজকাল বহুস্থানে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের চেয়ে পরিবেশের প্রভাবের উপর গুরুত্ব বেশী দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতো বুঝলাম, কিন্তু পরিবেশের মানুষগুলিই যে বিসদৃশ অর্থাৎ কেউ কারও মতো নয়। পরিবেশের প্রত্যেকটি মানুষই স্ববৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যবান। তাই তাদের পরস্পরের মধ্যে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্রোত চলে তাও কিন্তু বিশিষ্ট রকমে ঘ'টে থাকে। একই পরিবেশে থেকে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন প্রভাব বিস্তার করে এবং বিভিন্ন-ভাবে প্রভাবিত হয়। এই জিনিসটা যে ঘটে তার মূলে থাকে ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্য।

একটা-একটা ব্যষ্টি নিয়েই সমষ্টি। দুটো ব্যষ্টি এক রকম নেই। সমষ্টি দিয়ে ব্যষ্টি হয় না, ব্যষ্টি দিয়ে সমষ্টি হয়। আমার মনে হয় দেশ তখনই স্বাধীন হয়, যখন দেশের প্রত্যেকটি মানুষ তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাঁচাবাড়ার পথে চলতে পারে—এক আদর্শকে অবলম্বন ক'রে—পারস্পরিক সহযোগিতা ও আদানপ্রদানের ভিতর-দিয়ে।

দিনে ঘুমের অভ্যাস সম্বন্ধে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যে অভ্যাস করেছে তার নিরসনের জন্য প্রথমটা কিছু suffering (কষ্ট) আছেই। এখনও চেষ্টা করলে পারবে, পরে আমার মতো অবস্থা হ'লে আর পারবে না।

১৭ই বৈশাখ ১৩৫৬, শনিবার (ইং ৩০।৪।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। শরৎদা (হালদার), যতীনদা (দাস), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), নরেনদা (মিত্র), কালিদাসদা (মজুমদার), সুরেনদা (বিশ্বাস), ভূপেনদা (চক্রবর্ত্তী), হরেনদা (বসু), হরিদাসদা (সিংহ) প্রভৃতি উপস্থিত আছেন।

বৈরাগ্য-সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একটা জায়গায় অনুরাগ হ'লে অন্য জায়গায় সহজ বিরতি আসে। অনুরাগের সক্রিয় বাস্তবচর্চ্চা তৎ-বিপরীত সবকিছুতে সহজ বৈরাগ্য সৃষ্টি করে। অনুরাগের অনুকূলে কাজগুলি বিন্যাস না করলে বৈরাগ্য বাড়ে না।

তোমরা যেমন ঋত্বিক, আমাকে ভালবাস, কিন্তু তোমাদের পারিবারিক সমস্যা আছে, সেগুলিকে যদি এমন ক'রে নিয়ন্ত্রিত কর যাতে তোমাদের ঋত্বিকতার কাজের অনুকূল হয়, তাহলে তা'র ভিতর দিয়ে একটা সহজ সুকৌশলী রকম আসবে যাতে কষ্ট থাকলেও কৃচ্ছ্রতার বোধ থাকবে না। অনুরাগটা প্রবল হ'লে বৈরাগ্যটা কসরত ক'রে আনতে হয় না, সেই বৈরাগ্যই সহজ বৈরাগ্য।

অনুরাগের অনুকূল চর্চ্চা না থাকলে, ত্যাগটা living (জীবন্ত) হয় না, চরিত্রে ফুটে ওঠে না—মর্কট বৈরাগ্য মতো হয়। আবার, সক্রিয় চিন্তা ও চেষ্টায় অনুরাগের প্রতিকূল যা', তার বর্জ্জনে বৈরাগ্যের অনুশীলন হয়। অনুরাগের সঙ্গে এই বৈরাগ্য অভ্যাস না থাকলে, অনুরাগের থেকে অতখানি বাদ পড়ে। যাকে ভালবাসি, হাসি-মুখে তা'র জন্য দুঃখ, কষ্ট, ত্যাগ ও অসুবিধা এমন কি নিন্দা, অপমান পর্য্যন্ত সহ্য করতে অভ্যস্ত হ'লে ভালবাসাটা আরও উপভোগ্য হয়।

হরপ্রসন্নদা (দাস) বিচার-সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় বিচার মানে কোন্‌টা কতটা আমার আদর্শের অনুকূল বা প্রতিকূল তা' বিবেচনা ক'রে সেইভাবে আচার-আচরণ ক'রে চলা। বিচারের মধ্যে আছে পর্য্যালোচনা ও তদনুপাতিক চলা।

কাকে শ্রমণ করা হবে সেই সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যার চিন্তা ও অভ্যাসে ইষ্টানুগ আত্মশুদ্ধির চারিত্রগত লক্ষণগুলি ফুটে উঠছে, বা যে, সেগুলি নিজের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট এবং যে কিছুতেই তা' থেকে প্রতিনিবৃত্ত না হয়, সেই শ্রমণ হবে। তাকে আপনারা নিষেধ করেও ঠেকাতে পারবেন না। ভিতরে দেবভাবের সংস্কার না থাকলে ঘষে-মেজে তা' সৃষ্টি করা যায় না। হাভাতেগুলি ইষ্টানুগ তপঃপ্রাণতার মধ্যে রস পায় না। তারা শুধু পশুর মত প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির দিকে ছোটে। ইষ্ট ও কৃষ্টির প্রতি নেশায় তারা ইন্দ্রিয়কে আত্মনিয়মনে নিয়ত রাখার পুণ্য প্রচেষ্টায় সুখ খুঁজে পায় কমই। দু'হাজার ঠিক ধরনের শ্রমণ কলকাতায় ছেড়ে দিয়ে যদি সারা শহরটাকে তাদের শুভ চারিত্রিক প্রভাবের বেড়াজালে ঘিরে রাখা যায় তাতে whole Bengal (সারা বাংলা) অনেকখানি ঠিক হ'য়ে যায়। খারাপের যেমন সংক্রমণ হয়, ভালর-ও তেমন সংক্রমণ হয়। যদি কিনা ভাল নেশাওয়ালা চরিত্রবান মানুষ রোজ-রোজ মানুষের দুয়ারে-দুয়ারে হানা দিতে থাকে। তারা উপদেষ্টার ঢং নিয়ে চলবে না। জীবন-চোঁয়ান উদাহরণ ও ইষ্টমুখী নেশা দিয়ে মানুষের অজ্ঞাতে তারা প্রত্যেকের সত্তার গভীরে সম্ভাব খোদাই ক'রে দেবে। আমি চাই আমার ঋত্বিক, অধ্বর্য্যু, যাজকরাও এমনতর হ'য়ে উঠুক। নইলে—মিছে এই সহকার শাখা, মিছে এই মঙ্গল কলস।

শরৎদা—তদর্থভাবনাটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি হয়তো নামটা analyse (বিশ্লেষণ) করে ভাবছেন—নামটা আসলো কিসের থেকে, এর প্রতিপাদ্য কী,—কী fact (তথ্য)-টাকে, কোন্ mechanism (মরকোচ)-টাকে সূচিত করছে এই নাম, এবং তার material manifestation (বাস্তব প্রকাশ) কী,—তার থেকে normally (স্বভাবতঃই) দেখতে পাবেন—ইষ্টের সঙ্গে তার সম্পর্ক, বুঝতে পারবেন—নাম নামী অভেদ, নামের বাচক যিনি তাঁ-তেই নাম সার্থক এবং তিনিই নামের বাস্তব মূর্ত্তি।

আপনার ইষ্টই যে যা'-কিছু analytically ও synthetically (বিশ্লেষণ ও

সংশ্লেষণ সহকারে) সর্ব্বভাবে—এইটে প্রতিভাত হতে থাকবে দুনিয়ার সব-কিছুর ভিতর-দিয়ে। এর অর্থটা ততই উদ্ঘাটিত হবে, যতই ইষ্টের প্রতি emotional (ভাবমুখর) টানের উপর দাঁড়াবেন আপনি। এর ভিতর-দিয়ে পরিণামে বিশ্বরূপ-দর্শন হতে থাকে। বিশ্বরূপ মানে Universal Cosmic Order (বিশ্বজনীন বিশ্বজাগতিক শৃঙ্খলা)-এর তত্ত্বটা—তথ্য-টা ফুটে উঠবে আপনার কাছে প্রত্যেকটার ভিতর দিয়ে—সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, কলা, সমাজ, বিবাহ—সবটার মধ্য-দিয়ে সেই এক-এ সার্থকতা লাভ করে—সপর্য্যায়ে—বিন্যাসে—সমন্বয়ী সমাধানে। তখন আপনার বোধের কাছে ফুটে উঠবে—

"কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাঁহার স্বরূপ
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ।"

এটা actually (বাস্তবে) দেখতে পাবেন।

সমস্ত science (বিজ্ঞান) চুষে নিয়ে, সমস্ত philosophy (দর্শন) চুষে নিয়ে, সমস্ত ism (বাদ) চুষে নিয়ে আপনি সেটা তখন দেখতে পারবেন, বলতে পারবেন, বোঝাতেও পারবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সকাল সাড়ে নটা ও প্রায় দশটার সময় দু'টী বাণী দিলেন। শেষোক্ত বাণী দেওয়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—আপনি যদি গান না'ও জানেন এবং একজন গায়কের প্রতি যদি আপনি সশ্রদ্ধ হ'ন, গান সম্পর্কে আপনার খানিকটা জ্ঞান হবে। এর ভিতর-দিয়ে গানও ফুটে উঠতে পারে একদিন।

মণিদা—গুরু পুরুষোত্তম বা ভগবান বললে লোকে বুঝতে পারে না কিন্তু Superior Beloved (প্রেষ্ঠ) বললে বুঝতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুরু তিনি, যিনি উপদেশ দেন, জীবনবৃদ্ধির পথ ও নিয়মকানুন বাত্‌লে দেন। পুরুষোত্তম মানে best fulfiller (সর্ব্বোত্তম পরিপূরণকারী)—এই তো সোজা কথা। ভগবান মানে—ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয় গুণ যাঁতে আছে তিনি। ভগবান কথার চল এইভাবেই ছিল—যেমন, ভগবান মনু, ভগবান যাজ্ঞবল্ক্য ইত্যাদি। ভগবান কথার মানে—ইংরেজীতে Lord (প্রভু) যাঁকে বলে।

মণিদা একজনের অভদ্র ব্যবহার সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি একটা অন্যায় করেছ। তুমি তাকে তোমার হাতে পেয়ে সেই psychological situation-এ (মনোবিজ্ঞানসম্মত পরিস্থিতিতে) সেই moment-এ (মুহূর্তে) on the spot (সেই স্থানে) যে তাকে sweetly ও tactfully (মিষ্টভাবে ও সুকৌশলে) adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে convince (প্রত্যয়দীপ্ত) ক'রে দিলে না—তাকে যে correct (সংশোধন) ক'রে দিলে না—;

সেইটেই অন্যায় করেছ। সে corrected (সংশোধিত) হয় তা তো তুমি চাও। সে যে uncured (অচিকিৎসিত) অবস্থায় চ'লে গেল, তা'তে আমি হলাম loser (ক্ষতিগ্রস্ত)। তুমি পারতে তাকে soothingly (প্রশান্তভাবে) adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে দিতে। সে সঙ্গতি তোমার আছে। তুমি পাইছিলে opportunity (সুযোগ)— তা' ছেড়ে দিলে। তুমি তেমন ক'রে ধরিয়ে দিলে সেও satisfied (সন্তুষ্ট) হ'য়ে যেতে পারত। যেমন পুঁজ বের ক'রে দিলে রোগী বলে—আপনি বাঁচালেন,—সেও তেমনতর সোয়াস্তি বোধ করতে পারত, যদি তুমি মিষ্টি ক'রে ধরিয়ে দিতে পারতে। মানুষ যদি তোমার সুকৌশলী সংশোধনাত্মক ব্যবহারে স্বস্তি না পায়, পথ না পায় তাহ'লে তোমার এলেমের দাম কী?

সদা সত্য কথা বলিবে—লাখ বার বললেও বোঝে না যদি জায়গা মতো, কায়দা মতো ধ'রে ঠিক সেই বিশেষ মুহূর্তে মাথায় ঢুকিয়ে না দেওয়া যায়—particular affair-এর (বিশেষ ব্যাপারের) মধ্য-দিয়ে। তুমি একটা সুযোগ ছেড়ে দিলে অযথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হ'য়ে ইজিচেয়ারে হাসিখুশি মনে ব'সে আছেন এবং প্রীতিপ্রসন্ন দৃষ্টিতে সবার দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখছেন। দেখে মনে হয় তাঁর চোখ দুটি চারিদিক ঘুরছে। পরিষ্কার মনে হচ্ছে তাঁর স্নেহক্ষরা দৃষ্টি যেন প্রতি প্রত্যেকের মধ্যে অমৃত সিঞ্চনে নিরত।

সুশীলদা (বসু) জিজ্ঞাসা করলেন—ভোগ থেকে কি ত্যাগ হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কামনা থাকলে যেমন মানুষ লোক থেকে লোকান্তরে যায়, ভোগবুদ্ধি প্রবল হ'লে তেমনি ভোগ থেকে ভোগান্তরে চলাফেরা করতে থাকে। সত্তা-পোষণী ভোগই আমাদের কাম্য। তার মধ্যে ত্যাগ ও সংযম থাকেই। ভোগটা সত্তার জন্য।

কিরণদা (মুখাজ্জী) —চতুরাশ্রমের ভিতর-দিয়ে তো মানুষকে ভোগের মধ্য দিয়েও পূর্ণতায় নেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আশ্রম মানে, যেখান থেকে শ্রম ক'রে, সত্য ও জ্ঞান লাভ করা যায়। তার আবার একটা ক্রম আছে এবং পর্য্যায় আছে। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে যে শিক্ষা লাভ করে গার্হস্থ্য আশ্রমে তা' দৈনন্দিন জীবনের মধ্য-দিয়ে বাস্তবায়িত করা হয়। বাণপ্রস্থে বিস্তারের পথে চলা হয়। আর সন্ন্যাস আশ্রমে পূর্ণ আত্মসমর্পণের সাধনা চলতে থাকে। গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করা মানে, ভোগের মধ্যে ডুবে যাওয়া নয়, ওর ভিতর-দিয়ে সমৃদ্ধতর অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়—through activity (কাজের ভিতর দিয়ে)—আচার্য্যের প্রদর্শিত পথে, এইভাবে নিজের সত্তাকে গভীরতর ক'রে উপলব্ধি করাই প্রকৃত উপভোগ। সমস্ত আশ্রমের মধ্যে ক্রমাধিগমনে আরওতর ভাবে ইষ্টের পরিপূরণের দিকে চলাটাই জীবন উপভোগের মূল সূত্র। ইষ্ট হ'লেন তোমার অবিকৃত ও অখণ্ড সত্তারই প্রতীক। তোমার বৈশিষ্ট্যের স্ফুরণের ভিতর-দিয়ে সপরিবেশ ইষ্টকে যতখানি অনুভব, উপভোগ, উপলব্ধি ও পরিপোষণ কর ততই

তোমার জীবনটা সার্থক হ'য়ে ওঠে। সত্তার স্থিতি, বিকাশ ও বৃদ্ধিকে বাদ দিয়ে প্রকৃত ভোগ হয় না।

কিরণদা—আপনি বলেছেন—যে সাংসারিক জীবনে অকৃতকার্য্য, তার আধ্যাত্মিক চক্ষুও তমসাচ্ছন্ন। জওহরলাল প্রভৃতি খুব কৃতী মানুষ, তাহ'লে কি বুঝতে হবে যে, তাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনেও খুব উন্নত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাংসারিক জীবনে কৃতকার্য্য মানে, যে purpose to the principle (আদর্শাশ্রিপূরণী উদ্দেশ্য)-কে ঠিকভাবে fulfil (পূরণ) ও materialise (বাস্তবায়িত) করতে পারে। জহরলালই হোন আর যিনিই হোন তাঁর জীবনে যদি কোন বৈশিষ্ট্যপালী আপূরণমাণ আদর্শ থাকেন এবং তিনি যদি তাঁর সর্ব্ব বৃত্তি দিয়ে তাঁর পরিপূরণে সপরিবেশ বাস্তবে বিহিতভাবে সার্থক হ'ন তবে তাঁকে তো আধ্যাত্মিক জীবনেও উন্নতই বলা চলে। আত্মসমর্পণের ভিতর-দিয়ে integration of personality (ব্যক্তিত্বের সংহতি) এবং adjustment of complex (প্রবৃত্তির বিন্যাস) সপরিবেশ যার জীবনে যত বেশি হয় সে তত আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নত এবং এতে জাগতিক উন্নতিও বাদ পড়ে না।

সন্ধ্যা ছ'টায় শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

যেখানে আদর্শ নাই
ধর্ম্মচর্য্যাও সেখানে ব্যাহত,
আবার যেখানে ধর্ম্মচর্য্যা ব্যাহত,
সেখানে বিচ্ছিন্নতাই প্রভাবান্বিত ;
আর যেখানে বিচ্ছিন্নতা—
অকৃতকার্য্যতাই সেখানে অধিষ্ঠিত।

শৈলেশদা (ব্যানার্জ্জী)—মহাপুরুষ যখন জীবন্ত না থাকেন, এবং তাঁ'তে অকপট অনুরাগীও কাউকে না পাওয়া যায়, তেমন ক্ষেত্রে সেখান থেকে দীক্ষা নিলে তো বিকৃতি আসার সম্ভাবনা !

শ্রীশ্রীঠাকুর—তবু ওই পোঁ ধরা থাকলে অনেকখানি সুবিধা হয়। তাঁর প্রবর্ত্তিত দীক্ষায় দীক্ষিত হওয়াই ভাল। তখন অন্তত ধাঁচটা থাকে। যে যেমনতর অনুশীলন করে সে ততটা লাভবান হয়। তবে তাঁর প্রবর্ত্তিত দীক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে অন্য রকম কিছু মেশাল দেওয়া ভাল নয়।

হাউজারম্যানদা—নিজের জন্য যারা Lord (প্রভু)-কে ভালবাসে তাদের দিয়েই গোলমাল শুরু হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন স্বার্থপর মানুষ যদি ধর্ম্মসংঘের নেতৃত্বে দাঁড়ায়, তখন নিঃস্বার্থ ও নিষ্ঠাবান যারা তারা আবার জায়গা পেয়ে ওঠে না। সেবা মানে—to protect, nurture and fulfil (রক্ষণ, পোষণ এবং পূরণ করা)। যারা Lord (প্রভু)-কে protect (রক্ষা) করে, nurture (পরিপুষ্ট) করে, fulfil (পরিপূরণ) করে,

তাদের মধ্যেই Lord-এর (প্রভুর) spirit (ভাব) living (জীবন্ত) থাকে। আর, যারা চায় to protect, nurture and fulfil self alone (শুধু নিজেকে রক্ষা, পোষণ ও পূরণ করতে), সেখান থেকে তিনি বহু দূরে, আর সেখানে সংহতিও সুদূর-পরাহত।

শৈলেশদা (ব্যানার্জ্জী)—ত্যাগ ও ভোগের বিচার কিভাবে করতে হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তা-সম্বর্দ্ধনাই কাম্য। যা' তার অনুকূল তাকে গ্রহণ করব, যা' এর অন্তরায়ী অর্থাৎ যা'তে সত্তা-সম্বর্দ্ধনার ব্যাঘাত হয়, তা' ত্যাগ করতে হবে।

শৈলেশদা (ব্যানার্জ্জী)—পরিবেশের সেবা মানেও তো তাদের রক্ষা, পোষণ ও পূরণ করা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সকলের জন্যই ঐ করব, কিন্তু তা' সুকেন্দ্রিক হ'য়ে সার্থক হয়ে ওঠা চাই ইষ্টের রক্ষণ, পোষণ ও পূরণে। ইষ্টের রক্ষণ, পোষণ ও পূরণ ব্যাহত হয় এমনতরভাবে পরিবেশের সেবা করতে যাব না। আর তাতে তাদের প্রকৃত সেবা হবেও না। প্রধান সেবাই হ'ল ধর্ম্মদান। পরিবেশকে যত ইষ্টপ্রাণ ক'রে তুলতে পারব, ততই তাদের প্রবৃত্তিগুলি সুনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে তাদের বাঁচাবাড়ার পথ খুলে যাবে এবং তাদের মধ্যে প্রীতি-সংহতি গজিয়ে উঠবে।

শৈলেশদা—মানুষ তো চায় অন্যকে তার প্রবৃত্তির চাহিদায় লাগাতে, তা' না পেলে তো চটে যায়, সেখানে করণীয় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার কাছে বিরাট সম্পদ আছে, তা' দিয়েই পার তার মোড় ফেরাতে। তোমার কথা-বার্ত্তা চাল-চলনই হবে এমন, যে সে বুঝবে, যে তুমি তাকে অত্যধিক ভালবাস এবং তার স্বার্থেই যা' কিছু করছ। প্রকৃত ভালবাসা থাকলে, মানুষের হৃদয় জয় করা খুব কঠিন ব্যাপার নয়। তবে কিছু লোকের স্বভাব এমনই থাকে যে, উপকারের বদলে তারা অপকারই করতে চায়, সে-সব জায়গায় সাবধানে চলা লাগে। আমরা যদি অজ্ঞতাবশতঃ লোক চিনতে না পারি এবং নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত হতে দিই সেটা কিন্তু আমাদের মূর্খতা। মানুষের প্রকৃতি বুঝে যেখানে যেমন শোভন, সেখানে তেমনভাবে চলা লাগে।

সন্ধ্যার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর মাঠে পশ্চিমাস্য হ'য়ে চেয়ারে উপবিষ্ট। সূর্য্য অস্ত গেছে, তবুও পশ্চিম আকাশে ডিগরিয়া পাহাড়ের কোলে লালিম আভা উজ্জ্বল হ'য়ে আছে। পাহাড়ের কালো রেখা তার পাশে রক্তিমছটা এবং তদুপরি শুভ্র মেঘের খেলা একটি মনোরম বর্ণাঢ্যতা সৃষ্টি করেছে। দেখে যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্রকূট সেবন করতে করতে তন্ময় হ'য়ে চেয়ে আছেন সেদিকে।

পূজনীয় খেপুদা এবং কেষ্টদা, সুশীলদা, কাশীদা (রায়চৌধুরী), গোপেনদা (রায়), ভগীরথদা (সরকার), সরোজিনীমা, রেণুমা প্রভৃতি অনেকেই কাছে আছেন।

কাশীদা প্রশ্ন করলেন—সত্তাচর্য্যা, সত্তাপুষ্টি ইত্যাদি কথার মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাতে মানুষ না ম'রে ভাল ক'রে বাঁচে-বাড়ে—মনের স্বস্তি ও শান্তি

নিয়ে পরিবেশের সঙ্গে শুভ সঙ্গতি বজায় রেখে—তাই করাই সত্তাচর্য্যা। সত্তার পুষ্টি মানে—সত্তার বিকাশের সুযোগ যাতে বাড়ে তাই করা।

জনৈক দাদা বললেন—আমি আজ সারাদিন জিদ্ ক'রে খাইনি। কেউ আমাকে অযথা ছোট মনে করলে তাতে আমি অত্যন্ত অপমানিত বোধ করি। Undue criticism (অসমীচীন সমালোচনা) আমি সহ্য করতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ জিনিস যদি তোমাকে বিচলিত করে, তা'র ফলে অবান্তর unprofitable (ক্ষতিকর) চলনেও চলতে পার তুমি। তুমি যদি তোমার বিবেকের কাছে সাচ্চা থাক, তবে লোকের criticism-এ (সমালোচনায়) কি যায় আসে? অবশ্য tactfully (সুকৌশলে) চলা লাগে, যাতে বেকুবীপ্রসূত opposition (বিরোধিতা) এড়িয়ে চলা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট। যতিবৃন্দ এবং মণিদা (চক্রবর্ত্তী) প্রভৃতি আছেন।

মণিদা বললেন—আপনার কথা শুনতে ভাল লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথাটা বার বার শোনাও ভাল, তাতে মাথা অনেকটা সাফ্ হয়, কিন্তু সেই অনুযায়ী কাজ যদি না করা যায় তবে সব উবে যায়,—মাথায়, জীবনে বা চরিত্রে থাকে না।

মণিদা ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন সম্পর্কে কথা উত্থাপন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা'র জন্য চাই, আদর্শে অচ্যুত অনুরাগসমন্বিত অটুট চলন। তা' নাহলে যে যতই জোয়ান-চামরা হোক না কেন, সে বড় জোর কোন একটা বিশেষ প্রবৃত্তির দাস হ'য়ে থাকে, ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ কিছু হয় না। আবার, ঐ প্রবৃত্তি তাকে কোন্ পথে কোথায় ঠেলে নিয়ে যেতে পারে তার কিছু ঠিক নেই।

এরপর সত্যনদা (দাস) সেবার তাৎপর্য্য সম্পর্কে জানতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেবা মানে, সর্ব্বতোভাবে পরিপালন, পরিপোষণ, পরিপূরণ ও পরিরক্ষণ। তাই ভক্তি না হ'লে ঠিক-ঠিক সেবা বুদ্ধির জাগরণ হয় না। প্রকৃত সেবার উদ্দেশ্য সত্তা-সম্বর্দ্ধনার পরিপালন, পরিপূরণ ও পরিরক্ষণ। কারও বৃত্তিকে পরিপুষ্ট করলে কিংবা কোন প্রবৃত্তি পরায়ণ মানুষের প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না ক'রে, শুধু তাকে বাঁচিয়ে রাখার জোগান সরবরাহ করলেই তাকে সেবা কয় না। তুমি যদি একটা সাপকে দুধকলা দিয়ে পুষ্ট কর, সেই সেবায় লাভ হবে এই যে, সে বহু-জনকে কামড়াবার সামর্থ্য অর্জ্জন করবে।

অন্যায়ের প্রতিবাদ সম্পর্কে কথা ওঠায় মণিদা বললেন—চারিদিকেই তো অন্যায়, ক'টার প্রতিবাদ করা যায়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—অন্যায় বেড়ে গেছে প্রতিবাদ না ক'রে-ক'রে, support (সমর্থন) ক'রে-ক'রে—তা'র ফলে তো এখন আর প্রাণে বাঁচি না। অন্যায়কে সমর্থন ক'রে-ক'রে তাকে আজ এত শক্তিশালী ক'রে তুলেছি যে, তা আর resist (নিরোধ) করতে

পারি না। তবে resist (নিরোধ) করা শুরু যদি না করি তবে ঐ শাতনী প্রভাব আমাদের গলা টিপে মারবে। অন্যায়কে বাড়তে দেওয়া পাপ। আমাদের নিজেদের সত্তাকে যদি ভালবাসি তাহ'লেও যেমন অন্যায়কে নিরোধ করা উচিত, অন্যায়ে সক্রিয়-ভাবে লিপ্ত যারা তাদের প্রতিও যদি আমাদের বিন্দুমাত্র ভালবাসা থাকে, তাহ'লেও তাদের অন্যায় চলনাকে নিরোধ করাই দরকার। তা' না করলে ঐ তাদের সঙ্গেও শত্রুতা করা হয়। এই মহা পাপ আজ সমাজে দানা বেঁধে উঠেছে। যেন তেন-প্রকারেণ এর প্রতিকার করাই চাই। কিছু মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে, সংযতভাবে, সুকৌশলে যদি এর প্রতিকারে বদ্ধপরিকর হয়ে না ওঠে তাহলে নিস্তার নেই। যারা এসব এড়িয়ে চলে তারা নিজেদেরও শত্রু, তারা বুঝছে না যে তাদের নিষ্ক্রিয়তা সবার মরণের পথকেই প্রশস্ত করে তুলছে। যারা সত্তাকে ভালবাসে তারা সত্তা-পরিধ্বংসী জিনিস কী ক'রে বরদাস্ত করে আমি বুঝতে পারি না। এই মহা পাপের নিরসন না হলে, ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টি সবকিছুকে বিধ্বস্তির দিকে ঠেলে দেওয়া হবে।

—বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুরের গলার স্বর চ'ড়ে গেল। শেষটা রুষ্ট কণ্ঠে বললেন—এ দায়িত্ব প্রতিপ্রত্যেকের উপর, যে তা' সাধ্যমত না করবে সে ঈশ্বরের কাছে অপরাধী হ'য়ে থাকবে। তাই ব'লে আমি কাউকে প্রতিহিংসাপরায়ণ হ'তে বলছি না। আমরা রোগীকে বাঁচাবার জন্যই রোগের প্রতিরোধ করব, দোষীকে বাঁচাবার জন্যই তার দোষের বিরুদ্ধে দাঁড়াব। সঙ্গে-সঙ্গে তার সদ্ভাব যাতে পরিপুষ্ট হয় তাও করব।

ইষ্টভৃতি-স্বস্ত্যয়নী সম্পর্কে কথায় মণিদা বললেন—ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী করলে এই-এই ভাল হবে, সে লোভ দেখিয়ে মানুষের মধ্যে এ সবের প্রবর্ত্তন করা ভাল নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' করলে যা' হয়, সে-বিধির কথা আমরা লোকের কাছে বলব না কেন? ম্যালেরিয়া রোগীর কাছে ডাক্তার কি বলবে না যে, কুইনাইন খেলে ম্যালেরিয়া সারে? যা' মঙ্গল বলে জানি, তা' কেন বলব না? অবশ্য, ইষ্টকে ভালবেসে, ইষ্টের প্রীত্যর্থে যদি কেউ বিধিমাফিক ইষ্টভৃতি ও স্বস্ত্যয়নী করে, তা' যে সর্ব্বোত্তম সে বিষয়ে সন্দেহ কি? কিন্তু তুমি ঐ যে বলছ, ইষ্টভৃতি স্বস্ত্যয়নীর কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে ব'লে লোককে তা'তে প্রবৃত্ত করা ভাল নয়, এটা কোন কাজের কথা নয়। প্রবৃত্তিমুখী যাজন সমাজে এন্তার চলবে অথচ সত্তাপোষণী নীতিবিধি সম্বন্ধে নীরব থাকতে হবে এ কেমন কথা? পণ্ডিতী ছেড়ে নিজের ও অপরের ভাল যা'তে হয় বাস্তবে তাই ক'রে চল। ভাল-ভাল গালগপ্প করার আসর খুলে বসিনি আমি। দরকার হ'লে রোগীর বুকের উপর হাঁটু গেড়ে ব'সে ওষুধ খাইয়ে রোগীকে সুস্থ ক'রে তুলতে আমি বদ্ধ-পরিকর। তা'তে লোকে আমাকে যাই বলুক সেদিকে খেয়াল দেওয়ার অবসর আমার নেই। আমি তোমাদের ভালবাসি এবং ছলে, বলে, কৌশলে তোমাদের ভাল ক'রে যাবই। এই-ই আমার জন্ম-জন্মান্তরের নেশা। ইষ্টভৃতি-স্বস্ত্যয়নী ক'রে যে মানুষের কী হয় সে experience (অভিজ্ঞতা) আমার এত লোকের কাছে শোনা আছে যে তার অন্ত নেই।

প্রচণ্ড তোড়ে কথাগুলি শ্রীশ্রীঠাকুর বলে গেলেন। উপস্থিত সবাই এখন নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ এবং এক গভীর ভাবে তন্ময়।

একটু পরে মণিদা বললেন—ইষ্টকাজের সঙ্গে আমার নিজের জীবনের কাজ মেলাতে পারিনি, প্রধানতঃ নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে ও দুটো একায়িত হয়নি। তা' যদি হ'ত তোমার glow (দীপ্তি) বেড়ে যেত, মানুষ তোমাকে পেয়ে কৃতার্থ হ'ত। কোথাও তুমি নিজের প্রয়োজনে গেলেও তোমাকে দেখে বাবা ব'লে, বাছা ব'লে, যাদু ব'লে কুল পেত না, তোমাকে ছাড়তেই চাইত না। তুমি যেখানে হয়ত দু'শো টাকার একটা চাকরী আশা কর, সেখানে তোমাকে কাছে রেখে ধন্য হওয়ার আশায় তোমাকে পাঁচশ টাকা দিতে চাইত।

১৮ই বৈশাখ ১৩৫৬, রবিবার (ইং ১।৫।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে যতিবৃন্দ এবং মণিদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—একজন ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ যদি থাকেন তবে তিনিই হবেন বিধানদাতা, তাঁর অভাবে তিনজন, পাঁচজন অথবা দশজন আচারবান, সুনিয়ন্ত্রিত, শিষ্ট ব্রাহ্মণের পরামর্শ নিয়েই রাষ্ট্র ও সমাজ-বিধান চালাতে হবে। যাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ নেই, যারা আচারবান নয়, তাদের পরিষত্ত্ব নেই। কারণ, তারা জানে না, বোঝে না কেন কী করতে হয়। তারা যদি পরিচালক হয়, তবে তাদের দেওয়া বিধান নিয়ন্ত্রিত হবে বৃত্তিদুষ্ট বিবেচনা দিয়ে। তাদের দিয়ে সত্তা তো পরিপোষিত হবেই না, সম্বর্দ্ধনার পথও রুদ্ধ হয়ে যাবে।

আমাদের বর্ণাশ্রমের বিধানে প্রত্যেক বর্ণেরই লক্ষ্য ছিল ব্রহ্মজ্ঞান লাভ, কিন্তু তা' স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী কর্ম্ম ও বৃত্তির মধ্য-দিয়ে। নিজ বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী চলার ভিতর-দিয়ে মূল সত্যে পেঁছানর পথ অনেক সহজ হয়। হীনম্মন্যতাবশতঃ বৈশিষ্ট্য-সম্মত কর্ম্ম ও জীবন-চলনা ছেড়ে দিয়ে, অন্য কোন কিছু অবলম্বন করতে গেলে সেখানে মানুষ সহজে খাপ খাওয়াতে পারে না এবং তাতে সে নিজে আনন্দও পায় না। তাই গীতায় আছে—

> "সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ
> সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতা।"

নরেনদা (মিত্র) তাঁর ব্যক্তিগত জীবনচলনার কয়েকটি ত্রুটি সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন তাঁকে বললেন—যা'ই করেন না কেন তপস্যার খাঁক্তি যেন না হয়। আর, তপস্যা ঠিক রাখতে গিয়ে অন্যান্য করণীয় যা' কিছু, তা' করার গতিটা যেন ব্যাহত না হয়। ফলকথা অন্তর্জীবন যদি ইষ্টের সঙ্গে পুরোপুরিভাবে সঙ্গতিশীল হয়, তবে কর্ম্মজীবনও সেই সাথে-সাথে ইষ্টের ছন্দে ছন্দায়িত ও সুবিন্যস্ত হ'য়ে উঠবে।

সর্বদিক সুষ্ঠুভাবে চালানর মূল তুক-ই হ'ল এই। প্রত্যেকটা প্রত্যেকটার সঙ্গে জড়ান, মূলে গোল হ'লে সব ক্ষেত্রেই গোল ঢুকে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার প্রাক্কালে মাঠে এসে বসেছেন। কেষ্টদা ও হেনরী প্রভৃতি আছেন। পূজনীয় বড়দাও আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—কারও প্রতি ভালবাসা থাকলে সহজেই তার কাজ-কর্ম্মগুলি বোঝাও যায়, সমর্থন করাও যায়। একজন আমার সামনে আমার ইষ্টের বিরূপ সমালোচনা করল, অথচ আমার মুখে তার কোন উত্তর যোগাল না, তার মানে আমার ভালবাসারই খাঁকতি।

দুঃখ-কষ্ট সম্বন্ধে কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের নেশা, অনুরাগ যদি concentric (সুকেন্দ্রিক) না হয় এবং সে-নেশা যদি আবার প্রবৃত্তির উপর নেশার থেকে প্রবলতর না হয়, তবে, প্রবৃত্তি-প্রসূত নানাবিধ দুর্ভোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া কঠিন। ইষ্টের পথে চলতে গিয়েও মানুষের অনেক দুঃখ-কষ্ট আসতে পারে কিন্তু প্রেষ্ঠ-পূরণের জন্য মানুষের জীবনে যে কষ্ট আসে, সাত্বত চলন অক্ষুণ্ণ থাকার দরুন সে-কষ্ট মানুষকে কাবু করতে পারে কমই। তখন কষ্টের মধ্যে প'ড়েও ইষ্টের ইচ্ছা পূরণের সম্বেগ দুর্ব্বার হ'য়ে ওঠে। সে তখন ম্রিয়মাণ না হ'য়ে উল্লাসদৃপ্ত হ'য়ে ওঠে। তাকে দেখলে বোঝা যায়, তার কাছে যেন—"জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।" কষ্ট সত্ত্বেও তার জীবনের জেল্লা দেখে মানুষ উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে। কষ্টটা যেন তার জয়টিকা।

কেষ্টদা—কারও হয়ত মা-র উপর সব-ছাপান টান থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐটে আমার ছিল, তখন কোন কষ্ট গায়ে লাগত না, নেশার ঘোরে চলতাম, করতাম।

কেষ্টদা—এখনও তো সেই ভাব থাকা উচিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন আছে—মা না থাকার বেদনা।

কেষ্টদা—তাহ'লে তো স্থায়ী সমাধান কিছু হ'ল না। প্রেষ্ঠ যতদিন জীবন্ত থাকেন ততদিনই তাঁকে নিয়ে জীবনের উপভোগ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা'ছাড়া উপায়ও নেই। রূপ ছিলেন, তাঁর গুরুর মৃত্যুর পর মানুষ যতই তাঁকে সম্মান দিত, তিনি ততই ফ্যাৎ ফ্যাৎ ক'রে কাঁদতেন। তাঁর ওসব ভাল লাগত না। দুঃখে তখন তাঁর প্রাণ যায়-যায়। শোক ছেঁড়া যায়, যদি প্রচণ্ড উদ্দামতা নিয়ে প্রিয়-পূরণী কর্ম্মে মাতাল থাকা যায়। বিরহের যে-বেদনা সে-বেদনার মধ্যেও প্রিয়ের স্মৃতি বহন ক'রে চলে মানুষ। ওর-ও একটা দিক আছে। প্রিয় তো হ'লেন মানুষের অস্তিত্বের অস্তিত্ব। তাই তাঁকে ভোলা যায় না। আজকাল আমি কাজকর্ম্ম যাই করি, মা যেন আমার প্রাণে অপরিত্যাজ্য ব্যথা রূপে জেগে থাকেন। এও এক প্রকারে যুক্ত থাকা। ভালবাসাই তো আমাদের জীবন। এখনও আমি

বিশ্বাস করি—আমার চলা দিয়ে আমি মাকে পুজো ক'রে চলেছি। ইষ্টের অবর্ত্তমানেও মানুষ তাই বিরহ-বিদগ্ধ অন্তরে সতত তাঁকে সেবা করে ও তৃপ্ত করে।

১৯শে বৈশাখ ১৩৫৬, সোমবার (ইং ২। ৫। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোল তাঁবুর পাশে ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট। তখনও রোদ বেশী ওঠেনি। হাওয়াটাও তাই বেশ মিষ্টি লাগছে। ভক্তবৃন্দ একে একে এসে প্রণাম ক'রে নিবিড় হ'য়ে তাঁর কাছে ঘিরে বসছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর জনে-জনে প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করছেন—নাম-ধ্যান কেমন চলছে? কেমন লাগছে? নামধ্যানের মাত্রা আগের থেকে বাড়াচ্ছিস তো?

প্রত্যেকে তাঁর নিজের মতো ক'রে জবাব দিচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ইসারায়-ইঙ্গিতে, হাসিখুশিভাবে বলছেন—চালিয়ে যাও, চালিয়ে যাও। লেগে থাক, যতদিন যাবে, তত দেখতে পাবে কি দারুণ মজা এতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভুপেনদাকে (চক্রবর্ত্তী) বললেন—ভিতরের চাপা ভাবটা একটু খোলা লাগছে না? পথ ফুটে উঠছে না? আগে কাটা-কাটা ভাবটা যত বেশী ছিল, এখন তার থেকে কমছে না?

ভুপেনদা—এক-এক দিন, এক-এক রকম।

শ্রীশ্রীঠাকুর চোখের ভঙ্গী ক'রে বললেন—ওরকম তো হয়-ই। প্রধান জিনিস হ'ল লেগে থাকা।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিরণদা (মুখাজ্জী)-কে জিজ্ঞাসা করলেন—তুই কেমন চালাচ্ছিস?

কিরণদা—যেদিন মন বসে সেদিন বেশ ভাল লাগে। যেদিন তেমন ভাল লাগে না তখন উঠে পড়ি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল লাগুক, না লাগুক রোখ নিয়ে লেগে থাকতে হয়।

সুধীর বসুদা আসতে, শ্রীশ্রীঠাকুর অপূর্ব্ব মনোরম ভঙ্গীতে ওই একই কথা জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর বললেন—নাম করলেই fat (মেদ) কমে যায়, কিন্তু জেল্লা খুব বাড়ে।

এরপর একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যে সর্ব্বক্ষণ নাম করে, সে যদি কাউকে স্পর্শ করে, তার ভিতর একটা অপূর্ব্ব পুলক-শিহরণ জাগে। সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়ে আনন্দের বিদ্যুৎ-দীপ্তি খেলে যায়, সে বোধ করে তার চোখের ভিতর-দিয়ে যেন ঐ স্পর্শসঞ্জাত জ্যোতিষ্ক কণা ঠিকরে বেরুচ্ছে। যারা ঠিক-ঠিক মত রোজ করে তারা নিজেরা যেমন উপকৃত হয়, তাদের কাছে এসে অপরেও তেমনি উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে। চোখমুখের লালিত্য দেখে মানুষ মোহিত হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা পৌনে দশটার সময় একটি বাণী দিলেন। সেই বাণী প্রসঙ্গে কেষ্টদা জিজ্ঞাসা করলেন—চল্লিশ বছর আগে যে অন্যায় করেছি তা' নিয়ন্ত্রণ ও সংশোধন করা যায় কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—উপায় আছেই। হয়তো কারও কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলাম, সে বেঁচে নেই, কিন্তু তার আপনজন আছে, তাদের যে ওই টাকা দিতে পারি সে সামর্থ্যও আমার নাই। কিন্তু তাদের বলে রাখলাম—ভাই, এই ভাবের সাহায্য আমি অমুকের কাছে পেয়েছিলাম, কিন্তু তা' ফেরত দিতে পারিনি, এখনও পারছি না। কিন্তু আমি খুব কৃতজ্ঞ তোমাদের কাছে। আমাকে দিয়ে তোমাদের যদি কোন সাহায্য হয় তো বোল। কিংবা যদি পারি তা' তাদের দিয়ে বললাম—তোমরা এটা ভোগ করলে আমি তৃপ্তি পাব।

দুটো ছেলে একদিকে যাচ্ছিল, যেখানে সাপের ভয় আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের বারান্দায় ব'সে তা' লক্ষ্য করা মাত্র পাঁচুদা (চক্রবর্ত্তী)-কে পাঠিয়ে দিলেন—ওদের সাবধান ক'রে দিতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে বললেন—Alert attitude (সতর্ক ভাব) আমার খুব আছে। সাধারণতঃ আমার মাথাটা সর্বদিকে ঘোরে এবং নজরও সর্বদিকে থাকে। প্রবৃত্তির ঊর্দ্ধে যতটা থাকা যায় ততই এই রকমটা সহজ হয়।

নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—তোমরা যদি মানুষ হও, তাহ'লেই আমার সুখ। এই আমার তহ্বা। যীশুখ্রীষ্ট বলেছেন—'ছাত্র যদি শিক্ষকের মতো এবং সেবক যদি প্রভুর মতো হয়, তাহ'লেই যথেষ্ট।' কিন্তু আমার তা' মনে হয় না। আমি ভাবি—আপনারা আমার চাইতে যদি এক হাত উপরে না ওঠেন তা'হলে কী হ'ল? কল্পনা-বিলোল হয়ে থাকি আপনাদের চিন্তা নিয়ে, এ একেবারে পাকাপাকি ওহ্বা, যায় না। পাঁচু এতদিন বাইরে ছিল, তত ভাবনা হ'ত না, এখন ভাবি ও যদি বুদ্ধি, বিদ্যা, কৌশল ও চরিত্রে Saviour of the country (দেশের উদ্ধাতা) হ'য়ে ওঠে তাহলেই হয়। তহ্বার যা' লক্ষণ, তা' সবই আমার আছে। আর ভাবি কবে এই এ্যালাওয়েন্স দেওয়াটা ছুটায়ে দেওয়া যায়। প্রত্যেকটা পরিবার কিভাবে এর থেকে রেহাই পায়। আমি ভাবি আপনারা কিভাবে প্রত্যাশাহীন সেবা দানের ভাগবত ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারেন। যাতে আপনাদের ফিলানথ্রোপির ভাতার উপর নির্ভর না করতে হয়। আপনাদের যোগ্যতা বাড়ুক, মানুষ স্বতঃস্বেচ্ছভাবে আপনাদের দিক, এই আমার দেখতে ইচ্ছে ক'রে। কষ্টের মধ্যে দিয়ে কিন্তু মানুষ বেড়ে ওঠে। ছেলেপেলেই হোক, আর যেই হোক nurture (পোষণ) দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করা যায় না কারও জন্য। আপনার উপর যদি admiration ও adherence (শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা) থাকে, তাহ'লে সেই সূত্র ধরেই উঠতে পারে তারা। ওইটে যদি না থাকে, তাদের যদি আপনাকে দেওয়ার নেশা না থাকে তাহ'লে আপনি যতই দেন ও আপনার কাছ থেকে যতই পা'ক, ততই তাদের চাহিদা বাড়তে থাকে, কিন্তু যোগ্যতা বাড়ে না।

আত্মসংশোধন-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ইষ্টানুরাগ না থাকলে, শুধু বুদ্ধি

ক'রে ঠিকভাবে চলা যায় না। হয়ত বুদ্ধি ক'রে রকম-সকম ক'রে চলছি, কিন্তু প্রবৃত্তি কান চেপে ধ'রে কোথায় টেনে নিয়ে কোন্ ভাগাড়ে ফেলে দেবে তার ঠিক নেই। কিন্তু টান যদি থাকে তখন মানুষ সহজেই টের পায় কোন্ চলন তাকে ইষ্ট থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং সে তন্মুহূর্ত্তেই সজাগ হ'য়ে রুখে দাঁড়ায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর কয়েকখানি চিঠি লেখালেন প্রফুল্লকে দিয়ে—

কল্যাণবরেষু,

হরিদাস, তোমার দুখানি চিঠিই পেয়েছি। তুমি আমার কথা এতখানি ভাব, তাতে মনটা আমার প্রসন্নতা ও কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে।

যে জমির কথা লিখেছ, সে সম্বন্ধে খেপুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রে যা করণীয় ক'রো। খেপুকে তোমার চিঠি দেখান হয়েছে, সে কলকাতায় গেছে। মণিকে পাঠাবার কথা লিখেছিলে জমি দেখতে, কিন্তু মণি প্রায়ই অসুস্থ থাকে—পেট ভাল নয়—তাই বাইরে পাঠাতে সাহস হয় না। তুমি ও খেপু যুক্তিবুদ্ধি ক'রে যা করবে, তাতেই আমার মত জেনো।

মাসিমা কেমন আছেন? তাঁকে আমার প্রণাম দিও।

তুমি আমার স্নেহঝ্যান্দিত 'রাধাস্বামী' জেনো। তোমার শরীর কেমন লিখো।

ইতি

তোমারই

দীন

দাদা

কল্যাণীয়াসু,

খুকী, তোমার নববর্ষের প্রীতি অভিনন্দন আমাকে অশেষ তৃপ্তি দিয়েছে। একক পড়ে আছি এখানে—মাঝে-মাঝে অন্ততঃ তোমাদের চিঠিপত্র পেলেও যেন অসহায় মন আশ্রয়ের আশ্বাস পেয়ে আশায় ভর ক'রে দাঁড়াতে পারে।

তোমার শরীর খারাপ জেনে বড়ই উদ্বেগ বোধ করি। ঔষধপত্র ও পথ্যাদির বিহিত ব্যবস্থায় নিজেকে সুস্থ ক'রে তোল, পেটটার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখ। তোমার খাটুনিও খুব বেড়েছে—তারপর শরীর খারাপ, তবে ওর মধ্যেও অনিয়ম এড়িয়ে সত্তা-পোষণী সামঞ্জস্যে যত চলা যায়—ততই ভাল।

আমরা একপ্রকার আছি। তোমরা আমার আন্তরিক স্নেহপ্রীতি ও 'রাধাস্বামী' জেনো এবং যারা চায় তাদের দিও।

ইতি

তোমার বড়দা

কল্যাণবরেষু,

কানু, তোমার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি—কিন্তু লোকজনের ভিড়ে তোমাদের চিঠির কথা আমার মনেই ছিল না—প্রফুল্লর কাছে শুনে আজ মনে হল।

আমি সন্তপ্ত যে এতদিনেও তোমাদের চিঠির উত্তর দেওয়া হয়নি। যাই হোক তোমরা কিন্তু মাঝে-মাঝে চিঠিপত্র দিতে ভুলো না—তোমাদের চিঠিপত্র পেলে খুবই ভাল লাগে।

তোমরা সবাই কেমন আছ লিখ। শান্তর পরীক্ষা কেমন হয় জানিও। পাগলুর খবর অনেকদিন পাই না—সে কেমন আছে?

পরমপিতার নিকট প্রার্থনা করি—তোমরা সুস্থ থাক, সুখী ও সুদীর্ঘজীবী হ'ও, তাঁরই পূরণ, পোষণ, পালন ও রক্ষণে সার্থক হ'য়ে ওঠ—অমৃতময় দিব্যানন্দনায়।

ইতি

তোমার জ্যাঠামহাশয়

অর্চ্চনা, তোতা, মঞ্জু!

মা আমার!

তোমাদের চিঠি পেয়ে সুখী হ'লাম।

তোমরা ভাল আছ ত? বাবা, পিসিমা, দাদা এরা সবাই কেমন আছেন? পিসিমার শরীর খারাপ—তাঁর প্রতি লক্ষ্য রেখ—তাঁর যত্ন নিও।

তোমরা সাবধানে থেক। শরীর-মন যাতে ভাল থাকে তাই ক'রো। সকলকে সুখী করতে চেষ্টা ক'রো—তাঁতে অনুরাগ রেখো।

আমার আন্তরিক 'রাধাস্বামী' জেনো।

ইতি

তোমাদের

জ্যাঠামশায়

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকেলে বড়াল-বাংলোর সামনের বারান্দায় তক্তপোষে প্রসন্ন বদনে ব'সে আছেন।

একাদিক্রমে বেশ কিছুদিন গরমের পর আজ অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। প্রথমে একটু কালবৈশাখীর হাওয়া ছিল। এখন ঝোড়ো হাওয়া নেই, কিন্তু প্রবল বর্ষণ হচ্ছে।

রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), কিরণদা (মুখাজ্জী), মতিদা (কবিরাজ, রায়), মণিভাই (সেন), সুনীতি ভাই (পাল), কমল ভাই (রায়চৌধুরী), দীনবন্ধুদা (দত্ত), বঙ্কিমদা (দাস) এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে ঝড়ের আগে থেকেই উপস্থিত আছেন।

কিরণদা—অভ্যাসগুলি সংস্কারে পরিণত হ'তে নাকি দশ হাজার বছর সময় লাগে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জন্মগত সংস্কারের সঙ্গে যোগ রেখে অভ্যাস গঠন করলে, সেগুলি সংস্কারে পরিণত হ'তে খুব বেশি দেরী লাগে না। একেবারে নূতন কিছু করতে গেলে সেটা সংস্কারে পরিণত হ'তে অনেক সময় লাগতে পারে। সহজাত সংস্কার

অনুকূল পোষণ পেলে আরও বিকাশের পথে যায়। সহজাত সংস্কার আবার goad (চালনা) করে activity-তে (কর্মে)।

কিরণদা—ভালবাসা থেকে যা' মানুষ অর্জন করে তা' নাকি সংস্কারে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে; তা' কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Love-এর (ভালোবাসার) মধ্যে থাকে libido (সুরত)। তুমি যাকে ভালোবাস, তোমার গোটা সত্তাটা চায় তার পরিপোষণ, পরিপূরণ, পরিপালন ও পরিরক্ষণ—সব-কিছুর ভিতর-দিয়ে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই তুমি চল। Miscellaneous universe-এর (বৈচিত্র্যময় বিশ্বের) থেকে সেইগুলিই তুমি বেছে নাও, যেগুলি তার পরিপোষক। এইভাবে তখন যা' achieve (লাভ) কর, তা' being (সত্তা) দিয়েই কর এবং সে habit (অভ্যাস)-টা তোমার শুক্রগত কাঠামোকেও রঙিল ক'রে তোলে। ফলে, তা' সহজে সন্তান-সন্ততিতে transmitted (সঞ্চারিত) হ'তে পারে। তবে ভালবাসাটা হওয়া চাই শ্রেয় প্রিয়ে।

কিরণদা—Evolution (বিবর্ত্তন) জিনিসটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবনটা বৃদ্ধির দিকে যায়—আরও হয়। মূল বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়েই আরও-তে অধিগমন করে শ্রেষ্ঠসেবার আকূতি নিয়ে।

কিরণদা—যে সাংসারিক জীবনে অকৃতকার্য্য তার আধ্যাত্মিক চক্ষু তমসাচ্ছন্ন—ব্যাপারটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গোড়ায় যদি মানুষের বাবা-মা বা অন্য কাউতে concentric zeal (সুকেন্দ্রিক ঝোঁক) থাকে, তবে তারই আরোতর ক্রমাধিগমনে মানুষ যত adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়, বাস্তব জীবনে তার চলাটাও প্রত্যেক ব্যাপারে তত নিখুঁত হ'তে থাকে এবং তার ফলে সে যুগপৎ ভিতরে ও বাইরে দুই দিকেই কৃতকার্য্য হ'তে থাকে। আমাদের character-এর (চরিত্রের) adjustment (বিন্যাস) যেমন হয়, অবস্থানও হয় তেমনতর। এটা ভালর দিকে যেমন, মন্দের দিকেও তেমন। মনে কর, তুমি একজনের একটা কলম এনে যখন তা' ফেরত দেওয়ার কথা বলেছিলে, সময়মত তা' দিলে না। তাতে মাথায় একটা ভুলের ছাপ পড়ল। বার-বার যদি এমনটা হয় তবে মস্তিষ্কে ঐ ভাবের একটা ভুলের ঝোঁক সৃষ্টি হয় এবং তা' তোমার কাজকর্মগুলিকে সেইভাবে চালিত করতে থাকে। ধীরে-ধীরে তখন সব কাজে এলোমেলো বিশৃংখল ভাব দেখা দিতে থাকে। এতে তুমি বাস্তব জীবনেও অকৃতকার্য্য হও। আর সঙ্গে-সঙ্গে দেখা যায় তোমার সুকেন্দ্রিক নিষ্ঠাটাও শিথিল হ'তে থাকে। তাই সুকেন্দ্রিক সক্রিয় টানের উপর জীবনের অনেকখানি নির্ভর করে। ঐটে না থাকলে মানুষের মনোবল ও সুশৃংখল চলন দুই-ই ব্যাহত হয়। তখন ভিতরে বাইরে দুই দিকেই অসঙ্গতি ও অকৃতকার্য্যতা বাড়তে থাকে। মনেও তখন শান্তি থাকে না, কেমন যেন উড়ু উড়ু ভাব।

কিরণদা—একদিকে খাঁকতি থেকেও তো দেখা যায় অন্যদিকে কৃতকার্য্য হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইদিকটা হয়ত তার খানিকটা এস্তামাল ছিল তার আগের করার ফলে। কিন্তু একবার যদি খাঁকাত ঢুকে যায়, তখন নতুন কিছু আয়ত্ত করতে গেলে, সেখানে সেই খাঁকতি ঢুকে যাবে এবং failure (অকৃতকার্য্যতা) অনেকখানি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে। মানুষ যে যা' করে তাতে যদি unsuccessful (অকৃতকার্য্য) হয়, তাহলে সেইটেই pursue (অনুসরণ) করে তাকে অন্য ব্যাপারেও। তাই, যা' করব তা' thoroughly (পুরোপুরি) করব, নচেৎ এলেমেলো আধখেচড়াভাবে করার অভ্যাস যদি বেড়ে যায়, inertia-র (জড়তার) বশে সেই ধাঁচই চলে অন্য কাজেও। Gap (ফাঁক) যেখানে, সেখানেই গোল আছে, উদগ্র আগ্রহ নেই, টান নেই, তাই regulate (নিয়ন্ত্রণ) করতেও পারে না নিজেকে যথাযথভাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন।

যতিবৃন্দ এবং জ্ঞানদা ও মণিদা (চক্রবর্ত্তী) প্রভৃতি আছেন।

মণিদা একজন পণ্ডিত লোকের কথা বললেন যার কোন spiritual interest (আধ্যাত্মিক অনুরাগ) নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Spiritual interest (আধ্যাত্মিক অনুরাগ) তখনই হয়, যখন জানাগুলি সত্তার সঙ্গে গেঁথে ওঠে, অর্থাৎ সত্তাপোষণী হয়। সত্তা কি, তাই-ই মানুষ বোঝে না। তুমি যে ক্ষুধা লাগলে খাও, সে spirit (আত্মা)-কে maintain (পোষণ) করার জন্যই। spirit (আত্মা) মানে Spirare to breathe (নিঃশ্বাস নেওয়া)—অর্থাৎ যার উপর দাঁড়িয়ে তুমি বেঁচে আছ। আত্মা বা সত্তাকে সন্দীপ্ত রাখবার জন্য যা' যা' করণীয়, তার কোনটা বাদ দিলে কিন্তু চলে না। সত্তার জন্যই যে সব, এ সম্বন্ধে বোধ থাকলে তার জন্য যা' যা' প্রয়োজন, সবগুলির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টা থাকে। আবার, আমাদের বাঁচাটা সার্থক হয় আদর্শে। আদর্শের কাছে আমাদের চলনটা, জীবনটা যত উপভোগ্য হ'য়ে ওঠে, ততই আমরা জীবনের একটা সার্থকতা বোধ করি। সতী স্ত্রী যেমন স্বামীকে খুশী ক'রেই খুশীতে ভরপুর হ'য়ে ওঠে। এমনতর একজন Superior Centre (উন্নত কেন্দ্র) না থাকলে জীবনে কোন রস থাকে না।

মণিদা—Auto-suggestion (স্বতঃ-অনুজ্ঞা)-টা করা লাগে—খুব alert (সজাগ) থাকা লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথমটা খুবই alert (সজাগ) থাকা লাগে, কিন্তু পরে চরিত্রে বা সত্তায় যখন গেঁথে যায়, তখন আর অত ভাবা লাগে না।

শিবরামদা (চক্রবর্ত্তী) হুগলী থেকে চিঠি লিখেছেন—ওরা বিড়ি, পান, তামাক, চা, নস্য ইত্যাদি ছেড়ে দেওয়ায় সৎসঙ্গীদের মধ্যে একটা প্রেরণা জেগেছে ঐসব অভ্যাস ছেড়ে দেবার এবং তাঁরা সংকল্প নিয়ে সেই চেষ্টা করছেন।

ননীদা (চক্রবর্ত্তী) এই চিঠি শ্রীশ্রীঠাকুরকে প'ড়ে শোনালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন মণিদাকে বললেন—দেখ, এই যে লোকে আরম্ভ করেছে, সে

যতিদের দেখেই। কাউকে জোর ক'রে এ-কথা বলা হয়নি যে—তোমার অমুক ছাড়তে হবে, তমুক ছাড়তে হবে, নাহ'লে তোমাকে শাস্তি দেওয়া হবে। একটা জায়গায় এদের টান আছে এবং এই যতিদের আচরণ দেখে স্বতঃস্বেচ্ছ আগ্রহ ও আনন্দে যার-যার শুরু করেছে। তাই দেখ, একটা আদর্শ বা কেন্দ্রে যদি টান থাকে, তবে কিছু চারাতে বেশী দেরী লাগে না। তখন লায় লাহেল্লা বলে জিগির ছাড়লেই হ'ল।

এরপর মণিদা ও জ্ঞানদা বিদায় নিলেন। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর শিবরামদার চিঠির সূত্রে শরৎদাকে বললেন—এর থেকে বুঝতে পারেন আপনাদের কতখানি খাঁটি হওয়া উচিত in form and spirit (বাহ্যভাবে এবং আন্তর তাৎপর্য্যে)। কিছুই তো করেননি তাতেই এত।

প্রফুল্ল—আমার কেবল মনে হয় আগেই এইভাবে আরম্ভ করলে খুব ভাল হ'তো।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঈষৎ হেসে বললেন—তোমাদের থলের ওগুলি না ফুরলে এ ধরতেই না। যা'হোক, যত রকম flaw (ত্রুটি) আছে, সেগুলি ছাড়া লাগবে mercilessly (নিদ্দ'য়ভাবে)।

মতিদা (চ্যাটাজ্জী')—ছাত্রানাম্ অধ্যয়নং তপঃ—মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অধিকার করার চলন—আয়ত্ত করার চলন—চরিত্রগত করার চলনই ছাত্রদের তপস্যা। অভ্যাসে-ব্যবহারে সবটা ফুটিয়ে তুলতে হবে;—নিরন্তর এই তপ না করলে জিনিসগুলি আয়ত্ত হবে না।

যতীনদা—আমাদের তো নিত্য পাঠ করা দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু পাঠ নয়, তা' আবার অভ্যাস করা লাগে। নচেৎ খারাপ হয়। Motor sensory in coordination (কর্ম্মপ্রবোধী ও বোধপ্রবাহী স্নায়ুর অসঙ্গতি) হয়। সেটা মোটেই ভাল নয়। বুঝলাম, অথচ করলাম না—ওতে চরিত্রের মধ্যে কপটতা আসে। ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হ'য়ে যায়।

যতীনদা—যদি করি অথচ না পড়ি!

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে বরং ভাল, করাটাই জানিয়ে দেয়। আমার life (জীবন)-টাই তার example (উদাহরণ)। করাই যা'-কিছু জানিয়ে দিয়েছে আমাকে।

শরৎদা—আপনার কথা স্বতন্ত্র। আপনার তো সবই জানা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-কথা কইতে নেই। তাতে লোকে ভাবে—আমরা আর পারব না। চৈতন্য চরিতামৃতে আছে—

"আমারে ঈশ্বর ভাবে আপনারে হীন
তার প্রেমে কভু আমি না হই অধীন।"

২০শে বৈশাখ ১৩৫৬, মঙ্গলবার (ইং ৩।৫।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আশ্রমে আসীন।

কিরণদা (ব্যানাজ্জী') ইছাপুরের কতিপয় সৎসঙ্গীসহ এসেছেন।

কিরণদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমাদের ওখানকার প্রায় প্রত্যেকটি সংসারে রোগ, শোক, বিপদ-আপদ আছেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর অভয় দিয়ে বললেন—ওসব তো আছেই, খুব ক'রে নাম লাগাও, নামের আগুন যত জ্বালাবে, জঞ্জাল তত সাফ হবে। তোমাদের করাটা যদি চরিত্রকে আলোকিত ক'রে তোলে, তা' কতজনকে পথ দেখাবে, বাঁচিয়ে দেবে। তোমাদের প্রত্যেকটা করা, চাউনি, চলন, পদক্ষেপ—সব-কিছুই তখন মঙ্গল বিচ্ছুরিত করবে।

কিরণদা—আচ্ছা, মানুষ যে ধর্ম্মের কথা শোনে না, সে কি আমাদের দোষ, না লোকই খারাপ হ'য়ে গেছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুনবে কি? শোনার রকমটাই যে ভেঙ্গে দিয়েছে তাই শুনতে চায় না। কিন্তু এখনও instinct (সংস্কার) যায়নি। এটা রক্তের মধ্যে আছে। এখনও ভাল ক'রে তুলে ধরতে পারলে সাড়া দেয়ই। তার জন্য ব্যাপক কর্ম্মপ্রচেষ্টা চাই। তা'তো আমরা পারি না। Pursue করা (পিছনে লেগে থাকা) চাই, ছেলেপেলেদের জন্যে যেমন করি, অবুঝ মানুষদের জন্য তেমনি করা লাগে। যারা শোনে না, তারা যে কী চায় তাও জানে না। যার জীবনের ক্ষুধা আছে, যে-ই বাঁচতে চায়, তার কাছে ঠিকমতো পরিবেষণ করতে পারলে, সে শুনবেই।

জনৈক দাদা—মানুষ ঠ'কে-ঠ'কে হুঁশিয়ার হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেউ-ই ঠকতে চায় না, ঠকা থেকে বাঁচাতে চায় নিজেকে। তা'তেই বোঝা যায় যে, শোনার পথ আছে এখনও। মানুষ এতই ঠকেছে, যে ভাল কথা শুনলেও, বিশ্বাস আসতে চায় না। ধর্ম্মের নামে যারা মানুষকে ঠকায়, তারাই অনেকাংশে এর জন্য দায়ী।

উক্ত দাদা—বাঙালী চরিত্রের গলদ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাঙালী চরিত্রের গলদ বিশেষ কিছু নেই, গলদ এই যে—আদর্শ নেই, সংহতি নেই, healthy sentiment (সুস্থ ভাবানুকম্পিতা) নষ্ট হ'য়ে গেছে। এরা বিদেশীদের সঙ্গে বেশী মিশেছে কিনা। আদর্শ বিসর্জ্জন দিয়ে মিশতে গিয়ে নিজেদেরটাও হারিয়েছে, ওদেরও খারাপ বই ভালটা নিতে পারেনি। টিমটিমে কাজে চলবে না। যদি বাঁচতে চাই, ভীষণ পরিশ্রম লাগবে। নিজেদের বৈশিষ্ট্য ও কৃষ্টিতে অটুট ও কঠোরভাবে দাঁড়ালেই বাঁচতে পারব।

"শোন যতি, শোন সন্ন্যাসী···" লেখাটি প'ড়ে শোনান হ'ল।

মণিদা (চক্রবর্ত্তী) বললেন—আমি বুদ্ধি দিয়ে এটা বুঝি, কিন্তু আমি নিজে এ হ'তে চাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ যা'ই কিছু করে, তার মূলে থাকে চাওয়া। সুস্থ থাকতে চাইলে সুস্থ থাকার পথে চলে, অসুস্থতার এক কণাও প্রশ্রয় দেয় না। অসুস্থ থাকতে চাইলে, অসুস্থ থাকার পথেই চলে। সেই চলনের ফলই আবার বুঝিয়ে দেয় সেই

চলনের স্বরূপ। কালভৈরব বা যমদূত যখন ধেয়ে আসে তখন আবার মানুষ বলে—আমি মরতে চাই না, আমি বাঁচতে চাই।

মণিদা—আমি বুঝি, আমি পরিবারের কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছি, এখন আমার পরিবারের চাহিদা পূরণ করা দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরিবারের যত চাহিদাই থাকুক, প্রথম চাহিদা হ'ল বাঁচাবাড়া। সেই চাহিদা যাতে ভালভাবে পূরণ হয়, সেইটেই প্রধান করণীয়। সবাই কিন্তু চায় ভালবাসা। ছেলেবেলায় দোলাই গায়ে দিয়ে বসে মুড়ি খেতাম। পাখি এসে গা'-র 'পরে বসত, মাথার উপর বসত। আমি মুড়ি খেতাম, ওরাও আমার সাথে মুড়ি খেত। আমিও যেমন ওদের ভালবাসতাম, ওরাও তেমনি আমাকে ভালবাসত। আমার সম্বন্ধে ওদের কোন ভয় বা সন্দেহ ছিল না, এতে আমার খুব ভাল লাগত। নাম-টাম যখন করতাম কত কী দেখতাম, শুনতাম। ওগুলির যে কোন দাম আছে তা' জানতাম না। প্রথম যখন কলকাতায় মাসিমাদের বাড়িতে গেলাম তখন অনেকে আসত কাছে। নানা রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত। নিজে যা' দেখেছি তা'র উপর দাঁড়িয়ে সব কিছুর জবাব দিতাম। বিজ্ঞান-টিজ্ঞান তো পড়িনি, কিন্তু বিজ্ঞানের সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেও তার উত্তর নিজের অনুভূতি-অনুযায়ী দিতাম। তখন লোকে বলত—অমুক সাহেব এ-রকম বলেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর মণিদার দিকে চেয়ে বললেন—তুমি যেখানে আছ, সেখানে থেকেই যদি এগুলির অনুশীলন কর, তাহ'লে তোমার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী অনেক কিছু অনুভব করতে পার। তাতে তোমারও উপকার হবে, তোমার পরিবার-পরিবেশেরও উপকার হবে। যা' করবার ওখান থেকে করলে হয়।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য)—প্রত্যেকের বোধহয় নিজস্ব একটা রকম আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক-একজনের ক্ষুধা মেটাতে এক এক রকমের খাবার চাই, কিন্তু ক্ষুধাটা common (অভিন্ন), universal (সার্বজনীন)।

মণিদা একজন সন্ন্যাসীর কথা বললেন, যিনি দশ-পনের বছর সন্ন্যাস-জীবন যাপন করবার পর সন্ন্যাসের বিরুদ্ধে নানারকম অসন্তোষ প্রকাশ করতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা প্রকৃত সন্ন্যাসের লক্ষণ নয়। নিজের খেয়ালের গরিমায় আসলে, তা' fulfilled (পরিপূরিত) না হ'লে, ঐ সব রকম হয়। নিজস্ব ধাঁধা থাকলে ঐ রকম বোল বেরয়। সন্ন্যাস মানেই হ'ল—পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। গিরিশ ঘোষের প্রাণ যেমন সমর্পিত ছিল, তাকে সন্ন্যাসীই বলা চলে। রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে তার কিন্তু উল্টো কথা বলার জো ছিল না। তার বইগুলি প'ড়ে দেখ, প্রাণ কেমন ভগবানের জন্য আকুলি-বিকুলি ক'রে ওঠে। সাধু নাগমশায়ের মত লোক ক'জন মেলে? বিবেকানন্দ নাকি বলেছেন নাগ মশায়ের মত সাধু তিনি সারা দুনিয়ায় দেখতে পাননি। এরা সাজা-সাধু না, হওয়া-সাধু।

মণিদা—প্রকৃতি-অনুযায়ী প্রত্যেকের চলন হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার যেমন প্রকৃতিই হোক, প্রত্যেকেই বাঁচতে চায়। আর বাঁচতে গেলেই বাঁচার প্রতিকূল যা' তা' নিয়ন্ত্রণ করা লাগেই। কোন প্রবৃত্তিকে এমনভাবে লাই দেওয়া চলে না—যাতে তা' বাঁচার প্রতিকূল হ'য়ে ওঠে। তাই যতি হওয়া মানে, বাঁচাবাড়ার সাধক হওয়া। বাঁচাবাড়ার জন্য যা' করণীয় তা' করতে চায় না কে? কেউ হয়ত ঘরে বসে মহা যতি, আবার কেউ হয়ত জঙ্গলে গিয়েও প্রবৃত্তির পেছনে ঘোরে। ঘাড় ধ'রে কাউকে জোর ক'রে কিছু করাতে গেলে হয় না। প্রধান জিনিস হ'ল গুরুনিষ্ঠা। তা' বাদ দিয়ে বাইরের ভড়ং করে বেড়ালে হয় না।

জ্ঞানদা (চক্রবর্ত্তী)—পাঁচু যেমন এখানে এসে আছে, ওর নিজের সংসারের জন্য ওর তো করণীয় আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই যদি ওর লাইন হয়, তবে শুধু সংসার কেন আরও bigger fulfilment (বৃহত্তর পরিপূরণ)-ও হয়ত নিয়ে আসতে পারবে। ওর চলার ভিতর-দিয়ে দেখা যাক্ ওর লাইনটা কী। কিছুদিন অপেক্ষা ক'রেই দেখুন না। মানুষ অসুখ হয়েও তো কিছুদিন প'ড়ে থাকে। যা-হোক, এখানে এসে চেষ্টা করছে, দেখা যাক্ রকমটা কেমন দাঁড়ায়।

সংসারকে দাঁড় করাবার জন্য বড়ভাই হিসাবে জ্ঞানদা সাধ্যমত যতদূর যা' করেছেন তা' শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন বললেন—সাধারণভাবে যা' দেখি, তাতে সংসারের চোখে সকলের থেকে বড় পাপী তো হ'ল বাবা, তারপর বড় পাপী হ'ল বড়ভাই—যদি তার মমতা থাকে। কারণ, বেশীর ভাগ সংসারেই এদের উপর প্রত্যাশার অন্ত নাই। কিন্তু এদের জন্য যে সংসারের প্রত্যেকের করণীয় আছে তা' বড় কেউ-একটা ভাবে না। অবশ্য, সব সংসারই যে এমন তা' আমি বলি না। সংসারের কর্ত্তাকে সোয়াস্তি দিতে চেষ্টা করে তেমনতর ঢের সংসার আছে। যাদের সেই চেষ্টা থাকে তারা মঙ্গলেরই অধিকারী হয়; বাড়ির কর্তাও সেখানে শান্তি পায়।

মণিদা—আমি প্রথম শুনি আপনার কথা বাবার কাছে। বাবাকে আপনার সম্বন্ধে বলতে শুনেছি—তিনি সত্যিই বড়। যাঁকে লক্ষ-লক্ষ লোক প্রণাম করে, তিনি আমাকে নিজ হাতে তামাক সেজে খাওয়ালেন—কত ভদ্র, কত বড়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অতিথি-অভ্যাগতকে যত্ন করা তো প্রত্যেক সংসারীর-ই কর্তব্য। এটা না করাই অন্যায়।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর ঘুম থেকে উঠে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উত্তরাস্য হয়ে তক্তপোষের উপর শুভ্র শয্যায় উপবিষ্ট।

কিরণদা প্রভৃতি এবং আরও অনেকে কাছে উপস্থিত আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে কিরণদা বললেন—কম্যুনিষ্টরা বলে—কোনও ব্যক্তিবিশেষের কাছে নতি স্বীকার কল্যাণকর নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি মাথা নোয়াচ্ছ তোমার সত্তা সম্বর্ধনার কাছে—তোমার নারায়ণ

অর্থাৎ বৃদ্ধির পথের কাছে। মাথা নোয়ানর কোন compulsion (বাধ্যবাধকতা) নেই। কোথাও মাথা নোয়ায়ে যদি তোমার তৃপ্তি হয়, তাতে যদি তোমার মঙ্গল হয় তাহ'লে তোমাকে বাধা দেওয়ার আমার কি অধিকার আছে? আর এতে মহান যিনি, তাঁর কাছে মাথা নোয়াচ্ছি, লাভ তাঁর নয়, লাভ আমাদের। ওরা যে স্ট্যালিন, লেনিন ও মার্ক্স্‌কে শ্রদ্ধা করে, তা' করে কেন? করে এই জন্য যে, তারা বিশ্বাস করে যে তাদের মত ও পথ সর্ব্বসাধারণের পক্ষে কল্যাণকর। আমরা জীবনকে ভালবাসি এবং জীবনের জন্য যা'-যা' প্রয়োজন সেগুলি সত্তাপোষণী ক'রে ব্যবহার করতে চাই। আর, এটা করতে গেলে একটা সত্তাপোষণী সংযমের দরকার হয়। তার জন্যই দরকার হয় সত্তাপোষণী আত্মবিনায়ন লাভ করেছেন যিনি এমনতর কোন জীবন্ত আদর্শে সুকেন্দ্রিক হওয়া। গোড়ায় ঐটে থাকলে মানুষের জীবনের বাঁধন ঠিক থাকে। তখন সে নিজেকেও ঠিক পথে চালাতে পারে এবং অন্যকেও ঠিক পথে চালনা করার পথ নিজেঁর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বাত্‌লাতে পাবে। অমনতর মানুষের প্রতি নতি তাই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। শুধু তাই নয়, পিতামাতার প্রতি যদি স্বাভাবিক শ্রদ্ধাভক্তি না থাকে, তাহ'লে কিন্তু মানুষ গুরুভক্তি লাভ করতে পারে না। তাই আমাদের শাস্ত্রে বলেছে—"পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো ভব, আচার্য্যদেবো ভব।" এটা হচ্ছে science of normal growth (স্বাভাবিক বিকাশের বিজ্ঞান)। বিজ্ঞান বা বিধিকে মানব না, আমরা তো তেমন বেহেড হইনি! আর, এর বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করবার অধিকারই বা কার আছে?

কিরণদা—বেশীর ভাগ কম্যুনিষ্ট ছেলেদের দিয়ে নিজ-নিজ বাড়ির বিশেষ কোন উপকার হয় না। তারা শুধু দেশকে ও দশকে নিয়েই ব্যস্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর পেছনেও প্রবৃত্তির খেলাই বড়। মা-বাবার কথা একবারও ভাবি না, দেশের-দশের জন্য মাথা ঘামিয়ে বেড়াই এটা স্বাভাবিক নয়। অবশ্য তাই বলে আমি এ কথা বলি না যে শুধু নিজের পারিবারিক স্বার্থের কথাই ভাববো, পরিবেশের দিকে ফিরেও চাইব না। Concentricity (সুকেন্দ্রিকতা) বাদ দিয়ে যে sublimation (ভূমারিতি) তা' বাজে কথা। ওর ভিতর আদত মাল কতটুকু আছে তা' বোঝা যায় না। এমনতর উদারতা বা স্বাধীনতার কোন দাম নেই। Freedom (স্বাধীনতা) মানে—প্রিয়ের ঘরে বাস করা। আমার নিজের বাড়ি যদি আমার কাছে প্রিয় না হয় অথচ দেশের জন্যে যদি আমার অন্তরে প্রীতির বন্যা বইতে থাকে, সেটা একটা ঢং-ও হ'তে পারে।

যা শুনতে পাই, তাতে কম্যুনিষ্ট দেশে পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক খুব ভালভাবে গড়ে উঠতে পারে ব'লে মনে হয় না। আর, ঐ স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ভালবাসার চায যদি না হয়, তাহ'লে মানুষ লাখ খাক, পরুক, তার অন্তরের ক্ষুধা যে কতখানি মেটে তা' বুঝতে পারি না। ভালবাসার ভিতর-দিয়ে, চরিত্রের ভিতর-দিয়ে জীবন ফোটে। শুধু মাথার বুঝের মধ্যে জীবনের সার্থকতা নেই।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হয়ে বড়াল-বাংলোর মাঠে ইজি-চেয়ারে উপবিষ্ট। গরমের দিন। বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণ বিজ্‌লী বাতির আলোয় ঝল্‌মল্‌। ছেলেপেলেদের মধ্যে অনেকে তখন এদিকে-ওদিকে আনন্দে হুটোপুটি ক'রে বেড়াচ্ছে। কোথাও-কোথাও ভক্তগণ নিজেদের মধ্যে ইষ্টপ্রসঙ্গে রত। যতি-আশ্রমে যতিবৃন্দ ধ্যান-ভজন করছেন।

মণিদা (চক্রবর্ত্তী) শ্রীশ্রীঠাকুরের খুব কাছে ব'সে ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—মহাপুরুষের influence-এ (প্রভাবে) current (তরঙ্গ) তখনই down (নিম্নগামী) হয়, যখন মানুষ তাঁর অথবা তদগতপ্রাণ ভক্তের contact (সান্নিধ্য) পায় না। তিনি যার মধ্যে যতখানি জীবন্ত, তার দ্বারা মানুষের ততখানি মঙ্গল হয়।

মণিদা জিজ্ঞাসা করলেন—বৃত্তি ও ব্যক্তিত্ব এই দুটি জিনিসের পারস্পরিক সম্পর্ক কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৃত্তির মধ্য-দিয়ে মানুষ দুনিয়াটাকে চেনে, জানে, অনুভব ও উপভোগ করে। এক-একটা বৃত্তির এক-একটা জগৎ আছে। সেই বৃত্তির মধ্যে মানুষ যখন obsessed (অভিভূত) থাকে, তখন সেইটেই যেন তার কাছে সবকিছু হ'য়ে দাঁড়ায়। অন্য বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে তখন তার খেয়াল থাকে না। এইভাবে যখন মানুষ এক-এক বৃত্তির অধীন হয়, তখন তার কাছে সেইটেই যেন যথাসর্বস্ব হয়ে ওঠে। অথচ তা' তো বাস্তব ব্যাপার নয়। জীবনে সবগুলি বৃত্তিরই স্থান আছে, কিন্তু তা' মাত্রামত। বৃত্তিগুলির ঊর্ধ্বে থেকে সপারিপার্শ্বিক নিজের সত্তা সম্বর্দ্ধনার জন্য প্রয়োজনমত প্রত্যেকটি বৃত্তিরই যথাযথ ব্যবহার করতে হবে এবং তার জন্যই প্রয়োজন সবগুলি বৃত্তির উপর আধিপত্য লাভ ক'রে অখণ্ড ব্যক্তিত্বে উপনীত হয়েছেন যিনি, এমনতর একজন মানুষে বৃত্তিভেদী প্রবল টান নিয়ে অনুরক্ত হ'য়ে অবস্থান করা। সেই টানের মধ্য-দিয়ে আমরা আমাদের প্রকৃত সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হ'তে পারি এবং তখন বুঝতে পারি যে বৃত্তি ও সত্তায় তফাত কী। ঐ রকম ব্যক্তিত্বে প্রবল টান হ'লে আমরা বোধ করতে পারি যে, বৃত্তিগুলি সত্তার জন্য, অর্থাৎ সত্তার বৃত্তি, কিন্তু বৃত্তির জন্য সত্তা নয়। এই বোধের উপর দাঁড়িয়ে যখন বৃত্তিগুলির সাত্বত ব্যবহার আমরা শিখি কিন্তু সত্তাকে ক্ষতিগ্রস্ত ক'রে কোন বৃত্তির দাসত্ব করি না, বৃত্তিগুলি যখন আমাদের অধীন হয় এবং আমরা যখন ওগুলির অধীশ্বর হই, তখনই আমাদের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব গজায়। যারা ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিতে গিয়ে তাদের কোন প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দিয়ে চলে, বুঝতে হবে তারা প্রবৃত্তির অধীন হয়েই আছে। ঐ ধরনের মানুষকে যারা অনুসরণ করে, তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মণিদা—আমাদের অহং যখন আহত হয়, তখন সত্তাটা বিচলিত হ'য়ে ওঠে এবং তখন আমরা অহং-এর প্রতিষ্ঠার জন্যে পাগল হ'য়ে উঠি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Inferiority (হীনম্মন্যতা) থাকে, তাই অমন হয়। সমস্ত বৃত্তি

আদর্শে যুক্ত থাকলে তখন সব কিছুকে সত্তা-সম্পোষণার কাজে লাগায়। সত্তাকে ব্যাহত হ'তে দেয় না। তখন অহং আর সহজে wounded (আহত) হয় না। মনে কর, টাকায় অনুরক্ত তুমি, তোমাকে অপমানসূচক কথা বলল, তখনও সেটা বিশেষ গায়ে না মেখে এমন কথাবার্ত্তা বল, ব্যবহার কর তার সাথে, যাতে টাকা বেরিয়ে আসে তার গাঁট থেকে। প্রবৃত্তিতে interested (স্বার্থান্বিত) হ'লে মানুষের যখন এই ধাঁজের সচেতনতা আসতে পারে, তখন ইষ্টস্বার্থী হ'লে তো আর কথাই নেই। তবে ছোট আমি বা হীনম্মন্যতা সহজে যেতে চায় না। ইষ্টকে সত্তা ক'রে নিয়ে সেইভাবে যদি মানুষ চলতে শেখে, তাহ'লে কিন্তু কসরত অনেক ক'মে যায়।

মণিদা—যাকে অবলম্বন ক'রে সম্পূর্ণ বৃত্তি ভেদ হয়, তার সঙ্গে সম্পর্ক কী রকম হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৃত্তি ভেদ হওয়ায় অনেকের আর কোন কামনা-বাসনা থাকে না, একটা মহাভাবে লীন হ'য়ে থাকে। আমার কাছে বৈষ্ণবদের ভাবটা ভাল লাগে—আমি চিনি হতে চাই না, চিনি খেতে চাই। অর্থাৎ তাঁকে eternally enjoy (অনন্তকাল উপভোগ) করতে ইচ্ছা করে। এইরকম বুদ্ধি থাকলে, লয় হ'তে দেয় না। ওতে evolution-এর (বিবর্ত্তনের) সাহায্য হয়। গীতায় আছে—

"বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে, বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।" ইষ্টই তখন তার কাছে যথাসর্ব্বস্ব হ'য়ে দাঁড়ান। সব-কিছুর মধ্য-দিয়েই তার ইষ্টোপভোগ চলতে থাকে।

তুমি একজনকে ভালবাস—সে বিলেত গেল। তখন যাই কিছু দেখ, তাই দেখেই সেই প্রিয়ের কথা মনে পড়তে থাকে। একটা দোকানে ভাল রাজভোগ করেছে—দেখেই তোমার হঠাৎ মনে হবে—এই রাজভোগ তার কত পছন্দের জিনিস। বিরহের ব্যথায় বেদনায় বুকখানা ফেটে যেতে থাকে। আর দুনিয়ায় যা'-কিছু অনুভব কর, সেই সঙ্গে কোন-না-কোন প্রকারে অহরহ তার কথাই মনে পড়তে থাকে। "যত্র যত্র নেত্র পড়ে, তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে"—এমনতর হ'তে থাকে। মূর্ত্তি ফোটা নয়—association of ideas-এ (ভাবের অনুষঙ্গে) মনে পড়ে। তার সঙ্গে যাবতীয় যা'-কিছুর সঙ্গতি ও সম্পর্ক কী সেটা সর্ব্বক্ষণ চেতনায় প্রতিভাত হ'তে থাকে। আদত কথা, তোমার অস্তিত্বই যেন প্রিয়ময় হ'য়ে গেছে। তাকে বাদ দিয়ে তোমার ও তোমার অস্তিত্ব-উদ্দীপনী জগতের যেন কোন অর্থ নেই। একবার ভেবে দেখ, অবস্থাটা কী দাঁড়ায়।

মণিদা ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভক্তির মধ্যে যাজন, ইষ্টপ্রসঙ্গ, ইষ্টের স্মরণ, মনন, ইষ্টের গুণগান ইত্যাদি থাকেই। আর এইগুলি যেখানে থাকে, সেখানে তাঁর উপস্থিতি বোধ করা যায়। ভক্ত তার সমস্ত সত্তা দিয়ে ইষ্টসেবায় বিভোর হ'য়ে থাকতে চায়। এর মধ্যে একটা সানুকম্পী সঙ্গতি থাকে। ইষ্টের চলা, বলা, বোধ ও অনুভবের একটা অনু-

কম্পন স্পষ্টতঃ টের পাওয়া যায় ভক্তের সংস্পর্শে এলে। এটা অবশ্য প্রত্যেকের ভিতর বোধ করা যায়, তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী। ভক্তকে দেখলে তার উপাস্যের স্মৃতির উদ্দীপন হয়-ই কি হয়। তার কারণ, তার অস্তিত্বটা প্রেষ্ঠের পরিপোষণ, পরিপূরণ ও পরিরক্ষণ নিয়ে ব্যাপৃত থাকে। ভক্ত চায় ইষ্টের ইচ্ছাগুলি নিজের জীবন দিয়ে পরিপূরণ করতে। স্বভাবতঃই তার মধ্যে সর্ব্বজীবের প্রতি শুভেচ্ছা ও সম্প্রীতির ভাব প্রবল হ'য়ে ওঠে। সে চায়—সবাই বেঁচে থাক, পুষ্ট হোক, তুষ্ট হোক। কারণ, তাতে সত্তারূপী প্রিয়পরম খুশী হন। ভালবাসি খুব, অথচ তদনুযায়ী motor action (কর্ম্মপ্রবোধী স্নায়ু-ক্রিয়া) নেই, তার মানে সেখানে ভালবাসাই নেই। বৌ, ছেলেপেলে যাদের ভালবাসি, তাদের বেলায় কিন্তু কখনও inactive (নিষ্ক্রিয়) হ'য়ে বসে থাকি না। তাদের ভালর জন্য যা' করণীয় ব'লে মাথায় আসে, তা' বাস্তবে করতে লেগেই থাকি। ইষ্টের প্রতি ভালবাসা থাকলে আমাদের কাম, ক্রোধ, লোভ, X. Y. Z যতরকম প্রবৃত্তিই থাক না কেন, সেগুলি তাঁতে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে অন্বিত হ'য়ে ওঠে। তখন সেগুলি আর রিপু থাকে না, মিত্র হ'য়ে যায়। সুকেন্দ্রিক হ'য়ে সেগুলি পোকাটা-মাকড়টার পর্য্যন্ত ধারণ-পালনে সক্রিয় হয়—ইষ্টের প্রীত্যর্থে। এই যার মধ্যে যত হয়, তা' দেখে বোঝা যায় তার অন্তর্নিহিত ঈশ্বরত্ব বা ঠাকুরত্ব তত জেগে উঠছে এবং সে ঈশ্বরলাভের পথে ততখানি অগ্রসর হ'চ্ছে। ইষ্টের চরিত্র স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী যার ভিতর যতখানি সক্রিয় স্ফুরণা লাভ করে, তা' দেখে বোঝা যায় তার ভিতর ভক্তি কতখানি জাগছে।

মণিদা—বৈষ্ণবরা বলেন—পরম ভাবের প্রকাশ হ'লেন রাধাঠাকুরাণী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Super-conscious plane-এর (মহাচেতন স্তর-এর) becoming (পরিণতি)-টা শ্রীরাধা। শ্রীরাধা হ'লেন উৎসমুখী অনুরাগের পরাকাষ্ঠা। এর উল্টোটা অর্থাৎ আত্মস্বার্থ প্রতিষ্ঠা ও প্রবৃত্তিমুখী আকর্ষণটা হ'ল মায়া, অবিদ্যা বা জড়ত্বঘন প্রকৃতি।

মণিদা—নারদীয় ভক্তিসূত্রের মধ্যে ইষ্টে সারসিকী ভাব-ভক্তির কথা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাটি শুনে হেসে বললেন—কথাটা বড় ভাল। ঐ রকম ভাবভক্তি থাকলেই তাঁকে পরিপূরণ, পরিপোষণ ও পরিরক্ষণের বুদ্ধি প্রবল হয়। প্রকৃত ভালবাসা ও সেবার মধ্যে এই তিনটে ভাবই থাকে। এই তিনটের সম্মিলন না হ'লে প্রকৃত সেবা হয় না। ইষ্টে টান হ'লে—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ, ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ" —এমনতর রকম হয়। এতে প্রবৃত্তির বন্ধন খ'সে পড়ে এবং নিশ্চয়াত্মিকা প্রত্যয়ের আবির্ভাবে অন্তর জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে, সেখানে সংশয়ের লেশমাত্র ঠাঁই পায় না। প্রবৃত্তিতৃষ্ণা ও আত্মস্বার্থ প্রতিষ্ঠার বুদ্ধি যতদিন থাকে, ততদিন শয়তান-রূপী ফেউ লেগে থাকে পেছনে। ঐ জঙ্গল থাকলে তার মধ্যে ফেউ-এর আস্তানা থাকে।

মণিদা—ললিতা, বিশাখার সঙ্গে রাধার কী সম্পর্ক ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাধা অর্থাৎ uphill motion-এর (ঊর্দ্ধমুখী গতির) সঙ্গে চিরকাল থাকে ওরা—ওরা ঐ ভাবকেই পুষ্ট করে।

মণিদা বিবর্ত্তন ও অপবর্ত্তন সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বীজের মধ্যে যেমন গাছ থাকে, গাছের পরিণতির মধ্যেও তেমন বীজ থাকে। যে সবটা জানে, সে বীজের মধ্যেও গাছ ও তার শাখা-প্রশাখার সম্ভাব্যতা দেখতে পায়।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ব্রহ্মজ্ঞান বলতে অনেকে মনে করে—স'ব বুঝি একাকার হ'য়ে যায়, বহুত্বহীন একত্বজ্ঞান বিরাজ করে। কিন্তু আদতে ব্যাপারটা তা' না। ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্যে বিশ্লেষণাত্মক বৈশিষ্ট্যজ্ঞান এবং সংশ্লেষণাত্মক ঐক্যজ্ঞান দু'টোই একই সঙ্গে থাকে। একটা গাছ দেখলে যেমন গাছের পুরোটা বিবর্ত্তন চেতনায় ভেসে আসে—তাতে বীজ, বীজ থেকে চারা, চারা থেকে গাছের বৃদ্ধি, তার থেকে তার ফল, ফল থেকে বীজ সবটা দেখা হয় এবং তার মধ্যে মূল ব্রহ্মবস্তু ও তার চৈতন্যশক্তির একটা বিশেষ লীলা ব'লে মনে হয়—সব-কিছু সম্বন্ধেই তেমনি ঐক্য ও বৈচিত্র্যের নানা খেলা বোধ করা যায় এবং সে খেলার সঙ্গে আমার সত্তা যে জড়ান আছে, তা' প্রত্যক্ষ ক'রে একটা গভীর আহ্লাদ হ'তে থাকে। আমি যে কতরকম হ'য়ে কতরকম করছি, আবার আমি যে এর ভিতরে থেকেও এর ঊর্দ্ধে আছি এ সব ছায়াচিত্রের মত অনুভব করা যায়। একটু attention (মনোযোগ) দিলেই মালুম হয় যে, আমি কাউকে বাদ দিয়ে নই এবং কেউ বা কিছুই আমাকে বাদ দিয়ে নয়। সবটা মিলে একেরই খেলা। সে এক যেন একাধারে ব্যক্তিলীলা—আবার নৈর্ব্যক্তিক লীলা, আবার তা' ব্যক্তি-নৈর্ব্যক্তিকের পারেও আরও কিছু। এর যেন কোন আদি নেই, আবার অন্তও নেই, হ'য়েই চলেছে, ক'রেই চলেছে।—তাই কয় প্রকৃতি। এসব কথা ভাষায় বেশী কওয়া যায় না। কইতে গেলে মনে হয়, এসব কইতে গেলে যে ভাষায় কওয়া যায় সে ভাষার এখনও জন্ম হয়নি। বোঝে প্রাণ বোঝে যার। তাই বোধহয় রামকৃষ্ণদেব বলেছেন—ব্রহ্মতত্ত্ব উচ্ছিষ্ট হয়নি। অন্য কথায়, তিনি বচনাতীত—ভাবাতীত।

বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ চুপ হ'য়ে গেলেন। দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি যেন কি দেখছেন কিন্তু তা' বলতে পারছেন না। তাঁর সে সময়কার অভিব্যক্তি আজও মনে প'ড়ে মন যেন এক গভীর ভাবলোকে লীন হ'য়ে যেতে চায়। মাঝে মাঝে তিনি যেন চেতনাকে এমন স্তরে পৌঁছে দিতেন, যাকে অনির্ব্বচনীয় ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।

বেশ কিছু সময় চুপ থাকার পর মণিদা বললেন—অথা তো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা—বেদান্তের এই কথা আসে কোন্ সময়, কোন্ অবস্থায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, দুনিয়ার নানারকম ঘাত-প্রতিঘাতে বিধ্বস্ত হ'য়ে, সত্তার একসময় আবেগ আসে—বৃত্তি-প্রবৃত্তির এত যে নাকানি-চোবানি, ভুল-ভ্রান্তি-জনিত এত যে বিধ্বস্তি—এর মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বাঁচাবাড়া যায় কি ক'রে ? ব্রহ্মজিজ্ঞাসা

মানে—বৃদ্ধির জিজ্ঞাসা। মানুষ শুধু বেঁচেই খুশী নয়, সে চায় তার সত্তার চরম ও পরম সার্থকতা যে becoming-এর (বিবৃদ্ধির) মধ্যে আছে, তা' নিজ জীবনে আয়ত্ত করতে।

মণিদা—কৈবল্য অবস্থাটা বোঝা যায় কিভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে সত্তাবোধের শেষ নেই, যে অনুভব করে যে সে প্রত্যেক যা'-কিছুর মধ্যে আছে এবং প্রত্যেক যা'-কিছুই তার মধ্যে আছে, এইভাবে প্রত্যেকের interest (স্বার্থ)-কে যে নিজের interest (স্বার্থ) ব'লে বোধ করে—সেই অন্তহীন একাত্ম-বোধের অবস্থাই কৈবল্য। ব্রহ্মস্বরূপ গুরুকে পেয়ে, গুরুগত প্রাণ হ'য়ে ছাড়া শুধু যুক্তি বিচারের ভিতর-দিয়ে এই ভূমিতে স্থিতি হয় না। এমনতর হ'লে তার গালাগালি ও শাসনের ধাঁজও অন্যরকম হ'য়ে যায়—নিজেকে নিজে গালাগালি পাড়লে বা শাসন করলে যেমন হয়, এও তেমন হয়। গালাগালির মধ্যে দিয়েও যেন মধু ঝরে পড়ে। যে গালাগালি শোনে, সেও কেঁদে আকুল হয়—ভাবে এমন আপনজন পৃথিবীতে আমার আর কেউ নেই।

২১শে বৈশাখ ১৩৫৬, বুধবার (ইং ৪।৫।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোল তাঁবুর পাশে ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হ'য়ে ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট।

ইছাপুরের কিরণদা (ব্যানার্জ্জী) জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি তো ছোট শিল্প পছন্দ করেন, কিন্তু বড়-বড় শিল্প না হ'লেও ত' নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড় শিল্পের বিভিন্ন অংশ আলাদা-আলাদাভাবে যথাসম্ভব বাড়িতে-বাড়িতে করা লাগে, সেগুলি আবার assemble (একত্র) করা লাগে। তখন assembler's society (সম্মেলকদের সমাজ) একটা আলাদা হ'য়ে যাবে। প্রত্যেকটা শ্রমিককে ধনিক ক'রে তোলা লাগবে। আর, শাসনতন্ত্র দেখবে যাতে বর্ণাশ্রম ঠিক থাকে। কেউ তার বর্ণগত বৃত্তি থেকে চ্যুত হ'য়ে যাতে বেকার হ'য়ে না পড়তে পারে। প্রত্যেক বাড়িতে-বাড়িতে যাতে লোকের মধ্যে গবেষণাবুদ্ধি বাড়ে তাই করা লাগে। কাজ করুয়ে যদি ভাবুয়ে হয়, তাহ'লে accurate (নিখুঁত) হয়। না-করুয়ে যদি ভাবুয়ে হয়, তাহ'লে তার সে ভাবনা সব সময় প্রয়োগের ক্ষেত্রে উপযোগী হয় না। করুয়ে-ভাবুয়ে এক না হ'লে করা ও ভাবা যুগপৎ progressive (প্রগতিমুখর) হয় না।

কতকগুলি universal machine (সার্ব্বজনীন যন্ত্র) produce (উৎপাদন) করতে হয়। যা' দিয়ে বহুরকম কাজ একসাথে করা যায়। এমন করতে হয়, যাতে দেশের প্রয়োজন মিটিয়ে জিনিসপত্র অন্য দেশে supply (সরবরাহ) করা যায়। অবশ্য, সবকিছুর একটা মাত্রা ঠিক রেখে চলতে হয়। আমি ভাবি—জিনিসপত্র দেদার

হোক, কিন্তু টাকা যেন আক্রা থাকে। টাকার জোগান বেশী হওয়া, বা টাকা সস্তা হওয়া ও প্রয়োজনীয় জিনিসের জোগান ক'মে যাওয়া ভাল নয়।

আগে অনেক সময় গ্রামের লোক গাতাপ্রথায় কাজ ক'রে পরস্পরের কাজ উদ্ধার ক'রে দিত। তাতে শ্রমের জন্য কাউকে অর্থ দেওয়ার প্রথা ছিল না। যার বাড়ির কাজ ক'রে দিচ্ছে সেখানে সবাই মিলে খাওয়া-দাওয়া করছে, আবার প্রয়োজন মতো হয়ত কিছু জিনিসও দিচ্ছে। হাতে টাকা নেই ব'লে, প্রয়োজনীয় কাজকর্ম্ম অচল হ'য়ে থাকত না। গ্রামের মানুষগুলির মধ্যে সক্রিয় সামাজিকতা, সহযোগিতা ও আত্মীয়তা-বোধ ছিল। আবার তাই করা লাগে, যাতে মানুষ মানুষের আপন হয়। দিন-দিন সব জিনিসেরই ধরন বদলে যাবে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধটা যদি আপন-জনের মত থাকে, তাহ'লে কেউ কিন্তু অসহায় বোধ করবে না নিজেকে। যখন দেখছ অর্থের প্রয়োজন ক'মে গেল, শ্রম, প্রস্তুতি ও প্রীতি বেড়ে গেল, তখন বুঝবে যে তোমরা inter-interested (পরস্পর স্বার্থান্বিত) হ'য়ে উঠছ। তোমরা নিজেদের মধ্যে এই কাণ্ডটা ক'রে ফেল, তখন বলতে পারবে—ঠাকুর ব্যাপারটা কী দেখে নাও, লোকেও তখন বুঝবে।

কিরণদা—আজকাল বেশীর ভাগ পারিবারিক জীবন অসুখী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনিয়ন্ত্রিত দাম্পত্য-জীবন যা'-কিছু গোলমালের সৃষ্টি করে। দাম্পত্য-সম্পর্কের উপর দাঁড়িয়ে পরিবারের ভিত তৈরী হয়। সেখানে যদি ভূমিকম্প লেগে যায়, তাহ'লে কি সাত তলা বা চোদ্দ তলা দালান ঠিক থাকবে? উচ্ছৃঙ্খল মেয়েদের চেহারাই আলাদা। ধরিত্রীর যদি আকর্ষণী শক্তি নষ্ট হ'য়ে যায়, তাহ'লে ধারণ করবে কে? পুরুষ অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ হ'লে যা' হয়, তেমনতর স্বামীতে ঐ ধরনের নিষ্ঠা হ'লে মেয়েদেরও তেমনি adjustment (নিয়ন্ত্রণ) হয়। পুরুষ আবার নারীর পরিপূরণী না হ'লে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়, দাম্পত্য জীবনে ভূমিকম্প লেগেই থাকে। বিয়েই যদি ঠিকমত না হয়, তাহ'লে ভাল-ভাল পুরুষ ও নারীর জীবন নষ্ট হ'য়ে যায়।

প্রফুল্ল—পুরুষ যদি ইষ্টমুখী না হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো আছেই। উপদেশ খাটাচ্ছি—সুকেন্দ্রিক হও, অথচ নিজে আমি ইষ্টে সুকেন্দ্রিক নই, তাতে কিছু হয় না। নিজে হ'লে তখন স্ত্রী-পুত্রাদি স্বাভাবিকভাবে ঐ ধরন ধরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর যতি-আশ্রমে এসে বসলেন। কিরণদা প্রভৃতিও সঙ্গে-সঙ্গে আসলেন।

কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সত্তাসম্বর্দ্ধনী যতি-সন্ন্যাসী যারা—তারা আছে ব'লেই আমরা টিকে আছি। তাই পুত্রকন্যা ভরণপোষণের মতো তাদের পালন-পোষণ করাও আমাদের পরম পুণ্য কর্ম্ম। তাদের যদি পালন-পোষণ না করি, তারা কাজ করবে কিভাবে? তারা বেঁচেবর্ত্তে থাকলে তবে তো তাদের করণীয় করতে

পারবে ? তারাই যে আমাদের বাঁচাটা বাঁচায়—তাই সংসারের আগে তাদের চিন্তা ও ব্যবস্থা করা উচিত আমাদের। সন্ন্যাসীরা অবশ্য প্রত্যাশা করবে না, তবে গৃহস্থদের সব সময় তাদের জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার এবং সেটা তাদের বিশেষ করণীয়। অবশ্য, সন্ন্যাসীরা নেবে তাদের minimum (ন্যূনতম) প্রয়োজনটুকু মাত্র।

প্রফুল্ল—যতিদের যদি নিত্য ভিক্ষা করতে হয়, তাহ'লে ত' তাতে তাদের অনেকখানি সময় ও শক্তি ঐ কাজে নষ্ট হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভিক্ষায় বেরিয়ে অতগুলি পরিবারের সঙ্গে মিশে, তাদের সংশোধন ও নিয়ন্ত্রণ করার এবং সেবা ও পোষণ দেবার একটা সুযোগ পাওয়া যায়। সেইটেই তো একটা মস্ত কাজ। আর, নিজেরও training (শিক্ষা) হয় ওর ভিতর-দিয়ে।

কিরণদা—ধ্যান-ধারণা করতে গেলে তো খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে সাবধান হওয়া লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খাওয়া-দাওয়া হাল্কা ও পুষ্টিকর হবে এবং মাত্রাও কম হবে।

কাশীদা (রায়চৌধুরী)—জোর ক'রে খাওয়া-দাওয়া বিষয়ে বেশী কড়াকড়ি করতে গেলে, তাতে শরীর খারাপ হয় না কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি বোঝো আর না বোঝো, ভাল করলে তার effect (ফল) হবেই। মাছ-মাংস যদি জোর ক'রেও ছাড়া যায়, তাতে ভালই হয়। ভাল যা', তা' না বুঝে করলেও ভাল হয়, করার ফল আছেই।

কিরণদা—সর্বকিছু সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি কি আপনার জন্মগত সম্পদ ? না করার ভেতর-দিয়ে তা বেড়েছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার যাই থাক, করলেই আর একটু বাড়ে, একটু করতেই হয়।

জনৈক দাদা—চাকরীর ক্ষেত্রে ভাল ক'রে কাজকর্ম্ম করা সত্ত্বেও উপরের অফিসাররা অনেক সময় দুর্ব্যবহার করে, তাতে মন খারাপ হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হীনম্মন্যতার জন্য লাগে। চাকরীটা তো তোমার জীবন না, তাই চাকরীর ক্ষেত্রে বড়কর্ত্তাদের বাহাদুরী বা তারিফের দিকে নজর দিও না। নজর দেবে যোগ্যতা বাড়াবার দিকে, যাতে ছোট-বড় প্রত্যেকের হৃদয় জয় করতে পার। তোমার recognition (স্বীকৃতি) তুমি—তোমার work (কাজ)। ও সবের তোয়াক্কাই রাখবে না। তোমার যোগ্যতার বিকাশই তোমার আত্মপ্রসাদ। আত্মপ্রসাদ যদি আবার তোমাকে নিথর ক'রে দেয়, তাও ভাল নয়। তুমি চাইবে সব্যসাচী হতে, আর তা' ইষ্টপ্রীত্যর্থে। তোমার কাজের উপর আধিপত্যই তোমার কাম্য। তা' যদি তুমি লাভ করতে পার, তাহ'লে কোন্ দিক দিয়ে, কিভাবে ঠেলে উঠবে তার ঠিক নেই। হয়ত তোমার চাকরী করাই লাগবে না, নিজেই একটা কিছু করতে পারবে। আবার হয়ত বড়-বড় চাকরীর জন্য লোকে তোমাকে সাধাসাধি করবে।

কেষ্টদা—কিন্তু যোগ্যতা অর্জ্জন করতেই যদি বাধা দেয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—লোকে বাধা দেবেই। দুনিয়ার বাধাকে অতিক্রম ক'রে successful

(কৃতকার্য্য) হওয়া লাগবে—সেইটেই efficiency (যোগ্যতা)। Efficiency (যোগ্যতা) দিয়ে opposition (বাধা)-কে বাধ্য করাই efficincy-র (যোগ্যতার) পরখ। বাধাকে তোয়াক্কা করলে পারা যাবে না। কাজ করবে, কাজের ভিতর-দিয়ে নিজের শক্তিকে জাগ্রত করতে এবং সেই প্রস্তুতি দিয়ে প্রিয়পরমের মুখে হাসি ফোটাতে।

কেষ্টদা—সুযোগ পাওয়া দরকার তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার যোগ্যতা এতখানি হবে যে, যে আমাকে দাবাতে আসবে সে-ই opposition (বাধা) দিতে গিয়ে ঘায়েল হ'য়ে যাবে। এতখানি হ'লে মানুষ অপরাজেয় হ'য়ে যায়। আর ইষ্টের প্রতি অটুট টান থাকলেই মানুষ এমন হ'য়ে উঠতে পারে। ওই একটি বস্তু আছে, যা' কিছুতেই কাবু হয় না। ইষ্টার্থে কাজ করার সময় ইষ্টই শক্তি জোগান। কোন প্রবৃত্তিস্বার্থে কাজ আর ইষ্টার্থে কাজ এ দুয়ের ঝুনই আলাদা। ভবসাগর পাড়ি দেওয়ার মূল সম্বলই ওই।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে কেষ্টদাকে বললেন—আমি কিরণকে বলেছিলাম, কিছু সন্ন্যাসী জোগাড় করার কথা। Science man (বিজ্ঞানের লোক) হ'লে একটু চোস্ত হয়। যারা কাজ করবে তাদের এমন রোখ্ চাই যে, যে-কোন situation-এ (অবস্থায়) পড়ুক না কেন, master of the situation (অবস্থার প্রভু) না হ'য়ে ছাড়বে না। সব ব্যাপারেই এমনতর রোখ চাই। Nerve (স্নায়ু)-গুলি তেমন হবে।

জনৈক দাদা—শুধু পুরুষকারে হয় না, দৈব চাই, যেমন একজন হয়ত যথেষ্ট যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তার উন্নতি হ'ল না, আর একজন হয়ত কম যোগ্যতা নিয়েও উপরে উঠে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পুরুষকার আবার দৈবকে টেনে নিয়ে আসে। করার effect (ফল)-গুলি, যা adjusted (বিন্যস্ত) হ'য়ে আছে মাথায়, তাই দৈব হয়ে আছে। বর্ত্তমান action-এর (কাজের) উল্টো করা থাকলে, তারই ফল এসে অসুবিধার সৃষ্টি করে। পূর্বে যদি কোন go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) করা থাকে, তজ্জনিত সৃষ্ট ফাঁকগুলি বর্ত্তমান প্রাণপণ ক'রে সুফল পাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে। আগের করাগুলি ঠিক থাকলে, তার ফলগুলি tuned (একতান) হ'য়ে এখনও ভাল ফল দেয়। পূর্বের না-করা বা খারাপ করার সম্মিলিত ফল আমার প্রত্যেক কাজেই আমাকে pursue (অনুসরণ) করে। অবশ্য লোককে নিয়ে চলার ব্যাপারে সুকৌশলে চলার কায়দা জানা চাই। নচেৎ চালের ভুলে অনেক সময় গোলমাল হয়। আদর্শ ঠিক রেখে tactfully (সুকৌশলে) চলতে হয়।

যোগ্যতা সম্বন্ধে পুনরায় কথা উঠল।

সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—চরিত্রে যত রকমের ফাঁক থাকে সেগুলি পূরণ করা লাগে, তাহলে কর্ম্মের ফল ঠিকমত পাওয়া যায়। করার 'পর থাকতে হয়। করায় না-করার effect (ফল) কেটে যাবে। এখন যে কাজ করেও পারছ না, সে

করাটা কিন্তু একেবারে বিফলে যাচ্ছে না। তার ফল ভিতরে-ভিতরে হচ্ছেই। সাধ্যমত করা সত্ত্বেও যে আশানুরূপ ফল পাচ্ছ না, তার কারণ চরিত্রের মধ্যে আগের না-করার এবং অবিধিপূর্ব্বক করার ফল জমায়েত থাকায় তা' সাফল্যের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। মাতালের নেশার মতো যদি করে যাও বিহিতভাবে এবং যথাসময়ে—অসাফল্যের পথগুলি বন্ধ করে,—তাহলে পারবেই। Recognition-এর (স্বীকৃতির) তোয়াক্কা রেখ না যে বলেছি, তার মানে এ নয়, যে আমি disobedient (অবাধ্য) হতে বলছি। Manners (ব্যবহার) যেন ঠিক থাকে। সবাই যেন তৃপ্ত হয়, নন্দিত হয়।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—Adherence (নিষ্ঠা) যত ঠিক ও সক্রিয় হয়, সেবাও তত জীবনীয় হয়। আবার, যার বেষ্টনী যত strong (শক্তিশালী) হয়, সে তত successful (কৃতকার্য্য) হতে পারে। যীশুখ্রীষ্টের বেষ্টনী তত শক্ত ছিল না।

কাশীদা—যীশুখ্রীষ্ট কি এইজন্য দায়ী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি কী করবেন? তিনি ত ত্রুটি কিছু করেননি।

প্রফুল্ল—আমরা তো বলি যে, একটা মানুষ যদি তার পরিবেশকে favourable (অনুকূল) ক'রে নিতে না পারে সেই জন্য সে-ই দায়ী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যদি এ ব্যাপারে যীশুখ্রীষ্টকে দায়ী করতে চাই, সেটা আমাদের একটা মস্ত বড় অকৃতজ্ঞতা হবে। তিনি তো তাঁর প্রাণ দিয়ে করেছেন—শিষ্যদের ভালবেসেছেন, তাদের nurture (পোষণ) দিয়েছেন—নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা ঢেলে দিয়ে;—তাঁর শিষ্যদের কি কিছুই করণীয় ছিল না? তিনি তাদের ভালবেসে ঠাঁই দিয়েছিলেন, এই কি তাঁর অপরাধ? সেটা যদি দোষ হয়, সে দোষ তো আছেই। শরীর নিয়ে আসেন ব'লে, ভালবেসেই তাঁদের জীবন কাটে, তার দরুণই তো দুর্ভোগ তাঁদের। বিশ্বাসঘাতক যারা তাদেরও তিনি ভালবেসে কোল দেন—শোধরাতে চান, তারাই তাঁকে হয়ত যমের মুখে ঠেলে দেয়। পাবনায় যে পরিবেশ ঠিক থাকল না, চটে গেল,—সেও তো আমার দোষ বলতে পার। আমি যদি তোমাদের নিয়ে প'ড়ে না থাকতাম, আগের মতো স্থানীয় লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারতাম, তাহলে ও-অবস্থার সৃষ্টি হতো না। অবশ্য, তোমাদের দেখাশোনা ক'রেও যে সেদিকে তাল দিতে পারিনি, সেটা আমার defect (দোষ) বলতে পার। তা' হয়ত আমার করাই উচিত ছিল, কিন্তু পারিনি। আমার কথা ছেড়েই দাও, ক্রাইষ্টের যে এতখানি করা আমাদের জন্য, তাঁর জন্য আমাদের করণীয়ের দিক থেকে কি আমাদের কিছুই ভাববার নেই? তাঁকে অপরাধী করব? এতবড় অকৃতজ্ঞতার কথা ভাবতেও আমার কেমন জানি গা শিউরে ওঠে। ক্রাইষ্ট তো তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ক্যাসাবিয়াঙ্কার মতো তাঁর কর্তব্য ক'রে গেলেন—অতবড় জীবন—অতখানি চরিত্র, এত বিপুল করা—আমাদের চোখে পড়ল না;-হায় রে দুর্ভাগ্য! আর, তাঁর যদি ত্রুটি-ই থাকে,

যার দরুন তিনি ঐ বিকৃত পরিবেশকে ঠিক করতে পারেননি,—আমি বলি—"With all Thy faults I love Thee" (তোমার সবত্রুটি সত্ত্বেও আমি তোমাকে ভালবাসি)। এঁদের যে দোষ দেখি, সে আর কিছু নয়—আমাদের impurity (অপবিত্রতা)-ই পুষ্ট হতে চায় wise pose-এ (বিজ্ঞ কায়দায়)।

প্রফুল্ল—আমার কথাটা তা' নয়—আমি বলতে চাই পরিবেশ ভাল না হ'লে, একজন নিখুঁত মানুষেরও কিছু করার জো নেই। তাই, কেউ তার সমগ্র পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারল না ব'লে যখন আমরা একজন মানুষকে দায়ী করি, সেটা ঠিক নয়;—ওটা একটা impossible (অসম্ভব) কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Impossible (অসম্ভব) কেন বল? He who shoots at the star, reaches the height of a tree (যে আকাশের তারার দিকে তীর ছোঁড়ে, তার তীর অন্তত গাছের মাথায় গিয়ে পেঁছিয়)। এইভাবেই তো এগিয়ে যায় মানুষে। দুর্বলতা, অপারগতা, অসুবিধা তো আছেই, কিন্তু লক্ষ্য যদি বিরাট ও মহান না হয়, তাহলে evolution (বিবর্তন) হবে কি করে? এইভাবে মানুষ না-পারাকে ও অজানাকে অধিগত ক'রে এগিয়ে চলেছে আরোতে। পারবে না এ-কথা নয়,—পারবে।

প্রফুল্ল—ইতিহাস দেখলে ভরসা হয় কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি ইতিহাসের কথা বল, Urge (আকূতি) থাকলে ও কথা আসে না। অশোকের রাজত্ব হওয়ার আগে অমন আর একটা রাজ্য হয়নি। আমরা চাই কি? আমরা চাই কৃতকার্য্য হতে। পারার support (সমর্থন)-ই আমি চাই। না-পারার support (সমর্থন) আমরা চাই না। না-পারার complex-এর (প্রবৃত্তির) latitude-এর (প্রশ্রয়ের) support (সমর্থন) ঢের আছে। পারার support-এ (সমর্থনে) চল, তাতেই লাভ তোমার। তুমি তো বীজ বুনে গেলে, পুরুষপুরুষানুক্রমে চলতে থাকবে এটা।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে নক্ষত্রখচিত আকাশের তলে ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট।

বীরেনদা (মিত্র) কলকাতায় যাওয়ার প্রাক্কালে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করতে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে বীরেনদাকে বললেন—কলকাতায় গিয়ে দলের মধ্যে প'ড়ে আবার নূতন অভ্যাসগুলি সম্বন্ধে শিথিল হয়ো না। দলের induction (সন্তাপ) একটা বড় জিনিস। কতজন হয়ত তোমাকে ঠাট্টা করবে, কিন্তু যদি stick করে (লেগে) থাকতে পার, তাদের সম্ভ্রম বেড়ে যাবে। আর, ঐ অবস্থার মধ্যে-দিয়ে ঠিক থাকতে পারলে পাকা হবে। যা'-যা' বলেছি—ধ'রে-ধ'রে প্রত্যেকটা ঠিক করা লাগবে।

বীরেনদা—আগে একবার চা ছেড়ে দিয়ে, ছ'মাস পরে এক কাপ, এক কাপ ক'রে ধরলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে তোমার ছ'মাস পর্য্যন্ত danger (বিপদ)-ও আছে। অতদিন এবং আরো বেশীদিন হুঁশিয়ার থাকা লাগে। খুব fanatically (গোঁড়ামীর সঙ্গে), strictly (কঠোরভাবে) থাকা লাগে—প্রবৃত্তির নির্ম্মম প্রতিরোধ যাকে বলে, তাই করা লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর দরদের সুরে বললেন—বড়ই দেরী ক'রে ফেলেছি। তোদের পেছনে আরো আগে থেকে যদি একটু বেশী কড়া হতাম, তাহলে তোদের ভাল হ'ত।

বীরেনদা ছল-ছলে চোখে পুনরায় প্রণাম ক'রে ভাবিত মনে নীরবে নতমুখে বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রি সাতটা পঞ্চাশ মিনিটের সময়ে একটি বাণী দিলেন। তারপর কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী), কিরণদা (মুখাজ্জী), হরেনদা (বসু) ও প্রফুল্লকে বললেন—তোমাদের করাগুলি যেন প্রত্যাশার উপর না ঝোলে, তাহলে কাজের কাজ কিছু হবে না। টাকার লোভে, কি মেয়েমানুষের লোভে, কি সুনামের আশায় বা পিঠ-চাপড়ানির প্রত্যাশায় কিছু করতে যাবে না। নিজেরা ঠিক না হলে, কিছু করার জো নেই। যা-কিছু করার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকবে ইষ্টের মুখে হাসি ফোটান, আর সব consideration (বিবেচনা) মুছে যাক তোমাদের জীবন থেকে। তখন কত লোক তোমাদের ঐ চলন দেখে ইষ্টসর্ব্বস্ব হওয়ার প্রেরণা পাবে। তেমনতর মানুষ যদি গড়ে না ওঠে, ফাক্কিকারিতে কিছু হবে না।

একটু থেমে বললেন—মা ম্রিয়স্ব! মা জহি; মৃত্যুমবলোপয় (মরো না, মের না, মৃত্যুকে অবলুপ্ত কর)।—এই তোমাদের কাজ। এই কাজের কথা ঠিক এমন করে কেউ কোনদিন ভাবেনি। আমি সেই দায় তোমাদের উপর দিতে যাচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর বললেন—Typical man (আদর্শ কর্ম্মী) যোগাড় করা চাই। লিখিয়ে চাই। নিজেদের একটা ভাল প্রেস করা লাগে। যার যেদিকে প্রবণতা আছে, তাকে সেইদিকে ঠেলে দেওয়া লাগে to fulfil our principle (আমাদের আদর্শের পরিপূরণে)। কিছু ভাল বক্তা চাই। আরও পঁচিশ-তিরিশ-জন ডিগ্রিধারী ভাল-মাথাওয়ালা কর্ম্মী চাই, যারা জনসাধারণের মধ্যে ভালভাবে কাজ করতে পারে। এরসঙ্গে চাই দু'হাজার, আড়াই হাজার শ্রমণ। তিন হাজার কৃষ্টি-বান্ধব তাড়াতাড়ি করে ফেলতে হয়। ন্যূনতম এই সঙ্গতিটুকু হলে পারা যায়। আর চুনী প্রভৃতি যদি আরো adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়, ওরাও অনেক কাজ করতে পারে এবং লোককে চালনাও করতে পারে।

সুধীরদা (বসু)-কে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—করছ তো?

সুধীরদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজেকে একেবারে সোনা ক'রে ফেলা চাই। একেবারে নিখুঁত। যাই করি, যাই বুঝি, যাই জানি তা' যদি চরিত্রগত না হয়, তবে তা living (জীবন্ত) হয় না।

কথাপ্রসঙ্গে চুনীদা বললেন— আত্মবিশ্লেষণে তো নিজের ধ্যানই হয় !

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে চিন্তাগুলি তুমি এড়াতে পার না, আসেই, তাকে ছেঁটে ফেল না, বরং দেখে যাও, বোঝো তাকে—মূল ও ডাল-পালাসহ। তাকে সম্যক চেনা যদি থাকে এবং যদি profitably (লাভজনকভাবে) adjust (নিয়ন্ত্রণ) কর, তবে ওগুলি experience (অভিজ্ঞতা) হ'য়ে থাকবে। তুমি নিজে তো তাদের হাতে পড়বেই না, অন্যকেও সাহায্য করতে পারবে—ঐগুলি adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে। এক কথায়, তুমি অন্যকেও তোমার অভিজ্ঞতা-অনুযায়ী পথ দেখাতে পারবে।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে এসে বসলেন।

প্রফুল্ল—ইষ্টের কাজ একজন যদি খুব বেশী করতে না পারে, তার ক্ষমতা যদি খুব বেশী না থাকে, কিন্তু ইষ্টকে ধ'রে নিজেকে যদি ঠিক-ঠিক নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলতে পারে, তাহলে সে জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেতে পারে কিনা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পায়, যখন তৃষ্ণা আর না থাকে। তল্লা-টল্লা যা' থাক্ আর না-ই থাক্, with all our environment (আমাদের সমগ্র পরিবেশ-সহ) বাঁচতে পারি কিনা স্মৃতিবাহীচেতনা নিয়ে—সেইটেই আমার চাহিদা। জড়ত্বের conflict (সংঘাত) যেখানে নাই, সেখানে সবই চৈতন্য। পরিনির্বাণ-টির্বাণ ওই অবস্থা।

প্রফুল্ল—আত্মসচেতনতার জন্য তো অহং ও তার বাইরের কিছুর সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চাই !

শ্রীশ্রীঠাকুর—চৈতন্য বা শক্তি matter (বস্তু) হ'য়ে evolved (বিবর্ত্তিত) হয়। এই relativity (আপেক্ষিকতা) থেকে আসে self-consciousness (আত্ম-সচেতনতা)।

প্রফুল্ল—শুদ্ধ চৈতন্য হয়ে থাকাই তো ভাল- যেখানে জড়ের কোন স্পর্শ নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেখানে চৈতন্য থাকে, কিন্তু আমি আর থাকি না।

প্যারীদা (নন্দী)—জন্মমৃত্যুরহিত অবস্থাটা কী ? কিভাবে থাকে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে গান আছে—

"জলে জল হয়ে যাও গলে
কঠিনে মেশে না সে যে, মেশে তরল হলে", কতকটা এই অবস্থা। বৈষ্ণবরা দাস আমি আর ছাড়তে চায় না, সুকেন্দ্রিক সমবায়ী হয়ে থাকতে চায়—ঐটেই ভাল। আমি আছি, কিন্তু আমি তাঁর, তাঁর জন্যই আমার অস্তিত্ব।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বিদ্যে-বুদ্ধি যতই থাক, তা' যদি চরিত্রে না ফোটে, তার glow (দীপ্তি) হয় না। Living (জীবন্ত) হয় না তা'। আর সেই অবস্থায় যদি public work (জনসাধারণের সেবা) করতে যায়, তাহলে নিজেও ডোবে অন্যকেও সাবাড় করে।

আজ কেষ্টদা কলকাতায় যাবেন, বিদায় নিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় দক্ষিণদিকে

টিক্‌টিকি ডাকাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন খারাপ হ'য়ে গেল। কিন্তু কেষ্টদার সামনে কিছু বললেন না। কেষ্টদা চ'লে যাওয়ার পর আমাদের সামনে কথাটা জানালেন, জানিয়ে গম্ভীর হ'য়ে ব'সে থাকলেন। খানিকটা পরে বললেন—আমার মনে হচ্ছিল কেষ্টদা যদি যাত্রাটা বদল করে যেত, মন্দ হতো না।

তখনই হরিদাসদা (সিংহ) সাইকেল ক'রে চ'লে গেলেন জসিডি। হরিদাসদা যাওয়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বলতে লাগলেন—ডাকতে না পাঠালে নিজেই উদ্বেগ নিয়ে কাটাতাম। এইভাবে কত সময় যে বলতে পারি না, আর তার দরুন কষ্ট পাই নিজে। নানারকম আঘাত পেয়ে-পেয়ে এখন আমার খারাপটাই কেবল মনে হয়। প্রত্যেকের জন্য দুশ্চিন্তা লেগেই থাকে। এই আমার তহ্লা। এই তহ্লার ঠেলায় অমন ক'রে কথা বেরিয়েছে—মা ম্রিয়স্ব, মা জহি মৃত্যুমবলোপয় (ম'রো না, মের না, মৃত্যুকে অবলুপ্ত কর)। আমার মন চায় তোমরাও যদি এই অবস্থাটা সম্ভব ক'রে তুলতে পার পৃথিবীতে, তাহলে আমি বোধহয় একটু সোয়াস্তি পাই। আমাকে যখন তোমরা ভালবাস, তখন নিশ্চয়ই তোমরা এরজন্যে চেষ্টা করবে। আর, পরমপিতার দয়ায় সফলতার দিকে এগুতে থাকবে। আমার এই কথা পৃথিবীর ঘরে-ঘরে পৌঁছে দাও, আর তার পথ আমি যেমনভাবে, যতটুকু বাতলেছি সঙ্গে-সঙ্গে তাও ভাল ক'রে চাউর ক'রে দাও।

কেষ্টদা জসিডি থেকে ফিরে আসার পর, শ্রীশ্রীঠাকুর খুব খুশী হলেন। বললেন—আমি ভাবছিলাম তখনই বলব।

কেষ্টদা—তা' বললেন না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—লজ্জা করতে লাগল, তাই বলিনি।

ব'লেই শ্রীশ্রীঠাকুর বালকের মত হাসতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের হাসির সঙ্গে-সঙ্গে সবাই মিলে হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন।

২২শে বৈশাখ ১৩৫৬, বৃহস্পতিবার (ইং ৫।৫।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোল তাঁবুর পাশে ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট। চুনীদা (রায়চৌধুরী), কিরণদা (মুখোপাধ্যায়), হরেনদা (বসু), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), কাশীদা (রায়চৌধুরী), উমাদা (বাগচী), সুরেনদা (শূর), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য) প্রভৃতি এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে তাঁর শ্রীচরণতলে উপস্থিত।

কথাপ্রসঙ্গে কিরণদা জিজ্ঞাসা করলেন—পশ্চাদপসারিণী চিন্তায় অতীতটা বোঝা যায়, কিন্তু ভবিষ্যৎ বোঝা যায় কিভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভুত অর্থাৎ আগে কী করা হয়েছে, তার বিশ্লেষণের ভিতর-দিয়ে বর্তমান কিভাবে influenced (প্রভাবিত) হচ্ছে, তা' যদি বোঝা যায়, তবে তা' আবার গড়িয়ে ভবিষ্যতে কিভাবে উদ্ভিন্ন হয়ে উঠবে—পর্য্যায়ক্রমে, কার্য্যকারণ সম্পর্কে,—সেই ধারা-অনুযায়ী ঠিকভাবে ভাবলেই বোঝা যায়—এর পরিণতিস্বরূপ ভবিষ্যতে কী হবে। তাই তাও বলা যায়।

কিরণদা—দূরে ভবিষ্যতের কথা কি বলা যায় ?—৫০০, ৭০০ কিংবা ১০০০ বছরের পরের ঘটনা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অদূরে ভবিষ্যৎ যদি বোঝা যায়, দূরে ভবিষ্যৎও বোঝা যায়। কুড়ি হাত যদি এগোন যায়, কুড়ি কোটি যোজনও এগোন যায়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে এসে বসলেন। যতি-আশ্রমে কেবল শরৎদা (হালদার) এবং ননীদা (চক্রবর্ত্তী) উপস্থিত আছেন।

নামধ্যান সম্বন্ধে কথা উঠল।

শরৎদা—বিশেষ অনুভূতি টের পাই না, তবে নামটা স্বাভাবিকভাবে প্রায় সময়ই হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার এমন হ'তো—খামাখা নাম ক'রে যাচ্ছি—মরুভূমির মত অবস্থা—স্বাদ নাই, রস নাই, তাক নাই অথচ ছাড়তে পারি না। এইভাবে চলতে-চলতে হঠাৎ-হঠাৎ ক'রে কেমন ক'রে যেন বেঁধে গেল—তখন ঝরঝর ক'রে অনেকিছু আসতে থাকে। আমি নিজের নেশায়ই করতাম। হওয়া, পাওয়ার বালাই বড় একটা ছিল না। ভাল লাগত তাই করতাম। যেমন আছে—মদ খেয়ে যদি মাতলামি না করে, তাহলে মাতাল হয় না ; তেমন নাম ক'রে সেই মাফিক কাজ না করলে হয়ত নিরেট হ'য়ে রইল। নাম আর কাজ এক সাথে চালান লাগে। যারা থিয়েটার করে, তাদের মত ভেবে-ভেবে কথাবার্তা, চালচলনের ভঙ্গী ঠিক করতে হয়। চৈতন্যদেব যেমন ভক্তির অনুশীলন করতেন—ভাষায়, বলায়, করায়, চলায়, সাধনে, ভজনে, যাজনে, ভক্তি-আস্বাদনে,—সেইভাবে নিজেকে ঈশ্বরানুরাগে অনুষিক্ত ক'রে চরিত্রে তা' ফুটিয়ে তুলতে হয়। "ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।" "ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা-সন্ধ্যা সে কি চায় ? সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে তবু সন্ধি নাহি পায়।" এইরকম ভাবমুখী হ'য়ে থাকতে হয়।

আলিপুরদুয়ারের কেষ্টদা (দাস) লিখেছেন—তিনি শ্রমনের মত জীবনযাপন করতে আরম্ভ করেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই কথা শুনে উল্লসিত হ'য়ে বললেন—এ আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে।

গোটা দশেকের সময় শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন।

পরে সেই প্রসঙ্গে বললেন—পারিপার্শ্বিক বলতে এক নয়—বহু, যাদের কারও সাথে কারও মিল নেই। তাদের প্রত্যেকের আলাদা impulse (সাড়া) পড়ছে প্রতিটি ব্যক্তির উপর—যার মিল নেই কারও সাথে, যে ঠিক অন্য কারও মত নয়। এই যে প্রত্যেকটা মানুষ তার মত, এইটেই হ'ল তার বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেকটি মানুষেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। ফলকথা মানুষটা ঐ-ই। তাকে বিয়েও দিতে হবে এমন মেয়ের সাথে, যে হবে তার বৈশিষ্ট্যপরিপোষণী। তাকে খেতেও দিতে হবে তার বৈশিষ্ট্যপরিপোষণী রকমে। তাকে চলতেও দিতে হবে তার বৈশিষ্ট্যের পথে। এইটে

যে জানে না, সে মানুষ নিয়ে চলতেই শেখেনি। সে কেবল সংঘাতই সৃষ্টি করতে জানে। যারা নেতৃত্বের নাম ক'রে মানুষকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য করে, তাদের কাছে থেকে মানুষ মানুষ হ'তে পারে না, বরং তাদের ব্যক্তিত্ব pulverised (গুঁড়ো গুঁড়ো) হ'য়ে যায়। এটা একটা প্রচণ্ড ক্ষতি।

শরৎদা—আজকাল মনোবিজ্ঞানীরা বলেন—মানুষকে এমনভাবে সাহায্য করা ভাল না, যাতে তাদের ভিতর হীনম্মন্যতা জাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে আলাদা কথা। তবে রাষ্ট্র যদি মানুষের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেয়, অথচ তাদের যদি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য না থাকে, তবে রাষ্ট্র তাদের দায়িত্ব নেবে কেন? এবং নেবেই বা কি ক'রে, যদি তারা রাষ্ট্রের অনুশাসন-অনুযায়ী না চলে? সেখানে রাষ্ট্রও ভেঙে যাবে। হীনম্মন্যতা তো ভাল নয়ই, তবে পরস্পরের সহযোগিতা বজায় রাখতে গেলে, একটা স্বাভাবিক প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক থাকাই লাগে, নচেৎ একটা পরিবারও টিকে থাকতে পারে না।

শরৎদা—একজন জমিদার হয়ত প্রজাদের সাহায্য করল, আবার ব্যভিচার ক'রে কৃতজ্ঞতার দাবিতে প্রজাদের সমর্থন চাইল। বড়লোক বা জমিদারদের মধ্যে একই সঙ্গে এই দুইরকমের প্রবণতা তো দেখা যায় খুব। শেষ পর্য্যন্ত এদের নিয়ে গড়পড়তায় মানুষের উপকার না অপকার বেশী হয় তা তো বলা মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি আমার কারও উপর কৃতজ্ঞতা থাকে, তার সত্তার প্রতি আমার একটা টান থাকে, তার সর্ব্বনাশ হচ্ছে এমন কোন devil (শয়তান) যদি দেখি তার মধ্যে তা তো resist (নিরোধ) করা উচিতই। জমিদার বা মালিক যেমন অত্যাচারী হতে পারে, রাষ্ট্রের শাসকরাও তো তেমনি despot (স্বেচ্ছাচারী) হ'তে পারে এবং তাদের দিয়ে মানুষের সর্ব্বনাশ হ'তে পারে। তাই আমার কথা হচ্ছে—মানুষ যদি ভাল না হয়, তাহ'লে শুধু ব্যক্তিগত property (সম্পত্তি) না থাকলেই যে সমস্যার সমাধান হ'ল তা' নয়।

প্রফুল্ল—গণতান্ত্রিক শাসন-বিধান যদি থাকে, তবে যে-কোন মানুষকে তো তাড়াতাড়ি সরিয়ে দেওয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা'র হাতে প্রভূত ক্ষমতা থাকে, তাকে কি অত চট্ ক'রে সরান যায়? সে তো তার সমস্ত ক্ষমতা, গদি আঁকড়ে রাখবার জন্য নানা বড়-বড় বুলি আউড়ে প্রয়োগ করে। তাই যত সময় মানুষ না শোধরায়, ততদিন সাধারণ লোকের বিপদ আছেই। Mass-এর (জনসাধারণের) অবস্থা চিরকালই প্রায় সমান। একসময় এ মারে তো আরেক সময় ও মারে।

বেলা এগারটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—যে, যে-জাতের তার ডিম্বকোষও তেমনি। মানুষের পেটে মানুষই হয়। বীজে থাকে gene (জনি)—Ova-কে (ডিম্বকোষকে) রজই বল আর ভূমিই বল, তার কিন্তু ধরন থাকে ঐ জাতীয় প্রজাতিকে প্রসব করার।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে ব'সে কথাপ্রসঙ্গে যতিদের বললেন—আপনারা সত্তার উপর দাঁড়াতে চাচ্ছেন, তাই সত্তার দৌড় যেখানে ও যতদূর, আপনারাও সেখানে ততদূর এগিয়ে যেতে পারবেন—নির্বিবাদে ও সহজে। আমরা কোন সত্তারই ক্ষতি চাই না, কিন্তু সত্তার ক্ষতি করে যে বা যা', সেখানে আমরা চুপ ক'রে থাকতে নারাজ। তা' আমরা হ'তে দেব না। কথা তো আমার এই একটা, তাই দিয়েই এর সঙ্গে জড়িত সবকিছু affair (বিষয়) adjust (বিন্যাস) করা হয়েছে। আমার এ জিনিস বুঝতে খুব একটা দিগ্‌গজ মাথা লাগে না। নিজের উপর ফেলে যে বুঝতে চায় সে বুঝতে পারে। যে ভাবে তার জীবনটাই খুব মূল্যবান, কিন্তু অন্যের যা-হোক বা না-হোক তাতে কিছু এসে যায় না, তার মধ্যেই আছে শয়তানি বুদ্ধি। শয়তানি বুদ্ধি থাকলে, আমার এই সহজ প্রাণের কথা মাথায় আসতে চায় না। পরিস্থিতিই তখন তাদের বুঝিয়ে ছাড়ে। সেইজন্য আমি বলেছি—

যা' ইচ্ছে তাই করবে তুমি
তা' কিন্তু রে চলবে না
ভাল ছাড়া মন্দ করলে
পরিস্থিতি ছাড়বে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যক্তিগত জীবনের কয়েকটি অভিজ্ঞতার কথা বললেন—আমি যখন ঘুম ছাড়লাম, তখন দিনে রাত্রে কখনও ঘুমাতাম না। কিন্তু আদৌ অবসাদ লাগত না। তখন খুব নাম করতাম, সমস্ত শরীর যেন গরম হ'য়ে থাকত। একটা থার্মোমিটার ধরেছি তো ১১০° ডিগ্রী তাপ উঠে গেল। গায়ে জল দিলে উবে যাওয়ার মত হ'তো। বহু মাস পর যখন ঘুমতে আরম্ভ করলাম, তখন চোখ বুজলে এক জগৎ আর চোখ খুললে আর এক জগৎ। সূক্ষ্ম জিনিসগুলি এতখানি living figure (জীবন্ত মূর্তি) নিয়ে জেগে থাকত, যে চোখ বোজা মাত্র আপনা থেকেই সব ভেসে উঠত। ঘুমের মধ্যেও যেন সম্পূর্ণ চেতন—দেখে যাচ্ছি সব। শরীরের প্রত্যেকটা cell (কোষ)-ই অসম্ভব তীক্ষ্ণ, তরতরে ও তপান্বিত হ'য়ে থাকত। ভিতরে এত অসাধারণ স্ফূর্তি হ'ত, যে মনে হ'ত সমস্ত cell (কোষ)-গুলি যেন ফেটে যাবে। চলছি তো সোঁ করে যেন দৌড়ে চলতাম। speed (গতি) এত ছিল, যে মনে হ'ত—গাছপালা-গুলি যেন দৌড়াচ্ছে।

একটু থেমে পরে বললেন—পৈতের পর গেরুয়া কাপড় পরে আটকা অবস্থায় যখন ছিলাম—একদিন ঘুমিয়ে আছি, সেই সময় হুজুর মহারাজ নিজে এসে, ঘুম থেকে তুলে বসিয়ে আমাকে ভজন দেখিয়ে দিয়ে গেলেন।

শরৎদা—আপনার গুরু কে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সরকার সাহেবের নির্দ্দেশমত মা আমাকে নাম দিয়েছিলেন, কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই হুজুর মহারাজের উপর আমার খুব ঝোঁক ছিল।

২৩শে বৈশাখ ১৩৫৬, শুক্রবার (ইং ৬। ৫। ১৯৪৯)

কাল রাত থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর বেশ খারাপ। তিনি গোল তাঁবুতে বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করছেন। তাঁর পেট খারাপ হয়েছে, গা' বমি-বমি করছে, শরীরের মধ্যে অস্বস্তি বোধ করছেন। কাল রাত্রে ভুক্ত দ্রব্য গলা বেয়ে উঠে কাশিরও সৃষ্টি করেছে। রাত্রে ঘুম হয়নি। এর আগে ক'দিন একটু খাওয়ার অনিয়ম হয়েছে। বেশী ঝাল, বিশেষ ক'রে শুকনো লংকার ঝাল শ্রীশ্রীঠাকুরের সহ্য হয় না। শুকনো লংকার ঝাল খাওয়ায় দু' তিন দিন থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের হজম ঠিকমত হচ্ছিল না। যাঁরা ভাল রান্না করেন, যাঁদের রান্না শ্রীশ্রীঠাকুর পছন্দ করেন, তাঁদের কারও-কারও প্রলোভন থাকে যাতে তিনি রান্না খেয়ে তারিফ করেন। কিন্তু রান্না ভাল লাগার সঙ্গে, তা' খেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর ভাল থাকবেন কিনা সেদিকে তাঁদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে না। ইদানীং দেখা যায় শ্রীশ্রীঠাকুর হয়ত মোটামুটি সুস্থ আছেন, হঠাৎ কারও ভাল রান্না খেয়ে তাঁর পেট খারাপ হয়ে পড়ল, তা' থেকে আবার অন্য উপসর্গের সৃষ্টি হ'ল। আবার অনেক সময় মনে ব্যথা পেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর খারাপ হ'য়ে পড়ে। যাদের মনোজ্ঞ ব্যবহার তিনি আশা করেন, তাদের প্রীতিশূন্য, অবিবেচক ব্যবহার বা অবাধ্যতায় মনে আঘাত পেলেও তাঁর শরীর হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়ে।

২৬শে বৈশাখ ১৩৫৬, সোমবার (ইং ৯। ৫। ১৯৪৯)

কয়েকদিন শারীরিক অসুস্থতার পর শ্রীশ্রীঠাকুর আজ অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন। তিনি প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় তক্তপোশে বিছানায় উপবিষ্ট।

জনৈক বসুদা (বিশ্বাসের সৎসঙ্গী) এবং তাঁর সঙ্গে লক্ষ্ণৌ থেকে ডক্টরেট ডিগ্রীধারী এক মা এসেছেন। তাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে উপবেশন করলেন। তখন শরৎদা (হালদার), চুনীদা (রায়চৌধুরী), কিরণদা (মুখাজ্জী), অমূল্যদা (প্রফুল্লর দাদা), উমাদা (বাগচী) প্রভৃতি অনেকে এবং কতিপয় মা উপস্থিত ছিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সমগ্র ভারত যদি তার নিজস্ব কৃষ্টির উপর দাঁড়ায়, তাহ'লে অসম্ভব কাণ্ড হয়ে দাঁড়ায়।

প্রফুল্ল—দেশে প্রতিভাবান পুরুষ যতই থাকুক না কেন, জনসাধারণ যদি ইষ্ট ও কৃষ্টির ভিত্তিতে সংহত না হয়, তাহ'লে তার দাম হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইটে থাকলে সবকিছু জীবন্ত হ'য়ে উঠত এবং দেশের চেহারাও ফিরে যেত।

কিছুক্ষণ বাদে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা সৎসঙ্গীরা যদি সৎপন্থী অন্যকে উপেক্ষা করি, তাহ'লে আমাদের আদর্শের মর্য্যাদা রাখতে পারি না। সৎসঙ্গী মানে অস্তি-বৃদ্ধির সঙ্গী—যারা চায় বাঁচতে-বাড়তে এবং বাঁচাতে-বাড়াতে, তাই

প্রকৃতপক্ষে সবাই সৎসঙ্গী। সমস্ত সদ্‌গুরু-নিষ্ঠ গুরু বিভিন্ন হলেও একপন্থী। "সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ"—সদ্‌গুরুর ভিতর সমস্ত দেবতাই জাগ্রত থাকেন। কোন প্রেরিত পুরুষ বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের বিরোধ নেই। কিন্তু আমরা তাকেই নিরোধ করতে চাই, যা' সত্তাসংবর্ধনার অন্তরায়। আমি বলি—তুমি যদি বাঁচা বাড়ার পথ জান, যে জানে না তাকে তা' জানাও, যে উঠতে পারে না, তাকে ধ'রে তোল—তাই-ই ধর্ম্ম।

নবাগতা মায়ের দিকে চেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি বল মা ?

উক্ত মা সশ্রদ্ধভাবে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন।

এরপর প্রতিলোম-বিবাহের কুফল সম্বন্ধে কথা ওঠায় উক্ত মা বললেন—মানুষের ক্ষেত্রেও বোঝা মুশকিল কে বড়, কে ছোট।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যতদিন ঠিকমত বুঝতে না পারি, ততদিন ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষেরা যে বিধান ক'রে দিয়ে গেছেন, সেই অনুযায়ী চলাই ভাল। তাঁদের যে বুদ্ধি কিছু কম ছিল তা' ভাবার কোন কারণ নেই।

উক্ত মা পরিবেশের প্রভাবের সম্বন্ধে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! প্রত্যেক ব্যষ্টি পারিপার্শ্বিকের থেকে নিয়ে বাড়ে, কিন্তু প্রত্যেকে নেয় তার মতো ক'রে। আর, পারিপার্শ্বিকও তো কতকগুলি বিভিন্ন ব্যষ্টি, তারা প্রত্যেকে সাড়া দেয়ও তার মতো ক'রে। পারিপার্শ্বিক না হ'লে মানুষ বাড়ে না, কিন্তু পারিপার্শ্বিকের থেকে নিয়ে প্রত্যেকের তা' হজম করা লাগে নিজের মতো ক'রে ;—নচেৎ হয় না। যেমন, যত খাবারই খাই, রস-রক্ত ক'রে নিতে হয় আমাকে।

উক্ত মা কথায়-কথায় বললেন—আজকাল যোগ্যতার কদর কম, বেশীর ভাগ জায়গায় corruption (দুর্নীতি) ও nepotism (স্বজন-পোষণ)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গোড়ায় গলদ।

শরৎদা—গোড়ায় গলদ মানে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জাতির যখন আদর্শ ব'লে কিছু না থাকে, তাঁর প্রতি অনুরাগ না থাকে, তখন যতই বক্তৃতা দিই কাজের কাজ কিছুই হয় না তাতে। আমাদের প্রাণ যদি আদর্শে অচ্যুত হয়, তখন চরিত্রও জীবন্ত হ'য়ে ওঠে। ভাষাও বেরয় তেমনি, তখন তা' মানুষের মধ্যে চারায় এবং তা'তে মানুষ অনুপ্রাণিত হয়। মোটকথা প্রেম চাই তাঁতে।

শরৎদা—দেশপ্রেম তো আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রেম হ'তে একজন মানুষ লাগে। সেবা চাই তাঁর। প্রকৃত চরিত্রবান মানুষের প্রতি টানের ভিতর-দিয়ে জাগে চরিত্র। প্রবৃত্তিগুলি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়। আমার ভিতর সু কু যাই থাক তাই দিয়েই তাঁকে খুশী করার ইচ্ছা জাগে। তখন সেগুলি সেই মুখী হ'য়ে দানা বেঁধে ওঠে। ভিতরটাও দানা বাঁধে।

বাইরেরটাও দানা বেঁধে ওঠে। ওতে ব্যক্তিগত জীবনে যেমন সঙ্গতি আসে, তেমনি তাঁকে কেন্দ্র ক'রে যারা চলে তাদের মধ্যেও ঐক্য গজায়। আমার যদি কারও উপর নতি না থাকে, মান্য না থাকে, তবে অন্যে আমাকে মেনে চলবে—এ আশা করা যায় না।

শরৎদা—গান্ধীজী শেষ বয়সে বলতেন—কেউ তাঁর মতবাদের অনুরাগী হ'ল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা পাথুরে কেষ্টঠাকুর বা পিতলের গোপালের 'পরও যদি উপযুক্ত গুরুকে কেন্দ্র ক'রে কারও প্রকৃত টান হয়, তাতেও চরিত্র একমুখী হ'য়ে অনেকখানি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়। আমার পক্ষে মহাত্মাজী সম্পর্কে কিছু বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা, কিন্তু তাঁর যদি বাস্তব কোন অবলম্বন থাকত তাহ'লেও হ'ত। দাশ-দা এখানে দীক্ষা নিলেন। তিনি নামকরা লোক ছিলেন, কিন্তু সে-সম্বন্ধে তাঁর কোন অভিমানই ছিল না। শিশুর মতো আগ্রহ নিয়ে তিনি সৎসঙ্গের ভাবধারা বুঝতে চেষ্টা করতেন। বাস্তব surrender-এর (আত্মসমর্পণের) প্রয়োজন আছে কিন্তু সবারই।

উক্ত মা—Horizontal level-এর (সমতল স্তরের) সঙ্গে vertical level-এর (ঊর্ধ্বাধঃ স্তরের) উন্নতি একসঙ্গে চাই অর্থাৎ সামাজিক ও আর্থিক উন্নতির সঙ্গে আধ্যাত্মিক উন্নতি চাই। সব মাত্রায় উন্নতি হওয়া দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যদি সদ্‌গুরুকে ধ'রে অনন্তের উপাসনা করি, তাহ'লেই আমাদের জীবনে বিবর্ত্তন আসে। যীশুখ্রীষ্ট বলেছেন—I am the way, the truth, the life, none can come to the Father but by Me (আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই জীবন, আমাকে বাদ দিয়ে কেউ পরমপিতার কাছে পেঁছিতে পারে না)। আমাদের প্রবৃত্তিগুলি যদি আমাদের বাইরে সুনিয়ন্ত্রিত কোন আদর্শে অনুরক্ত না হয়, তাহ'লে বৃদ্ধি ব'লে কোন জিনিস থাকে না। তাতে সেগুলি নিয়ন্ত্রিত হ'তে পারে না।

শরৎদা—রামকৃষ্ণদেবের নিজ মায়ের উপর অগাধ টান ছিল, তাই তিনি জগন্মাতাকে পেয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে মায়ের পেটে জন্মেছ, তাকে বাদ দিয়ে জগতের মাকে পাওয়া হয় না। যার কাছে তার মা'র ছবিখানা ঠাঁই পায় না, জীবন্ত হ'য়ে ধরা দেয় না, তার কাছে মা-কালী জীবন্ত হবেন কি করে ?

কথাপ্রসঙ্গে মা বললেন—আমরা কেবল বাইরে থেকে নিচ্ছি, কিন্তু আমাদের originality (মৌলিকতা) grow করছে (বাড়ছে) না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের বৃদ্ধির জন্য বাইরে থেকে নেওয়ার প্রয়োজন আছে, তবে ভাবের থেকে আদর্শ ভাল। জীবন্ত আদর্শ না হ'লে জোর বাঁধে না। আবার, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যদি না থাকে, তাকে যদি বিবর্দ্ধনে বা উন্নতিতে নিতে না পারি, তবে স্বাধীনতা কথার মানে কি ? প্রধান কথা হ'লো এই যে—আদর্শের প্রতি অনুরাগ যত অচ্যুত হয়, কওয়া, করা, চলায় আমরা যত তাঁর মত হতে চেষ্টা করি—স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য

অনুযায়ী ;—ততই আমরা পরস্পর স্বার্থান্বিত হ'য়ে উঠি। সমষ্টিটা যেন ব্যষ্টি হ'য়ে ওঠে, যেমন আমাদের এই শরীর। এর প্রত্যেকটা আলাদা organ (অঙ্গ) মিলিয়ে যেন এক। আর, এই বিচিত্র ঐক্যবন্ধ সমাবেশ যা, তা' সত্তায় সুস্থিত থেকেই সমগ্র শরীরকে টিকিয়ে রেখেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—সমস্ত মহাপুরুষরাই একেরই বার্ত্তাবাহী—যেখানে যেমন প্রয়োজন, সেখানে তেমন পরিবেশন করেন। আমরা তাই দেখে আবার নিজেদের মত বিচার করি, মাপ করি। কিন্তু তাঁরা জানেন—কোথায়, কখন, কাকে কতটুকু দিতে হবে। যেখানে, যখন, যাকে যতটুকু দেন, মানুষ নিষ্ঠা-সহকারে তাই যদি আয়ত্ত করে, তার ভিতর-থেকেই কিন্তু সব পাওয়ার পথে এগুতে পারে।

তুই মা পি এইচ ডি। কিন্তু তুই যদি ছোট ছেলেদের অংক শেখাস, তাদের কিন্তু তাদের ধরনেই শেখাবি। তাই দেখে তোকে যদি বিচার করি এবং ভাবি বেশী কিছু জানিস না, তাহ'লে ভুল করা হবে। তোর জ্ঞানের দৌড় ঐ পর্য্যন্ত—এমনতর যদি বুঝে নিই, তাহ'লে তোর যে বিরাট জ্ঞান আছে তা' থেকে বঞ্চিত হ'ব। অবশ্য অত জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, ওদের যে সহজ ক'রে বোঝাতে পার—ওদের স্তরে নেমে,—সেটা যে একটা কত বড় কৃতিত্ব তা' হৃদয়ঙ্গম করতেও এলেম লাগে। মনে কর, শুক্লপক্ষের রাত্রে রোজই চাঁদটা বাড়ে, কিন্তু আগের তিথি ও পরের তিথির চাঁদ যে একই চাঁদ, সেইটে যে জানে না সে হয়ত ভাবে রোজ বুঝি আলাদা চাঁদ উঠছে। বিন্নাস সৎসঙ্গের গুরু, আগ্রা সৎসঙ্গের গুরু, তরণতারণ সৎসঙ্গের গুরু—এঁরা পরস্পর পরস্পরকে যদি না মানেন, যেখানে যাচ্ছি সেখানে আমার গুরুকেই যেন পাচ্ছি—এমনতর যদি না হয়, তাহ'লে কিন্তু হ'ল না। যাঁরা উপলব্ধিবান গুরু তাঁরা কারও ভাবে ব্যাঘাত করেন না। তাঁদের কাছে গেলে প্রত্যেকেরই গুরুভক্তি পরিপূরণী পোষণ পায়। শুনেছি, আগে এক ঋষির ছাত্রকে অন্য ঋষির কাছে পাঠাত। তুই হয়তো তোর এক ছাত্রকে দিল্লির কোন এক দিকপাল অধ্যাপকের কাছে পাঠালি, কোনও একটা বিষয় শেখার জন্য। আবার, সেখানকার কেউ হয়তো তার ছাত্রকে পাকাপোক্ত ক'রে তোলবার জন্যে তোর কাছে চিঠি দিয়ে বিশেষ কোন বিষয় শেখবার জন্য পাঠাল—যে-বিষয়ে হয়তো তুই অসাধারণ অগ্রণী। এইভাবে যদি পারস্পরিক আদান-প্রদান চলে এবং সব বৈশিষ্ট্যগুলি inter-fulfilling (পরস্পর-পরিপূরণী) হ'য়ে integrated (সংহত) হ'য়ে ওঠে, তাহ'লে তার ফলে বিদ্যার কেমনতর পরিপূরণী বিস্তার হতে থাকে তা' ভেবে দেখেছ? চৈতন্যদেবের ভক্তরা এবং রামানুজ সম্প্রদায়ের ভক্তরা স্ব-স্ব নিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রেখে যদি পরস্পর মেলামেশা ও আদান-প্রদানে অসম্মত হয়, সে কি ভাল কথা? এই আদান-প্রদান ও মেলামেশা যদি না থাকে, তাহ'লে বিবর্দ্ধনী তপস্যাগুলি sterile (বন্ধ্যা) হ'য়ে যায়। তবে ঋষিকে বাদ দিয়ে, ঋষিবাদের উপাসনা ভাল নয়, তাতে বাদগুলি প্রাণহীন হ'য়ে যায়। কেউ যদি তোমার কাছ থেকে mathematics (গণিত) শিখতে চায়, অথচ তোমার প্রতি তার

শ্রদ্ধা না থাকে, তাহ'লে সে যা' শিখবে সে-শেখাটা জীবন্ত হ'য়ে উঠবে না তার চরিত্রে। তার জানার রকমটা নিষ্প্রাণ ও বিকৃত হ'য়ে থাকবে তার মধ্যে। সে তা' জীবন্তভাবে অন্যের ভিতর সঞ্চারিত করতে পারবে কিনা সন্দেহ।

উক্ত মা—মনুষ্য প্রকৃতির বিকাশের একটা বিধি আছে তো! সে বিধি বোধহয় চিরন্তন।

শরৎদা—শুনেছি, শাশ্বত বিধি ব'লে কিছু আছে—এ-কথা অনেকে মানে না। তাঁদের বক্তব্য হ'লো, পরিবেশ যখন যেমন, তখন তেমন হ'য়ে দাঁড়ায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ পরিবেশ থেকে যা' পায় তা' দিয়ে যদি নিজের সত্তাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে, তাহ'লেই সে প্রকৃত লাভবান হ'তে পারে। কিন্তু এই সত্তা ব'লে যদি কিছু না থাকে, তাহ'লে পরিবেশ থেকে জীবনীয় সরবরাহ সংগ্রহ করে কোন ব্যাটা? আর, সত্তা যদি না থাকে তাহ'লে সম্বর্দ্ধিতই বা হয় কে? আমিই যদি উড়ে গেলাম, তাহ'লে রইল কে এবং কার জন্যই বা কি?

শরৎদা—মানুষ কর্ম্ম করবে, খেতে পরতে পাবে—এমনতর ব্যবস্থা তো চাই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিও তো সে কথা বলি। কিন্তু খাওয়া-পরাটা তো ব্যক্তির বাঁচাবাড়ার জন্য? সেই ব্যক্তিগুলিকে এবং তাদের বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিয়ে ঢালাও রকমে চললে কারও প্রকৃত ভাল হয় না।

উক্ত মা—দুটো দিক ভাবতে হবে। শুধু প্রয়োজন-পূরণই শেষ কথা নয়, প্রাচুর্য্য বলে একটা জিনিসও দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকটি মানুষ তা'র বৈশিষ্ট্যসম্মত প্রয়োজনকে পূরণ ক'রে যখন সর্ব্বতোমুখী প্রাচুর্য্যের পথে চলে, আমরা সেইটেকেই বলব ধর্ম্ম। "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।" সাত্বত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে অবাধ করার স্বাধীনতা যদি থাকে, তাতে প্রত্যেকটি ব্যষ্টি বেড়ে উঠবে—চিন্তায়, চলনে, কর্ম্মে, চরিত্রে ও প্রাপ্তিতে। আমরা যা' বলি তা' যদি করায় ফুটিয়ে না তুলি, তাহ'লে তা' জীবন পায় না। তাই যা' কই বা চাই বলি, তা' কিন্তু করা চাই। বোধা-স্নায়ু ও কর্ম্মী-স্নায়ু—এ দুটোর মধ্যে ভালরকম মিতালি চাই। কেউ যেন কাউকে ছেড়ে না চলে, তাহ'লে আমরা ঠেকে পড়তে বাধ্য হ'ব। তুই শিক্ষকতা করিস। তোর চালচলন এমন হৃদয়গ্রাহী হওয়া চাই, যাতে শতজন্মেও তোর ছাত্ররা তোকে ভুলতে না পারে। তোর কাছে এসে মানুষগুলি যেন অমৃতের স্বাদ পায়—অমৃত হ'য়ে ওঠে। তাহ'লেই না মা তুই প্রকৃত শিক্ষক বা আচার্য্য!

শ্রীশ্রীঠাকুর মা'টিকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোরা সকালে কিছু খেয়েছিস তো?

উক্ত মা—হ্যাঁ, চা এবং জলযোগ করেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—দেখিস যেন এদের কোন কষ্ট না হয়।

উক্ত মা—আপনার সান্নিধ্যে যে অপূর্ব্ব আনন্দ ও প্রেরণা পেলাম, তা জীবনে চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে।

এরপর কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মৈনুদ্দীন চিশ্তি ছিলেন আমাদের পূর্ব্ব গুরু—তাঁকে তো মান্য দিয়েছে সবাই। একজন মেথরও যদি সদ্‌গুরু হন, তাঁকেও ধরতে হবে। সদ্‌গুরু যাঁরা, তাঁরা কারও বৈশিষ্ট্য ভাঙ্গেন না, আর সেখানে মানুষগুলি united (ঐক্যবদ্ধ) হয় বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী।

উক্ত মা—লক্ষ্ণৌ-এর এক কলেজে কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান উপলক্ষে রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতির নামের উল্লেখে মুসলমান সম্প্রদায়ের তরফ থেকে আপত্তি ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনিই এই সব হ'য়ে এসেছেন বিভিন্ন সময়ে। খোদার বান্দাকে যদি অস্বীকার করি, তাঁকেই অস্বীকার করা হয়। তোমার একটি সন্তানকে যদি তোমার সন্তান বলতে অস্বীকার করে, তাহ'লে কি তোমাকেই অপমান করা হয় না? সর্ব্ব সম্প্রদায়ের ঐক্য সম্বন্ধেও রসুলের বহু কথা বলা আছে। সেগুলি সংগ্রহ ক'রে রাখতে হয়। রসুলের জীবনী, কোরাণ, হাদিস, ইসলামের ইতিহাস ইত্যাদি ভাল ক'রে প'ড়ে রাখতে হয়। ইসলামের বিকৃতিকে আমাদের কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। তা' যদি আমরা সুকৌশলে নিরোধ না করি, তাহ'লে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। ধর্ম্মকে নিয়ে কোথাও কোন বিরোধের কারণ আছে ব'লে আমার মনে হয় না। ধর্ম্মের সম্প্রদায় লাখ হ'তে পারে, কিন্তু একজন বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মান unit (এক) যদি থাকেন, তখন সবই ঐক্যে সমাবিষ্ট হয়। তখন দুনিয়ায় ভয় থাকে না, দুঃখ থাকে না, কষ্ট থাকে না। অবশ্য, শয়তান সবসময়ই তার কারসাজি চালাতে থাকে। বিভেদের বীজ সৃষ্টি করতে না পারলে যেন তার পেটের ভাত হজম হয় না।

উক্ত মা—পথ আলাদা দেখেই মানুষ ভাবে—বুঝি সেগুলি পরস্পরবিরোধী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পথ আলাদা নয়। পথ ঐ এক পথ। সদ্‌গুরুতে অনুরাগ চাই, আর এর ভিতর-দিয়ে চরিত্রগঠনও চাই। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম ইত্যাদি যা'ই কই, আসলে অনুরাগের গন্ধ না থাকলে, সেখানে ধর্ম্ম থাকে না।

বসু-দা—ফকিরের দোঁহায় আছে—তাঁর দয়া অগাধ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান আমাদের লাখ ভালবাসলেও তা' কিন্তু আমাদের সম্পদ নয়। তাঁর প্রতি আমাদের সক্রিয় ভালবাসাটাই আমাদের প্রকৃত সম্পদ।

উক্ত মা—আমরা যতই ভালবাসি, তাঁর ভালবাসার সঙ্গে কোন তুলনা হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি তো করেনই। পাপীই হ'ই আর পুণ্যাত্মাই হ'ই—আমরা সবাই তাঁর অপার দয়াতেই টিকে আছি। আমার তৃপ্তি হয়—যদি আমার সর্ব্বস্ব বিকিয়ে দিয়েও তাঁকে ভালবাসতে পারি, অবশ্য যদি সর্ব্বস্ব ব'লে আমার কিছু থাকে।

বৈশিষ্ট্য পরিপালন সম্বন্ধে কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মহাপুরুষরা কখনও বৈশিষ্ট্য ভাঙ্গেন না। তাঁরা হ'ন সত্তাসম্বর্দ্ধন-তৎপর। তাঁরা যেখানে যেমনভাবেই থাকুন না কেন, তাঁরা পরস্পরের পরিপূরক। তাই তাঁরা কখনও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছাড়া সাম্প্রদায়িক বিরোধের কথা বলেন না। প্রত্যেকটি মানুষই এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের

ধারক ও বাহক। এগুলির আবার নানা গুচ্ছ আছে—তাকে বলে বর্ণ। বর্ণ অনুযায়ী মানুষের মধ্যে রকমারি যোগ্যতা দেখা যায়। আগ্রা থেকে একজন এসেছিলেন। তিনি বলছিলেন—দীক্ষা নিলে সবাই এক জাত হ'য়ে যায়। আমার কথা হ'ল, দীক্ষা নিয়ে প্রত্যেকের রক্ত ও বৈশিষ্ট্য কি এক হ'য়ে গেল? সবাই কি বৈশিষ্ট্য-হীন একই ধাঁজে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গেল? প্রত্যেকে তাঁর সেবা করবে নিজ বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী। বিচিত্রভাবে তাঁর পরিপূরণের জন্য বিভিন্নতা তো চাই-ই। নইলে সবই যদি একাকার হ'য়ে যায়, তবে তাঁর এই সৃষ্টি রক্ষা করতে গিয়ে, যে বিচিত্র রকমের প্রয়োজন পূরণ করতে হ'য়, তা' করবে কে? যেখানে কোন দুটো জিনিসই এক নয়, সৃষ্টির যা'-কিছুই যখন আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল, সেখানে খোদার উপর খোদকারী করবার দরকার কি? বরং সবরকমের বৈশিষ্ট্য, তাঁর ও সমাজের অজস্র প্রয়োজন পারস্পরিকভাবে পরিপূরণ ক'রে, দেশ ও দুনিয়াকে মহা সমৃদ্ধ ক'রে তুলুক—আমি তো এইভাবে ভাবি।

বসু-দা—আগ্রার সৎসঙ্গ-প্রধান অসুস্থ। এ সব কি পরমপিতার মৌজ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যেমনতর করব, তাঁর মৌজও তেমন হবে। আমি যদি অপকর্ম্ম করি, তা' অসুস্থতা আনবে তাঁর উপর। আমাদের ব্যত্যয়ী চলনায় সাধুপুরুষদের অনেক ভুগতে হয়। মানুষ একলা বাঁচে না, বান্ধনী অর্থাৎ পরিবেশ লাগে। নিকটস্থ পরিবেশ যত strong (শক্তিমান), যত interested (স্বার্থান্বিত) ও যত pure (পবিত্র) হয়, মানুষ তত ভাল থাকে।

এমন সময় একটা ছেলের কান্না শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যস্ত হ'য়ে বললেন—দেখ, কোনও ছাওয়াল-পাওয়াল প'ড়ে যেয়ে ব্যথা-ট্যথা পেল নাকি?

খগেন মণ্ডল তখন চৌবাচ্চায় জল ভরছিল। সে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দেখে এসে বলল—দুটো বাচ্চা খেলা করতে-করতে একজন আর একজনকে চড় দেওয়ায় সে কাঁদছিল। এখন আবার দু'জনেই একসাথে খেলছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিশ্চিন্ত হ'য়ে তামাক খেতে-খেতে বললেন—আমরা মহাপুরুষের কাছে যাই, তখন কিন্তু একটা আড়াল থাকে। আমরা কেউ চাই টাকা-পয়সা, কেউ চাই মান, বড়াই, আত্মপ্রতিষ্ঠা, কেউ চাই নানা কামনা-বাসনার পরিপূরণ। ঠিক-ঠিক তাঁকে চাই না, চাই—তাঁর অনুগ্রহে নিজেদের উদ্দেশ্যগুলি পরিপূরণ করতে। হনুমানও প্রথমে ঐ-রকম বুদ্ধি নিয়ে রামচন্দ্রের কাছে গিয়েছিল। কিন্তু পরে মনটা ঘুরে গেল। রামচন্দ্রকে পূরণ করাই তার একমাত্র স্বার্থ হ'য়ে দাঁড়াল। তখন তার ঠেলায় পরিবেশও অনেকখানি ঠিক হ'য়ে দাঁড়াল। রাবণ অত prepared ও powerful (প্রস্তুত ও শক্তিশালী) হওয়া সত্ত্বেও, অনেকখানি হনুমানের বুদ্ধি, বিবেচনা, পরাক্রম ও পরিকল্পনার দরুন রামচন্দ্রের জয় হয়ে গেল। ভক্তি থাকলে এমনতরই হয়।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর উক্ত মায়ের দিকে সস্নেহে চেয়ে বললেন—আমাদের সমাজ চায়—

ঘরে-ঘরে ভগবান জন্মাক, কিন্তু আজকাল কি যে প্রতিলোমের ঝোঁক হ'য়ে গেছে, তাতে সবই তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। সব জায়গায়, বিশেষ ক'রে বাংলার মানুষ আজ বড় বিভ্রান্ত হ'য়ে গেছে। কি বলতে কি করে, ফুলের মালা বলতে সাপ ধ'রে বসে—এ বড় দুঃখের কথা। তুই মা যদি mathematically (গাণিতিকভাবে) প্রতিলোমের কুফল প্রমাণ ক'রে দিতে পারিস, তাহ'লে একটা বড় কাজ হয়। ক'রে দে—দেখিয়ে দে—জাতটাকে বাঁচিয়ে দে—West (পাশ্চাত্য) পর্যন্তও saved হ'য়ে (বেঁচে) যাবে তাতে। লেখাপড়া যদি জানতাম, তাহ'লে দুষ্টি ঘোলাটে হ'য়ে যেত। কিন্তু আবার লেখাপড়া না জানায়, ভাল ক'রে গুছিয়ে বলতেও পারি নে। তোরা করলে অনেক ভাল ক'রে করতে পারবি।

মা-টি অভিভূতের মত প্রণাম ক'রে বললেন—আপনার কথাগুলি মাথায় রাখব।

শ্রীশ্রীঠাকুর ওদের দু'জনকেই বললেন—সুযোগ পেলেই আবার এস।

ওঁরা যাওয়ার সময় ফিরে-ফিরে পিছন দিকে চাইছেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরও স্নেহকরুণ দৃষ্টিতে ওদের দিকে চেয়ে আছেন। মেয়ে বাপের বাড়ি থেকে যাওয়ার সময়, পিতা ও কন্যার যে মনের অবস্থা হয়, বড়াল-বাংলোর উত্তরের বারান্দায় এখন যেন ঠিক তেমনতরই একটি দৃশ্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—যারা কোন মহৎ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, তাদের প্রত্যেকের খুব সাবধান হ'য়ে চলা লাগে। এদের কারও ব্যবহারের দোষে হয়ত প্রতিষ্ঠানের ঘাড়ে দোষ চাপে, আবার, একজনের সদ্ব্যবহারে হয়ত প্রতিষ্ঠানের সুনাম হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাঠে ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট। অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। মিসেস স্পেনসার আসলেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—ভারতবর্ষ কি কোনদিন পাশ্চাত্ত্যের মত সমৃদ্ধ ছিল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তুলনামূলকভাবে কিছু বলতে পারি না। তবে spiritually (আধ্যাত্মিকভাবে) যখন উন্নত ছিল, তখন তার সঙ্গে material (বৈষয়িক) উন্নতি ছিল ব'লে আমার মনে হয়। কারণ, spiritual (আধ্যাত্মিক), material (ভৌতিক) আলাদা নয় এবং এ দুটোর মধ্যে কোনই বিরোধ নেই।

মিসেস স্পেনসার—সাধুরা তো ভিক্ষা করে খেতেন, বৈষয়িক উন্নতির দিকে নজর দিতেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একজন ঠিক-ঠিক মানুষ হলে, তার সংস্পর্শে এসে বহু মানুষ উন্নত হ'য়ে পড়ে। আবার, যাদের চারিত্রিক উন্নতি হয়, তাদের অর্থগত উন্নতিও হয়েই ওঠে। প্রকৃত সাধুরা অর্থের প্রতি নিরাসক্ত হলেও, তারা বহু মানুষের স্বার্থকেন্দ্র হ'য়ে ওঠায় তাদের সম্পদের অভাব থাকে না। ক্রাইস্টের মত বড়লোক ক'জন ? মানুষরূপ ধন যার আছে, সেই তো প্রকৃত ধনী। তার গাঁটে এক পয়সা না থাকলেও, অপরের অর্থ তার সেবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে।

মিসেস স্পেনসার—ভারতবর্ষে এত মহাপুরুষের আবির্ভাব সত্ত্বেও ভারতবর্ষ এত দরিদ্র কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁরা যতই আসুন, যতই দিউন, মানুষ যদি বাস্তব জীবনে তাঁদের সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ না করে, তাহলে deterioration (অপকর্ষ) ও disintegration (ভাঙন) রোধ করা যায় না। ধর্ম্ম যেখানে যতটা জাগ্রত হয়, ধর্ম্মসম্মত অর্থ সেখানে আসেই কি আসে। ধর্ম্মের নামে ভারতবর্ষের বহু স্থানে বহু লোকের মধ্যে যে other-worldniness (ইহ-বিমুখতা) দেখা যায়, তা কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্ম নয়। ধর্ম্ম মানে সপরিবেশ অন্তরে-বাহিরে একযোগে বড় হ'য়ে ওঠা।

মিসেস স্পেনসার—পাশ্চাত্ত্য ও তো ক্রাইস্টকে follow (অনুসরণ) করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে ওখানেও বিপর্য্যয় বেড়ে যাচ্ছে। আত্মিক ও নৈতিক উন্নতির বিনিময়ে আর্থিক উন্নতি লাভ করার উপর যদি মানুষের নজর বেশী যায়, তাতেও বাঁচাবাড়া ব্যাহত হয়, balance (সমতা) থাকে না। মহাপুরুষরা শুধু east (প্রাচ্য) বা west-এর (পাশ্চাত্ত্যের) জন্য আসেন না। তাঁরা আসেন সারা পৃথিবীর জন্য—সমগ্র মানব সমাজের জন্য। One-sided materialism বা spiritualism (একদেশদর্শী বৈষয়িকতা বা আধ্যাত্মিকতা)-র উপর তাঁরা জোর দেন না। তাঁদের লক্ষ্য হল, মানুষের সর্ব্বতোমুখী উন্নয়ন এবং তা' লাভ করতে হবে স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে—আদর্শনিষ্ঠ হয়ে—পরিবেশকে সঙ্গে নিয়ে।

মিসেস স্পেনসার—ভারতে খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজকদের কাজ সম্পর্কে আপনার কী মত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যীশুর কথা মানুষে যতই জানে ততই ভাল। কিন্তু যীশুর নাম ক'রে যদি অন্য কোন মহাপুরুষকে খাটো করা হয় এবং তাঁকে ছেড়ে যীশুকে ভজনা করার কথা বলা হয়, তাতে কিন্তু যীশুকে ধরার পক্ষেই অসুবিধা হয়। যীশু কিন্তু কখনও তা' শেখাননি। তিনি বলেছেন—I am come not to destroy but to fulfil (আমি ধ্বংস করতে আসিনি, পরিপূরণ করতে এসেছি)। কিন্তু তাঁকে এমন ক'রে পরিবেশন করা হ'ল, যার থেকে এসে গেল seed of difference (অনৈক্যের বীজ)। আমি বলি—যে কৃষ্ণকে মানে না, সে ক্রাইস্টকেও মানে না এবং যে ক্রাইস্টকে মানে না, সে কৃষ্ণকেও মানে না। অবতারপুরুষদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা ভাল না। প্রেরিতপুরুষ যাঁরা তাঁরা সবাই বৈশিষ্ট্যপালী এবং আপূরয়মাণ। আবার, ভারতবাসীদের মধ্যে একটা বোধ আছে যে, পূর্ব্বপূরয়মাণ বর্ত্তমান পুরুষোত্তমের মধ্যে পূর্ব্বতন মহাপুরুষরা সবাই জীবন্ত থাকেন।

প্রফুল্ল—আধ্যাত্মিক উন্নতি বাদ দিয়ে শুধু বৈষয়িক উন্নতি হ'তে পারে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Spirit বা আত্মা যদি energy বা শক্তিরই নামান্তর হয়, আবার, শক্তিই যদি matter-এ (বস্তুতে) পরিণত হয়, তবে আত্মিক উন্নতি বাদ দিয়ে বস্তুতান্ত্রিক উন্নতি হবে কি করে? আমার কথাটা হ'ল এই—আত্মিক ও নৈতিক উন্নতির

উপর দাঁড়িয়ে যে বস্তুতান্ত্রিক উন্নতি হবে, তাতে মানুষ সপরিবেশ ভিতরে ও বাইরে দুই দিকেই স্থায়ী উন্নতি লাভ করবে। নইলে পরিবেশকে শোষণ ক'রে বা সুনীতিকে বিসর্জ্জন দিয়ে যদি সাময়িক বস্তুতান্ত্রিক উন্নতি হয়ও, তাহলেও তা' টেকসই হবে না। পরিবেশকে বড় ক'রে মানুষ যখন বড় হয়, তখনই তার মধ্যে থাকে ধর্ম্মের বীজ। আবার, এটা যদি আদর্শকেন্দ্রিক না হ'য়ে আত্মকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠে, তাহলে প্রবৃত্তির এমনতর উত্থান হ'তে থাকে যাতে ভিতরে ও বাইরে পতনের বীজ উপ্ত হতে থাকে, নানা প্রবৃত্তি আধিপত্য করতে থাকে। Self-adjustment (আত্মনিয়ন্ত্রণ) না থাকায় ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়েও তার সদ্ব্যবহার করতে পারে না। বাপের মৃত্যুর পর অনেকে কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা পায়। আবার দেখা যায়, চারিত্রিক সমৃদ্ধি না থাকায় ঐ ঐশ্বর্য্যই তার কাল হয়ে দাঁড়ায়।

প্রফুল্ল—অসাধুতা দিয়ে কেউ যদি জাগতিক উন্নতি চায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে কতটুকু? অসাধুতা যখন অবলম্বন করে, তখন বুঝতে হবে যে, সে আয়ের সম্বল খোয়াতে শুরু করেছে, তখন সে অর্জ্জনের পথে নেই। উচ্ছন্নে যাওয়ার পথে চলেছে—তা' আজই হোক বা দুদিন পরে।

বাঁচাবাড়া সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা ভোগ করতে চাই। কিন্তু বুঝি না সত্তাটা কিভাবে অক্ষত থেকে বৃদ্ধির পথে চলবে—যাতে পারিপার্শ্বিকের প্রলোভন এবং প্রবৃত্তির আকর্ষণ আমাদের exploit (শোষণ) করতে না পারে। কিন্তু দেখা যায় একজন Ideal-কে (আদর্শকে) সবাই মিলে ভালবেসে, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও পারস্পরিক সেবা ও সহযোগিতার পথে যদি চলি, তাহ'লে কিন্তু আমাদের সবারই বাঁচাবাড়া ও উপভোগ অবাধ ও নিরবচ্ছিন্ন হ'তে পারে। ধর্ম্ম মানে এইটুকু। প্রবৃত্তিগুলির উপর আমাদের যদি কিছুটা আধিপত্য না থাকে, তাহ'লে সেগুলি সপরিবেশ আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করতে শুরু করে দেয়। এইজন্য চাই আদর্শের প্রতি সক্রিয় অনুরাগ। Common Ideal (অভিন্ন আদর্শ) মানে, যাঁর কাছ থেকে আমরা সবাই বাঁচাবাড়ার nurture (পোষণ) পাই। তাঁকে যদি ভালবাসি, তাহলে আমরা কখনও পরিবেশের বাঁচাবাড়ার সহায়ক না হয়ে শোষক হ'তে পারি না। ইষ্ট ও পারিপার্শ্বিকের উপর সক্রিয় সুকেন্দ্রিক প্রীতির ভিতর-দিয়ে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবনে যে উন্নতি ও সুখ স্বাভাবিকভাবে গজিয়ে ওঠে আমি তাকেই প্রকৃত কম্যুনিজম বা স্বাধীনতা বলে মনে করি।

মিসেস স্পেনসার—সব সময় কি একজন পরিপূরণী জীবন্ত আদর্শকে পাওয়া যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখন পাই তখন ভাল। পেয়ে গেলে তাঁকে ধরবই। যখন তিনি চ'লে যান, তাঁর শিক্ষা থাকে, ভক্ত থাকে—আমাদের চলার পথ বাতলে দিতে। যে যীশুর ভাবে অনুষিক্ত হ'য়ে তাঁরই প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর কথা বলে, সে আমাদের কাছে যীশুর living materialised message (জীবন্ত বাস্তবায়িত বাণী) বহন করে আনে।

তার মাধ্যমেই আমরা যীশুর স্পর্শই পাই—অবশ্য যতটা পাওয়া সম্ভব। ভক্তের মধ্যে যদি আত্মস্বার্থ, আত্মপ্রতিষ্ঠার বালাই থাকে, তাহলে সে কিন্তু প্রভুর সাচ্চা জিনিস আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারে না। ভক্তই হ'লো ভগবানের বাহন।

মিসেস স্পেনসার—রামকৃষ্ণদেব কি এই ধরনের আদর্শপুরুষ ছিলেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ।

মিসেস স্পেনসার—ভক্ত কেমন হওয়া দরকার?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেউ যদি প্রভুকে প্রভুর জন্যই ভালবাসে, তাই যথেষ্ট। তেমনতর ভক্ত মনুষ্যজাতির পক্ষে ভগবানের আশীর্বাদস্বরূপ।

মিসেস স্পেনসার—রোমান ক্যাথলিক সাধুদের স্বীকার না করা কি প্রোটেস্ট্যাণ্ট চার্চের পক্ষে অন্যায় হয়েছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ওটা ভাল লাগে না। আমার মনে হয় প্রোটেস্ট্যাণ্টরা যদি রোমান ক্যাথলিক চার্চের গলদগুলি পরিশুদ্ধ ক'রে নিতে চেষ্টা করত, তাহ'লে ভাল হ'ত। পূর্বতন যীশুপ্রেমীদের অস্বীকার করা—আমার মতে একটা ব্যতিক্রমী ব্যাপার ব'লে মনে হয়। ওতে মানুষকে আত্মিক দিক দিয়ে দৈন্যগ্রস্ত ক'রে তোলা হয়। যাঁরা শ্রদ্ধেয় তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে, তাঁদের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া ভাল না।

মিসেস স্পেনসার—প্রোটেস্ট্যাণ্টরা যদি বুঝে থাকেন যে, রোমান ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে জড়িত থেকে যীশুকে ঠিকমত সেবা করা সম্ভব নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওদের থেকে বিচ্ছিন্ন না হ'য়ে যদি ঐটেকেই reform (সংস্কার) করতে চেষ্টা করত, তাহ'লে ভাল হ'ত। যীশু খ্রীষ্ট তো দুজন নন, তাই ভিতরে থেকে তাঁর প্রতিষ্ঠার জন্য যা' করণীয় তা' করার চেষ্টা করলে সমীচীন হ'ত। আমার মনে হয় প্রোটেস্ট্যাণ্টরা অনেকটা আমাদের দেশের ব্রাহ্ম সমাজের মত—অবশ্য আমি ভাল ক'রে জানি না, যেমন শুনেছি, তা থেকে এমন মনে হয়।

মিসেস স্পেনসার—লুথার রোমান ক্যাথলিক চার্চ ছেড়ে যেতে চাননি, কিন্তু রোমান ক্যাথলিক চার্চ তাঁকে টিকতে দেয় নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যীশুকে যে ভালবাসে তার চরিত্রই মানুষকে সংহত ক'রে তোলে। যীশুর বার জন প্রায় অক্ষরজ্ঞানহীন প্রধান শিষ্যই সারা দুনিয়ায় যীশুকে ছড়িয়ে দিয়েছিল।

মিসেস স্পেনসার—এখন প্রোটেস্ট্যাণ্ট চার্চের কি তাহ'লে রোমান ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে মেশা দরকার?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তেমন ভালবাসার মানুষ আসলে, তা করতে পারবে। প্রোটেস্ট্যাণ্টদের যদি এই ধারণা হ'য়ে থাকে যে, রোমান ক্যাথলিকরা ঠিক পথে চলছে না, তাহ'লে তো তাদের প্রত্যয়মত রোমান ক্যাথলিকদের ভুল ভাঙিয়ে দিতে চেষ্টা করা উচিত। হারানো মেষটার প্রতিই তো যীশুর দরদ ছিল বেশী। অবশ্য, রোমান ক্যাথলিকদের সম্বন্ধে প্রোটেস্ট্যাণ্টদের যে ধারণা—তা' যে নির্ভুল একথা আমি বলতে চাই না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে এসে উপবেশন করলেন। বিভিন্ন ভক্ত হাতে-হাতে ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের ইজিচেয়ার, হাতপাখা, গড়গড়া, তামাক, টিকে, দেশলাই, সুপারির কৌটা, জলের ঘটি, ঘটি রাখার স্ট্যাণ্ড, পিকদানি, দাঁত-খোটা, মশা-মাছি তাড়ানর ঝাড়ন, টর্চ, হ্যারিকেন, ভক্তদের বসার পিঁড়ি ইত্যাদি যথাস্থানে নিয়ে আসলেন। নরেনদা (মিত্র), যতীনদা (দাস), শরৎদা (হালদার), সুরেনদা (বিশ্বাস), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), কালিদাসদা (মজুমদার), ভুপেনদা (চক্রবর্ত্তী), মোহনভাই (ব্যানার্জী), খগেন (মণ্ডল), খগেনদা (তপাদার) প্রভৃতি যতি-আশ্রমে উপস্থিত। শ্রীশ্রীঠাকুর একবার তামাক খেলেন।

প্রতিলোম বিবাহ-সম্পর্কে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রতিলোম সন্তানকে বলে চণ্ডাল। চণ্ডাল কথার মানে ক্রোধী। তার মানে প্রতিলোম জাতকের inter cellular cohesion (আন্তকৌষিক সংসক্তি)-টা শ্লথ, তাই তাদের balance (সমতা) ঠিক থাকে না।

যতীনদা—অনেকের আবার রাগ নেই কিন্তু inactive (নিষ্ক্রিয়)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাও-ও ঐ ব্যাপার—চেতেই না। তার মানে তার বৈশিষ্ট্যটাই শিথিল। মানুষ যদি ক্রোধী না হ'য়ে তেজী হয় অর্থাৎ রাগ যদি তার বশে থাকে, তাহ'লে তা কিন্তু খুব কার্য্যকরী হয়।

শরৎদা—প্রতিলোম বিবাহ হ'লে, স্ত্রী কি স্বামীর প্রতি স্বাভাবিকভাবে কিছুটা বিদ্বেষপরায়ণা হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বহু confession (স্বীকারোক্তি) শুনেছি যে, মেয়েটার পুরুষের প্রতি খুব প্রলোভন থাকা সত্ত্বেও, উপগতির মুহূর্তে সে অজ্ঞাতসারে স্বামীকে লাথি মেরে ফেলে দেয়। প্রথমে repeatedly (বারবার) এই রকম করে, পরে habituated (অভ্যস্ত) হ'য়ে গিয়ে আর তেমন করে না। আর, ঐ-রকম উপগতির সময় প্রথম-প্রথম নাকি মেয়েটার মনে হয় যে, একটা জাহাজ যেন ডুবে যাচ্ছে আর হাজার হাজার যাত্রী যেন বাঁচাও বাঁচাও ব'লে চিৎকার করছে। তার মানে, তার অন্তর্নিহিত পূর্ব্বপুরুষরা যেন সমবেতভাবে ঐরকম আকুলি-বিকুলি করছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে প্রসঙ্গত বললেন—সাধন-জগতে দু'রকম হয়, প্রথমে ভিতরে নানারকম অনুভূতি হয়, কিন্তু পরে তদনুগ বাস্তব আচরণের মধ্য-দিয়ে তা' materialised (বাস্তবায়িত) হয়। Motor-sensory co-ordination (কর্ম্মপ্রবোধী ও বোধপ্রবাহী স্নায়ুর সঙ্গতি) না আসলে, ঠিক-ঠাক materialisation (বাস্তবায়ন) হয় না। কিশোরীর Co-ordination ও materialisation (ঐ সঙ্গতি ও বাস্তবায়ন) বেশী ছিল। টানও ছিল তার তেমনি তুখোড়। কেষ্টদা জপতপ অনেক করেছে কিন্তু materialisation (বাস্তবায়ন) কম, তবে এখন চেষ্টা করছে। কেষ্ট দাস-ও এত পাঁয়তারা ভাঁজত, কিন্তু মহারাজের মত সাধন-সম্পদ না থাকায়, সূক্ষ্ম জিনিসের বোধের ব্যাপারে মহারাজের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারত না।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোল তাঁবুতে ভোগে বসেছেন। শ্রীশ্রীবড়মা, বঙ্কিমদা (রায়), কাশীদা (রায়চৌধুরী), প্রফুল্ল ও মায়ামাসিমা ছাড়া আর লোকজন নেই। একটু আগে যতি-আশ্রমে অনুভূতি সম্পর্কে কথা হচ্ছিল, তাই তাঁর মন যেন তুরীয় অনুভূতির রাজ্যে বিচরণ করছিল। খাচ্ছিলেন, কিন্তু মন যেন অন্য রাজ্যে। কতকটা অস্পষ্ট ও স্বগতভাবে আবিষ্ট চিত্তে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলে গেলেন—কি যে করলাম, কেন করলাম—কি সব কইলাম—কেমন ক'রে কইলাম—নিজেই ঠিক পাই না। যেন একটা পাগল আমি। ঐ কথাই ঠিক—আত্মা যাকে বরণ করেন—আত্মা তার দ্বারাই লভ্য। আমার বেলায় এ-কথা খুবই ঠিক। কিসের প্রেরণায় কি যেন ক'রে গেলাম জীবনভোর—কি জন্য যে এসব করছি—টেরই পেলাম না—ক'রে চলেছি—কে যেন করিয়ে নিচ্ছে।

ভোগের পর শরৎদা প্রভৃতি অনেকেই গোল তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর গল্পচ্ছলে বললেন—হিমায়েতপুরে অনেক ভাটির গাছ ছিল। মাঝে-মাঝে ফাঁক ছিল, নিম গাছের তলে ফাঁকা ছিল। কিশোরী ওরা অনেক সময় সেখানে আসন-টাসন নিয়ে বসে নামটাম করত। একদিন নাম করছে কিশোরী—দেখে—অগণিত সাপ তার চারিপাশে। তখন ছুটে আমার কাছে এসে হাজির হ'লো। আবার কোনদিন ভূত-প্রেত নানা রকমারি ভঙ্গীতে ভেংচি কাটত ওর নাম করার সময়। আমি কত অভয় দিতাম, কিন্তু তা' কি মানে? তখন নফর, কোকনকে সাথী ক'রে নিল। ওরা প্রত্যেকেই করত, করার ত্রুটি ছিল না। কিশোরীর ফুটলো উদ্দাম কীর্ত্তনের ভিতর-দিয়ে। ওতে বাধা দিলে ভাল হতো না। প্রত্যেকের একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যার যে বৈশিষ্ট্য তাই ভাল—যদি materialisation (বাস্তবায়ন) থাকে।

কাশীদা—Materialisation (বাস্তবায়ন) কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Motor-sensory co-ordination-এর (কর্ম্মপ্রবোধী ও বোধ-প্রবাহী স্নায়ুর সঙ্গতির) ভিতর-দিয়ে উচ্চ অনুভূতিগুলিকে প্রত্যেকটি রকমে নিজ চরিত্রে ফুটিয়ে তোলা।

চুনীদা (রায়চৌধুরী)—অনুভূতিগুলি কি বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী আলাদা আলাদা হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাধারণ কতকগুলি একরকম থাকে, আবার figure (মূর্ত্তি)-গুলি আলাদা আলাদা আসে।

২৭শে বৈশাখ ১৩৫৬, মঙ্গলবার (ইং ১০।৫।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোল তাঁবুর পাশে ইজিচেয়ারে সুখাসীন। সুধাংশুদা (মৈত্র), কিরণদা (মুখোপাধ্যায়), উমাদা (বাগচী) প্রভৃতি কাছে আছেন।

ধনিক ও শ্রমিকের বিরোধের জন্য মূলতঃ ধনিকরাই যে দায়ী এবং তারা যে অত্যন্ত শোষণপ্রবণ ও নিষ্ঠুর সেই সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শোষণ করা মানে, আমি তোমাকে খরচ করলাম অর্থাৎ তোমাকে কাজে লাগালাম, অথচ পূরণ ও পোষণ করলাম না। যোগ্যতা-অনুযায়ী প্রাপ্তির তারতম্য থাকবে না বা দেওয়া-নেওয়া চলবে না, এ কখনও হ'তে পারে না। আমি নিজে ছমাস বাজিতপুর ষ্টীমারঘাটে কুলিগিরি করেছি। কুলিদের মধ্যে চুরি করার প্রবৃত্তিও দেখেছি। হয়তো একজনের একটা জিনিস পট্ ক'রে নিয়ে এল। আবার, ভদ্রলোকও দেখেছিলাম একজন। হিলসা ষ্টীমার থেকে মাল নামাবার সময় খাড়া সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে, একটা বালতির ভিতরকার ঘি-এর বোতলটা ভেঙ্গে যায়, তাতে সে কি দুর্ব্যবহার ও কদর্য্য গালাগালিটাই-না আমাকে করল! অমন অমানুষিক ব্যবহার ও ভাষার কথা আমি ভাবতেও পারিনি। আমার অভিজ্ঞতার ভিতর-দিয়ে দেখেছি, দুই দলের মধ্যে ঢের খারাপ আছে, আবার ভালও আছে। রাষ্ট্র যদি ঠিক না হয়, তাহ'লে শ্রমিক ও ধনিক দুই-ই খারাপ হয়। আবার, ধনিক যদি খারাপ হয়, তাতে শ্রমিক খারাপ হতে বাধ্য হয় এবং শ্রমিক যদি খারাপ হয় তাতেও ধনিকও খারাপ হতে বাধ্য হয়।

কিরণদা—কুলিগিরি কেন করলেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে ভাবতাম ওদের খুব কষ্ট, তাই ওদের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করতে চাইলাম। পরে মিশে দেখলাম কষ্টবোধ ওদের মোটেই নেই—কাজ-কাম করে, খায়-দায়, নিজেদের মধ্যে মহাস্ফূর্ত্তিতে থাকে।

কিরণদা—মেথরের কাজ কেন করলেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মেথর-টেথর ছিল না আশ্রমে, তাই নিজে ক'রে দেখলাম। অবশ্য, জ্ঞানবুদ্ধিমতো সংক্রমণ বাঁচাতে যা' করতে হয়, তা' আমি করতাম।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কম্যুনিজম বলতে আমি বুঝি—ইষ্টার্থে স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী পরস্পরের সেবা করা। রাষ্ট্র দেখবে যাতে কারও উপর অবিচার না হয়। প্রত্যেকের জীবন, সম্পত্তি, বৈশিষ্ট্য, সাত্বত স্বার্থ, মর্য্যাদা এবং অধিকার যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে। সবার যে প্রাপ্তি এক-রকম হবে তা' নয়। যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী যাতে প্রত্যেকের প্রাপ্তি সমীচীন ও সুবিচার-সম্মত হয় তা' দেখতে হবে এবং এমনতর চলার পথে যে-ই অন্তরায় সৃষ্টি করুক তাকে নিরস্ত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে। সমঞ্জসা বাঁচাবাড়ার পথে ধনিক বা শ্রমিক যে-ই বাধা সৃষ্টি করুক, রাষ্ট্র তাকেই বিহিতভাবে শাসন ও সংশোধন করবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর মঙ্গলা-মাকে ধীরেনদার (চক্রবর্ত্তীর) মেয়ের বিয়ের জন্য সাধ্যমত সাহায্য করতে বললেন।

মঙ্গলা-মা নিজের অসুবিধার কথা জ্ঞাপন করলেন।

র—তুমি যা' পার, তাই যদি মানুষকে দিতে থাক, মানুষের জন্য করতে

থাক, তার মধ্যে-দিয়েই ভগবানের দয়াও তুমি আকর্ষণ কর। অপ্রত্যাশিতভাবে অযাচিত সাহায্য এসে হাজির হয়। অসময়ে উপকার পেলে সাধারণত তা' মনে থাকে।

সুধাংশুদা—অনেকে পেয়েও তো মনে রাখে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অত্যন্ত প্রয়োজনের মুহূর্তে পেলে সাধারণত তা' ভোলা যায় না। দুর্গানাথ-দার কথা আমি ভুলতে পারি না। সে অসময়ে ঘর থেকে অনেকগুলি টাকা এনে দিয়ে আমার সম্পত্তি বাঁচিয়েছিল। ভাঁওতা দিয়ে যারা নেয় কিংবা পেশাদার ভিক্ষুক, যারা কায়দা ক'রে মানুষের সহানুভূতির উদ্রেক ক'রে অপরের কাছ থেকে সংগ্রহ করে, আবার তা' দিয়ে হয়তো মদ খায় বা অন্য বাজে খরচ করে তাদের মনে থাকবে কেন? একটা গরু কাঠ ফাটা রোদে তৃষ্ণার্ত হয়ে একটু জলের জন্য হাহাকার ক'রে আর্ত্ত হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে যদি তখন এক বাল্‌তি জল খেতে দাও তা'তে তার প্রাণে যে স্বস্তি আসে, তার ফলও তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক হয়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে এসে বসলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শরৎদা জিজ্ঞাসা করলেন—আমাদের ঋষিরা মানেন যে, বিশ্বের পিছনে একটা intelligent will (জ্ঞানদীপ্ত ইচ্ছা) আছে, তাই evolution (বিবর্ত্তন) হচ্ছে। কিন্তু ডারউইন প্রভৃতি তো বিবর্ত্তনের একটা mechanical interpretation (যান্ত্রিক ব্যাখ্যা) দিয়েছেন। কোনটা ঠিক?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Purely mechanical (শুধু যান্ত্রিক) কিছু আছে কিনা বুঝি না। Mechanical (মরকোচ) বলতে বুঝি—conscious mechanism (চেতন মরকোচ)। ধূলিকণাগুলির পেছনেও spirit, energy ও consciousness (আত্মা, শক্তি ও চেতনা) আছে—ওদের মত ক'রে। একটা পাথরের মধ্যেও অমনি আছে, তারও ব্যথা লাগে তার মতো ক'রে। আমি এক সময় মাটিটাটি কোপাতাম, তখন মনে হ'তে লাগল মাটির দানাগুলিও তো আমার মতো জীবন্ত, ওদেরও তো লাগে তাই আর মাটি কোপাতে পারতাম না পরে। গাছের ডাল ভাঙ্গতে পারতাম না —মনে হ'ত, আমার হাড়খানাই যেন মট্ ক'রে ভেঙ্গে গেল।

শরৎদা—পরে আপনি গাছটাছ কাটতে দিতেন না, তবে ডাল কাটায় আপত্তি করতেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা বুদ্ধি ক'রে—যেমন চুল কাটলে বা নখ্ কাট্‌লে ক্ষতি হয় না, ব্যথা লাগে না। এটা বুদ্ধির কথা, তবে গাছের ডাল কাটলে তার কিন্তু লাগেই।

অভ্যাস-গঠন সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন। পরে সেই সম্পর্কে বললেন—এ ব্যাপারে নিরন্তরভাবে লেগে থাকতে হয়। চরিত্রগত না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়, নইলে তা' পাকা হয় না—ছুটে যায়। প্রবৃত্তিগুলি যতই adjusted (বিন্যস্ত) হ'য়ে আসে, ততই নিষ্ফল চাঞ্চল্য ক'মে যায়, চরিত্রে স্থৈর্য্য আসে। ক্রমাগত নাম করলে মনের ইতস্ততঃ গতি ক'মে যায়। তার মানে complex (প্রবৃত্তি) তখন সত্তাকে শোষণ করতে পারে কম। মানুষ মিষ্টি হ'য়ে

ওঠে—যায় চাওয়াটা, চলাটা, বলাটা, করাটা, ভঙ্গীটা ইত্যাদি সবকিছু নিয়ে। কর্ম্ম-ক্ষমতাও বেড়ে যায়। বানরের মতো যারা, তারা চঞ্চল হ'য়ে ঘুরে বেড়ায় বটে, কিন্তু কিছুই সুষ্ঠুভাবে করতে পারে না। নিষ্ঠাবান সাধনশীল যারা, তারা স্থৈর্য্য ও প্রীতি নিয়ে সহজভাবে বহু কাজ সম্পন্ন ক'রে যায়, কিন্তু তার মধ্যে কোন শোরগোল বা লোক-দেখান ভাব থাকে না।

যতিদের জীবনধারা সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তারা দাঁড়াবে বিশ্বাসের উপর, উদারতার উপর—মানুষের প্রীতি-অবদানের উপর। উদারতা বলতে আমি বুঝি—একই সঙ্গে সুনিষ্ঠ ও পরমতসহিষ্ণু হ'য়ে চলা—নির্ব্বিরোধ অসৎ-নিরোধসহ।

ধীরেনদা (চক্রবর্ত্তী) বিদায় নিতে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন যেয়ে কি করবি ?

ধীরেনদা—না গেলে তো চাকরী থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চাকরী তো বরাবর করলি, কিন্তু কী হ'ল ? ওর চেয়ে এতদিন ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ালে ভাল হ'তো। তাতে মোষও বাঁচত, রাখালও বাঁচত।

শ্রীশ্রীঠাকুর ধীরেনদাকে আদর ক'রে কাছে ডেকে বসিয়ে বললেন—"নিমেষের দেখা" বলে যে গানটা গাইতিস, ঐ গানটা গা তো একবার।

ধীরেনদা গানটা গাইতে-গাইতে হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে বললেন—ভুলে গেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও গান কি ভোলে ? অন্য কথা ভাবিস, তা' মনে থাকবে কি ক'রে ?

ধীরেনদা ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন—একটা ভূমিকম্পে ভিতরটা যেন গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'য়ে গেছে—মাথা ঠিক নেই। এখন কী করি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাম কর, ধ্যান কর, আত্মবিশ্লেষণ কর, আত্মনিয়ন্ত্রণ কর, নিরখ-পরখ কর। দুঃশীল, দুষ্ট, স্বার্থসন্ধিৎসু যা'-কিছু আছে চরিত্রে সবটারই নিরসন ক'রে ফেল। পুরনো স্মৃতি আবার জাগিয়ে তোল। দাঁড়াও আবার tactful diplomatic (কুশলকৌশলী কূটনৈতিক) বীর্য্যবত্তা নিয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে যতিদের দিকে চেয়ে বললেন—ও কেমন কথাটা বলল ! ইচ্ছা করলে ও ভাল ঔপন্যাসিক হ'তে পারত। ওকে দেখে মনে হয়, ওর ভিতরের বামুন এখনও মরেনি, একটু চড়া প'ড়ে গেছে। এখন ইচ্ছা করলে সব ফুটিয়ে তুলতে পারে। ঐ গানটা শুনলে আমার মেরী ম্যাক্‌ডিলিনির কথা মনে প'ড়ে যায়। জলপাই গাছের ফাঁক থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে প্রাণপ্রিয় প্রভুকে—আকুল আগ্রহ নিয়ে। মেরীকে দেখে জনতা ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠল—তাকে পাথরের টুকরো ছুঁড়ে মারবে ব'লে। অমনি উচ্চারিত হ'লো—"যে তোমাদের মধ্যে পাপ করনি সেই ঢিল ছুঁড়তে পার ওর গায়ে।" অমনি সবার হাত থেকে ঢিলগুলি গড়িয়ে প'ড়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ধীরেনদাকে বললেন—শুধু বুঝে হয় না, ধরা, বোঝা, মগ্নকরা—এই তিনটে না থাকলে adjusted (বিন্যস্ত) হয় না।

হরিদাসদা (সিংহ) কিছুক্ষণ আগে যতীনদার সঙ্গে উগ্র মেজাজে কথা বলছিলেন।

তাঁর কথা বলার ভঙ্গী সম্বন্ধে উল্লেখ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর হরিদাসদার দিকে চেয়ে বললেন—তোমার বক্তব্য যাই থাক, যতীনদার সঙ্গে ব্যবহারটা তোমার ভাল হয়নি। নিজেকে ধরাটাই শক্ত জিনিস। নিজের দোষ নিজে ধরতে ও সংশোধন করতে যদি না পার, তাহ'লে কিছুই লাভ হবে না।

হরিদাসদা বিনীতভাবে নিজের ত্রুটি স্বীকার করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বলার পর যে তুমি নিজের ভুল বুঝলে, সেটা মন্দের ভাল, কিন্তু তুমি নিজে থেকে নিজের ভুল ধ'রে যদি যতীনদাকে আলাদা ডেকে নিয়ে তার কাছে নিজের ভুল স্বীকার ক'রে অনুতাপ প্রকাশ করতে, সেইটেই শোভন হ'তো। তাহ'লে বোঝা যেত যে, তুমি সর্ব্বদাই নিজেকে নিরখ-পরখ কর এবং নিজেকে ক্ষমা কর না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদাকে behaviour শব্দটির root-meaning (ধাতুগত অর্থ) দেখতে বললেন।

শরৎদা অভিধান দেখে বললেন—কথাটা এসেছে—be এবং have এই দুটি শব্দের সংযোগ থেকে এবং এর একটা মানে আছে—to control oneself (নিজেকে সংযত করা)।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাগুলি শুনে খুব খুশী হ'য়ে বললেন—ঠিক আছে। আমারও বলা আছে—Be and have (হও এবং পাও)!

শ্রীশ্রীঠাকুর দুপুরে ভোগের পর বড়াল-বাংলোর ঘরে তাঁর বিরাট চৌকিতে এসে শুভ্রশয্যায় ব'সে উপস্থিত মাতৃবৃন্দের সঙ্গে ঘরোয়া কথাবার্ত্তা বলছিলেন। এমন সময় লাবণ্যমা-র ছেলে বাবুলালদা (সরস্বতী) এসে জানালেন যে, তিনি আসামে চাকরী পেয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসি-হাসি মুখে বললেন—কাজ খুব sincerely (আন্তরিকভাবে) discharge (নির্ব্বাহ) করা চাই। আর সহকর্ম্মীদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করা চাই, যাতে বাঙ্গালী-আসামী ব'লে কোন প্রশ্ন না জাগে। তোমার অসমীয়া সহকর্ম্মীরা যেন তোমাকে আপনজন ব'লে মনে করে।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর মাঠ থেকে বেড়িয়ে এসে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে ইজিচেয়ারে বসলেন। শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদের আলোয় চতুর্দ্দিক ঝলমল করছে। গরমের রাত ব'লে অনেকেই তখনও ঠাকুরবাড়ীতে উপস্থিত।

অদূরে কাজলভাই একজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ডাকলেন—কাজল! ও কাজল!

কাজলভাই সামনে এসে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাজারে গেছিলে?

কাজল—হ্যাঁ, লাটাই কিনে এনেছি। লাটাই-টাটাই হ'লো ভাল, কিন্তু মা পান আনতে বলেছিলেন, সেইজন্য কত দোকানে খোঁজ করলাম কিন্তু পেলাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার এমন হওয়া উচিত যে, মা'র জিনিস না পেলে তোমার নিজের জিনিস কেনার প্রবৃত্তিই হবে না। মা'র উপর তোমার এতখানি টান থাকা উচিত।

কাজল—হ্যাঁ, আগে মা'র পান কিনে তারপর আমার লাটাই কেনা উচিত ছিল। এখন থেকে তাই করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর খুশী হ'য়ে একটু হাসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে যতি-আশ্রমে এসে বসলেন। যতিবৃন্দ, পাঁচুদা (চক্রবর্ত্তী), হরেনদা (বসু) প্রভৃতি আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর আজ চরম দুরবস্থা। এই যে কূট গ্লানি, তা' যদি গড়িয়ে চলে—কী অবস্থা দাঁড়াতে পারে অদূর ভবিষ্যতে এবং তার প্রতিকার করতে গেলে কতখানি equipped (প্রস্তুত) হওয়া দরকার তাও ভেবে দেখেন। আমরা পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে, ষোড়শোপচারে অর্ঘ্য সাজিয়ে এই দুরবস্থা ঘরে ডেকে নিয়ে এসেছি। মানুষ দেখি না একটাও। এখনও যদি মানুষ পাওয়া যায়, তাদের character, voice ও behaviour (চরিত্র, কণ্ঠস্বর ও ব্যবহার) যদি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়, তাহ'লে তারাই আবার সব ঠিক করতে পারে—যদি কিনা তারা man of conviction (প্রত্যয়দৃপ্ত মানুষ) হয়। এখনও এমন মানুষ আমাদের দেশে আছে, যারা মানুষকে ইষ্টে মুগ্ধ ও উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে পারে। কিন্তু তারা হয়তো একটা সাব-ডেপুটির চাকরীর জন্য লালায়িত হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রাণ নেই প্রতিভা আছে, তাদের দিয়ে পরমপিতার কাজ হওয়ার নয়।

শরৎদা—আমাদের দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ নেতৃত্ব করতে চান কিন্তু তাঁরা উপযুক্ত কাউকে মেনে চলতে নারাজ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা surrendered (আত্মনিবেদিত) নয়, তারা কি কারও surrender (আত্মনিবেদন) আশা করতে পারে? তাই তারা নেতা হয় কি করে?

শরৎদা—বাঙ্গলা বহুদিন বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছে কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে যেন বাঙ্গলায় একটা অধোগতির যুগ আসছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইদানীং বাংলাদেশে যতজন যত কাজ করেছে, বৈশিষ্ট্যের উদ্বর্দ্ধনের চেষ্টা কেউ করেনি, সংহতির পথ কেউ দেখায়নি—এক ঐ মুখ্যু বামুন রামকৃষ্ণ ঠাকুর ছাড়া। তিনি না আসলে, আজ আপনারা যতটুকু যা' করছেন করতে পারতেন না। তিনি জাতির চেতনার মোড়টা ঘুরিয়ে দিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ তো 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' বলে লিখলেন, কিন্তু আর-একটা দিক তিনি তুলে ধরেননি। উচ্চশ্রেণীর বহুলোক যে সর্ব্বসাধারণকে বুকের রক্ত দিয়ে বাপের মতো, মায়ের মতো পালন করেছে, তা' দেখান হয়নি। মুসলমানদের নাকি এরা ঘৃণা করত, কিন্তু নিজের ভাইও যদি অভক্ষ্যভোজী ও অসদাচারী হয়, সেখানেও তো নিজের নিষ্ঠা

অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলা লাগে। কোথায় ঘৃণা? কত পীর-সাহেবের পা-ধোওয়া জল হিন্দুরা খেয়েছে। চরিত্র যেখানে দেখেছে, সেখানেই তারা নতি স্বীকার করেছে—সে-কথা বলার বা সে-চিত্র আঁকার লোক আজ নেই। এখন চাই ইষ্ট-কৃষ্টির পূজারী নূতন শক্তিমান শিল্পী, লিখিয়ে, বক্তা, ভাল-ভাল প্রবন্ধ, নাটক, সিনেমা, বেতার-প্রচার, মায় টেলিভিশন—নইলে এ স্রোত রোধ করা যাবে না।

২৮-শে বৈশাখ ১৩৫৬, বুধবার (ইং ১১। ৫। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। যতিবৃন্দ উপস্থিত।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের অজানাকে জানার আগ্রহ আছে, কিন্তু যথেষ্ট জ্ঞান না থাকায় বুঝতে পারে না কিভাবে সে তার ঈপ্সিত বস্তুকে আয়ত্ত করবে। জানার চেষ্টা, পারার চেষ্টা এবং অজ্ঞানতা ও অক্ষমতা এই দুটো দিকই এক সাথে থাকে। তাই, অজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়ে গোঁজামিল দিয়ে ভাবতে চায় কিভাবে বিধিমাফিক না ক'রেও চাহিদাগুলি হাসিল করতে পারে। ওখানেই আসে miracle-এর (অলৌকিকত্বের) উপর আস্থা ও নির্ভরতা। সেই অবুঝ ধারণাটা এমন ক'রে পেয়ে বসে যে, সে ভাবে যা' অসম্ভব ব'লে মনে হচ্ছে, তা' হয়তো পরমপিতার অলৌকিক শক্তির প্রভাবে বা দৈবকৃপাবলে সম্ভব হ'য়ে উঠবে। তাই সহজেই বিশ্বাস ক'রে নেয়—শ্রীকৃষ্ণ কেনো আঙুলে গিরিগোবর্ধন ধারণ করেছিলেন। কিন্তু এ-কথা বুঝতে চেষ্টা করে না যে তিনি হয়তো এমন কোন বিহিত পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, যাতে তাঁর আশপাশের মানুষ প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। পুরাণে পুষ্পক রথের কথা পাওয়া যায়, তা' থেকে মানুষ অনায়াসে বলে—পুষ্পক রথ মানে এ্যারোপ্লেন। হয়তো সে যুগের মত কোন দ্রুতগামী যান ছিল এবং সেটা কী ও কেমন, সে-সম্বন্ধে যুক্তিযুক্তভাবে কিছু বোঝার চেষ্টা না ক'রে আবোল-তাবোল আজগবী জিনিসে বিশ্বাস করে। আলৌকিত্ব মানে—অজ্ঞতা ও না ক'রে পাওয়ার বুদ্ধি। এর সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নেইকো। ধর্ম্মের মধ্যে যেখানে যতটা miracle mongering (অলৌকিকত্বের প্রশ্রয়) ঢুকে পড়ে, ধর্ম্মও সেখান থেকে ততখানি অন্তর্হিত হয়। তবে এর মধ্য দিয়েও একটা দিক বোঝা যায় এই যে, অজ্ঞতা ও অক্ষমতার হাত থেকে নিস্তার লাভ করার একটা দুর্নিবার ইচ্ছা মানুষের ভিতর বরাবরই অজ্ঞাতসারে ক্রিয়া করে চলেছে। এইটেকেই বিহিত বৈজ্ঞানিক পথে পরিচালনা করার ভিতর-দিয়েই মানুষের জানার ও পারার পরিধি বিস্তার লাভ করে। বিবর্ত্তনের মূলেও রয়েছে এই আকূতি। তাই অলৌকিকতায় আবিষ্ট না থেকে, অজ্ঞাত যা' তাকে লোকলোচনের গোচর ক'রে তোলার চেষ্টাই প্রকৃত ধর্ম্ম। এইভাবেই ধর্ম্ম বিজ্ঞানকে ডেকে আনে।

এরপর কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষ যতই কামপ্রবণ হোক না কেন, নিছক ইন্দ্রিয়সুখই কিন্তু তার চরম ও পরম কাম্য নয়। তা' যদি হ'তো তাহলে

সন্তানের প্রতি মানুষের টান হতো না, সন্তানের জন্য মানুষ কোন দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারত না। নারী-পুরুষ যখন কামচর্য্যায় রত হয় সেই মুহূর্ত্তে হয়ত ভাবে না যে, এর ফলে যে সন্তানটি হবে সে কেমনতর হবে। কিন্তু তবু তারা চায় না যে, তাদের কোন সন্তান বনবুষ হোক বা অযত্নে জীবন হারাক। মানুষ অনন্তকাল বেঁচে থাকতে চায় সন্তানসন্ততির মধ্য-দিয়ে। অন্তর্নিহিত এই কামনা সহবাস-সুখের পেছনেও অজ্ঞাতসারে সক্রিয় থাকে। স্বামী-স্ত্রী, মেয়ে এবং ছেলে দুই রূপই নেয়, তাদের ভিতর-দিয়েই তারা বেঁচে থাকতে চায়। পুরুষের অনুপোষক মেয়ে, মেয়ের অনুপূরক পুরুষ। শুধু মানুষের ক্ষেত্রে এটা নয়, জীবজগতে সর্ব্বত্র এটা আছে।

শরৎদা (হালদার)—আমার মনে হয়, লীলা অর্থাৎ আলিঙ্গন ও গ্রহণের ইচ্ছা থেকেই এটা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লীলা জিনিসটা আমি বুঝি—positive ও negative-এর (ঋজী ও রিচীর) মিলনে যেমন একটা shoot (উদ্গম) ও flash (আকস্মিক দীপ্তি) হয়, পুরুষ-নারীর বিহিত মিলনে তেমনি তাৎকালিক উপভোগ ও সন্তানের জন্ম দুই-ই সংঘটিত হয়।

শরৎদা—কোন মহাপুরুষ এসে তাঁর জীবদ্দশায় সব মানুষকে কি ঠিক ক'রে দিয়ে যেতে পারেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর ইচ্ছাটা আমাদের ভিতর বাঁচার ইচ্ছারূপে কাজ করে। তৎসত্ত্বেও আমরা মরার কাম করি কেন? তার কারণ, তাঁর চাইতে প্রবৃত্তি আমাদের কাছে বড়। আমি আপনাদের ক'লাম—এই করুন, এই করুন, কিন্তু করলেন না। তার কারণ—আপনাদের will (ইচ্ছা), প্রবৃত্তিপোষণের কাজে নিয়োজিত ক'রে রেখেছেন। অল্প-বিস্তর প্রবৃত্তির পূজারী আপনারা, তাই আমি যা' বলি তা' আপনারা করতে পারেন না।

শরৎদা—আপনি যদি পাঁচটা টাকা আনতে বলেন, তাহ'লে তা' তখনই পারা যায়, যদি পাঁচ কোটি ডলার আনতে বলেন তাহ'লে তা' পারা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে আপনি পাঁচ কোটি ডলার আনার সামর্থ্যে উন্নীত নন। পাঁচ কোটি ডলার পাঁচ টাকার মত হ'তে পারে যদি আপনার সে মন হয়। তার মানে নিজেকে সীমার মধ্যে অতখানি আটকে রাখতে চান। নিজেকে ছেড়ে দিতে চান না তাঁর হাতে—তাই পারেন না। না পারার ইচ্ছা ও আসক্তিটা পুষে রাখতে চান, তাই পারার ardour (উদ্যম) ফোটে না—বুদ্ধি, বিবেচনা, দক্ষতা ও চাতুর্য্যও তাই আপনার নিজস্ব স্তরে circumscribed (সীমাবদ্ধ) হ'য়ে প'ড়ে থাকে। যেখানে তুলতে চাই আপনাকে, সেখানে উঠতে আপনি নারাজ, তাই পারেন না।

শরৎদা—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাব শিষ্যতে।

এর মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যদি আমার পূর্ণতা উপলব্ধি করি তখন বুঝি যে আপনিও তাই। কিন্তু আপনি ইচ্ছা ক'রে হয়তো নিজেকে খাটো ক'রে রেখেছেন। তবে উৎসে এতখানি অনুরাগ যদি থাকে, যাতে প্রবৃত্তির যে সীমাতে গণ্ডীবদ্ধ ক'রে রেখেছেন নিজেকে—তা ভেঙ্গে যায়,—তাহ'লে 'পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে'—এমনতর অবস্থা আর থাকে না। বরাহ বধ করা আর লাগে না। শোনা যায় বরাহ অবতারে, বরাহ তাঁর কার্য্যোদ্ধারের পর বরাহরূপে বংশবৃদ্ধি ক'রে এমনভাবে তাদের নিয়ে মায়ায় জড়িয়ে আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন যে, স্বধামে ফিরে যাওয়ার কথা তাঁর আর মনেই থাকল না। তখন তাঁকে আত্মসচেতন করবার জন্য, বিধির বিধান অনুযায়ী বধ করার ব্যবস্থা করা হ'লো এবং সেই অবস্থায় তিনি সচেতন হ'লেন যে, তিনি বিষ্ণুর অবতাররূপে প্রলয়পয়োধিমগ্না পৃথিবীকে উদ্ধার করবার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আপনারা করেন না তাই তো দুঃখকষ্ট আসে, নইলে তো ভ্রমপ্রমাদজনিত দুঃখ-কষ্ট আপনাদের পাওয়ার কথা নয়। আর্ত্ত না হ'লে আপনারা চেতেন না। তাই দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পড়তে হয় আপনাদের—সে অবশ্য আপনাদের কর্ম্মফল-অনুযায়ী। যীশুখ্রীষ্ট, রসুল, কৃষ্ণ, চৈতন্য ইত্যাদিকে ভগবান ব'লে জানি। তার মানে তাঁরা সজ্ঞানে ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্য যোগযুক্ত থেকে পৃথিবীতে তাঁদের কাজ ক'রে গেছেন নরদেহ ধারণ ক'রে। মুসলমানরা রসুলকে অবতার না ব'লে, বলে প্রেরিতপুরুষ, তা' একই কথা একটু রকমারি ক'রে বলা। কেষ্টঠাকুর অর্জ্জুনকে বলেছেন—তোমাতে আমাতে কোন প্রভেদ নেই—প্রভেদ শুধু এই যে, আমি সব জানি, তুমি জান না। আপনারা না-জানা ও না-পারায় সীমায়িত হয়ে আছেন স্বেচ্ছায়। আপনাদের ইচ্ছা-শক্তি জাগ্রত হ'লে, তাঁর উপর পাগলের মতো নেশা হ'লে, তখন না-পারা থাকবে না। তেমন কয়েকটা মানুষও যদি হয়, তাহ'লে শুধু ভারত কেন, সারা পৃথিবীর রূপ বদলে দেওয়া যায়।

শরৎদা—বুদ্ধদেব যেমন বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন কিন্তু সবাই বুদ্ধত্ব লাভ না করা পর্য্যন্ত তাঁর সেই জ্ঞানপ্রাপ্তি কি সার্থক হ'ল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর তিনি বুঝলেন যে, প্রতি-প্রত্যেকের পক্ষে একদিন-না-একদিন বুদ্ধত্বলাভ অবশ্যম্ভাবী। আমি ভগবান, এরা আলাদা, আমি পারলাম, এরা পারবে না—এ পর্দ্দাটা স'রে গেল তাঁর কাছ থেকে।

শরৎদা—সবাই যখন এক সত্তা, তখন একের পূর্ণতা হয় কি করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যষ্টির পূর্ণত্ব যে আসে, তা' থেকেই শুরু হয় সমষ্টির মধ্যে তা' সঞ্চারিত ও বাস্তবায়িত করার চেষ্টা ; তাই-ই চলছে নানাভাবে। তিনি বলেছেন—আমি আসিনি—তোমরাই এনেছ ;—ক্ষীরোদ-সমুদ্রের কাছে দেবতারা দানবের অত্যাচারে ক্লিষ্ট হ'য়ে যখন প্রার্থনা শুরু করলেন তাঁদের প্রত্যেকের দেহ থেকে জ্যোতি নির্গত হ'য়ে দেবীর আবির্ভাব হ'লো। দুর্গা যিনিই হোন, তিনি দেবতাদের

পরিণয়ন ছাড়া আর কিছুই নন। বৈষ্ণবদের কথা আছে—অদ্বৈতের আকর্ষণে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়েছিল। অদ্বৈত যেন conscious representative of ignorant people (অজ্ঞ জনগণের চেতন প্রতিনিধি) আর চৈতন্যদেব যেন, তাঁরই প্রার্থনার মূর্ত্ত পরিপূরণ।

শরৎদা—ব্যক্তিগত মুক্তি এবং সমষ্টিগত মুক্তির রকমটা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি নির্ব্বাণ লাভ করলাম সেইটে হ'ল ব্যক্তিগত মুক্তি এবং সবাই যখন মুক্ত-কাউকে অনুসরণ করবার ভিতর-দিয়ে মুক্তির স্বাদ পেল তাকে বলা যায় সমষ্টিগত মুক্তি বা মহাপরিনির্ব্বাণ।

শরৎদা—সবার হ'তে চায় না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার হয়তো পাঁচটি ছেলে। তার মানে আপনারই পরিণয়ন অর্থাৎ আপনার এক-এক অবস্থার পরিণতি। আপনার ইচ্ছা আছে, আপনার আত্মজ হয়েও তাদের সে ইচ্ছা হচ্ছে না। কিন্তু প্রত্যেক ছেলেই আপনার মতো হ'তো, যদি তাদের উৎসে অবাধ্য অনুরাগ থাকত। আপনার ইচ্ছাটাই তখন পাঁচজনের ভিতর-দিয়ে পাঁচ রকমে fulfilled (পরিপূরিত) হ'তো। যতক্ষণ তা' না হচ্ছে, ততক্ষণ নিস্তার নেই। তিনি পূর্ণ এবং প্রত্যেকে পূর্ণ আছেই। কিন্তু যে যেমন গণ্ডী সৃষ্টি ক'রে রেখেছে ; ইষ্টানুরাগের ভিতর-দিয়ে, যদি সে ঐ প্রবৃত্তির গণ্ডী ভেদ ক'রে যায়—'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি' যদি হয়, তাহ'লে সবারই হওয়ার পথ খোলা। ব্যক্তির মুক্তি হ'ল জীবন্মুক্তি এবং সবাইকে নিয়ে যে মুক্তি তা' হ'ল মহা-পরিনির্ব্বাণ।

শরৎদা—আমি পূর্ণ হ'লাম, ননীদা যদি না হয়, আমারই তো খাঁক্তি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি না হ'লে আবার ননীকে করতে পারবেন না, আপনার হওয়ায় আবার ননীর হওয়ার সম্ভাবনা সূচিত করবে—অবশ্য যদি ননীর আপনার উপর টান থাকে। নিজের বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে, মুক্তির সঙ্গে-সঙ্গে লোকক্ষুধা, লোকলালসা অর্থাৎ লোকসংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায় মানুষের। লোকলালসা যত বাড়বে আপনার এবং আপনার শ্রদ্ধার্হ চরিত্র দেখে, আপনার উপর লোকের শ্রদ্ধা যত বাড়বে, তত বুঝবেন আপনার গণ্ডীর বাইরে আপনার হাত গেছে। এই যে পাঁচু আছে, যেই ওর ভিতরটা খুলে যাবে, তখন ওর লোকলালসা এমন বেড়ে যাবে যে, কী ক'রে যে কী ক'রে ফেলবে তার ঠিক নেই।

শরৎদা—আমাদের মূল কাজ তাহ'লে তো হ'ল দীক্ষা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুরাগ হ'লে ঐ conception (বোধ) আপনা-আপনি আসে। ছেলে যেমন জন্মেই মাই খাওয়া শেখে, মাই মুখে পুরে দিলে টেনে দুধ বের করে—এও তেমনি।

যতীনদা (দাস)—লোক-লালসা বেড়ে গেলে তো মানুষের স্বাভাবিকভাবে বানপ্রস্থ আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। তখন হয়—অন্যের becoming (বিবর্দ্ধন) হ'লে যেন আমারই becoming (বিবর্দ্ধন) হ'লো।

শরৎদা—তাহ'লে আমাদের ইচ্ছার উপর সব নির্ভর করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাইতো! তেমন হ'লে বাঙ্গলার অবস্থা এই মুহূর্ত্তে কি হ'য়ে যায়। তখন আর পুলিশ দিয়ে লোক ঠেঙ্গান লাগবে না।

শরৎদা—বৈশিষ্ট্য নষ্ট হ'য়ে গেলে কিন্তু কিছু করা যায় না—এটা নূতনভাবে বুঝেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। বৈশিষ্ট্য যা' বলি, তা' আবার চলে বীজ-সংক্রমণে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে আত্মপ্রসাদের সুরে বললেন—আপনারা যে-নিয়মে, যে-পন্থায় করেন, সেই তপঃপন্থা যেমন স্বাভাবিক তেমনি সহজতম।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ প্রফুল্লর খাতার দিকে চেয়ে বললেন—ও যা' লিখছে, এ নিতান্ত কম জিনিস হবে না। আমার মনে হয়—এগুলি নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে। এগুলি হ'লো complex-এর (প্রবৃত্তির) antiforce (বিরোধী শক্তি)। তাই Satan (শয়তান) চায় তা' নিরোধ করতে, destroy (ধ্বংস) করতে। এ চুরি হয়ে যেতে পারে, উই-ইঁদুরে কেটে ফেলতে পারে। এটা এখন বেরুলে জীবন পায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর মাঠে ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট। কথাপ্রসঙ্গে সুশীলদা (বসু) বললেন—আজ স্টেটসম্যান পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছে—কেন ইংল্যাণ্ডে যুব অপরাধীদের সংখ্যা বাড়ছে। লেখক বলেছেন যে, সমাজে যথেচ্ছ বিবাহ-বিচ্ছেদ, ধর্ম্ম-সম্বন্ধে উদাসীনতা এবং যুদ্ধের দরুন বহু যুবকের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া—ইত্যাদি কারণে এসব হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে বললেন—পরিবারগুলি যদি সুকেন্দ্রিক না হয়—বাস্তবে, তাহ'লে সেসব পরিবারের লোকজনের প্রবৃত্তিগুলি হয় অনিয়ন্ত্রিত, তাদের চলনও হয় তেমন। আবার, বিয়ে-থাওয়ায় যদি গোলমাল থাকে, তাহলে এই উপসর্গ বেশী ক'রে বাড়ে।

তারপর স্পেনসারদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তুমি নাম দিয়ে জমি চাষ কর, আর ভগবৎপ্রীতির বীজ বোন ও তার পোষণ দাও। তাতে যে ফসল হবে, তা' হবে সত্তাপোষণী।

একটু পরে প্রসঙ্গতঃ বললেন—মেয়েরা যদি স্বামীতে concentric (সুকেন্দ্রিক) না হয় এবং পুরুষ যদি God-centric (ঈশ্বরকেন্দ্রিক) না হয়, তাহ'লে ঐ ফাঁক দিয়ে বহু দোষ ঢুকতে পারে এবং কালে-কালে জাতটাই নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে। পুরুষ স্বাধীন ভগবানকে নিয়ে আর মেয়ে স্বাধীন স্বামীকে নিয়ে—স্বামী আবার হওয়া চাই ইষ্টমুখী এবং স্ত্রীর বৈশিষ্ট্যপূরণী।

তারপর বললেন—নিজেকে শাসন করতে হয় ইষ্টের প্রতি নিম্মর্ল নিষ্ঠার ভিতর দিয়ে এবং এতেই চরিত্র নিম্মর্ল হয় এবং প্রেম প্রস্ফুটিত হয়।

২৯শে বৈশাখ ১৩৫৬, বৃহস্পতিবার (ইং ১২।৫।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের সামনের বারান্দায় এসে বসেছেন। আজ সকালে এখন ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির ছাঁট শ্রীশ্রীঠাকুরের বিছানায় এসে পড়ছে। বিছানার সামনের দুই পাশ একটু গুটিয়ে দেওয়া হয়েছে। যতিবৃন্দ উপস্থিত আছেন। বৃষ্টিতে আবহাওয়াটা বেশ ঠাণ্ডা হয়েছে। তাই গরমের দিনে আরামপ্রদই মনে হচ্ছে।

কথাপ্রসঙ্গে ননীদা (চক্রবর্ত্তী) জিজ্ঞাসা করলেন—নাম করতে-করতে মাঝে-মাঝে খুব নীরস লাগে। এর কারণ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তি ঢেউ খেলে কিনা, তাই অমন হয়। তাছাড়া, শরীর-মনের অবস্থা তো সবসময় এক রকম থাকে না। মাঝে-মাঝে এমন হয় যে ভীষণ বিশ্রী লাগে, কিছুই ভাল লাগে না—সবই যেন নীরস ও শুষ্ক। আমার তো হ'ত ঐরকম, তবু চালিয়ে যেতাম, তারপর হঠাৎ হয়তো ভাবের জোয়ার এসে গেল। ক্রমাগতি বজায় রাখাটাই বড় কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু পরে বললেন—শরীর ঠিক রাখতে হয়। খাওয়া-দাওয়া খুব সাবধানে করা চাই। পেট খারাপ থাকলে, নাম-ধ্যান, ভজন ভালভাবে করা যায় না।

শরৎদা (হালদার)—কোন বার অতিবৃষ্টি, কোন বার অনাবৃষ্টি হয়, তার ফলে মানুষের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ তেমন ক'রে mechanically (যান্ত্রিকভাবে) manipulate (পরিচালন) করতে পারে, যাতে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি শস্যের ক্ষতি করতে পারবে না। জমি তেমন ক'রে প্রস্তুত করলে জল গড়িয়ে যায়। একটা বিরাট আগুনের সৃষ্টি করতে পারলে, সে এলাকায় হয়ত বৃষ্টি কম হয়। মানুষ যদি ক্রমাগত অসুবিধা-গুলি অতিক্রম করার ব্যাপারে চিন্তা ও চেষ্টা ক'রে চলে, তাহলে পথও বেরোয়। কিছুদূর এগোলে সে পরিস্থিতিতে আবার হয়তো নতুন অসুবিধার সৃষ্টি হয়। চেষ্টা করলে তাকেও আয়ত্তে আনা যায়। মানুষের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা আছে, প্রয়োজনের মধ্যে প'ড়ে সক্রিয় অনুরাগ, অনুসন্ধিৎসা, অনুসরণ ও উৎসাহের ফলে তা' ক্রমাগত বাস্তবায়িত হ'তে থাকে। কিন্তু মানুষের জগতে সর্ব্ববিষয়ে অগ্রগতির জন্য সর্ব্বোপরি প্রয়োজন হলো, সুবিবাহ ও সুপ্রজনন। সেইটে যদি থাকে, তাহলে মানুষ ক্রমাগতই সব প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে জয়ী হ'তে পারে।

শরৎদা—যা-কিছু প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় হয়, তার পিছনেও একটা বিধান আছে তো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিধানের অমিত চলন আবার বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করে।

প্রফুল্ল—কেমন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন, লিভার ঠিকভাবে কাজ করছে না, তার ফলে হার্টের খাটুনি হয়তো বেড়ে গেল। তার ভিতর-দিয়ে আসে হার্টের অমিত চলন।

শরৎদা—প্রকৃতির মধ্যে প্রবৃত্তি পরতন্ত্রতা নেই তো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' না হলে আমাদের মধ্যে প্রবৃত্তিপরতন্ত্রতা আসল কী ক'রে ? আমাদের শরীর, জীবন, মন এগুলিও তো প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। ধর্ম্মের কাজ হ'ল, বাইরের এবং ভিতরের—এই দুই রকমের প্রকৃতিকে আয়ত্ত ক'রে তাকে সত্তা-পোষণী অর্থাৎ ইষ্টার্থপূরণী ক'রে তোলা।

শরৎদা—আচ্ছা! এঁটো সম্বন্ধে আপনি এত সাবধান কেন ? কাল নাকি কাপড়ে একটা ভাত পড়ায় বিছানাশুদ্ধ বদলালেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যদি অতটুকু না করি, তাহলে আর সবাই বিছানার 'পরে এঁটো থালা রেখে খাবে।

শরৎদা—আপনি যে বিছানায় ব'সে টেবিলে খান ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো এমনভাবে খাই, যাতে বিছানার সাথে এঁটোর কোন সংস্রব না ঘটে।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হ'য়ে বড়াল-বাংলোর পূর্ণিমা-কিরণস্নাত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ইজি চেয়ারে ব'সে আছেন। এমন সময় পূজনীয়া কল্যাণীমা সহ মিসেস স্পেনসার আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কল্যাণীমাকে বললেন—ওকে তাড়াতাড়ি বাংলা শিখিয়ে দে।

কল্যাণীমা—একসঙ্গে বেশী শিখতে চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বস্তু ও ব্যাপারগুলির সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে ভাষা শিক্ষা দিলে, আপসে-আপ অনেক কিছু শিখে যাবে অথচ শেখার কষ্ট মনে হবে না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে এসে বসলেন। চারিদিকে জ্যোৎস্নার প্লাবন ব'য়ে যাচ্ছে।

প্রফুল্ল—আজ বুদ্ধপূর্ণিমা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজ মহাপুণ্যাতিথি। এই তিথির তাৎপর্য্য স্মরণ ক'রে, যদি ভগবান বুদ্ধের আলোকে আজকের দিনে নিজ ইষ্ট সম্বন্ধে গভীরভাবে জপ, তপ, ধ্যান, ভজন ও স্বাধ্যায় করা হয়, তবে তার ভিতর-দিয়ে অনেক মাল পাওয়া যায়। মদ্‌ গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরু—এটা সম্বন্ধে বাস্তব অনুভব যত বাড়ে, প্রত্যয়ও তত পাকা হয়।

যতীনদা (দাস)—আমি স্পেনসারকে বলছিলাম, ওর বিভিন্ন সময়ের নোটগুলি সঙ্কলন করার কথা। ওকে বললাম কোন কাজ থাকলে, তোমার মন খারাপ হ'তে পারবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওভাবে বলতে নেই। ওতে উল্টো ফল হয়। বরং কেন, কিভাবে মন খারাপ হয় এবং কিভাবে তা এড়ান যায়, সে-সম্বন্ধে নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে নেতিবাচক ভাবটাকে নস্যাৎ ক'রে, মানুষকে ইষ্টার্থপূরণী প্রচেষ্টায় প্রবুদ্ধ ক'রে তুলতে হয়। Tactfully ও profitably (সুকৌশলে ও লাভজনকভাবে) কথা

কিভাবে বলতে হয়, সে-কায়দা আয়ত্ত ক'রে ফেলতে হয়। তখন আমাদের প্রত্যেকটা কথাই মন্ত্রের মত অমোঘভাবে সুফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। কথায় বলে—বাক্ই ব্রাহ্মণের প্রধান অস্ত্র। তেমনি ক'রে কথা বলতে গেলে চাই নিত্য যুক্ত থাকা।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর শরৎদাকে বললেন—আমি যখন যে-যে কাজের কথা বলেছি, তা কেন হয়নি, কেন করেননি বা করতে পারেন নি, কী কী অন্তরায় তার মধ্যে ছিল—সেটা বাহ্যিকই হোক বা আপনার গাফিলতির দরুনই হোক—নিদিধ্যাসনের ভেতর দিয়ে খুঁজে পেতে তার কার্য্য-কারণ সম্পর্ক বের করতে হয়, এবং তা' আবার practically (বাস্তবে) adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা লাগে। তখন ভবিষ্যতে অমনতর হওয়ার পথ রুদ্ধ হ'য়ে যায়। আসত জিনিস হ'লো অনুরাগ। শুধু intention (অভিপ্রায়) হিসাবে থাকলে হয় না। Urge (আকূতি) থাকলে তা' কাজে ফুটে বেরোয়ই। পাঁচুকে যে বই-টই পড়ার কথা বলি, সেটা হলো আকূতি জাগাবার জন্য। এখন আছে intention (অভিপ্রায়), intention (অভিপ্রায়)-টা urge-এ (আকূতিতে) ফুটে উঠলে, তখন সব জিনিসটা visualise (প্রত্যক্ষ) করা যায়। কোথায় কেমনভাবে অগ্রসর হ'লে mission (উদ্দেশ্য) fulfilled (পরিপূরিত) হবে, তার অন্তরায় কোন্-কোন্ দিক থেকে কেমনভাবে আসতে পারে, সবই প্রতিভাত হয় এবং সে ব্যবস্থাও করে তেমনি—প্রয়োজন যা'-যা, তাও যোগাড় রাখে তেমনিভাবে। যুক্তি, বুদ্ধি, চলন অন্বিত হ'য়ে ওঠে সার্থক সঙ্গতি নিয়ে। আর তখন পারাটা নির্ঘাত হ'য়ে ওঠে।

রাত সাড়ে ন'টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

ধারণা শুদ্ধ না হলে
ভাব শুদ্ধ হয় না,
ভাব শুদ্ধ না হলে
ভাবসিদ্ধ হতে পারে না—
শুদ্ধতায়,
ভাবসিদ্ধ না হলে
ভাবান্বিত করে তুলতে পারে না—
অপরকে।

কাশীদা (রায়চৌধুরী)—বুঝে-সুঝেও করা আসে না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন প্রবৃত্তির আবেগ যদি চাপে তখন তার সব অন্তরায় নিয়ন্ত্রণ করে তা' করিই, কিছুতেই ঠেকাতে পারে না। যেমন মেয়েছেলের উপর নেশা যদি হয়, মানুষ সেদিকে ছোটেই। তেমনি একটা প্রত্যয়ী আবেগ আসলে, কেউ ঠেকাতে পারে না। একটা রাখাল মানুষই হয়তো দুনিয়া কাঁপায়ে দিতে পারে। প্রকৃত আবেগ আসলে তোমার ধরন, ধারণ, চলন, চরিত্র সেইভাবে ভাবিত হ'য়ে ওঠে।

কাশীদা—চা-খাওয়া খারাপ বুঝেও তো খাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে আমরা বদভ্যাসের কাছে এমনভাবে আত্মসমর্পণ করি যে, মনে হয়, যত ক্ষতি হয় হোক কিন্তু এটা ছাড়ব না। প্রবৃত্তির দাসত্ব হ'লে এমনতরই হয়, আর ইষ্টের প্রতি অনুরাগে আসে একটা wise conscious adjustment and manipulation of all complexes and obstacles (প্রবৃত্তি এবং বাধাগুলির প্রাজ্ঞ সচেতন বিন্যাস ও পরিচালনা)। এখানেও enjoyment (উপভোগ), ওখানেও enjoyment (উপভোগ)। কিন্তু একটা যেন চিটে গুড় আর একটা যেন মিশ্রীর পানা। অদম্য অনুরাগে নিজেকে ইষ্টের সঙ্গে বেঁধে ফেলে সেইভাবে ঝাঁপ দিতে হয়, তবেই অসাধ্য সাধন করা যায়। শ্রীকৃষ্ণের বা বুদ্ধদেবের কি ভোগের বস্তু কম ছিল? কিন্তু কিছুই আকর্ষণ বিস্তার করতে পারল না তাঁদের মনের উপর। অত কঠোরতার মধ্যে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানই তাঁদের কাছে প্রীতিপ্রদ মনে হ'ল। এটা একটা inspirational enjoyment (প্রেরণাপ্রদীপ্ত উপভোগ)। এতে সত্তার যে উল্লাস হয়, উদ্দীপনা হয়, তাতে কষ্টটাও সুখের মনে হয়। আমরা ঐ রস পাইনি ব'লে ওটাকে কষ্ট ব'লে মনে করি। কিন্তু যার মন মাতে, প্রাণ মাতে সে আদর্শের পূরণার্থে চরম দুঃখদুর্দশা হাসি মুখে বরণ ক'রে নেয়। তা যেন তার আনন্দের অপরিহার্য উপাদান।

হরেনদা (বসু)—আপনি ইষ্ট, অহং এবং পরিবেশের সমন্বয় সাধনের কথা বলেন, সেটা কেমনভাবে সম্ভব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যেমন তাঁর জন্য, তোমার সেবা ও ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে তোমার পারিপার্শ্বিককেও তেমনিভাবে তাঁর সুনিষ্ঠ সেবক ক'রে তুলতে হবে। তাঁর সেবা, পালন, পোষণ ও পূরণের ভিতর-দিয়ে, তোমার যে জ্ঞান লাভ হচ্ছে, তা তাদের ভিতর পরিবেশন করতে হবে—তোমার আচরণের ভিতর-দিয়ে তাদের সশ্রদ্ধ ক'রে তুলে তোমার প্রতি। এইভাবে তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে normally (স্বাভাবিকভাবে) ইষ্ট, অহং ও পরিবেশের মধ্যে coordination (সমন্বয়) এসে যাবে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে, আত্মপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধি নিয়ে যদি এটা করতে যাও তাহলে তুমি কিছুতেই কৃতকার্য্য হতে পারবে না। প্রত্যেকের সত্তার সার্থকতা ও পরিপূরণ নিহিত থাকে ইষ্টের মধ্যে, তা' তোমারও যেমন, অন্যেরও তেমন। তুমি কোন মানুষকে যদি তোমাতে আবদ্ধ ক'রে রাখতে চাও, তাতে তার সত্তা সম্যক সার্থকতা ও পরিপূরণ লাভ করার সুযোগ না পাওয়ায় একদিন সে তোমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। প্রবৃত্তির পোষণ জুগিয়ে চিরকাল তুমি কোন মানুষকে তোমার বশে রাখতে পার না। ঐ চেষ্টা নিয়ে চললে, তুমি নিজেই নিজের কবর খুঁড়বে। তোমার আওতায় ওঁছা মানুষ পেতে পার, কিন্তু তাজা তরতরে, প্রাণবন্ত মানুষ একটাও পাবে না।

৩০শে বৈশাখ ১৩৫৬, শুক্রবার (ইং ১৩। ৫। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। যতিরা সব উপস্থিত আছেন। কথাপ্রসঙ্গে

প্রফুল্ল প্রশ্ন করল—প্রতিলোম সন্তানদের কেউ-কেউ লেখাপড়ায় খুব কৃতী হয়। তা সম্ভব হয় কী করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হবে না কেন ? ওটা তো আর শিক্ষা নয়। শিক্ষা অর্থাৎ সুনিয়ন্ত্রিত চরিত্র গঠন এবং প্রবৃত্তি-প্রলোভন জয় করা, ইষ্ট ও কৃষ্টির প্রতি সুনিষ্ঠ হওয়া—ইত্যাদি ব্যাপারের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখতে পাবে, সেই দিক দিয়ে এদের অগ্রগতি হবে কমই।

প্রফুল্ল—ডিগ্রীগত শিক্ষায়ও তো তাদের বিশেষ উন্নতি হওয়া উচিত না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা বানরকেও তো কত কিছু শেখান যায়, তাতে কি বানরের বানরত্ব ঘুচে যায় ?

স্পেনসারদা ও যতীনদা আসলেন। তাঁরা বড়াল-বাংলোর জমিতে কয়েক রকমের বীজ পুঁতেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—কি বীজ পোঁতা হল ?

যতীনদা—কুমড়ো, ঢেঁড়স ইত্যাদি।

পরে যতীনদা বললেন—স্পেনসার তার কিছু নোট খাতা আমার কাছে রেখে যায়। পরে Ray সেগুলি আমার কাছ থেকে নিয়ে গোলাপবাগে রাখে এবং সেখানে উই‍্‌পোকায় খাতাগুলি নষ্ট ক'রে ফেলেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শয়তান আমাদের fault-এর (দোষের) ভিতর-দিয়ে pursue (অনুসরণ) করে।

যতীনদা—কার fault (দোষ) ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার fault (দোষ), স্পেনসারের fault (দোষ), রে-র fault (দোষ)।

যতীনদা—আমার fault (দোষ) অতি কম। আমার দোষটাই বিশেষ দেখতে পাচ্ছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের দোষ কম ক'রে দেখতে বা দেখাতে চেষ্টা করা ভাল নয়, ওতে বোঝা যায়—দোষের প্রতি আপনার ভালবাসা আছে এবং দোষ শীঘ্র ছাড়বে না।

কথাপ্রসঙ্গে ননীদা (চক্রবর্ত্তী) বললেন—আপনি কাজকর্ম্ম করার কথা বলেন কিন্তু ভাগবতে আছে—ঊর্জ্জিতা ভক্তি ছাড়া কিছু হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুরাগ ছাড়া ঠিক-ঠিক করা হয় না, অবশ্য করা আবার অনুরাগ বাড়ায়।

ননীদা—শেষটা কি তাঁর উপর সব নির্ভর করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর উপর নির্ভর করে মানে—অনুরাগের উপর নির্ভর করে। 'সে তো একলা থাকে না ভাই, যখন যেখানে যায় তার সঙ্গে থাকে গো রাই।' রাই মানে রাধা—হ্লাদিনী শক্তি অর্থাৎ বর্দ্ধনী শক্তি। রাধা এসেছে রাধ্ ধাতু থেকে।

রাধা মানে নিষ্পন্নকারিনী শক্তি—প্রকৃতি, এক কথায় যাকে বলা যায় libido (সুরত), যার সম্বেগে মানুষ কাজ করে। বাঞ্ছিতের প্রতি আকুল নেশার ফলে আমাদের অন্তর্নিহিত হ্লাদিনী শক্তি জেগে উঠলে পরে সর্বদাই স্ফূর্তি লেগে থাকে। মূল জিনিস উজ্জী ভক্তি—বীর্য্যবান, সক্রিয় অনুরাগ—যা' নাকি ফোটে—কথায়, কাজে, হাবভাবে ও ব্যবহারে। ঐ আসলে আর কথা নেই।

৩১শে বৈশাখ ১৩৫৬, শনিবার (ইং ১৪।৫।১৯৪৯)

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে ব'সে কাজলভাইকে দীক্ষা দিলেন।

কাজলভাই দীক্ষা নিতে বসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আচ্ছা বল তো আমরা ভগবানকে ডাকব কেন? কারণ, তিনি আমাদের জীবন-স্বরূপ—বীর্য্যস্বরূপ। তিনি না হ'লে আমরা থাকি না। তাঁর দয়াতেই আছি, তাই তাঁকে ডাকা লাগে। ডাকতে গেলে আসন লাগে অর্থাৎ যেমন ক'রে বসলে ডাকার সুবিধা হয়, তেমন ক'রে বসতে হয়, তাকে বলে আসন। আসনে ব'সে ধ্যান করতে হয়, ভাবতে হয় তাঁর কথা। নাম করবে আর মন্ত্র মনন করবে অর্থাৎ ভাববে। কী ভাববে? যা' ভাবলে ভগবান খুশী হ'ন। আমার মধ্যেও ভগবান আছেন, আমাকে ধ্যান করতে পার। নামের সঙ্গে ধ্যান করতে হয়। সকলকে ভালবাসলে, কাউকে ঘৃণা না করলে, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দিলে, পতিত যে তাকে হাত ধ'রে উন্নতির দিকে টেনে তুললে তিনি খুশী হ'ন। তাই এ সম্বন্ধে ভাববে ও করবে—প্রতি পদক্ষেপে সদাচারী থেকে। এখন এই কর। এতে উন্নতি হ'লে পরে বলা যাবে।

শরৎদা (হালদার) শ্রীশ্রীঠাকুরকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী থেকে কিছুটা প'ড়ে শোনাচ্ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন বললেন—মা কালীর উপর আমার খুব টান ছিল। সেই টানটাকে বাস্তব রূপ দিতাম আমার মাকে তুষ্ট ও তৃপ্ত করে। জীবনে কতরকম দর্শন যে হয়েছে, তার শেষ নেই।

একটা কাঠের দোতলা ঘর ছিল। ঘরের পশ্চিম দিকে দু'খানা চৌকি ছিল। সুরেন স্যানাল ও আমি শুয়ে ছিলাম। শুয়ে-শুয়ে কাঁদছিলাম ভগবানের নাম ক'রে। দেখলাম—ছোট একটা আলো এসে পড়ল। ক্রমে সে আলোটা বড় হ'য়ে গেল। তার মধ্যে দেখলাম শ্যামবর্ণ চেহারার চার-হাতওয়ালা বিষ্ণুমূর্ত্তি। চোখ দুটি অপূর্ব সুন্দর। সবরকমভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখলাম ঠিক কিনা। কিন্তু সেই অপরূপ মূর্ত্তির বাস্তবতা সম্বন্ধে আমার মনে কোন সন্দেহ রইল না। পরমপিতা বোল ছিল আমার। বিশ্বাসটাকে আরো পাকা করবার জন্য আমি বললাম—পরমপিতা! তুমি যদি এসেই থাক, তাহ'লে এমন কিছু নিদর্শন দেখাও যাতে আমার মনে সংশয়াতীত বিশ্বাস চিরকাল জেগে থাকে। তখন ঐ বিষ্ণুমূর্ত্তি একটা হাত উঁচু ক'রে জীবন্ত মানুষের মতো নাড়লেন। তখন বললাম—যখন ডাকি তখন আসবা তো? মনে

কষ্ট যখন হবে, তখন আসবা তো ? তিনবার হাত নেড়ে বললেন—হ্যাঁ। পরে আলোটা আস্তে আস্তে ছোট হ'য়ে গেল, অদৃশ্য হ'য়ে গেল। বাইরে বেরিয়ে দেখি অন্ধকার রাত। এই দর্শন সম্বন্ধে আমি বুদ্ধিগত যুক্তি কিছু দিতে পারি না।

শরৎদা—শ্রীকৃষ্ণ আবার আবির্ভূত হ'য়ে তাঁর পূর্বের রূপ দেখেন কি ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' যায়। আপনি কি আপনার প্রফেসারী জীবনকে এখন দেখতে পারেন না ?

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আর একটা জিনিস বুঝতে পারি না কি ক'রে হ'লো। আমার শরীর থেকে একদিন এমন বিপুল আলো বেরিয়েছিল, যাতে মাঠ-ঘাট আলোয় আলোময় হ'য়ে গেছিল। আশ্রমের পূবের দিকে বসন্ত ডাক্তারের যে মাঠটা ছিল, রাত এগারটা-বারটার সময় সেখানে ছিলাম। সে আলো-দেখা লোকের মধ্যে দুর্গানাথদা (সান্যাল) এখনও বেঁচে আছে। আর বিরাজদার (ভট্টাচার্য) বাড়ীর ওখানে একদিন রাত্রে, কপাল থেকে অসাধারণ উজ্জ্বল আলো বেরিয়েছিল। সে আলোর জোর এক হাজার পাওয়ারের বাল্বের আলোর চাইতেও বেশী। সরোজিনী ছিল তখন।

শরৎদা বোস-মার কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মা ওদের ওখানে খুব যেতেন। রামায়ণ-টামায়ণ পড়া হ'তো। বোস-মা আমাকে কোলেপিঠে ক'রে মানুষ করেছে। ওদের বাগানেরই তো কাজ সেরেছিলাম গাছপালা উঠিয়ে উঠিয়ে। ভাবতাম এক মাটি অথচ এত বিভিন্ন রকমের গাছ কেন! উঠিয়ে উঠিয়ে দেখে তখন বুঝ হ'লো, আলাদা-আলাদা বীজের দরুন ব্যাপারটা ঘটে। বীজের আবার আলাদা-আলাদা coating (আবরণ), সেগুলি আলাদা-আলাদাভাবে রস সংগ্রহ করে ও গঠনও নেয় তেমনি ক'রে। তখন কাজলের এ-রকম বয়স বা তার চাইতে একটু বড়। ছেলেদের মধ্যে বাপের ভাব কিছু-কিছু এসে পড়ে। বড়খোকা, মণি, কাজলার মধ্যে আমার ধরন কিছু-কিছু আছে।

শরৎদা একজন সাধুর কথা তুললেন, যিনি এসেছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ছেলেবেলায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, তিনি ছিলেন সত্যিকার সাধু। তিনি এসেছিলেন গোপাল সান্যালের বাড়ীতে। তারই ছেলে সুরেন সান্যাল। ওদের বাড়ীটা ছিল এখনকার কাছারী বাড়ীর সামনে। ওরা খুব অতিথিবৎসল ছিলেন। সে সাধুকে কতজনে কত পয়সাকড়ি দিত, তিনি নিজে যৎসামান্য প্রয়োজন যা' তাই নিতেন, আর সব বিলিয়ে দিতেন। অনেক সময় পয়সার স্তূপ প'ড়ে থাকত, যে-সে নিয়ে যেত। আমাকে খুব ভালবাসতেন—গোপাল! গোপাল! ব'লে ডাকতেন। আমাকে স্নান করিয়ে দিতেন, আদর-যত্ন করতেন। অনেক সময় ভাল-ভাল খাওয়ার জিনিস যা' পেতেন, আমাকে খাইয়ে তারপর নিজে খেতেন। ক'দিন পরে চ'লে গেলেন। পয়সার জায়গায় পয়সা প'ড়ে রইলো। যাবার দিন ব'লে গেলেন—আবার দেখা হবে।

এরপর পূজনীয় বাদলদা আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ছেলেবেলায় তোর মাথার উপর একটা সাপের ফণা দেখেছিলি—সে ব্যাপারটা বলত।

বাদলদা সংক্ষেপে সে-কথা জানালেন।

এই প্রসঙ্গে সাপ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি একবার একটা খেজুর গাছে উঠেছিলাম শালিক পাওয়ার লোভে। উঠে ফোকরে হাত দিয়ে বের ক'রে দেখি, একটা মিসমিসে কালো সাপ। তখন তাড়াতাড়ি সাপটাকে ওখানে রেখে নীচে নেমে এসে একটা দৌড় দিলাম। দৌড়ে একটু দূর এসে আমি যেন ভয়ে নিথর হ'য়ে গেলাম।—আগে কিন্তু ভয়টয় টের পাইনি, দৌড়বার পর ভয় চেপে ধরল। ওর থেকে আমার মনে হ'ল কোন ভাবের উদ্বোধন আমাদের মধ্যে হ'তে গেলে, তার আগে তদনুযায়ী শারীরিক অভিব্যক্তি হয়। শারীরিক অভিব্যক্তিকে অবলম্বন ক'রে ভাবটা যেন জীবনীশক্তি পায়। তাই, আমার মনে হয় ভক্তি-অনুযায়ী করা-বলাটা যদি না থাকে, তাহ'লে ভক্তিও শুকিয়ে যেতে থাকে। সব ভাব সম্বন্ধেই এ কথা অল্পবিস্তর খাটে। এই জিনিসটা আছে ব'লেই বৈধীভাবে সাধন অনুসরণ ক'রে আমরা ধীরে-ধীরে ভক্তিপথে নিরন্তর এগিয়ে যেতে পারি। তাইতো আমি বলি—দীক্ষা নিয়ে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি ও সদাচার পালন ক'রে চলার কথা। এ অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। করলেই হয়।

১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, রবিবার (ইং ১৫।৫।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোল তাঁবুর পাশে ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট। পূজনীয় বড়দা কাছে আছেন। কাশীদা (রায়চৌধুরী), চুনীদা (রায়চৌধুরী), হরেনদা (বসু), স্পেনসারদা প্রভৃতি আসলেন। কলকাতা থেকে হাউজারম্যানদা এ্যান্থনীসহ এসে উপস্থিত হলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাউজারম্যানদা ও এ্যান্থনীকে দেখে খুশী হয়ে নানা খোঁজখবর নিতে লাগলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ইষ্টের প্রতি টানের ভিতর-দিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণের পথ অবলম্বন ক'রে আমরা যতক্ষণ অন্তর্জীবনে কিছুটা সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে না পারি, ততক্ষণ অন্যের ভিতর ইষ্টপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমরা দক্ষতা অর্জ্জন করতে পারি কমই।

শরৎদা—সন্ন্যাসের আদর্শই যদি চরম হয়, তাহ'লে বাস্তব জীবন-সম্বন্ধে আপনার এত যে নীতি-নির্দ্দেশ ও কার্য্যক্রম তার সম্পর্ক কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিম্নতম স্তরের যা'-কিছু তাকেও কি ক'রে becoming-এর (বিবর্দ্ধনের) দিকে adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে sublimate (ভূমায়িত) করা যায়—সেই কথাই বলা আছে আমার। অনেক ধর্ম্মাচার্য্য এ-সব দিকের কথা বিশেষ বলেন নি। তার মানে এ নয় যে তাঁরা সে সব জানতেন না। Analytically ও

synthetically (বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ সহকারে) সবকিছুই তাঁরা জানতেন, তবে প্রয়োজন বোধ না করায় তাঁদের অনেকে এ-সব বিষয়ে বিশেষ কিছু বলেন নি। তাঁরা আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপরেই জোর দিয়েছেন। কিন্তু কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা হয় না।

শরৎদা—আমার শরীরটা ও জীবনটাই যখন নশ্বর তখন এত সবের প্রয়োজন কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা বাদ দিয়ে পারার জো নেই। যে-ঘোড়ার উপর চেপে যাব, সে ঘোড়াই যদি কাবু হ'য়ে যায়, যাব কি ক'রে?

শরৎদা—কোন-কোন শূদ্রের ছেলেকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে দেখা যায়, আবার কত ব্রাহ্মণের ছেলের হয়তো পাত্তা পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শূদ্রদেহের যদি কোন বিকৃতি না হয়, তবে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী ব্রহ্মলাভের পথে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে তার কোন অসুবিধে নেই। এটা সবার পক্ষেই সত্য। এর সম্ভাব্যতা ক'মে যায়, যদি বিকৃত প্রজনন হয়। শরীরটা শুধু শরীর নয়, তা' হল চৈতন্যের পরিণয়ন। তাই, শরীর অর্থাৎ বাস্তব বৈধানিক সংস্থিতি যাতে চৈতন্যমুখর হ'য়ে ওঠে, বিবাহ, সমাজ-বিধান প্রভৃতি তেমনতর ক'রে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে হয়। Becoming (বিবর্ধন)-টা শুধু নিজের নয়, Universe-এর (ব্রহ্মাণ্ডের)। Environment (পরিবেশ) ভাল না হ'লে নিজেরও মুশকিল হয়, impulse (প্রেরণা) পাওয়া যায় না। এখনই এই অবস্থা, আরও বিকৃত হ'লে কি রকম দাঁড়াত? প্রথম ছাতি মাথায় দিয়ে ঢিল খাওয়া লেগেছিল—তা' জানেন তো? Environment (পরিবেশ) এমন জিনিস।

পূর্ব প্রসঙ্গ উল্লেখ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সবারই বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী সম্ভাব্যতা আছে, তবে শূদ্রের হাতেকলমে করার মধ্যে-দিয়ে যেতে হয়—নচেৎ শুধু তত্ত্ব নিয়ে চললে বিকৃতি আসতে পারে। প্রত্যেকের মত ক'রে তার ঢের সম্ভাবনা আছে। জেলের ছেলে যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারবে না তা' নয়। প্রত্যেকেই পারবে, তবে প্রত্যেকের বোধের রকম আলাদা, approach (প্রবেশ পথ) আলাদা, তবে চরম প্রাপ্তি হ'য়ে গেলে তারা প্রত্যেকেই নির্বিশেষের যাবতীয় বিশেষত্ব ও সর্ব-প্রকার বিশেষের নির্বিশেষত্ব যথাযথভাবে বুঝতে পারে। Sublimation (ভূমায়িতি) হ'য়ে গেলে প্রত্যেকেই সব কিছু বোঝে। তখন শূদ্র-ব্রহ্মজ্ঞও বিপ্রত্ব বোঝে আবার বিপ্র-ব্রহ্মজ্ঞও শূদ্রত্ব বোঝে। সব কিছুর মরকোচ তখন জানা হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু চুপ ক'রে থেকে ব্যাপারটা পরিস্ফুট করবার জন্য বললেন—তোমার উপাধি আছে বটে, কিন্তু তোমার কোন উপাধিকে সর্বস্ব মনে কোর না। তুমি তাঁর, তাই উপাধিতে অধিষ্ঠিত থেকেও তাঁর প্রতি অচ্যুত অনুরাগ নিয়ে সর্ব সীমা অতিক্রম ক'রে যেতে চেষ্টা ক'রো। যে শৃঙ্খলার ভিতর-দিয়ে, যে-যে রকমে, যেমন ক'রে পুরুষের পরিণয়ন হয়েছে তোমার প্রকৃতিতে, তা' বাদ দিয়ে তুমি সেই নির্বিশেষ পুরুষে উপনীত হ'তে পারবে না। মায়াকে অর্থাৎ পরিমাপিত সীমাকে বাদ দিতে

পারবে না, তবে তাকে সর্ব্বস্ব ব'লেও মেনে নিও না। আমরা স্ব-স্ব প্রকৃতি অনুযায়ী transformed (পরিবর্ত্তিত বা রূপায়িত) হ'য়েও তা' transcend (অতিক্রম) ক'রে আছি, তাই becoming (বিবর্দ্ধন) আছে। এক কথায়, আমরা determined (নির্দ্ধারিত) হ'য়েও divine (ভাগবত) হ'য়ে আছি।

ননীদা—বৈদ্যনাথকে জাগ্রত দেবতা বলে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর প্রতি বিশ্বাসে হয়তো মানুষের রোগ সারে অর্থাৎ curative force (রোগ-আরোগ্যকারী শক্তি)-টা হয়তো বেড়ে যায়। উভয়ে in tune (একতান) না হ'লে ফল হয় না।

প্যারীদা (নন্দী)—যীশুর স্পর্শে কারও রোগ সারলে তিনি বলতেন—Thy faith has healed thee (তোমার বিশ্বাসই তোমাকে সুস্থ করেছে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ।

হরেনদা (বসু)—রামকৃষ্ণদেব তাঁর বিশেষ কর্ম্মীদের পক্ষে অবিবাহিত জীবন পছন্দ করতেন ব'লে মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিও যে বিবাহের কথা বলি, আবার কিছু দিন বাদে কাউকে হয়ত সংসার থেকে আলগা হ'য়ে থাকতে বলতে পারি, দুটোর জন্যেই সমানভাবে রাজি থাকতে হবে। কাউকে আমি আবদ্ধ সংসারী হওয়ার কথা বলি না। যতিদের যে বাড়ী ছেড়ে চ'লে আসতে বলেছি, কিন্তু তাদের মন যদি সংসারমুখী হ'য়ে থাকে, তাহ'লে বুঝতে হবে আমি তাদের কাছে মুখ্য হ'য়ে উঠিনি। ইষ্টের চেয়ে কারও কাছে যদি সংসার বড় হয়, তাহ'লে সে কিন্তু সংসারও ঠিকভাবে করতে পারে না। সংসার হওয়া চাই ইষ্টার্থে। যার যেভাবে উন্নতি হয়, তাকে আমি তাই করতে বলি। মনের মধ্যে কিন্তু সন্ন্যাসের ভাবটা থাকাই লাগে। তা না হ'লে কিন্তু তারা খুব বড় কাজ করতে পারে না। সন্ন্যাসের ভাব বলতে আমি বুঝি—সংসারাসক্তি থেকে ইষ্টানুরক্তিকে প্রবল ক'রে চলা। অবশ্য কোন সংসারী তার কর্ত্তব্য কাজে অবহেলা করুক তা' আমি চাই না। সংসারটা যদি ইষ্টের জিনিস ব'লে মনে করে, তাহ'লে সে-ব্যাপারে কোন ত্রুটি করা তো সমীচীন নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে ব'সে কথাবার্ত্তা বলছেন।

তিনি শরৎদাকে বললেন—লিখিয়ে একদল ঠিক ক'রে ফেলেন। চুনী (রায়চৌধুরী), কিরণদা (মুখার্জ্জী), হরি (গোস্বামী) এদের দিয়ে একটা গুচ্ছ ঠিক ক'রে ফেলেন। লেখার মধ্যে consideration (বিবেচনা) চাই—কোথায় কোন কথা কেমন ক'রে বলব। লেখাও চাই এমন, যা' ধনেশ পাখীর তেলের মত ভিতরে ঢুকে যায়—কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল, আকুল করিল গো পরাণ—এমন হওয়া চাই।

শরৎদা—বুদ্ধদেব ক্ষত্রিয়ের ছেলে হ'য়ে অহিংসার কথা বললেন কেন অত ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো ঠিক-ঠিক ক্ষাত্রভাব—ক্ষত-ত্রাণী ভাব। ক্ষাত্রভাব বলতেই আমরা বুঝি মামুলি বীর্য্যবত্তা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর রকমটাই বীর্য্যদৃপ্ত।

রাজার ছেলে হ'য়ে ঐভাবে বেরিয়ে চ'লে গেলেন, কঠোর সঙ্কল্প নিয়ে জগতের কল্যাণের জন্য ঐভাবে অতন্দ্র তপস্যা করলেন, সে কি কম বীরত্ব? আবার, ও"র মনের মধ্যে একটা ব্যথা ছিল—মা মারা গিয়েছিলেন অত ছেলে বয়সে, তাই সেই ব্যথাই যেন sublimated (ভূমায়িত) হ'য়ে গিয়েছিল। জরা, মৃত্যু, ব্যাধির দৃশ্যে মন তাঁর চঞ্চল হ'য়ে গেল—কারও যেন অমন কষ্ট না হয়। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, রামচন্দ্র প্রত্যেকের জীবনে ক্ষাত্রভাবের এক-এক বিশেষ অভিব্যক্তি দেখা যায়।

২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, সোমবার (ইং ১৬।৫।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। যতিবৃন্দ উপস্থিত আছেন।

দুদিন পূর্ব্বে সকালে এমন সময় শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে ব'সে কাজলভাইকে দীক্ষা দান করেন। কাজলভাই-এর দীক্ষাকালীন ফটো-টি তুলে রাখার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু বিশেষ কারণে সেদিন ফটো তোলা সম্ভব হয়নি। তাই এখন কাজলভাই শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে কম্বলাসনে এসে বসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দীক্ষাদানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি কথা বুঝিয়ে বললেন। সেই সময় ফটোগ্রাফারকে দিয়ে একটি ফটো তুলে রাখা হলো। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন।

সেই প্রসঙ্গে শরৎদা (হালদার) জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে গেলে বৈশিষ্ট্যের পথে চলতে হয় এটা বুঝলাম। তাহলে ব্রহ্মদর্শনের চরম অবস্থায়ও তো বৈশিষ্ট্যের রকম থাকে। সুতরাং প্রত্যেকের ক্ষেত্রে তার ব্রহ্মদর্শন কি তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী বিশিষ্ট রকমে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে ব্রহ্মদর্শন হলে ব্রহ্ম limited (সীমিত) হন না। আপনার যে ক্যামেরা দিয়ে ব্রহ্মের ফটো তুললেন, সে ক্যামেরা সীমিত হ'তে পারে, কিন্তু ফটো উঠবে ব্রহ্মেরই। তাছাড়া উপায়ও নাই। বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে কি করে পারবেন? কিন্তু তাতে পে'ছুলে, তাঁকে ঠিক-ঠিক জানলে, ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য তাতেই উন্নীত হয়। তাই বলে—'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি' (ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মই হন)। তবে, তাঁকে পেতে গেলে, তাঁকে পেয়েছেন এমনতর মানুষে অচ্যুত সক্রিয় অনুরাগ চাই।

শরৎদা—শঙ্করাচার্য্য যে নির্ব্বিশেষ অনুভূতির কথা বলেছেন, সেইটেই তো কাম্য?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি নির্ব্বিশেষের কথা ক'য়ে থাকতে পারেন, কিন্তু তাও বলেছেন নিজের বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে। আমি আমার বৈশিষ্ট্য দিয়ে দেখেছি ব'লে আপনাকে বলতে পারছি। আপনার বৈশিষ্ট্য দিয়ে আপনি আবার যত সময় না দেখছেন, তত সময় আমার দেখায় আপনার দেখা হবে না। তবে আমার দেখাটা আবার আপনাকে এবং অন্য সবাইকে impulse (প্রেরণা) দেয়, তাই তার মূল্য আছে আপনার ও অন্যের কাছে। সব গাছই ওঠে ঐ আকাশের দিকে।

কিছু সময় চুপচাপ কাটল। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর গল্পচ্ছলে বললেন—আমার

প্রথম ভরসা হলো যখন একদিন সকালে চরে শিশিরকণার উপর সমগ্র সূর্য্যকে প্রতিফলিত দেখলাম। সেই শিশিরকণা আবার সূর্য্যের আলো ঠিকরে দিচ্ছিল। তা' দেখে আমার মনে খুব একটা বল পেলাম যে, এই ক্ষুদ্র শিশিরকণার বুকে যখন অতবড় সূর্য্য প্রতিফলিত হ'তে পারে, তখন আমার মধ্যেও তিনি প্রতিফলিত হতে পারেন, যদি আমি যোগ্য হই—তা' আমি যতই ছোট হই না কেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে হেনরীকে বললেন—Love (ভালবাসা) যেখানে যত real (বাস্তব), patience ও perseverance-ও (ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ও) সেখানে তত automatic (স্বাভাবিক)।

একটু থেমে আবার বললেন—দুটো জিনিস আছে—passionate urge and life urge (প্রবৃত্তির আকূতি এবং জীবন আকূতি)। Passionate urge (প্রবৃত্তির আকূতি) থেকে যে love (ভালবাসা) আসে, তা হয় turbid (মলিন), আর life-urge (জীবন আকূতি) থেকে যে love-এর (ভালবাসার) জন্ম, তা হয় serene (নির্ম্মল)। যে passionate urge (প্রবৃত্তির আকূতি) life urge-এর (জীবন আকূতির) সঙ্গে সুসঙ্গত, তা পবিত্র জিনিসেরই সৃষ্টি করে। যেমন, real conjugal love-কে (প্রকৃত দাম্পত্য প্রণয়কে) আশ্রয় করে যে lust (কাম) থাকে, তা holy offspring (পবিত্র সন্ততি) আবাহন করে।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর উম্মুক্ত প্রাঙ্গনে ইজিচেয়ারে বসেছিলেন। প্রবোধ বাগচীর শরীর খুব অসুস্থ। প্যারীদা (নন্দী) তাঁকে দেখছেন, কিন্তু তিনি ব্যস্ততাবশতঃ সময়মত প্রবোধদার খোঁজ নিতে না পারায় শ্রীশ্রীঠাকুর খুব ব্যথিত হয়ে প্যারীদাকে বললেন—দেখ! দায়িত্ব নিতে হয় তো পুরোপুরি নাও, নচেৎ আমার অন্য ব্যবস্থা করতে হয়। কোন patient (রোগী) ignored (উপেক্ষিত) হয়, আমি তা' চাই না। জীবন, যা' দিতে পারি না—তার দায়িত্ব নিয়ে যেন এতটুকু শৈথিল্যের পরিচয় না দিই।

প্যারীদা তখন বুঝিয়ে বললেন—কেন যেতে পারেননি এবং কতটা কী করা হচ্ছে ও হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্যারীদাকে ঔষধপত্র সবকিছুর দায়িত্ব নিয়ে সবদিকে নজর রেখে নিখুঁতভাবে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে বললেন।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর মাঠ থেকে বেড়িয়ে এসে আবার বড়াল-বাংলোর খোলা মাঠে ইজিচেয়ারে বসেছেন। মায়া মাসিমা কাছে ছিলেন। হরিদা (গোস্বামী), কিরণদা (মুখাজ্জী), চুনীদা (রায়চৌধুরী), উমাদা (বাগচী), গোপেনদা (রায়), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), সন্তোষদা (রায়), লাটিমদা (গোস্বামী), সুরেনদা (শূর), ভুষণদা (চক্রবর্ত্তী) প্রভৃতি এবং মায়েদের মধ্যে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি-জীবনের কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর রহস্যচ্ছলে বললেন—অনেক চেষ্টা ক'রে আমাকে ঐ অবস্থা রুদ্ধ করে রাখতে হয়েছে। যখন দেখলাম—আমার দেখাদেখি অনেকের ঐরকম ভাব হচ্ছে এবং ভাব হয়ে আবার মেয়েলোকের দিকে ভিড়ছে, তখন ভাবলাম—এইটেকে আশ্রয় করে তো শয়তান ঢুকছে মানুষের ভিতর, তখন অনেক কসরত ক'রে সে অবস্থা বন্ধ করলাম।

কিরণদা—স্ফূর্ত্তির দরুন নাকি জলে খুঁটো পুঁতে ডুবে থাকতেন!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে এত স্ফূর্ত্তি হতো যে, মনে হতো আর একটু স্ফূর্ত্তি যদি বাড়ে, স্ফূর্ত্তির ঠেলায় হয়ত ম'রে যাব। তাই পদ্মার মধ্যে খুঁটো গেড়ে তাই ধ'রে ডুব মেরে প'ড়ে থাকতাম। ভাবতাম চারিদিক দেখে-শুনে বোধহয় স্ফূর্ত্তি বাড়ে, তাই ডুব মেরে থেকে নিজেকে কষ্টের মধ্যে ফেলতাম—তাতে যদি আনন্দ একটু কমে। তবু গুড়গুড় করে ভিতর থেকে আনন্দের উচ্ছ্বাস জাগত, কিছুতেই ঠেকান যেত না। আর, তখন চলাফেরা ও কাজকর্ম্মের গতি দুরন্ত বেগে বেড়ে যেত। স্টীমারের হুইসেল শুনে শালগেড়ে থেকে রওনা হয়ে চার মাইল দূরে বাজিতপুরঘাটে পেঁছে দেখি—স্টীমার লেগে কেবল সিঁড়ি ফেলছে। দলকে দল এইভাবে হাঁটতাম, কেবল আমি একলা নয়। আমার সঙ্গে যারা থাকত তারাও যেন আনন্দ-মাতাল হ'য়ে থাকত।

মাসিমা—তখন গ্রামের লোকের সঙ্গেও তোমার খুব মেলামেশা ছিল, ওরাও তোমাকে খুব ভালবাসত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরে এদের নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে থাকতে হতো, ওদের সঙ্গে মিশতে পারতাম না। এরাও ওদের সঙ্গে মিশত না, আবার অহং-এ আঘাত দিত—টাকার গরম দেখাত। তা' থেকেই ধীরে-ধীরে অসুবিধার সৃষ্টি হ'তে লাগল। আমি যতদিন মেলামেশা বজায় রেখেছিলাম, ততদিন নানাভাবে ওদের সাহায্য-সহযোগিতাই পেয়েছি, ওদের কত আগ্রহ দেখেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর যতি-আশ্রমে এসে বসলেন। সেখানে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—নাম আর ধ্যান করতে-করতে মাথার অনম্য প্রবৃত্তিমুখী ভাবগুলি কিছু-কিছু নমনীয় হয়। সেইসঙ্গে যদি সক্রিয়ভাবে চরিত্র নিয়ন্ত্রণ না করা হয়, তবে ঐ নমনীয়তা শীতকালের ঘি-এর মত জমে আবার শক্ত হয়ে যায়।

সুশীলদা (বসু)—এক জায়গায় ব'সে কেউ যদি দীর্ঘদিন নামধ্যান করে এবং কোথাও মেলামেশা না করে, তাহলে কেমন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐভাবে নাম-ধ্যান করলে পরেও পরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা লাগে। গাছপালা বা পশুপক্ষী যা'র ভিতরেই থাকুক, সেখানেই ওটা করা লাগে। নইলে নিথর হ'য়ে পড়ে। তবে পশুপক্ষী বা গাছপালা, যা-কিছুর সেবা সাহচর্য্যই করি না কেন, তার ভিতর-দিয়ে ইষ্টকেই সেবা করছি এমনতর ভাব বজায় রাখা লাগে। এটা হলো ভাবমুখী থাকার বাস্তব পন্থা। হাতে-কলমে ঐ-সব যখন করি তখনও

নামময় হ'য়ে থাকা লাগে। তাঁর মধ্যেই আছি, তাঁকে নিয়ে এবং তাঁর জন্য যা'-কিছু করছি এমনতর একটা মনোভাব সর্ব্বক্ষণের জন্য পাকা ক'রে ফেলা লাগে। তেমন ভক্তকে দেখলে স্বতঃই মানুষের মনে ভগবৎ-প্রেরণার উদয় হয়। জীবন দিয়ে এই যে যাজন, এই হলো শ্রেষ্ঠ যাজন। এতে মানুষ সাধনপথে তরতর ক'রে এগিয়ে যেতে পারে এবং সে যেখানেই যায়, সেখানেই অজ্ঞাতসারে ভগবৎ-ভক্তি সঞ্চারিত করে। আমার ঋত্বিকরা কবে এমন হবে, আমি সেই আশায় পথ চেয়ে আছি।

সুশীলদা—রামকৃষ্ণদেব তো ষোল থেকে প'য়তাল্লিশ বছর পর্য্যন্ত নির্জ্জন সাধনে রত ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লোকগুরু হিসাবে সাধনা যেমন করেছিলেন তেমনি ঐ পরিবেশের মধ্যে প্রয়োজনমতো নিজের অভ্যাস-ব্যবহারকেও নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন, সব-কিছুকে ঈশ্বরপ্রাপ্তির অনুকূল ক'রে তুলেছিলেন। সমস্ত সত্তা মায় প্রতিটি রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত ঈশ্বরপ্রাণ ক'রে না তুললে ঈশ্বর লাভ হয় না। চিন্তা যদি চলনকে নিয়ন্ত্রিত না করে, solution (সমাধান) যদি চরিত্রে দানা না বাঁধে, সে solution (সমাধান) কথার solution (সমাধান) হয়ে দাঁড়ায়, তাতে কাজের কিছু হয় না। রামকৃষ্ণদেবের কথাগুলি যে মানুষকে এমন ক'রে নাড়া দেয়, তার কারণ তাঁর প্রত্যেকটি কথাই জীবন-চোয়ান কথা।

সুশীলদা—নাম করলে তো সব হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিক-ঠিক করলে হয়। তবে emotion should be materialised in action (ভাব কার্য্যে রূপায়িত করতে হবে), নচেৎ ঠিক-ঠিক ফল পাওয়া যায় না।

শরৎদা সংহিতার নানা বিধান সম্পর্কে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সমস্ত সংহিতা চেয়েছে—সমাজটাকে এবং তার বিধিনীতিকে becoming-এর (বিবর্দ্ধনের) দিকে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে, আর তার অন্তরায় যা' তাকে লৌহনিগড়ে নিরুদ্ধ করতে। ওগুলির তাৎপর্য্য বুঝে বিহিতভাবে অনুসরণ করতে পারলে, মঙ্গল অবধারিত। তবে যে-সংহিতা ঋষি-অনুশাসিত নয়, তা' অনুসরণের বেলায় হিসাব ক'রে চলতে হয়। রঘুনন্দন যে কলিতে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন, তা' মানা সমীচীন ব'লে মনে হয় না। এটা চলতে থাকলে হিন্দু সমাজের সংহিতিই ব্যাহত হবে। আজকাল যে বিপ্র ছাড়া ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের উপনয়ন-সংস্কার উঠে গেছে, এটাও ঠিক হয়নি। বিহিত সংস্কার ও আচার থেকে ভ্রষ্ট হ'লে, তার ভিতর-দিয়ে পাতিত্য আক্রমণ করে। পারশব বিপ্রদের মধ্যে যে কেন উপনয়ন-সংস্কার নেই তাও আমি বুঝে পাই না। কোন ধর্ম্মসূত্র বা গৃহ্যসূত্রে এ সম্বন্ধে কোন নিষেধাত্মক নির্দ্দেশ আছে ব'লে আমি জানি না। আমি নিজে অবশ্য ও-সব পড়িনি, কিন্তু কেষ্টদা যা' ঘেঁটে দেখেছে তাতে আমার মনে হয় ওদের মধ্যে উপনয়ন-সংস্কার চালু হওয়াই উচিত। তাই আমি তো লাগিয়ে দিয়েছি। তবে

ওরা যে scheduled caste-এর (তপশীলী জাতির) মধ্যে নিজেদের নাম ঢুকিয়ে দিয়েছে, এটা আমার কাছে খুব insulting (অপমানজনক) ব'লে মনে হয়।

৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, মঙ্গলবার (ইং ১৭।৫।১৯৪৯)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর জসিডি লাইনের গাড়ী দেখবার জন্য রোহিনী রোডের উপর গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। সেখানে পূজনীয় বড়দা এবং আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

কোন একটা ব্যাপারের মোকাবিলা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর যতীনদা (দাস)-কে ডাকলেন। যতীনদা পূজনীয় বড়দার একটা কথা ভুল বোঝেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা ছিল যাতে উভয়ের মধ্যে সামনা-সামনি কথা বলার মধ্য দিয়ে সেই ভুল ধারণার নিরসন হয়।

যা' হোক, বড়দার সঙ্গে কথা শুরু হলে যতীনদা রাগতভাবে কথার উত্তর দিতে থাকেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যতীনদার মনোভাব শান্ত করবার জন্য যে-সব কথা বলছিলেন তাতেও কর্ণপাত না ক'রে যতীনদা আত্মসমর্থনের ভাব নিয়ে নিজের কথাই ব'লে যেতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এতে দুঃখিত হয়ে যতীনদার সংশোধনের জন্য তখন নিজেকে নিজে খুব প্রহার করলেন। সে দৃশ্য বড়ই মর্ম্মন্তুদ। যতীনদার ইচ্ছা ছিল তাঁর অন্যায় হ'য়ে থাকলে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে মারুন। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর তা' না করে নিজেই মার খেলেন।

এরপর যতীনদাকে ডেকে নিয়ে বড়াল-বাংলোর গেটের ভিতরে একটি জায়গায় যতীনদাসহ আলাদাভাবে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন— আপনি আমার কাছে অকপটভাবে বিশ্লেষণ ক'রে বলুন তো আজ ঐভাবে ব্যবহার করলেন কেন ?

যতীনদাও শিশুর মত কেঁদে ফেলে নিজের ত্রুটির কথা খুলে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর অনেক সময় ধ'রে যতীনদার সঙ্গে আদরভরে কথাবার্ত্তা বললেন। যতীনদা এতে একেবারে জল হ'য়ে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন বড়াল-বাংলোর বারান্দায় গিয়ে তক্তপোষে নিজের বিছানায় বসলেন। সেখানে ব'সে আবেগভরে যতীনদা এবং অন্য সবাইকে বললেন—আমি আপনাদের উপর কত প্রত্যাশা নিয়ে ব'সে আছি, সে তো আপনারা কিছু-কিছু জানেন। তাই আপনাদের ভালোর জন্য আমি যে-কোন ক্রূর ব্যবহার করতেও প্রস্তুত। আপনাদের মনের মতো ক'রে না পেলেই আমার নয়। আমার অহঙ্কার হ'লেও হ'তে পারে। আমি জানি—আমি যতীনদার teacher (আচার্য্য)। তাঁর ভালর জন্য যেমন প্রয়োজন মনে করেছি তেমন করেছি। প্রয়োজনমত আপনাদের জন্যও এমনতর করতে পারি। আমার জলদিবাজী আছে। আমি জানি একটা ফুস্ মন্ত্র দিয়ে একদিনে মানুষের সব গলদ সেরে ফেলা যায় না। তাতে বেশ সময় নেয়। তবু অশেষ প্রত্যাশা, তাই আমার তর সয় না। আমি এখনই, এই মুহূর্ত্তেই

আপনাদের মনোমত ক'রে পেতে চাই। বলেছি না ?—আমি আমার চাইতেও বড় দেখতে চাই আপনাদের ! যতীনদার একটা গুরুতর অপরাধের জন্য যে মার খেলাম, কি যতীনদার যে একটা খুব পাপ হয়েছে এতে তা' কিন্তু নয়। যতীনদা যে নিজেকে support (সমর্থন) করতে চেষ্টা করছিল—দাম্ভিকতা নিয়ে, সেই প্রবৃত্তি যে এখনও আছে, তাই আমি যতীনদাকে ব্যথা দিয়ে শোধরাতে চেয়েছি। আমি জানি যতীনদাকে মারলে, যতীনদার ততখানি কষ্ট হবে না, যতখানি হবে আমি মার খেলে। তাই এটা করলাম। যতীনদা নিজে এগিয়ে আসছিল আমার কাছে মার খেতে। আমি ভাবলাম—সেটি হচ্ছে না, অত সোজা না ! আমি এমন-কিছু করব যার ভিতর-দিয়ে যতীনদার অনুতাপ ও পরিশুদ্ধি অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

ননীমা—আপনার কথা তো বুঝলাম, কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য তো মানুষ বুঝবে না। যতীনদার সম্বন্ধে এখনই চারিদিকে বহু বিশ্রী সমালোচনা হচ্ছে। সৌদামিনী যে সৌদামিনী সেও বলছে—যতীনদা একজন ভণ্ড তপস্বী। এরা আবার সব যতি হয়েছে !

যতীনদা বিনীতভাবে বললেন—ওরা ঠিকই বলছে। যতি-আশ্রমের একটা sanctiy (পবিত্রতা) আছে, আমি তার উপযুক্ত নই। আমার মতো মানুষের এখানে থাকা উচিত না।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বললেন—উপযুক্ত হ'য়ে কেউ কি আসে ? কিন্তু উপযুক্ত না হ'য়ে যে রেহাই নেই !

শরৎদা (হালদার)—আমাদের জন্য যদি আপনার শাস্তি গ্রহণ করতে হয় সেও তো মহা অশান্তিদায়ক হ'য়ে ওঠে আমাদের পক্ষে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবই আমার পুরস্কার হ'য়ে দাঁড়ায়, যদি আপনারা সেই ব্যথা বুকে রেখে, যেমনটি চাই—তেমনটি হ'য়ে ওঠেন, আমার আশা পূরণ করেন। নচেৎ সামান্য ব্যাপারে অমন করব কেন ? একটা সাধারণ মানুষও তো এমনতর ব্যাপারে অতখানি চটে না। আমার জীবনের থেকেও আপনাদের দাম অত্যন্ত বেশী—এমনটাই আমার মনে হয়। আপনারা না দাঁড়ালে, আমার কিছু করার সাধ্য নাই। আমার পরিচয় হলেন আপনারা।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু পরে বললেন—আমার এরা চোর হোক, ভণ্ড হোক, বদমায়েশ হোক বা যা'ই হোক, আমি এদের জন্য যা' করি, তার কারণ এরা জানে ও বোঝে—অন্যলোকে না জানুক বা না-বুঝুক। আমি বেঁচে থাকতে-থাকতে দেখতে চাই যে, এরা মানুষের মতো দাঁড়িয়েছে, দুনিয়ার সামনে লোকত্রাতার ভূমিকা নিয়েছে—এক কথায়, ঠিক আমার চাহিদা মতো গ'ড়ে উঠেছে। আমি কোনভাবেই ছেড়ে দেব না, মানুষ করবার জন্য এদের যা'র জন্য যা' করবার তা করবই। তাই দেখে মানুষ যদি মনে করে—এরা খুব খারাপ, তারা কিন্তু ভুলই করবে। এরা সব সোনার মানুষ, এমন মানুষ বেশী পাওয়া যায় না। কিন্তু তাতেও আমি সন্তুষ্ট নই। এদের আরও নিখুঁত দেখতে চাই, যাদের দেখে দুনিয়ার লোক চলার পথ পায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর দুপুরে ভোগের পর বড়াল-বাংলোর ঘরে বিছানায় বসলেন। হরিপদদা (সাহা) তাঁর চুল আঁচড়ে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর উপস্থিত সবাইকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—আমি তখন ঐভাবে করলাম এই বুদ্ধি থেকে যে,—Strike the iron while it is hot (লোহা যখন অত্যন্ত উত্তপ্ত থাকে, তখনই তাকে আঘাত করতে হয়)। আমি চাই—যতীনদার ill temper (বদমেজাজ) যেন একদিনেই educated (শিষ্ট) ও adjusted (বিন্যস্ত) হ'য়ে যায়। তবে যতীনদার attitude (মনোভাব) আমার বড়ই ভাল লাগল। ঐ আচ্ছন্ন অবস্থায় সে নিজের দোষের কথা যেভাবে analyse (বিশ্লেষণ) ক'রে বলল, তারপর একটা শিশুর মতো অসহায়ভাবে আমার সামনে কাঁদতে লাগল,—তাতে আমার দারুণ ভরসা হ'লো। ভাবলাম—দোষ বা inferiority (হীনম্মন্যতা) যতই থাক, তার সবকিছু সম্বন্ধে সে সচেতন। তাই আমার আশা হ'ল—কোনও দুর্বলতা যতীনদাকে বেশীদিন কাবেজে রাখতে পারবে না। অত ধকলের মধ্যে ঐ টুকু আসান বোধ হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বার-বার খোঁজ নিতে লাগলেন যতীনদা প্রভৃতির খাওয়া হয়েছে কিনা।

প্রফুল্ল খবর নিয়ে এসে বলল—যতীনদা স্নান ক'রে না খেয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই খবর শুনে অস্থির হয়ে পড়লেন। তখন প্যারীদাকে (নন্দী) বললেন—যা, যতীনদাকে গিয়ে বল আমি তাকে ডাকছি।

প্যারীদা যতি-আশ্রম থেকে যতীনদাকে ডেকে নিয়ে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর যতীনদাকে বললেন—যান, এবার খেয়ে নেন গে।

যতীনদা বললেন—আমার প্রায়শ্চিত্ত করা দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি তো এমন কোনও অপরাধ করেননি, যাতে physical (শারীরিক) প্রায়শ্চিত্ত কিছু করা লাগবে। আপনি যদি না খান, তাহ'লে তো বুঝছি—আমারই খাওয়া উচিত হয়নি। যথেচ্ছ ব্যবহার ও শাসন করার অধিকার কি আমায় দেবেন না ? আমি তো বলছি—আপনাকে জব্দ করার জন্য, শায়েস্তা করার জন্য আমি অমন করেছি। আপনি আজ এমন কী করেছেন ? শুধু আপনার ভালর জন্য যা করবার তা করেছি আমি। তা বেশ চলেন—আমিও যাচ্ছি চলুন খাই গে !

শ্রীশ্রীঠাকুর এই বলে উঠতে যেতেই যতীনদা বালকের মতো কেঁদে ফেলে বললেন—আপনার খাওয়া লাগবে না। আমি যাচ্ছি, খেয়ে খাচ্ছি।

এই ব্যথাকরুণ দিব্যদৃশ্য দেখে সেই মুহূর্তে সকলের চোখ অশ্রুসিক্ত হ'য়ে উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে সুধাংশুদার (মৈত্রের) সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—নাম করি মানে wave (তরঙ্গ) সৃষ্টি করি। সেই wave (তরঙ্গ) brain-cell (মস্তিষ্ক কোষ)-কে তদনুগ সূক্ষ্ম স্তরে তুলতে সাহায্য করে।

নাম স্নায়ুর উপর একটা প্রভাব সৃষ্টি ক'রে আমাদের মস্তিষ্ককে একটা উচ্চতর শক্তির পর্য্যায়ে তোলে। তার ফলে সেই স্তরের সঙ্গে সমতান-সম্পন্ন সূক্ষ্ম সব-কিছু আমরা ধরতে সমর্থ হই। এই উচ্চতর পর্য্যায়ে উঠতে গেলে কতকগুলি অবস্থার ভিতর-দিয়ে যাওয়া লাগে। মস্তিষ্কের কোষগুলির মধ্যে তখন যে-সব রূপান্তর ঘটতে থাকে তাই-ই জ্যোতি ও শব্দরূপে প্রতিভাত হয়। কোন সময় আলোকের অনুভূতি prominent (প্রধান) থাকে, শব্দ তত প্রকট হয় না। আবার, কোন সময় শব্দ প্রবল হয়, জ্যোতি একটু স্তিমিত থাকে। আবার, কোন সময় বা শব্দ ও জ্যোতি দুই-ই simultaneously (যুগপৎ) প্রবলভাবে অনুভূত হয়।

সুধাংশুদা—চিন্তা-পদ্ধতি এবং বাস্তব জগৎ এই দুই-এর মধ্যে বোধহয় একটা সাদৃশ্য আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মতে matter (বস্তু) এবং spirit (আত্মা) আলাদা নয়। হয় সব spirit (আত্মা), নয় সব matter (বস্তু)। আত্মিক চৈতন্যের স্থূল প্রকাশ হ'ল energy (শক্তি) এবং তাই-ই matter (বস্তু) হয়েছে। আমাদের চেতনার জগৎ এবং বাহ্য জগৎ এই দুটোর মধ্যে যদি কোনও সঙ্গতি না থাকতো, তাহ'লে চিৎ-শক্তি থাকা সত্ত্বেও আমরা বস্তু জগতের তত্ত্ব বা ব্যাখ্যা খুঁজে পেতাম না। যা' আছে পিণ্ডে, তা' আছে ব্রহ্মাণ্ডে—এ-কথা খুবই ঠিক। প্রত্যেকটি মানুষই ক্ষুদ্রাকারে একটি বিশ্ব। তার অন্তর্নিহিত চৈতন্যশক্তি অর্থাৎ মস্তিষ্ক-শক্তি যত সূক্ষ্ম, উন্নত ও সুবিন্যস্ত হয়, ততই সে জগতের যা কিছুকে ভালভাবে জানতে, বুঝতে ও পরিচালনা করতে পারে। তাই শুধু নাম করলে হয় না, নামী অর্থাৎ যিনি কিনা নামের চেতন বিগ্রহ তাঁর উপর যদি টান হয়, তাহ'লে মানুষের মনে একটা স্বাভাবিক প্রেরণা জাগে—তিনি চেতনা, চারিত্র্য ও ব্যক্তিত্বের যে স্তরে সহজভাবে আসীন, নিজেকে সামগ্রিকভাবে সেই স্তরের দিকে উন্নীত ক'রে তুলতে। এই একাগ্র টান যদি থাকে, এবং নাম-ধ্যান, ভজন, নিরখ-পরখ—আমি যেমন ক'রে বলেছি, তেমন ক'রে যদি কেউ করতে থাকে, তাহলে সে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী তর্-তর্ ক'রে এগিয়ে যায়। সাধনা করতে গেলে জীবনের কেন্দ্রে এমন একজন মানুষ চাই-ই।

শ্রীশ্রীঠাকুর নাম সম্পর্কে বললেন—আমাদের এই যে নাম, এর মধ্যে যে-কোন নামেরই inner mechanism (অন্তর্নিহিত মরকোচ) নিহিত আছে। আমরা প্রত্যেকেই এক-একটা স্পন্দন-তরঙ্গের পরিণয়ন। এই নাম যদি ঠিকমতো করা যায়, তাতে একই সঙ্গে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যের পূরণ ও becoming (বিবর্দ্ধন) দুই ই হয়। কারণ, এই নামের ভিতর সর্ব্বপ্রকার স্পন্দনের আদিমতম প্রাণ, প্রকৃতি ও রূপ বিধৃত আছে। তাই প্রতিপ্রত্যেকেরই পরিপূরণ ও বিকাশ এই নামের অনুশীলনে ত্বরান্বিত হয়। নামীর প্রতি অনুরাগ নিয়ে নাম করতে-করতে আমাদের প্রত্যেকটি nerve (স্নায়ু) ও cell (কোষ) সৃষ্টির কারণস্তরের সঙ্গে tuning (একতানতা) লাভ করে। তাই, কারণ কিভাবে সূক্ষ্ম ও স্থূলে রূপান্তরিত হয় এবং স্থূল কিভাবে সূক্ষ্ম ও

কারণের সঙ্গে পারম্পর্য্য-ক্রমে সংগ্রথিত থাকে—তা আমাদের বোধের গোচরে আসে। এই বোধ মানে, দর্শন ও প্রত্যক্ষ অনুভূতি। যাঁদের জীবনে এই সামগ্রিক দর্শন জাগে, তাঁরাই ঋষিত্ব লাভ করেন। এই দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুতেই explain (ব্যাখ্যা) করা যায়। নচেৎ আমার মতো মূর্খ মানুষ এত কথা বলতে পারত না। আমি যা' পেরেছি, তা' তোমরাও পার। যদি ঠিক মতো চল ও কর।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে এসে বসলেন। যতীনদাকে খানিকটা অবসন্ন ও আনমনা দেখে বললেন—আপনি নাড়ী দেখতে জানেন না ?

যতীনদা—আজ্ঞে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাড়ী দেখতে শেখা ভাল।

যতীনদা—শেখাবার মতো লোক পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর যতীনদাকে বললেন—আমার কাছে আসেন। আমি কায়দাটা ধরিয়ে দিচ্ছি।

যতীনদা এগিয়ে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর যতীনদার হাত ধ'রে বোঝাতে চেষ্টা করলেন—বায়ু, পিত্ত, কফ ইত্যাদি জিনিষগুলি কী এবং কোনটার কী প্রকৃতি ও ক্রিয়া এবং তাদের পরস্পরের সম্পর্কই বা কী। তিনি যতীনদার নাড়ী ধ'রে বুঝিয়ে ও দেখিয়ে দিলেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—আমার নাড়ীটা দেখেন তো! আর যা'-যা' মনে হয় বলেন। যতীনদাও উৎসাহিত হ'য়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাড়ী দেখলেন এবং তাঁর যা' মনে হ'ল বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—আপনি তো খুব তাড়াতাড়ি বেশ খানিকটা pick up ক'রে (ধ'রে) নিয়েছেন। এইবার ঘড়ি ধ'রে শরৎদা ও ননীর নাড়ীটা দেখেন।

যতীনদা হাসিখুশিভাবে ঘড়ি ধ'রে ও'দের দুজনেরই নাড়ী দেখলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই তো হাতেখড়ি হলো, এরপর নাড়ী-বিজ্ঞান বইটা পড়বেন ও নাড়ী দেখার অভ্যাসটা বজায় রাখবেন। এতে আস্তে-আস্তে ওস্তাদ ব'নে যাবেন।

যতীনদাকে এখন বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বললেন—এইবার ভাল করে এক ছিলিম তামাক খাওয়ান।

যতীনদা তাড়াতাড়ি তামাক সেজে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে যতীনদার সঙ্গে তরিতরকারী কিভাবে ভাল ক'রে ফলান যায়, সে সম্বধে গল্প করতে লাগলেন।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, বুধবার (ইং ১৮। ৫। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে ভক্তগণসহ গোল তাঁবুর পাশে ইজিচেয়ারে ব'সে ছিলেন।

সরোজিনীমার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তোর নতুন গরুতে দুধ কেমন দেয় ?

সরোজিনীমা—গরুটার সঙ্গে এখনও ভাব হয়নি, তাই গরু দুইতে গেলে যেন ভাল ক'রে দুধ ছাড়ে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বললেন—তাই দেখ, ভাব-ভালবাসা না হওয়া পর্য্যন্ত গরুটাও দুধ ছাড়ে না। গরু, ছাগল, মানুষ সব জায়গাতেই ঐ এক কথা—ভালবাসা ছাড়া কারও ভেতরের সম্পদ মেলে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর যতি-আশ্রমে এসে বসলেন। ব'সে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে, পা দু'খানি ছড়িয়ে সুর ক'রে গাইতে লাগলেন—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর ॥"

গাইতে-গাইতে হঠাৎ থেমে বললেন—একেবারে cell to cell (দেহের প্রত্যেকটি কোষ) একমাত্র তাঁকেই চায়।

যতীনদা কালকের ব্যাপার নিয়ে খুব দুঃখ করতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন বললেন—যা'ই হয়েছে ভালই হয়েছে,'খারাপ কিছুই হয়নি। কাল আমি যা'-যা' বলেছি, করেছি, তাতে ভালই হবে আপনার, তা' পরে দেখতে পাবেন।

যতীনদা—আমি যেন কিছুই বুঝতে পারছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ হিসাবে আমি আপনাদের প্রতি যেমন interested (স্বার্থান্বিত), আমার কোন কথাই আপনাদের ভাল বই খারাপ করবে না, খারাপ করতে পারে না। আমার একটা মস্ত প্রলোভন আছে—সবকিছুর ভিতর-দিয়ে আমি বাঁচতে চাই আপনাদের মধ্যে। আমি যে জিনিসটাকে আঘাত করেছি, তা' আপনি নন বা আপনার কিছু নয় কিন্তু। আমার আঘাতের বস্তু হ'লো তাই, যা' আপনিও চান না, আমিও ভালবাসি না, যাতে সপরিবেশ আপনার কষ্ট বাড়বে কিন্তু লাভ কিছু হবে না।

যতীনদা—আমাতে যেন আমি নেই, আমার সমগ্র জীবন যেন ছাতু-ছাতু হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রীতিভরে বললেন—ও কিছু না। আমি মারলাম আমাকে, আপনাকে তো কিছু করিনি, বলিওনি। তাতে যে আপনার মনে এতখানি ব্যথা লেগেছে যে ব্যথা আপনি ভুলতে পারছেন না,—তাই-ই বুঝিয়ে দেয় যে আপনি আমার।

যতীনদা—ওরা ঠিকই বলেছে, আমি ভণ্ড। সত্যিই আমাকে দিয়ে কিছু হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভণ্ডই হো'ক আর গণ্ডই হো'ক, আপনি আমার। আর, আমি যা'ই কিছু ক'রে থাকি, যত ব্যথাই দিয়ে থাকি, জানবেন—আমি উপভোগ করেছি ঢের। আমার উপভোগ যদি আপনার উপভোগ্য হয়, তবে দুঃখের কারণ তো দেখি না। আমি বলছি—আমি খুশী, আমি তৃপ্ত আপনার ব্যবহারে। মানুষের তৃপ্তি যদি একজনকে আশীর্ব্বাদ করে, সে আশীর্ব্বাদ থেকে আপনি বঞ্চিত হবেন না। আমি যা'

আঁচ ক'রেছিলাম--দেখলাম তা' ঠিক। আমি ভেবেছিলাম আমার প্রকৃত আধিপত্য আছে, দখল আছে আপনার উপর। আপনার আচরণেও বুঝতে পারছি—আমার সিদ্ধান্ত একেবারে ঠিক।

যতীনদা মনের আবেগে কাঁদতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দরদভরা কণ্ঠে বললেন—লক্ষ্মী আমার! সোনা আমার! কিছু ভাববেন না, আমি খুশী আছি। আমি যদি খুশী থাকি, আপনি তা'র মধ্যেই স্বস্তি খুঁজে পাবেন। আর, আপনার অন্তরের প্রাপ্তি আপনাকে খুশী ক'রে দেবে।

যতীনদা—মন মানে না। নিজের brutish temper-এর (পশু-ধর্ম্মাক্রান্ত মেজাজের) জন্য দুঃখ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনিই মন মানবে। আমি যদি খুশী হ'য়ে থাকি, নিশ্চয়ই তাতে ভাল হবে আপনার। Brute (জন্তু) যদি হ'য়ে থাকেন, তাহলে আপনি brute of heaven (স্বর্গীয় জন্তু)।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অত ভেবে কাজ কী? আপনি বরং আমাকে একটু তামাক সেজে খাওয়ান।

তামাক সাজতে-সাজতে যতীনদা বললেন--আমার শান্তি তো হয়নি, অন্তর থেকে অশ্রদ্ধা ও দোষ-দর্শনের ভাব যাচ্ছে না। সবার প্রতি ভালবাসার ভাব আনতে পারছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারছেন না এ-সম্বন্ধে যদি আপনি সচেতন থাকেন, তাহলে একদিন পারবেনই। অবাঞ্ছিত মনোভাব থেকে রেহাই পাবেনই। নিজের দোষ ধরতে পারা একটা বড় কথা।

যতীনদা—আপনার ভালবাসারও তুলনা নেই, কঠোরতারও তুলনা নেই। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল, কথা বলার শক্তি ছিল না সেই মুহূর্ত্তেই আপনি আমাকে বাধ্য করলেন সব কথা বলতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর মধুর হেসে বললেন—সবই সত্যি।

যতীনদা—দুই-এক সময় মনে হয় আপনি বোধহয় কল্যাণবুদ্ধি থেকে একটা মানুষকে গুঁড়িয়েও দিতে পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষকে পারি না, পারি তার দুর্ব্বলতাকে।

যতীনদা—আপনাকে ব'লে হালকা লাগছে—পাপ যেন বেরিয়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল।

যতীনদা—আপনাকে ছেড়ে থাকাও মুশকিল, আবার আপনার কাছে থেকে তাল মিলিয়ে চলাও মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর যতীনদার দিকে চেয়ে অনবদ্য সুন্দর ভঙ্গীতে হাসতে লাগলেন।

প্রফুল্ল শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলল—কালকে যে আপনি ঐভাবে নিজেকে প্রহার করলেন, মনে হয় আমিও সেই জন্য দায়ী। আমার মধ্যেও প্রচণ্ড আত্মাভিমান আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন অপরাধ করনি, অন্যায় করনি, দুর্ব্যবহার করনি তোমরা আমার প্রতি বা আমার কারও প্রতি। আমি অমন করলাম—আমার জায়গা ক'রে নেওয়ার জন্য তোমাদের মধ্যে। পরমপিতার কাছে প্রার্থনা করি—তোমরা মানুষ হও। প্রার্থনা না করলেও তাঁর দয়া এমনিই আছে—যতক্ষণ তাঁর ঠাঁই আছে তোমাদের জীবনে। আমি বড় লোভী, আমার আশ মেটে না। আজীবন আমার এই ক্ষুধা—আমি তোমাদের মধ্যে থাকতে চাই, তোমাদের জীবন্ত রাজপ্রাসাদের মধ্যে বাস করতে চাই—যে-সৌধকে নতি জানাবে হয়তো সারা জগৎ। প্রত্যাশা আমার অঢেল—তা'র লেখাজোখা নাই। যে-প্রবৃত্তি থাকতে দেয় না, বসতে জায়গা দেয় না আমায়—তার উপর একটা নিৰ্ম্মম আঘাত আমি দিয়েছি, এই যা। আমি প্রার্থনা করি—অগুণ যা-কিছু আপনাদের, তা' স'রে যাক, সদ্‌গুণ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠুক। আপনারা সুস্থ দেহে, সুস্থ মনে সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাকুন। আপনারা এমন হ'য়ে উঠুন যে, মানুষ আপনাদের মানুষ বলতেও দ্বিধা বোধ করে, দেবতা ব'লে, ভগবান ব'লে ধন্য বোধ করে। আপনারা যেন দুনিয়ার সব ism-এর (বাদের) materialised (রূপায়িত) সমন্বয়, সামঞ্জস্য ও সমাধান হ'য়ে ওঠেন। এই আশাটা কি আমার অন্যায় ?

শরৎদা—তা' কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু পরে বললেন—মানুষের complex (প্রবৃত্তি) থাকে, সাধারণত ego (অহং) তার সঙ্গে indentified (একীভূত) হয়ে থাকে। Complex (প্রবৃত্তি) থেকে নিজেকে আলাদা ক'রে ভাবতে পারে না। তাই সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, সৎ যা'-কিছু বোঝা সত্ত্বেও তা' করতে পারে না। কিন্তু বৃত্তি-অভিভূত অহং-এর খোলসটা যখন ভেঙ্গে যেতে থাকে তখন কষ্ট হয় খুব। তাই অহং আবার shelter (আশ্রয়) নিতে চায় আর-একটা safe place-এ (নিরাপদ জায়গায়)। তৎসত্ত্বেও একবার যদি প্রবৃত্তিপরামৃষ্ট অহং-এর হাত থেকে আলগা হয়ে দাঁড়ান যায়, তখনই বুঝমতো চলাটা সহজ হয়। অহং ও প্রবৃত্তি সব-কিছুকে ইষ্টের সেবক ক'রে তুলতে পারলে, নিজেকে বিলকুল ইষ্টের হাতে সঁপে দিতে পারলে, তখন তাঁর স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটা নিঃশ্বাস ফেলতেও প্রবৃত্তি হয় না। ভক্তিই হলো প্রবৃত্তি জয়ের সহজ পথ।

এরপর যতীনদা উঠে গেলেন।

শরৎদা বললেন—পরিবেশের ভিতর যে ভাবের সৃষ্টি হয়েছে, তা' কিছুতেই অপনোদন করা যাবে না—এইটেই বড় কষ্টের বিষয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ কী মনে করবে—সেইটে যদি আপনাদের কষ্টের ব্যাপার হয়, তাতে কিন্তু আমি খুব আশার কিছু দেখি না। বরং আমার ব্যথায় ব্যথিত হ'য়ে আপনাদের মধ্যে আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের সঙ্কল্প যদি জাগে, তাতেই আপনারা লাভবান হবেন।

যতীনদা ঘুরে এসে বললেন—আমি বড়দার কাছে ক্ষমা চেয়ে এলাম। সত্যিই আমি বড়দাকে ভালবাসি। তাঁর উপর আমার কোন রাগ নেই। কাশীদার উপরও নেই—তাঁকে পাইনি, পেলে ক্ষমা চাইব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কারও উপর রাগ থাকবে না। আপনি আমার কতখানি—লোকে তা বুঝবে? আর, আমি বলছি—আপনার আচরণের ভিতর-দিয়ে সকলেই তা' অচিরেই ঠিক পাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর আশীর্বাদের ভঙ্গীতে আবেগভরে বললেন—আপনি অন্তরের সম্পদে সম্পদশালী হ'য়ে উঠুন, মানুষ তা' উপভোগ করুক—আপনি সুস্থ সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাকুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ক্ষণকাল নীরব থেকে উপস্থিত সকলের দিকে চেয়ে বললেন—আমি চাই যে, আপনারা যে-রাস্তা দিয়ে চলবেন, আপনাদের স্পর্শে রাস্তার ধূলি সোনা না হয়ে সুধা হয়ে উঠুক। সোনা তো পৃথিবীর জিনিস, তা' কিনতে পাওয়া যায়। সুধা হল স্বর্গের জিনিস, তা অমূল্য। আপনাদের স্পর্শে মানুষ সুধাস্বাদ লাভ করুক। ক্রাইস্ট যে বলেছিলেন—যারা তোমাদের কথা নেবে না, তাদের বাড়ীতে তোমাদের পায়ের ধুলো ঝেড়ে এস। আমার মনে হয়, তার মানে হল—আজ যারা মূঢ়তাবশে তোমাদের কথা নিতে পারছে না, পরে একদিন তারা হয়তো তোমাদের ঐ পায়ের ধুলোর অমৃতময় প্রভাবে প্রভাবিত হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু পরে বললেন—আপনারা যদি তাড়াতাড়ি শায়েস্তা হয়ে যান, এর পরে যারা আসবে পরমপিতার দয়ায় তাদের অত কষ্টই করা লাগবে না।

যতীনদা—আমি যে আপনার মনে ব্যথা দিলাম, সে-প্রবৃত্তি হল কেন আমার?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Purging attitude (আত্মবিশোধনের মনোভাব) হয়েছে, সব গলদ থেকে মুক্ত হ'তে চান, তাইতে বলেছেন। আর, আমি তো ব্যথা পাইনি। আপনার গলদ আপনি পুষে রাখতে চান না, বিশুদ্ধ হতে চান, সেই সুসময় উপস্থিত হয়েছে।

কিছু সময় চুপ ক'রে থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দয়ালের অপার দয়া। তিনি যেন দয়া করার তালেই ঘুরে বেড়ান। আমাদের মন যদি তাঁর দিকে থাকে, তাহলে সব অমঙ্গলকেই আমরা মঙ্গলে পর্য্যবসিত করতে পারি।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একটা আছে আত্মপ্রসাদ, আর একটা আত্মাভিমান। প্রথমটার মধ্যে আছে একটা সাত্ত্বিক উপভোগ, আর দ্বিতীয়টার মধ্যে আছে আত্মপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধি—আমার বিদ্যা, টাকা-পয়সা, গুণগরিমা ইত্যাদিকে মানুষ পূজা করুক—মানুষ আমাকে খাতির করুক, মান্য করুক—এমনতর একটা দাবীর ভাগ। জোর ক'রেই যেন তেমনটা আদায় করতে চাই। আর, মানুষের কাছ থেকে অমনটা না পেলে ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হ'য়ে থাকি। এমনকি কখনও-কখনও এটা এমন কুৎসিত রূপ নেয় যে, আমরা মানুষকে খামাখা বেকায়দায় ফেলে তাকে নতিস্বীকারে বাধ্য করি।

এইভাবে যে-মানুষটা নতিস্বীকারে বাধ্য হয়, তার সত্তা কিন্তু আমাদের প্রতি আক্রুষ্ট হ'য়ে থাকে। এইভাবে আমরা অযথা বহু শত্রু সৃষ্টি ক'রে তুলি। সুযোগ পেলে তারা আমাদের উপর শোধ তুলতে কসুর করে না—তা' আমরা যতই দয়া-দাক্ষিণ্য দেখাই না কেন। ভক্তির ভাব ছাড়া আমাদের অহমিকা ঠিক-ঠিক সুস্থ ও শান্ত হয় না। ভক্তের প্রার্থনা হল—

"আমার মাথা নত করে দাও হে
তোমার চরণ ধূলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে॥'

একজন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বললেন—আমি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির ব্যবহারে মনে অত্যন্ত ব্যথা পেয়েছি, মনে হয় কোন ভুল ধারণার বশবর্তী হ'য়ে তিনি আমার সঙ্গে ঐ-রকম ব্যবহার করেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সামনা-সামনি কথা ব'লে ঠিক ক'রে নেওয়া ভাল। কাউকে তোমার সম্বন্ধে অমূলক ভুল ধারণা পুষে রাখতে দেওয়া তার পক্ষেই খারাপ। এতে তোমার ক্ষতি না হ'লেও তার ক্ষতি হবে বেশী। এখনই যাও, কথাবার্তা ব'লে এস।

দাদাটি সেখান থেকে ঘুরে এসে সব কথা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই ভাল হলো না ?

উক্ত দাদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জটিলতাকে কখনও বাড়তে দিতে নেই ; সহজভাবে নিরসন যাতে হয় তাই করতে হয় !

আভিজাত্যবোধ সম্পর্কে কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওতে ঐতিহ্যগত গুণের কথা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ঠিক-ঠাক আভিজাত্য বোধ থাকলে মানুষ বংশমর্য্যাদার হানিকর কোন কাজ করতে পারে না। আভিজাত্যবোধ ও জাত্যভিমান কিন্তু এক কথা নয়। জাত্যভিমান থাকলে, আমি বামুন, তুমি চণ্ডাল, এরকম একটা অবজ্ঞার ভাব আসে। এটা মোটেই ভাল নয়।

এরপর যতীনদা আবার কাশীদার কাছে ক্ষমা চাইতে গেলেন।

কাশীদার বয়স যদিও যতীনদার থেকে অনেক কম, তবু যতীনদা মাঠের মধ্যে সর্বজন সমক্ষে কাশীদার পা ধ'রে বললেন—আমি অজ্ঞাতে যদি তোমার মনে কোন ব্যথা দিয়ে থাকি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর ভাই।—বলেই যতীনদা কেঁদে ফেললেন।

কাশীদাও হকচকিয়ে গিয়ে যতীনদাকে টেনে তুলে নিয়ে সাশ্রুকণ্ঠে বললেন—করেন কি করেন কি ! আমাকে অপরাধী করবেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই ঘটনার কথা শুনে খুব খুশী হলেন। তৃপ্ত কণ্ঠে বললেন—দেখ, যতীনদা কত বড় ! যেন দশজনের মাথার মুকুট।

একটু আগে আভিজাত্য সম্পর্কে কথা হচ্ছিল, সেই প্রসঙ্গে শরৎদা বুনো রামনাথের স্ত্রীর গল্প করলেন। তিনি একদিন এক ঘাটে স্নান করতে যান, সেখানে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মহিষী সখী-পরিবৃতা হয়ে স্নান করতে আসেন। বুনো রামনাথের স্ত্রীর পরনে ছিল মলিন বসন এবং শাঁখার বদলে হাতে লাল সুতো বাঁধা ছিল। এই দেখে তাঁরা তাঁর হাতে বাঁধা লাল সুতোর কথা উল্লেখ ক'রে তাঁকে ব্যঙ্গ করতে থাকেন। তাতে বুনো রামনাথের স্ত্রী গর্বের সঙ্গে বলেন—যেদিন এই লাল সুতো খ'সে যাবে, সেদিন নদীয়ার গৌরব-রবি ডুবে যাবে। উপস্থিত মহিলারা পরে বুঝতে পারেন যে, তিনি স্বনামধন্য পণ্ডিত বুনো রামনাথের স্ত্রী এবং নিজেরা লজ্জিত হন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই কথা শুনে খুব প্রীত হন।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বলেন—আগে বামুনরা নাকি রাজার দান গ্রহণ করতেন না। তাতে নাকি তাঁদের সামাজিক সম্মান ক্ষুন্ন হতো। রাজার সাহায্যের মুখাপেক্ষী হ'লে, তাদিগকে নাকি জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে সম্মান করা হতো না।

শরৎদা—অর্থনৈতিকভাবে অপরের উপর নির্ভরশীল হ'লে, কোন মানুষ কি সব সময় বিবেকসম্মতভাবে চলতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যতক্ষণ আছেন, পারিপার্শ্বিকের থেকে নেওয়াই লাগবে। একটা পাতা, ফল, ফুল নিতে গেলে একটা গাছের থেকে তা' নিতে হবে। আবার, সে-গাছটা যদি বিশেষ কোন মানুষের হয়, তার কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া লাগবে। পারস্পরিক পূরণ, পোষণ, রক্ষণের দিকে নজর রেখে দান-প্রতিগ্রহ যদি চলে, তাতে ভাল বই খারাপ হয় না। কারও মর্যাদা সেখানে কম নয়। তাই তেমনতর আদান-প্রদান থাকলে, তার ফলে অপরের বেচাল চলন সমর্থন করার প্রশ্নই আসে না। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন বিবেকী লোকেরা কখনও স্বার্থের খাতিরে দুর্নীতিকে সমর্থন করে না। সমীচীনভাবে তারা অসৎ-নিরোধ করেই কি করে। অসৎ-নিরোধী পরাক্রম না-থাকাটা দুর্বল ব্যক্তিত্বেরই লক্ষণ। সৌজন্য ও কাপুরুষতা এক জিনিস নয়।

শরৎদা—ঈশ্বরের ভয় থাকা ভাল, কিন্তু মানুষকে ভয় করা কি ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঈশ্বরকে ভয় করা থেকে ভালবাসা ভাল। তবে অমঙ্গল সম্বন্ধে ভয় থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ঈশ্বরকে ভালবাসলে তাঁর নীতি মানুষ এমনতরভাবে অবমাননা করতে চায় না, যাতে কিনা তার অমঙ্গল ঘটে। তবে ভয় থেকে প্রবল কারও কাছে নতি স্বীকার করার চাইতে তাকে যদি বরং নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাহলেই যুগপৎ আত্মপ্রসাদ লাভ হয় ও ব্যক্তিত্ব বাড়ে। ব্যক্তিত্ববান মানুষ সব সময়ই দেখে কিসে তার নিজের এবং অপরের সাত্বত মঙ্গল হয়। সে যখন কারও কোন অসৎ-প্রবৃত্তি নিরোধ করে, তাও এমনভাবে করতে চেষ্টা করে, যাতে মানুষটাকে হারাতে না হয়। মানুষের প্রবৃত্তির সঙ্গে আমাদের বিরোধ থাকলেও, কারও সাত্বত স্বার্থের সঙ্গে আমাদের কিন্তু বিরোধ নেই।

প্যারীদা (নন্দী) আসাম থেকে আগত ডাক্তার ধীরেনদা (ভট্টাচার্য্য) সম্পর্কে বললেন—ভদ্রলোক বড় ভাল, আমি আলাপ ক'রে বড় খুশী হয়েছি, ওর যেন একটা চাওয়া ছিল।

শরৎদা—আমি তো দেখি, যাদের গরজ থাকে, তারা আসেই—তাদের একটা খোঁজ থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অগরজেদেরও গরজে করে তুলতে হবে যাজনের ভিতর-দিয়ে। তাদের বাদ দিলে তো হবে না। যাজনমুখর হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। অবশ্য, তার সঙ্গে যজন চাই। যজনশীল যাজন যত বাড়ে, ততই অধিকতর সংখ্যক লোক ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হয়। আপনাদের তো ধর্ম্ম, কৃষ্টি, পিতৃপুরুষ, স্ববৈশিষ্ট্য ইত্যাদি জীবনীয় কোন-কিছুই ছাড়ান নেই—ধরানই আছে। তাই দীক্ষিতের সংখ্যা বাড়ানর পক্ষে আপনাদের কোনই অসুবিধে নেই, এতে তাদেরও ভাল, আপনাদেরও ভাল। মানুষকে ইষ্টে যুক্ত ক'রে তোলা ছাড়া তাদের, সমাজের ও দেশের কল্যাণের আর পথ নেই। দীক্ষিতের সংখ্যা বাড়ানও যেমন লাগবে, তেমনি তাদের পিছনে লেগে থেকে ইষ্টানুগ চলনে অভ্যস্ত ক'রে তুলতে হবে। এটা একটা পরম পুণ্য কর্ম্ম। ঈশ্বরকোটি তো খুব কম, জীবকোটিই বেশী, কিন্তু তাদের এ পথে আনা লাগবে। গরজে যারা অর্থাৎ ঈশ্বরের জন্য যাদের অন্তরে ক্ষুধা আছে, তারাই পারে জনসাধারণের রাখাল হ'তে। কারণ, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান অর্থাৎ ইষ্টপ্রীত্যর্থে পরিবেশের মঙ্গল-সাধনের সংস্কার নিয়েই তারা জন্মগ্রহণ করে। এরাই হ'লো প্রকৃত কর্ম্মী, এদের মধ্যে ধর্ম্ম জীবন্ত থাকে। তাই এদের মাধ্যমে মানুষ সহজেই ইষ্ট, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির প্রতি আকৃষ্ট হয়। কোন লোভের বশে যারা এ পথে আসে, তাদের নিজেদের ভিতরেও রং ধরে না—তাই তারা সাচ্চা ইষ্টানুরাগ সঞ্চারিত করতে পারে কমই। তারা নিজেরা যেমন লোভের বশবর্ত্তী হ'য়ে ইষ্টকে ধরে, অন্যকেও তেমনি প্রলুব্ধ ক'রে ইষ্টের পথে আনতে চায়। তাতে তারা নিজেরা এবং তাদের যাজিত যারা, তারা ধর্ম্মের রসাস্বাদন থেকে অল্পবিস্তর বঞ্চিত হয়। এইভাবে দীক্ষিত যারা, তারা যদি প্রকৃত ইষ্টপ্রাণ লোকের সংস্পর্শে আসে তাহ'লে অনেকখানি উপকৃত হ'তে পারে। যাইহোক, দীক্ষা নেওয়ায় একটা উপকার হয়ই। কিন্তু post initiation nurture (দীক্ষোত্তর যাজন) চাই-ই কি চাই। আর, মানুষগুলিকে দীক্ষার অব্যবহিত পরেই এখানে নিয়ে আসতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমার কিন্তু সুখ্যাতি করতে প্রলোভন হয়। অনেক সময় সামনেও ক'রে ফেলি, তাতে আপনাদের আত্মপ্রসাদ হয় সে ভাল, কিন্তু অহঙ্কার যেন না হয়। ইচ্ছা হ'লেও আপনাদের সুখ্যাতি করতে পারব না,—অহঙ্কার আসবে—এই আশঙ্কায়,—তা' কি ভাল? আবার, কটু কথা কই, প্রহার করি, গালিগালাজ করি, তাতে আপনারা ব্যথা পেতে পারেন, কিন্তু সে ব্যথা যেন আপনাদের আত্মসংশোধনে ব্রতী ক'রে তোলে। তাতে দুঃখিত, অভিমানক্ষুব্ধ বা হতাশ হ'য়ে যেন

আপনারা আত্মবিনায়নী প্রয়াস থেকে বিরত না হ'ন। এইটে মনে রাখবেন যে, আমি যাই করি, তা' আপনাদের ভালর জন্যই করি—তা' আপনাদের আপাততঃ ভাল লাগুক বা না-ই লাগুক। আপনাদের সঙ্গে আমার ইচ্ছামত ব্যবহার করার সুযোগ যদি আমাকে না দেন, তাহলে আপনারাই কিন্তু বঞ্চিত হবেন। আমার কাছে যারা কেবল তোয়াজ চায়, বুঝতে হবে তারা অভিমানী অর্থাৎ তাদের কাছে, তাদের নিজেদের অহং -এর ওজন—আমি যে মানুষটা, তার ওজনের চাইতে ভারী।

ঋত্বিকদের আত্মপ্রস্তুতি সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—লোকের সর্ব্বতোমুখী সেবার জন্য ঋত্বিকদের স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী আত্মপ্রচেষ্টার ভিতর-দিয়ে ধীরে-ধীরে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হ'য়ে ওঠা লাগে। আমার ইচ্ছা করে যে, আমার প্রত্যেকটি ঋত্বিক যেন এক-একটি walking University (ভ্রাম্যমাণ বিশ্ববিদ্যালয়) হ'য়ে ওঠে।

এই প্রসঙ্গে বললেন—একখানা ভারতীয় ভৈষজ্যতত্ত্ব দেখেছিলাম খুব ভাল—তার একখানা জোগাড় করতে হয়। আর আহার সম্বন্ধে একখানা ঘরোয়া ভাল বই আছে—এই দু'খানা বই নিজেদের কাছে কিনে রাখতে হয় এবং মাঝে মাঝে সেগুলি প'ড়ে আয়ত্ত ক'রে বাস্তব লোকসেবায় লাগাতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভোগের পর বড়াল-বাংলোর মধ্যে নিজ ঘরে শুভ্র শয্যায় উপবিষ্ট। মায়েরা অনেকেই উপস্থিত আছেন। টুকটাক কথাবার্ত্তা হচ্ছে।

কালিষষ্ঠীমা জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি রোজ গাড়ী দেখতে যান কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনে হয় এইসব গাড়ীতে কত লোক আসে, কত লোক যায়, আমিও এসেছি—আমিও যাব।

কালিষষ্ঠীমা—আপনি ও কথা ভাবতে যান কেন ? ও কথা ভাবার আপনার কী হয়েছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর কথার কোন জবাব না দিয়ে কালিষষ্ঠীমার মুখের দিকে চেয়ে নীরবে রহস্য মধুর ভঙ্গীতে হাসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট। ননীদা (চক্রবর্ত্তী), কিরণদা (মুখার্জ্জী), রমেশদা (চক্রবর্ত্তী), সুধীরদা (বসু), মণিভাই (সেন), নগেনভাই (দে), প্রবোধদা (মিত্র), ব্যোমকেশদা (ঘোষ) প্রভৃতি এবং আশ্রমের মায়েদের মধ্যে অনেকে তাঁর শ্রীচরণতলে উপনীত।

প্রতিলোম বিবাহ সম্পর্কে কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর দুঃখ ক'রে বললেন—এতে সন্তানের structure (কাঠামো)-টাই বিপর্য্যস্ত হ'য়ে যায়। তার প্রকৃতি সংশোধন করাই প্রায় অসম্ভব হ'য়ে ওঠে।

কিরণদা—ভগবানের রাজত্বে এতখানি hopeless (আশাশূন্য) ব্যাপার কি ঘটতে পারে—যার প্রতিকার সম্ভব হয় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর রাজ্যে তো hopeless (নৈরাশ্যজনক) কিছু নেই। কিন্তু যখন আমরা তাঁর বিধানকে অমান্য ক'রে চলি, তখনই যত গোলমালের সৃষ্টি হয়। ভগবানের আর এক নাম বিধি।

কিরণদা—মানুষের ভুলভ্রান্তি তো আছে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাকে বলে বিসমিল্লায় গলদ, তেমনতর ব্যাপার যদি ঘ'টে যায়, তখন তার প্রতিকার করবে কি ক'রে? সংশোধিত হওয়ার জন্য জৈবী-সংস্থিতির ভিতর যে উপাদানটি থাকা দরকার, তাই যদি গোড়া থেকে বিকৃতিদুষ্ট হ'য়ে থাকে অর্থাৎ গলদটা যেখানে ভ্রূণের মধ্যে সংঘটিত হয় তখন সেই ভ্রূণের পূর্ণতাপ্রাপ্ত রূপ হিসাবে যে জাতকের জন্ম হয়, তখন তাকে post-natal nurture (জন্মের পরবর্ত্তীকালীন পোষণ) যা'ই দেওয়া যাক না কেন, তাতে মাতৃগর্ভে আসা ও থাকাকালে যে বৈধানিক বিপর্য্যয় ঘটে গেছে, তার প্রতিকার করবে কি ক'রে? তবে ঐ সব জাতকদের মধ্যে যারা মেয়ে তাদের যদি অনুলোমক্রমে খুব উঁচু ঘরে বিয়ে দেওয়া যায়, এবং স্বামীর প্রতি ভাগ্যক্রমে তারা যদি খুব সশ্রদ্ধ হ'য়ে ওঠে এবং এইরকমটা কয়েক পুরুষ ধ'রে যদি চালানো যায়, তাহ'লে হয়ত কিছুটা সুফল ফলতে পারে। আর, ঐ রকম ছেলে যারা তাদের বংশ-বৃদ্ধি না হওয়াই শ্রেয়।

৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, বৃহস্পতিবার (ইং ১৯।৫।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। যতিরা সব উপস্থিত আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—কাল রাত্রে খাওয়ার পর যে লেখাটা দিয়েছিলাম (রাত সাড়ে এগারটার পর বাণীটি প্রদত্ত হয়) সেটা প'ড়ে শোনাবি নাকি?

বাণীটি প'ড়ে শোনান হ'ল।

সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আত্মশুদ্ধির অদম্য আগ্রহ থেকেই নিজের দোষ ধরার প্রবৃত্তি আসে।

শরৎদা বললেন—নিজের অজানিতে অনেক সময় আমরা নিজেদের দোষ সমর্থন ক'রে বসি। নাম-ধ্যান যতই করা যাক না কেন, কিছুতেই যেন এই অভ্যাস যেতে চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত উপাসনা করি, তপস্যা করি, কসরত করি আর যাই করি—মূল জিনিষ ঐ প্রেম, আনতি, অনুরাগ। তা' না হ'লে কিছুই করার জো নেই। আর, তা' থাকলে, স্বতঃই দাম্ভিক আত্মসমর্থনের প্রবৃত্তি লোপ পায়।

ননীদা—প্রেম কি কাউকে দেওয়া যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রেম আমাদের ভিতর দেওয়া আছেই। সেইটে ইষ্টের দিকে মোড় ফিরিয়ে সার্থক ক'রে তোলা যায়। আমরা এইটে যখন করতে পারি, তখন আসক্তির শক্তি মুক্তির সাথীয়া হ'য়ে দাঁড়ায়। তখন প্রবৃত্তি আমাদের আর বেঁধে রাখতে পারে না। চৈতন্যদেব অমুককে প্রেম দিলেন—তার মানে, তাঁর সংস্পর্শে তার অন্তর্নিহিত

প্রেম-প্রবৃত্তি জাগ্রত ও জীবন্ত হ'য়ে উঠল। প্রেম যখন জাগে, তখন ইষ্টকে প্রীত করার প্রচেষ্টা সলীল হ'য়ে ওঠে। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা, তারে বলি কাম, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা, ধরে প্রেম নাম।" এইটুকুই হ'লো জীবনের করণীয়।

উপভোগ সম্বন্ধে কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যাদের self-control (আত্ম-সংযম) আছে তারাই ঠিকঠিক উপভোগ করতে পারে। যারা প্রবৃত্তির বশীভূত হ'য়ে বৃত্তিস্বারূপ্যের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে, তারা কখনও সে সুখ জানে না। বৃত্তির ঊর্দ্ধে না থাকলে বৃত্তিকে উপভোগ করার সামর্থ্য গজায় না।

দাম্পত্য প্রণয় সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—স্ত্রীর কাজ হ'লো স্বামীর পোষণ। আর স্বামীর কাজ হ'লো স্ত্রীর পরিপূরণ। স্ত্রী যদি স্বামীর মনোবৃত্ত্যনুসারিনী ও পোষণদায়িনী হয়, তাহ'লে সে স্বামীর প্রত্যেকটা Gene (জীন)-কে এমনভাবে পুষ্টি যোগায় যে, সন্তান বিহিত সম্ভাব্যতা নিয়ে জন্ম-লাভ করতে পারে। নচেৎ যতই সুন্দরী, কায়দাদুরস্ত মেয়ে বিয়ে করা যাক না কেন, সে যদি উচ্ছৃঙ্খলভাবে নিজের খেয়ালমত চলে, তার যদি সেবাবুদ্ধি ও পোষণদানের প্রবৃত্তি না থাকে, সেখানে পুরুষের জীবনে আর কিছু থাকে না। সে বলতেও পারে না, সইতেও পারে না, ফেলতেও পারে না, ছাড়তেও পারে না, গিলতেও পারে না। তার পাছায় এক কর্ক চাপা, মুখে এক কর্ক চাপা—বলারও জো নেই, ভিতরের কষ্ট নিঃসরণ ক'রে দেওয়ারও জো নেই। মুখ আটকে মাটির তলে পুঁতে ছাগল মারার সময় সেই ছাগলের যে অবস্থা, ঐ পুরুষেরও সেই অবস্থা হ'য়ে দাঁড়ায়। আবার, স্বামীরও যদি স্ত্রীর প্রতি একটা স্নেহল মমতা ও পরিপূরণী প্রয়াস না থাকে, তাহ'লে স্ত্রীরও তার মতো ক'রে ঐ ধরনের দম-আটকা অবস্থার সৃষ্টি হয়। তবে স্ত্রী যখন সন্তান-সন্ততির মা হয়, তখন তাদের নিয়ে কিছুটা ভুলে থাকতে পারে, অবশ্য, স্বামী যদি নিতান্ত বদ-খেয়ালী ও অত্যাচারী না হয়। মোটপর দাম্পত্য-জীবন যেখানে সুখের নয় সেখানে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কষ্ট পায় এবং ছেলেমেয়েরও উপযুক্তভাবে গ'ড়ে ওঠা কঠিন ব্যাপার হ'য়ে ওঠে। সংসারে যতরকম সমস্যাই থাক, দাম্পত্য-জীবনে অবনিবনা মানুষকে যত বেশী ঘায়েল করে, অন্য কোন সমস্যা তাদের ততটা বিধ্বস্ত করতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর নিম্নলিখিত দুখানি চিঠির বয়ান ব'লে গেলেন ও প্রফুল্ল তা' লিখে নিল—

খুকী!

তোমার চিঠি পেলাম। উত্তর দিতে দেরী হ'লো। আমি প্রায়ই সুস্থ থাকি না, সুস্থ না থাকলেও পারিপার্শ্বিক নিয়ে ব্যস্ত থাকা ছাড়া পথ নেই।

তোমার অসুখের কথা শুনে দুঃখিত হ'লাম, সুস্থ হয়েছ কিনা খবর পাইনি।

পাগলু এসে পাঞ্জাবে ফিরে গেছে। পাগলুর যে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছে, তাদের বংশ ভাল ব'লে শুনেছি। যা' শুনেছি তাতে ভালই হবে আশা করা যায়।

তারা বোধহয় শ্রোত্রীয়। শোত্রীয়ের মেয়ে নেওয়াই ভাল। তা'ছাড়া মেয়ের স্বভাব ও চেহারা-টেহারাও ভাল শ্নলাম। বিয়ের খরচপত্র তারাই দেবে, না আমাদের করতে হবে, তা' জানতে পারিনি।

এখন অর্চ্চনার বিয়ে হ'লে পরে খানিকটা দম নেওয়া যায় হয়তো।

আজ দিনতিনেক হ'লো আমার শরীরটা খানিকটা ভাল প্র্বের চাইতে—যদিও স্থবিরতা ও শারীরিক অস্থৈর্য্য আছেই।

বাদল তার সকলকে নিয়ে ভালই আছে।

তুমি ওদের নিয়ে কেমন আছ? খেপ্ন কেমন আছে? কেষ্টদারাই বা কেমন আছে?

প্রার্থনা করি পরমপিতার কাছে—তোমরা স্নস্থ স্নদীর্ঘজীবী হ'য়ে স্নখে জীবনকে উপভোগ ক'র—সৎসম্বর্দ্ধনায়।

আমার আন্তরিক 'রাম্বা' জেনো। ইতি

তোমারই
দীন
দাদা।

পরবর্ত্তী চিঠিটি শ্রীজগজ্জ্যোতি সেনকে লেখেন।

জগজ্জ্যোতি।

তোমার চিঠি পেয়ে সুখী হ'লাম। স্ফ্রর্ত্তিতে আমার ব্নক ফ্নল্ল হ'য়ে উঠল—তোমার পদোন্নতিতে।

বাঙ্গোরের জমির কথায়ও অনেকখানি আশা উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলাম।

প্রার্থনা করি পরমপিতার কাছে—দক্ষ স্নকৌশলে যে সময়ে যেমন যা' করার প্রয়োজন তা' করার ভিতর-দিয়ে—তোমার কৃতিত্বের উপঢৌকন আমাকে অবিলম্বেই কৃতার্থ ক'রে তুল্নক। অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠার সাথে তপঃ প্রব্নত্তিকে আবেগশীল ক'রে, নাম ও ধ্যানে সক্রিয় হ'য়ে, নিজেকে সবসময় মনে ও চরিত্র-চলনে উদ্দীপ্ত ক'রে রাখতে ভ্নলো না।

মান্নষ কী চায় তা' জানে না। কিন্তু ঐ অন্নরাগ-উদ্দীপ্ত তপঃ প্রব্নত্তি তার সব চাওয়াকে সার্থক ক'রে তুলতে পারে।

নিজ অন্তরকে নিরখ-পরখ করতে ভুলো না। মন ও প্রব্নত্তিকে বিশ্লেষণ ক'রে, অন্নসন্ধান ও অন্নধাবনে তার গোড়া খ্নঁজে বের ক'রে, তাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে—যাতে লহমায় তোমার চরিত্র-চলনা অমর আলোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে।

প্রার্থনা করি পরমপিতার কাছে—অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ হও, কৃতী হও, কৃতার্থ হও; স্নস্থ থেকে স্নদীর্ঘজীবন লাভ ক'রে, কেন্দ্রায়িত সর্ব্বসম্বর্দ্ধনায় তাঁর আশীর্ব্বাদকে উপভোগ ক'র—অন্তরে-বাহিরে, সর্বদিক দিয়ে, সর্ব্বতোভাবে।

আমার আন্তরিক রাধাস্বামী জেনো। ইতি

তোমারই দীন
"আমি"

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর সামনের বারান্দায় উত্তরাস্য হয়ে তক্তপোষে শুভ্র শয্যায় উপবিষ্ট। পূর্বদিকে শ্রীশ্রীবড়মার ঘরের দরজাখানি খোলা। দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মুকুল। শ্রীশ্রীঠাকুর তার দিকে চেয়ে আদর-সোহাগের ভঙ্গীতে হাসছেন। মুকুল মহা পুলকিত। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ দাদু-নাতনির এই অপরূপ প্রীতি বিনিময়ের দৃশ্য উপভোগ করছেন। এমন সময় শরৎদা (হালদার) এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। ধীরে-ধীরে বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা শুরু হলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমাদের চাল, চলন, খাওয়া-দাওয়া, হাগা, মোতা ইত্যাদি থেকে শুরু করে সমাজ-রাষ্ট্র পর্য্যন্ত সবকিছুকে এমনভাবে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা লাগবে, যাতে সেগুলি সত্তাসম্বর্দ্ধনী হয়ে ওঠে, আর, এমনতর চলনকেই বলে ধর্ম্ম। ধর্ম্ম বাদ দিয়ে আমাদের দাঁড়াবার জায়গা নেই। কারণ, ধর্ম্ম আছে বাঁচা-বাড়ার সবখানি জুড়ে। তাই বলে—যতই মাকু ঘোরো-ফেরো চরকী ছাড়া নও।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। যতিবৃন্দ সেখানে উপস্থিত।

কথায় কথায় শরৎদা বললেন—কাল আপনি আর্য্যকৃষ্টি সম্বন্ধে হেনরীর সঙ্গে যখন আলোচনা করছিলেন, তখন লক্ষ্য করলাম আপনার যাজনের ভঙ্গী। হেনরী খুশী মনে আপনার প্রত্যেকটি কথা মেনে নিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Common interest-এর (সমস্বার্থের) বিষয়ে প্রথম বলা লাগে—যাতে স্বাভাবিক স্বীকৃতি আছে মানুষের। তারপর বলতে হয়—তার থেকে কার্য্যকারণ সম্পর্কে প্রসঙ্গতঃ যে সব কথা আসে। আর-একজনের মনে অযথা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়—তেমনতর কথার অবতারণা করতে নেই। যার সঙ্গে কথা বলছি তার মনের জগৎটা, ভাবের জগৎটা, বিশ্বাসের জগৎটা, পছন্দ-অপছন্দের ধারাটা আঁচ করে নিতে হয় এবং সশ্রদ্ধ ও প্রীতিপূর্ণ আগ্রহ অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে কথা বলতে হয়। কোনও মানুষের প্রতি সত্যিকার ভালবাসা থাকলে এমন কথাই মুখ দিয়ে বের হয় যার ভিতর-দিয়ে সে ঐ ভালবাসার স্পর্শ অন্তরে অনুভব করে প্রীত হয়। আপনি যদি কাউকে আপন ব'লে ভাবেন এবং আপনার ব্যবহারে সেও যদি মুগ্ধ হ'য়ে আপনাকে আপনজন ব'লে ভাবতে শুরু করে তাতে কিন্তু তার egoistic resistance ও rigidity (অহংপ্রসূত বাধা ও অনমনীয়তা) শিথিল হয়ে আসে। তখন তার ভিতরে একটা receptive mood-এর (গ্রহণোন্মুখ মনোভাবের) সৃষ্টি হয়। এই হৃদ্য পরিবেশ সৃষ্টিই প্রথম কাজ।

যতীনদা (দাস) কোনও একজনের সম্পর্কে বললেন—তার প্রণাম করা সম্বন্ধে আপত্তি আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রণাম করা শুধু একটা বাহ্যিক অনুষ্ঠান নয়, ওটা আসে অন্তরের শ্রদ্ধানতি থেকে। কাউকে এ সম্বন্ধে জোরজবরদস্তি করা ঠিক নয়। তবে প্রণাম করতে-করতে যে অন্তরে শ্রদ্ধা-ভক্তির জাগরণ হয় সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

যতীনদা—কোন বাইরের লোক যদি যতি-জীবনের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে জানতে চায় তবে আমাদের কী বলা উচিত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বলতে হয়,—আমরা চাই পরিবেশকে নিয়ে বাঁচতে-বাড়তে আর আমাদের অহংকে ভূমায়িত ক'রে তুলতে, যাতে আমাদের পারিপার্শ্বিক যা'-কিছুকে আমাদের নিজ সত্তার মতো বোধ করতে ও ভালবাসতে পারি। এটা সম্ভব হয়, যখন প্রেম-বিগ্রহ ইষ্টকে কায়মনোবাক্যে ভালবাসতে ও অনুসরণ করতে শিখি। যতি কথার মানে, যে এমনতর জীবনচর্য্যা আয়ত্ত করতে সর্বদা প্রযত্নশীল।

পূর্ব্ব-প্রসঙ্গের সূত্র ধ'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নিজের education-এর (শিক্ষার) জন্য শিক্ষকের কাছে গিয়ে practically (বাস্তবে) realise (উপলব্ধি) করা লাগে, achieve (লাভ) করা লাগে। যা' বলতে চাই, চারাতে চাই তার basis (মূল)-টা যদি practically (বাস্তবে) attain (আয়ত্ত) না করি, তবে তা কার্য্যকরী হয় না। Science (বিজ্ঞান) পড়তে গেলে practical laboratory experiment (গবেষণাগারে বাস্তব পরীক্ষা)-গুলি করা লাগে—scientist-এর (বৈজ্ঞানিকের) সঙ্গে থেকে। আপনারাও এখানে তেমনি আপনাদের ইষ্টের আওতায় থেকে কতকিছু করছেন, শিখছেন, জানছেন। এইভাবে নিরন্তর অনুশীলনের মধ্যে না থাকলে চরিত্র সুগঠিত হয় না। আমি চাই যে, আপনাদের প্রতি মুহূর্ত্তের চারিত্রিক চলন আমার ভাবধারাকে বাস্তবে ঘোষণা করুক। তাহলেই আপনাদের যতি হওয়া সার্থক।

সৎসঙ্গ-আন্দোলন সম্পর্কে কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—আপনাদের একটা সুবিধা আছে। আপনারা naked fact (নগ্ন তথ্য) নিয়ে deal (কারবার) করেন, super-imposed (উপর থেকে চাপান) কিছু নেই আপনাদের মধ্যে। এখন আপনাদের চরিত্রটা যদি জ্বলন্ত হয়—দেখবেন কি মজা লাগে ! কেমন জমাট বাঁধে !—ব'লেই শ্রীশ্রীঠাকুর খুশীতে উচ্ছল হয়ে নিজ হাতে হাঁটুর উপর চাপড় মেরে উপস্থিত সবার দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখলেন। লহমায় সবার মনে এক অপূর্ব্বপ্রেরণা-প্রবাহ সঞ্চারিত হ'য়ে গেল।

শরৎদা মহাভারতের সমাজ থেকে প'ড়ে শোনালেন যে, পূর্ব্বে ঊর্দ্ধরেতা হ'য়ে পুরুষরা কখনও-কখনও সস্ত্রীক বানপ্রস্থ আশ্রমে যেতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই কথা শুনে বললেন—ঊর্দ্ধরেতা হওয়া মানে—ঊর্দ্ধ অনুরাগ সম্পন্ন হওয়া। মানুষ যত সক্রিয়ভাবে ইষ্টগতচিত্ত হয় ততই তার জীবনে প্রবৃত্তির উপর আধিপত্য সহজ হ'য়ে ওঠে।

পাবনা আশ্রম সম্পর্কে প্রসঙ্গ ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর ভাববিভোর কণ্ঠে বললেন—হিমায়েতপুর সৎসঙ্গ আশ্রমকে পুণ্যক্ষেত্র ব'লে মনে হয়। ঐ জঙ্গলে ব'সে যে-জিনিস গজিয়ে উঠেছিল তার মূল্য আমি নিজেও তখন ভাল ক'রে বুঝতে পারিনি। কিন্তু যে-জিনিস ওখানে ব'সে পেলাম, তা' থেকেই তো সব। কতবার কতভাবে ক'লাম, তবু

শেষ হলো না, আর, শেষ হবেও না, কোনদিন—যদিও বলি আমি একই কথা যা' আমি নিজের জীবন দিয়ে পেয়েছি। এ যে অফুরন্ত, তাই তো বলে অমৃত। কত নাম, কত ধ্যান, কত তপ ওখানে হয়েছে—ওখান থেকেই সব evolve করেছে (গজিয়েছে)। যে-মাটিতে এই সব হয়েছে সে মাটি সামান্য নয়, তা পৃথিবীর মহাতীর্থ।

শরৎদা—আপনার জীবনে growth (বিকাশ বা বর্দ্ধনা) ব'লে তো কিছু দেখি না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—Growth (বৃদ্ধি) ব'লে বুঝি না কিন্তু জিনিসগুলি যে দিতে পারছি আপনাদের, সেই আমার মস্ত লাভ। এই দেখছি যে, জিনিসগুলি মানুষের কাজে লাগে, সর্ব্ববিষয়ক তপস্যালব্ধ সত্যের সঙ্গে মেলে। বলছি কিন্তু আমি একই কথা, Science (বিজ্ঞান)-ই ক'ই আর যাই ক'ই—তা, ক'ই আমার অভিজ্ঞতাগত জীবন-সত্য থেকে—অবশ্য স্থান, কাল ও পাত্রানুযায়ী যেখানে যেমন ক'রে যা' বলতে হয়।

শরৎদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমরা প্রবৃত্তিকে ভালবাসি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকৃতপক্ষে ভালবাসেন না, কারণ, অন্যের প্রবৃত্তি অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি যদি আপনার উপর applied (প্রযুক্ত) হয়, তাহলে তা' কি পছন্দ করেন? ওগুলি যে চান না, ভাল যে বাসেন না, ওতেই বোঝা যায়। কিন্তু আমাদের যে-জিনিস অর্থাৎ জীবনবৃদ্ধিদ আচরণ বা ধর্ম্ম, তা' আপনার উপর applied (প্রযুক্ত) হ'লেও ভাল লাগবে, অন্যের উপর applied (প্রযুক্ত) হ'লেও তার ভাল লাগবে। তাতে বোঝা যায় যে এটা প্রত্যেকের সত্তার চাহিদা।

৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, শুক্রবার (ইং ২০।৫।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। আশপাশের গাছে নানারকম পাখী ব'সে ডাকছে। শ্রীশ্রীঠাকুর উৎকর্ণ হয়ে সেগুলি শুনছেন।

শুনতে শুনতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন – আমার মনে হয়, পাখীগুলি যে ডাকে তার মানে ওর ভিতর-দিয়ে ওরা কথা কয়, ভিতরের সুখঃ-দুঃখের ভাব প্রকাশ করে। প্রত্যেকেই সমব্যথী চায়, দরদ চায়, সোহাগ চায়। ওদেরও সমাজ আছে, সংসার আছে, ভালবাসা আছে, বিদ্বেষ আছে। ওরাও আমাদের মত জীব, সত্তাপ্রীতি কারও কম নয়।

যতিবৃন্দ আগ্রহভরে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনছেন। এরপর সুপ্রজনন সম্পর্কে কথা উঠল।

শরৎদা জিজ্ঞাসা করলেন—পুরুষ যদি উচ্চতর ভাবভূমিতে অবস্থান করে এবং স্ত্রী যদি তার উপর সশ্রদ্ধ থাকে, সে-ক্ষেত্রে উপগতির সময় স্ত্রী যদি পুরুষকে উদ্বুদ্ধ না করে, তাহলে কি পুরুষের গুণ সন্তানে সংক্রামিত হবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্ত্রী স্বামীতে সশ্রদ্ধ ও অনুরাগী হ'লে, তা' হওয়ার বাধা নেই। কারণ, পুরুষই সত্তা পরিগ্রহ করে স্ত্রীতে। তবে স্ত্রী যদি সেবার ভিতর-দিয়ে পুরুষকে উদ্দীপ্ত ক'রে তাতে আনত করায়, তার ফলে সেই বীজকে পোষণ দেওয়ার মতো

উপকরণ স্ত্রীর মধ্যে সক্রিয় হ'য়ে ওঠে। নচেৎ, সন্তানের শরীর-মনের সংগতি ঠিক-ঠিক মত হয় না। অনেক সময় বিশিষ্ট লোকের সন্তান ভাল হয় না। কারণ, স্ত্রী পুরুষকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। আবার আছে, নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্ত্রীকে খুশী রাখবার জন্য পুরুষ উপগত হল এবং তার ফলে সন্তান হ'ল। এতেও ঠিক ঠিক যা' পাওয়ার তা সন্তান পায় না। পুরুষ ও নারীর উভয়ের শরীর-মনের সম্মতি ও সঙ্গতি না থাকলে, তেমন সময় উপগত না হওয়াই ভাল। অবশ্য, স্ত্রীর চাহিদা-অনুযায়ী মিলিত হ'লে তাতে সাধারণতঃ উভয়ের পক্ষে তা' জীবনীয় হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। একটা কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, পুরুষ যদি স্বভাবতঃই বড় না হয়, তবে তার বড়ত্ব সন্তানে বর্ত্তে না। কোন লোক নাম-কামওয়ালা হলেই যে, সেই খুব বড় হ'ল এমন কোন কথা নয়। অনেকে হীনম্মন্যতা থেকে উচ্চাকাঙ্ক্ষাবশে, আত্মপ্রতিষ্ঠার লোভে সমাজে নেতৃত্বের স্থান দখল করে। তাই দেখে বোঝা যায় না যে তারা স্বভাবতঃ বড়। স্বভাবতঃ বড় কিনা—তা বোঝা যায়, ছোটখাটো ব্যাপারে একজনের conduct (আচরণ) দেখে।

যতীনদার আজ ভোরে ভজনের সময় কতকগুলি উচ্চস্তরের অনুভূতি হয়। ভজন থেকে উঠে তিনি অনুভূতিগুলির বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে রাখেন। এইবার তিনি তা' শ্রীশ্রীঠাকুরকে প'ড়ে শোনালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে বললেন—খুব ভাল। দশ বছরের কাজ একসঙ্গে হয়ে গেছে। "আরতি করে চন্দ্র-তপন, দেব-মানব বন্দে চরণ, আসীন সেই বিশ্বশরণ তাঁরই ভকত-মন্দিরে।"

শ্রীশ্রীঠাকুর এমন ভাবমধুর কণ্ঠে কথাগুলি বললেন যে, তৎক্ষণাৎ যেন উপস্থিত সবার মন এক আনন্দময় ভূমিতে উন্নীত হয়ে উঠল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কাটা-কাটাভাবে নিম্নলিখিত কথাগুলি ভাবস্থ হ'য়ে বলে গেলেন—Light balls (আলোক বর্তুলসব) ছোটে প্রথলে লাল, নীল প্রভৃতি নানা রঙের। চোখ বুজেও সেগুলি দেখা যায়। আবার, চোখ খোলা অবস্থায় দেখা যায় হঠাৎ যেন ছুটে গেল। সাধারণ পুজার ঘন্টা শোনা যায়—ওটা ক্লীং-এর অনুরূপ ব'লে মনে হয়। প্রাথমিক স্তরে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকের মত শোনা যায়। আবার, মনে হয় মৌমাছির ঝাঁক যেন চ'লে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর পাঁচুদা (চক্রবর্ত্তী)-কে বললেন—কানে আঙ্গুল দিয়ে দেখ তো কিছু শোনা যায় কিনা ?

পাঁচুদা কানে আঙ্গুল দিয়ে একটু পরে বললেন—ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শোনা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো ধরেছে, একবার ধরলে আর যেতে চায় না।

শরৎদা—নির্জ্জন বিস্তৃত মাঠের মধ্যে গেলে মনটা যেন উদার ও উদাস হ'য়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভজনের পক্ষে অমন জায়গা ভাল।

শরৎদা—আমরা ছেলেবেলায় একটা ঘর করেছিলাম, সেখানে শিবপুজা করতাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওকেই বলে instinct, that goods and instigates (সহজাত সংস্কার, যা' কিনা চালিত ও উদ্দীপিত করে)।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসন্ন মনে বললেন—যতীনদার বজ্রকপাট খুলে গেছে। কা'র যে কখন কিভাবে ভিতরটা খুলে যায় তার ঠিক নেই, তাই লেগে থাকতে হয়।

কথাপ্রসঙ্গে শরৎদা বললেন—মহাপুরুষদের সকলের জীবনে তো ঠিক-ঠিক বোঝা যায় না যে, তাঁদের মা-বাবার উপর একটা অকাট্য নেশা ছিল। রামকৃষ্ণদেব মাকে ভালবাসতেন কিন্তু মা-ই তাঁর সর্ব্বস্ব ছিলেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, তাঁর মা'র sublimation (ভূমায়িতি) হয়েছিল কালীতে, তাই কালীকে অমন ক'রে ধরতে পেরেছিলেন। আমার তো তাই হতো—কালী, দুর্গা সব-কিছুর concentric point (কেন্দ্রায়িনী বিন্দু) যেন আমার মা। আর মারই sublimation (ভূমায়িতি) যেন তাঁরা।

বঙ্কিমদা (দাস)—চতুর্দ্দিকে পরিবেশের মধ্যে কেমন যেন একটা ঝোঁক হয়েছে, নাম-ধ্যান-সদাচার পরায়ণ হওয়ার দিকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিছু লোকের চিন্তা ও চলন যদি কোন সৎ ব্যাপারে সু-সমন্বিত হয়ে ওঠে, তবে তাদের এই হওয়াটা ঐ জিনিসটাকে enlivened (সঞ্জীবিত) ক'রে তোলে পরিস্থিতির কাছে। যাদের ভিতর শুভ প্রবণতা আছে তারা তখন জিনিসটা ধরে।

শরৎদা—আচ্ছা, পরিবারের লোক বা আত্মীয়স্বজন বুঝি প্রভাবিত হয় কম!

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রদ্ধা থাকলে হয়। ফল কথা, চরিত্র-চলন enchanting (মনোমুগ্ধকর) যত হয়, শ্রদ্ধার্হ যত হয়, ততই মানুষ influenced (প্রভাবিত) হয়। পরিবার-পরিজনের অনেক সময় একটু দেরীতে হয়--due to too much familiarity (অত্যধিক পরিচিতির জন্য)। তাদের মধ্যে হয়, যখন বাইরের লোককে খুব তারিফ করতে দেখে। অবশ্য সর্ব্বত্র এমন নয়।

শরৎদা—রামকৃষ্ণদেব যে ভগবান দর্শনের জন্য ছটফট করতেন, তিনি বাস্তব কোনও মানুষকে খুঁজতেন ব'লে তো মনে হয় না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কি রকম! আমার মা যদি বাস্তব থাকেন, তাহ'লেই তাঁকে universal (বিশ্বজনীন) ক'রে পেতে পারি; কিন্তু concrete (বাস্তব) নেই, তিনি শুধু universal (বিশ্বজনীন) হ'য়ে গেলেন—তাতে আমার আশ মেটে না।

যতীনদা—চৈতন্যদেব তো স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তিনি আবার তাঁকে অমন ব্যাকুল হ'য়ে ডাকতেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি তো ওভাবে ভাবতেন না। তাঁর ছিল অকাট্য টান তাঁর ইষ্টে। তাঁর ইষ্ট আবার দেখিয়ে দিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে। তাই শ্রীকৃষ্ণকে ইষ্টপ্রতীক মনে ক'রে আপ্রাণ নিষ্ঠায় তাঁরই অনুসন্ধান করতেন। সেই ব্যাকুল ঐকান্তিক অনুরাগ ও তপস্যায় যা' হওয়ার তা' হলো, এই তো সোজা কথা।

যতীনদা—তাহ'লে তো সাধারণ মানুষের মতো!

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন ক'রে যা' করলে যা' হয়, তাই তাঁদের জীবনে মূর্ত্ত। তাঁদের থাকে আকুল নেশা—উদগ্র টান। তাঁদের বাঞ্ছিতকে না পেলেই নয়, প্রাণের দায়ে তাঁরা খোঁজেন, চলেন, পান। তাঁরা দেখিয়ে যান কেমন ক'রে তাঁকে পেতে হয়। তাঁরা কোন তত্ত্বে আবিষ্ট হ'য়ে থাকেন না। তাঁদের মত আকুলতা থাকলেই বস্তু লাভ হয়, এইটেই দেখবার ও দেখাবার। কিন্তু মানুষ নিজের মতো ক'রে নানারকম রঙ চড়ায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে এসে বসলেন। কথাপ্রসঙ্গে শরৎদা জিজ্ঞাসা করলেন—সাধন-জগতের অনুভূতির সঙ্গে বিশ্বের সম্পর্ক কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিশ্বকে বাদ দিয়ে বিশ্বনাথ নন, আবার বিশ্বনাথকে বাদ দিয়েও বিশ্ব নয়। বিশ্বনাথকে যখন আমরা পাই তখন আমরা বিশ্বের তাৎপর্য্য, উপযোগিতা ও সার্থকতা কী, তা' বুঝতে পারি। আমি যা'-যা' ক'ই, দেখা জিনিস ক'ই। বিজ্ঞান-টিজ্ঞান যে ক'ই, সে ঐ দেখা। তা' যদি বিজ্ঞান হয় তাহ'লে ভাল, না হ'লেও আমার কোন উপায় নেই। নিজে যা' বোধ ক'রেছি তাই তো বলব। তবে আমি দেখি, যে পরমপিতার দয়ায় যা' আমি অনুভব করেছি তার মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কিছুই বাদ পড়ে না। সাধনার ভিতর-দিয়ে এইটে বোঝা যায় যে, সবকিছুই কার্য্য-কারণ সম্পর্কে নিবন্ধ এবং কোন বিষয়ই মূলের সঙ্গে সম্পর্করহিত বিচ্ছিন্ন কিছু নয়।

শরৎদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—সৎসঙ্গ আন্দোলনের গভীরতা ও ব্যাপকতার তুলনায় অন্যান্য অনেক আন্দোলনের কার্য্যধারা ও ভাবধারা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ, কিন্তু সেই সব আন্দোলনই সৎসঙ্গ আন্দোলনের তুলনায় অনেক বেশী জনপ্রিয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর আবেগের সঙ্গে বললেন—আমার নাম-টাম দিয়ে কাজ নেই। আগে মানুষ তো বাঁচুক। জাতটাকে তুলে দিয়ে যান, কৃষ্টিটাকে জাগিয়ে দেন, কাজ সেরে দেন তো। তারপর যা' হওয়ার হবে। আগে চলেন ঠিক হয়ে, মানুষকে বাঁচান। এ যদি না হয় মানুষের বাহবা নিয়ে আমার কী হবে? আর আপনাদের দীক্ষার ব্যাপার থাকায় অনেকে বিমুখ হয়। মানুষের বৃত্তিতে যদি না বাধে, surrender-এর (আত্মসমর্পণের) ব্যাপার যদি না থাকে, তাহ'লে মানুষ আলগা-আলগা সায় দেয় বেশী। দীক্ষা না দিয়ে মানুষকে integrate (সংহত) করার, unify (ঐক্যবদ্ধ) করার উপায়ও নেই। দীক্ষা না দিয়ে নাম-কাম খুব হ'তে পারত, কিন্তু তাতে জাত বাঁচত না। আমাদের দিয়েই হোক আর যে-সংস্থা দিয়েই হোক এই জীবন-বর্দ্ধনী কৃষ্টিটার প্রতিষ্ঠা হ'লেই হ'ল—আমার হ'ল এই কথা। আমি-ই যে করতে চাই এমন কিছু নয়। তারপর আপনাদের movement (আন্দোলন)-টা revolutionary (বিপ্লবাত্মক), তাতেও সবাই সুবিধা পায় না। যা' হোক, আমাদের আদর্শে, প্রত্যয়ে ও বোধে এমনতর অকাট্য নিষ্ঠা থাকা চাই যাতে বিন্দুমাত্র দ্বন্দ্ব, সংশয় বা ইতস্ততঃ ভাব না থাকে।

শরৎদা—হনুমানের মতো conviction (প্রত্যয়) চাই, নচেৎ হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হনুমান হ'লো—love embodied with conviction (ভক্তি ও প্রত্যয়ের মূর্ত্ত বিগ্রহ)।

শরৎদা—আপনার কি মনে হয় জগৎটা এক হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের এটা যতই অগ্রসর হবে, ততই ওটা হওয়ার দিকে চলা ছাড়া উপায় নেই। যেমন বলেছি—প্রত্যেক প্রদেশ যদি প্রত্যেক প্রদেশের জন্য হয়, প্রত্যেক দেশ যদি প্রত্যেক দেশের জন্য হয়, তাহ'লে ধীরে-ধীরে ঐ জিনিসই তো আসবে।

শরৎদা—যে-কোন সঙ্ঘনেতার প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ ভাব থাকা কি ভাল নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, খুব ভাল। চৈতন্যদেবের ভাবটা নিয়ে চলতে হয়। তিনি যেমন সার্ব্বভৌমের সাত রকম ব্যাখ্যা সশ্রদ্ধভাবে শুনেও পরে আবার আঠারো রকম ব্যাখ্যা করেছিলেন—সবগুলিকে স্বীয় আদর্শে কেন্দ্রায়িত ক'রে তুলে, আমাদেরও তেমন সবার সঙ্গে মিষ্ট, গাম্ভীর্য্য ও সৌজন্যপূর্ণ, সশ্রদ্ধ, সম্বর্দ্ধনী ব্যবহার করতে হয়—সুদৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে, নিষ্ঠায় রফাপ্রবণ না হ'য়ে, নিজ দাঁড়ায় অচ্যুত থেকে—নিষ্ঠায় কেন্দ্রায়িত ক'রে প্রতিপাদ্য যা'-কিছুকে। প্রত্যেক সঙ্ঘের মধ্যে গিয়ে এমন-ভাবে ব্যবহার করতে হয়, যাতে তারা ভাবতে না পারে যে আপনারা তাদের আপনজন নন, আর বাস্তবেও হতে হয় তাই। যে-মহাপুরুষকে কেন্দ্র ক'রে একটা সঙ্ঘ গ'ড়ে উঠেছে, তিনি মহাপূরণকারী হ'লেই জানবেন আপনার প্রাণের পোষক সেখানে আছেই। নিজের মতো ক'রে তাকে কুড়িয়ে নিতে পারলেই সার্থক হবেন।

৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, শনিবার (ইং ২১।৫।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি আশ্রমে ব'সে একটি বাণী দিলেন। সেই বাণীটির তাৎপর্য্য এই যে—কর্ম্মসহযোগিদের বুদ্ধিভেদ না ঘটিয়ে প্রত্যেককে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী চালনা করাই ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।

সেই প্রসঙ্গে প্রফুল্ল বলল—অনেকে মনে করে জোর-জবরদস্তি ক'রে আর-একজনকে নিজের মতে আনাই বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের লক্ষণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মূঢ় ব্যক্তিত্ব এমনতর মূঢ় পন্থা অবলম্বন করে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে নিম্নলিখিত দুটি চিঠির বয়ান ব'লে শেষে নিজে স্বাক্ষর ক'রে দিলেন—

সুশীলদা!

নরেনদার পত্রে এবং লোক মারফৎ আপনার প'ড়ে যেয়ে পা ভাঙ্গার কথা শুনে দুঃখিত হ'লাম। আমি বরাবর আপনাকে বলেছি—'সঙ্কটজনকভাবে রাস্তায় চলবেন না'—কিন্তু যে আশঙ্কা আমি করতাম তাই-ই ঘটল। আমার নিতান্ত দুরদৃষ্ট, নচেৎ এমনতরভাবে প'ড়ে থাকবেন কেন এই অসময়ে? যা' হোক, খুব সাবধানে থাকবেন,

যাতে তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে পারেন এবং কোন defect (খুঁত) না থাকে। বাবলা-ছালের চূর্ণ চারি আনা মধুসহ রোজ একবেলা ক'রে অন্ততঃ তিনদিন খেলে নাকি অল্পকালের মধ্যেই ভাঙ্গা হাড় জোড়া লেগে যায়। খুব fine (মিহি) powder (চূর্ণ) করে নেওয়া লাগে। অন্য যা' ওষুধ-পত্র ব্যবহার করছেন, তার সঙ্গে এইটে চালানো মন্দ নয়—যদি সম্ভব হয়।

এখানকার খবর মোটামুটি ভাল। আমার আন্তরিক 'রা-স্বা' জানবেন।

ইতি
আপনাদেরই
দীন
"আমি"

নরেনদা !

আপনার পত্রে সুশীলদার সংবাদ পেয়ে দুঃখিত হ'লাম। আপনাদের বিশেষ নজর আছে এবং দেখাশোনা করছেন জেনে খানিকটা সোয়াস্তি বোধ করছি।

দেখবেন—সুশীলদার যেন কোন অসুবিধা না হয় এবং তাড়াতাড়ি যেন সেরে ওঠেন। সুশীলদা কখন কেমন থাকেন জানাবেন। বাবলা ছালের চূর্ণ (চার আনা) মধু যোগে অন্ততঃ তিনদিন রোজ একবার ক'রে খেলে নাকি তাড়াতাড়ি ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগে। এ জিনিসটা দিতে পারলে ভালই হয়—যদি বিহিত হয়।

আমি এখন একটু ভাল আছি।

খেপু কেষ্টদা-সহ কেমন আছেন জানাবেন।

সব কাজের মধ্যে তপপ্রাণতাকে নিত্য জাগ্রত ও জীয়ন্ত রাখতে ভুলবেন না—সক্রিয় চলনে।

আমার আন্তরিক "রাধাস্বামী" জানবেন।

ইতি
আপনাদেরই
দীন
"আমি"

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে ইজি-চেয়ারে উপবিষ্ট।

জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে বললেন—বাবা ! আমি আর কত অতলে যাব ? আমাকে জাগিয়ে তোলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বলি জেগে ওঠ—ভগবানকে ভালবাস, তাঁকে ডাক। বৃত্তি ভাল না, সে কেবল কষ্ট দেয়, তার পথে চ'লে লাভ নেই।

৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, রবিবার (ইং ২২।৫।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে ব'সে নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

বৈশিষ্ট্য যেমন বিচিত্র,
দর্শনও তেমনি বৈচিত্র্যবান—
কিন্তু তা' সত্তা সম্বর্ধনী হ'লে
পরস্পর পরস্পরকে সার্থক ক'রে তুলবেই
এক পরিণয়নে ;
আর, সব দর্শন যেখানে
সার্থক হ'য়ে উঠেছে—
প্রজ্ঞা সেখানে।

প্রফুল্ল—দর্শন বলতে কি এখানে দর্শনশাস্ত্র ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাধারণ দেখা থেকে আরম্ভ ক'রে দর্শনশাস্ত্র পর্য্যন্ত সব-কিছু।

প্রফুল্ল—একটা বস্তুকে যদি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, তাহ'লে পৃথক দেখা যেতে পারে, কিন্তু একই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আলাদা দেখাবে কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকটা মানুষই যে বিশিষ্ট, তাই দৃষ্টিকোণ আলাদা হয়ই।

বসন্তদা (দে) এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে বললেন—খুব নাম করতে হয়। Urge-এর (আকূতির) সাথে যদি নাম করা যায়, ডাকাতে কাণ্ড হয়।

শরৎদা—কেমন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নূতন বিয়ে করলে যেমন স্ত্রীর প্রতি নেশা লেগেই থাকে, ঐ রকম আবেগ নিয়ে নাম করলে মানুষ সহজেই ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন হ'য়ে ওঠে।

শরৎদা—মীরাবাই-এর ভাবটা তো অনুরাগের ভাব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ ! ঐ ঠিক।

অনুভূতি-সম্পর্কে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এর কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই, যে যেমন—তার তেমন। তবে ইষ্টমুখী চিন্তা ও চলনের সমন্বয় হ'লে, তার ভিতর-দিয়ে জিনিসটা বাড়ে। যজনসমন্বিত যাজনের সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা আছে, সেজন্য গীতায় আছে—'যান্তি মদযাজিনোঽপি মাম্' (আমার যাজনকারীরা আমাকেই পায়)।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বেড়াতে গিয়ে মাঠে চেয়ারে ব'সে ভক্তদের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমি প্রায় সবার কাছেই বলি—অনুরাগ না হ'লে হবে না। কিন্তু অনেকে সে-কথা বুঝেও বোঝে না। মুখে-মুখে হুঁ হুঁ করে, বাস্তবে অনুরাগ ন্যস্ত করে যেখানে-সেখানে, তাই প্রকৃত উন্নতি লাভ করতে পারে না। অনুরাগ হওয়া চাই তীক্ষ্ম, অচ্যুত, সক্রিয়, কেন্দ্রায়িত ও একনিষ্ঠ—তাতে complex (প্রবৃত্তিগুলি) adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয় এবং তখন মানুষ দুনিয়াটাকেও adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মানুষ জ্ঞান আর ভক্তিকে আলাদা-আলাদা ক'রে ফেলে, কিন্তু ভক্তি না হ'লে জ্ঞানের সম্ভাবনা কোথায়? যেখানে interest (অনুরাগ) নাই, সন্ধিৎসা নাই, অনুসরণ নাই সেখানে কিই বা হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যাবেলায় বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে ব'সে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—বিয়ে যদি অন্য সবদিক দিয়ে ঠিকও হয়, অথচ পুরুষ যদি ইষ্টনিষ্ঠ না হয় এবং স্ত্রীও স্বামী-ভক্তিপরায়ণা না হয়, তবে দাম্পত্য জীবন সেখানে উদ্বর্দ্ধনমুখর হ'য়ে উঠতে পারে না। এতে পুরুষের পূরণপ্রবণতা এবং স্ত্রীর পোষণপরায়ণতা শিথিল হ'তে থাকে। পারস্পরিক সেবাপ্রাণতাও তরতরে থাকে না। উভয়েই উভয়ের কাছে ভার-স্বরূপ হ'য়ে উঠতে থাকে। তাতে দাবিদাওয়া ও বাধ্যবাধকতার ভাব মাথা তোলা দেয়। সন্তান জন্মসূত্রে যে সম্পদ পাওয়ার তা' পায় না এবং ঐ পারিবারিক পরিবেশে তাদের মাতৃভক্তি ও পিতৃভক্তিও পুষ্ট হ'তে পারে কম। এইভাবে পরিবারগুলিও নীচে নেমে যেতে থাকে। সমাজে এই ধরন যদি প্রশ্রয় পায়, তবে দেশের অবনতিও অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে।

কোনও একটি চিঠির সম্পর্কে প্রফুল্ল শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কেউ কোনকিছু যদি লিখতে চায় তবে সে সম্বন্ধে তার পাকা বুঝ থাকা চাই। বুঝ পাকা হ'লে, তা' থেকে আসে প্রত্যয়। মানুষ সুকেন্দ্রিক না হ'লে, তার জানাগুলি একায়িত হ'য়ে ওঠে না, আবার, তা' যদি না হয় তবে হাজার জ্ঞান থাকলেও সেগুলি সুসংবদ্ধ হয় না। ঐ অবস্থায় কিছু লিখলে তা' মানুষের মনে স্থায়ী রেখাপাত করতে পারে কমই। আজকাল অনেকেই লেখে, কিন্তু অল্প-অল্প যা' শুনি তাতে মনে হয়, অনেকেরই বক্তব্য কী তা' যেন তারা নিজেরাই জানে না। মানুষ সত্তা দিয়ে যা' হৃদয়ঙ্গম না করে সে বিষয়ে লিখতে গেলে, সে-লেখা প্রাণবন্ত হয় কমই—তাতে ভাষার চাকচিক্য যতই থাক না কেন। লেখা কেন, আত্মপ্রতিষ্ঠার লোভে মানুষ যা'ই করতে যাক না কেন, তাতেই ভণ্ডুল পাকিয়ে বসে।

৯ই জৈষ্ঠ ১৩৫৬, সোমবার (ইং ২৩।৫।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোল তাঁবুর পাশে ইজি-চেয়ারে উপবিষ্ট। অনেকে কাছে আছেন।

নব দীক্ষিত জনৈক দাদা বললেন—আমি বহু-কিছুই করেছি, অনেক-কিছুই শিখেছি, কিন্তু কোন্‌টা ধরে যে দাঁড়াব রাস্তা পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা রাস্তা ঠিক থাকলে সব রাস্তা ঠিক থাকে। ইষ্টের পথে, ধর্ম্মের পথে নিজেকে বেঁধে রাখতে হয়—অচ্যুত অনুরাগ নিয়ে। ধর্ম্মকে পরিপালন করা চাই দৈনন্দিন কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে। আর, চলনাটা এমন হওয়া চাই, যাতে সবার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। এইটে ঠিক রেখে যা'-কিছু করতে পার।

উক্ত দাদা—আমি মানুষকে আপন করতে যাই, কিন্তু যাদেরই আপন করতে যাই তারাই পর হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনও করার কাম নাই, পরও করার কাম নাই। যিনি আমার আপন তাঁকে নিয়েই যেন ব্যাপৃত থাকতে পারি, আর তাঁর সঙ্গে সম্পর্কটা যেন ঠিক থাকে। আর দেখা লাগে—আমাদের চালচলন, আচার-ব্যবহার যেন এমন হয়, যাতে মানুষ আমাদের শ্রদ্ধা ক'রে সুখী হয়।

উক্ত দাদা—আপনার দয়া চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর –তাঁর দয়া আছেই। আমাদের উন্মুখতা যত বেশী হবে, তাঁর দয়াও তত পাব।

উক্ত দাদা—আশীর্ব্বাদ করুন যেন পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আশীর্ব্বাদ কী ? আমার প্রার্থনা বুক-ভরা। আমি চাই তোমাদের মধ্যে বেঁচে থাকতে ; এই আমার বুক ভরা আশা।

উক্ত দাদা—ভোগবুদ্ধি ত্যাগ করাই তো ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভোগের জিনিস তো সেই ভগবান—ইষ্ট। সেই ভোগের অনুকূল যা' তাই নেওয়া লাগে, পরিপোষক যা' তাতে অনুরক্ত হওয়া লাগে, পরিপন্থী যা' তা' থেকে বিচ্ছিন্ন হ'তে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে যতি-আশ্রমে এসে বসলেন। যতিবৃন্দ উপস্থিত আছেন।

প্রফুল্ল যোগেন ব্যানাজ্জীদার একখানি চিঠি প'ড়ে শোনাল। তাতে তিনি ঋত্বিকতার কাজকর্ম্মের খবর জানিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—লিখতে হয়—'আপনি যে স্বতঃস্বেচ্ছ উন্মাদনায় এমন ক'রে লেগেছেন আপনার প্রাপ্ত জলুস নিয়ে, তাতে শ্রীশ্রীঠাকুর খুব প্রীত হয়েছেন। আপনার প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হোক।'

ননীদা এক ভদ্রলোকের কথা বললেন—তিনি নানারকম কাজ জানেন, পারেন, বেশ চৌকস।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চৌকস মানুষ খুব ভাল, যদি সুনিষ্ঠ হয়, কেন্দ্রায়িত হয়, ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্ন হয়।

একটি দাদার খুব ভাবোচ্ছ্বাস হয়। সে-সম্পর্কে শরৎদা জিজ্ঞাসা করলেন—এটা debilitated nerve-এর (দুর্ব্বল স্নায়ুর) লক্ষণ নয়তো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একদল আছে যারা সব ক্ষেত্রে এগুলিকে debilitated nerve-এর (দুর্ব্বল স্নায়ুর) লক্ষণ ব'লে বলে, এমনকি চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণদেবকেও রেহাই দেয় না। তাহ'লে তো বোধহীন যারা তাদেরই সবচাইতে শক্তিমান বলতে হয়। কিন্তু ভাবের একটা দিক আছে তো ? 'ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।' দুর্ব্বল স্নায়ুর লক্ষণ এই, যে সে নিষ্ঠা বজায় রাখতে পারে না, অচ্যুত থাকে না, concentric (সুকেন্দ্রিক) থাকতে পারে না, continuity (ক্রমাগতি) বজায় রাখতে পারে না, পরিবেশ তাকে এদিকে-ওদিকে টেনে নেয়—এই আমি যা' বুঝি।

শরৎদা—ভজনের সময় ঐভাবে বসে কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মেরুদণ্ডের মধ্যে তরল পদার্থ থাকে। অন্যভাবে বসলে সেটা খানিকটা আটকা থাকে, কিন্তু ঐভাবে বসলে আলগা থাকে—উদ্দীপনাটা গ্রহণ করতে পারে ভাল—আমার এই রকম মনে হয়।

শরৎদা—একজন ধরুন পঁচিশ বছর আপনাকে ধ'রে আপনার কাছে আছে, কিন্তু এর মধ্যে তার চলনায় নানা ব্যত্যয়ও দেখা গেল,—এটাকে কী বলব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে বরাবর লেগে থাকে, সে যেই হোক, আর যাই হোক, আর যাই-ই করুক, সাধারণতঃ তার নিষ্ঠা আছে ব'লে ধরা যায়—অবশ্য কখনও তা' আবেগপরায়ণ, কখনও তা' শিথিল।

শরৎদা—এখানে থেকেও অন্যভাবে চলাটা যদি দেখি, সেখানে কি continuity (ক্রমাগতি) আছে বলা যাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা শিথিল অনুরাগ সূত্রের লক্ষণ, কিন্তু সেটাও continuity (ক্রমাগতি)।

শরৎদা—অনেকদিন আগে নাম নিয়েছে, কিছু করে না, তবে অন্য দীক্ষাও নেয়নি, আপনার কথা শুনলে ভাল লাগে—সে কেমন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-ও ভাল। হয়তো কোন সময় করবে ?

শরৎদা—ছেলের বিয়ের খরচা নেওয়া কি পণ ব'লে গণ্য নয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের ছিল সালঙ্কারাকন্যা দানের প্রথা। বলিবর্দ-টর্দ স্বেচ্ছায় দিত। সদক্ষিণায় মেয়ে দিতে হ'ত। তাই ব'লে বাধ্যবাধকতা, জুলুম, জোরজবরদস্তি ভাল না। যেমন ক্ষমতা তেমনি দেবে। ফলকথা, ছেলের তরফ থেকে চাইবার কিছু নেই। তবে বিয়ের খরচ মেয়েওয়ালার দেওয়া উচিত, কারণ, দান করছে সে, নচেৎ দানের প্রত্যবায় হয়।

পূজনীয় বাদলদা এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে কথায়-কথায় বললেন—পান্তা ভাত কচুলে নুন, লেবুর রস ও কাঁচা লঙ্কা দিয়ে সেই জল রোজ খাওয়া ভাল। ভাতটা রাত্রে ভিজিয়ে রাখতে হবে, কিন্তু হাঁড়িটার মুখ বন্ধ থাকবে না, এমন একটা জাল দিয়ে দিতে হবে মুখে যাতে ধুলোবালি বা পোকামাকড় ভিতরে না যেতে পারে, অথচ বাতাস ঢুকতে পারে হাঁড়ির ভিতরে। পরদিন সকালে ওটা খেতে হয়। আমানিতে বি-ভিটামিন প্রচুর পাওয়া যায়। আর লেবুর রসে ভিটামিন সি থাকে। লেবুর রস দেওয়ার আগে পান্তা ভাতের জলটা যদি টক হ'য়ে যায় তাহ'লে কিন্তু নষ্ট হ'য়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্নান করতে উঠবার আগে অরুণ (জোয়ার্দার) একটা ফটো তুলল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার প্রাক্কালে মাঠে এসে চেয়ারে বসলেন। পূজনীয় বড়দা ছিলেন। স্মরজিৎদা (ঘোষ), চুনীদা (রায়চৌধুরী), শরৎদা (হালদার), স্পেনসারদা, মিসেস

স্পেনসার, হাউজারম্যানদা, আউটারব্রিজ, সরোজিনীমা প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত। চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মনোরম।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি এই জায়গায় বসতে খুব ভালবাসি। এই জায়গায় বসে ক্রাইস্টের কথা মনে হয়। মনে হয়, তিনি এই রকম পাহাড়ের কাছে বসতেন। তাঁকে যারা ভালবাসত তারা তাঁকে ঘিরে বসত—সমবেত হ'ত তাঁর কাছে। চোখের সামনে এইরকম একটা দৃশ্য ভেসে আসে। এক লহমার, সুখস্মৃতি, প্রীতিস্মৃতি বহুদিনের বহু দুঃখ দূর ক'রে দেয়, আর তাতে সহ্য করার শক্তি দেয়।

আকাশে মেঘের সমাবেশের দিকে চেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একটা সিংহের মত আকৃতি দেখাচ্ছে। আউটারব্রিজ artist (শিল্পী), ও এটা enjoy (উপভোগ) করবে।—Artist (শিল্পী)-রা ভগবানকে enjoy (উপভোগ) করে প্রকৃতির ভিতর, দুঃখের ভিতর, সুখের ভিতর, যা'-কিছুর ভিতর। আর, Philosopher (দার্শনিক)-রা সব-কিছুর সার্থকতা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করে।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—স্পেনসারের হাবভাব, চাল-চলন, চাউনি দেখে মনে হয় ও ক্রাইস্টের যুগের লোক। রে-র মধ্যে ক্রাইস্টের প্রতি যে মনোভাব ও ভালবাসা দেখা যায় তা' অত্যন্ত একনিষ্ঠ ও গোঁড়া। ও তাঁর স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেকে cruelly (নিষ্ঠুরভাবে) deny (অস্বীকার) করতে চায়।

স্পেনসারদা—ক্রাইস্ট তাঁর disciple (শিষ্য)-দের দিয়ে তাঁর কাজ করাবার জন্য কী পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁকে জীবন দিয়ে বহন করতে পারে এমনতর ভক্তদের তিনি পাঠিয়েছিলেন পৃথিবীর চারিদিকে, যাদের প্রতি সশ্রদ্ধ হ'য়ে, যাদের ভালবেসে মানুষ তাঁকে ভালবাসতে পারবে এবং এইভাবেই Kingdom of heaven (স্বর্গরাজ্য) established (প্রতিষ্ঠিত) হবে পৃথিবীতে।

স্পেনসারদা—তাদের বিশেষ programme (কর্ম্মসূচী) কী ছিল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসল programme (কর্ম্মসূচী)-ই হ'ল মানুষকে তাঁদের ভালবাসার স্পর্শ দেওয়া—যা' character-এর (চরিত্রের) ভিতর-দিয়ে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে ও মানুষকে প্রিয়পরমের ভাবে আলোকিত ক'রে তোলে। আমরা ক্রাইস্টকে যত ignore (উপেক্ষা) করেছি দৈনন্দিন জীবনে, তাঁর কথাগুলিকে সার্থক ক'রে তুলিনি আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে, তত আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

স্পেনসারদা—মানুষ আস্তে আস্তে ক্রাইস্টের কথা distort (বিকৃত) করেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুটো জিনিস আছে। একটা হ'লো জীবনের ভিতর-দিয়ে ক্রাইস্টকে জীবন্ত ক'রে তোলা। আর একটা আছে ক্রাইস্টের নাম ক'রে, ক্রাইস্টকে ভাঙ্গিয়ে, at the cost of christ (ক্রাইস্টের বিনিময়ে) complex (প্রবৃত্তি)-কে fulfil (পরিপূরণ) করা।

স্পেনসারদা—মানুষের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তো সবসময় সে ঠিক পথে চলতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে-ইচ্ছাটা খুব তাজা নয়। আমি কই—যদি ভালই বাস, ভালবাসতে ইচ্ছাই করে, তবে ভালবাসায় মাতাল হও, ভালবাসার মদ খাও প্রাণভরে, যাতে তোমার স্পর্শ আর সবাইকেও মাতাল ক'রে তোলে।

হাউজারম্যানদা—সবাই কি পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে করে সে পারে। আমি বলি—ভালবাস, ভালবেসে যাও, দিয়ে যাও, ভালবেসে ফতুর হ'য়ে যাও, কিন্তু চেও না প্রতিদানে কিছু, যা' পাবে তাতেই তৃপ্ত থাক, কিছুরই কাঙ্গাল সেজো না, যা' পাও তাতে ভরপুর হ'য়ে ওঠ, flooded (প্লাবিত) হ'য়ে ওঠ, অঢেল হ'য়ে ওঠ। আমি গল্প শুনেছি—ক্রাইস্টের একখানা রুমাল, একখানা ন্যাকড়া যে-ভক্তের কাছে ছিল, সে তাই নিয়ে ক্রাইস্টের ভাবে এমন বিভোর হয়ে থাকত যে কেউ তার সংস্পর্শে আসলে, সে তাকে একেবারে মাতাল ক'রে তুলত। ভালবাসা যার হৃদয় জুড়ে থাকে সে তো রাজাধিরাজ, তার কোন অভাব থাকে না। তার অন্তরের পূর্ণতা অপরকেও আনন্দপূর্ণ ক'রে তোলে। কিন্তু কামনায় কাঙ্গাল হ'লে মানুষ self-centric (আত্মকেন্দ্রিক) হ'য়ে পড়ে। সে কেবল ভাবে—কি পেলাম না, কি সে করল না। সে অবস্থায় প্রিয়কে enjoy (উপভোগ) করতে পারে কমই।

স্পেনসারদা—মানুষের মনটা যখন উচ্চভূমিতে থাকে তখন অনেক কর্ম্মপ্রেরণা তার মধ্যে দেখা দেয়, কিন্তু তার অবসানে তো সে সব থাকে না। পরে ভালবাসার বদলে কামনাই জেগে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনের গতি তরঙ্গের মতো কখনও উপরে ওঠে কখনও নীচে নামে। ঢেউগুলি যদি কূলের দিকে যায়, তাহ'লে ভাবনা নাই। কূলের দিকে মানে কেন্দ্রের দিকে। মন যত তাঁর দিকে ঝুঁকে থাকে, তত তাঁর প্রতি ভালবাসা জীয়ন্ত থাকে। ঢেউ-এর মত ওঠা-নামা আছেই। কবীর বলতেন—'উত্থানেরই পতন আছে কবীর কহে সাধু! ভক্তিটাকে সঙ্গে রাখিস ছাড়িস না তুই কভু।' ভক্তি মানে, কেন্দ্রানুগ আনতি। সব সময় সচেষ্টভাবে ভক্তিটাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে স্পেনসারদাকে বললেন—তুমি কোন নতুন গান শেখনি?

স্পেনসারদা তখন ইংরেজীতে একখানা গান গেয়ে শোনালেন।

গানটার ভাবার্থ এই যে—আমাদের চরিত্রে যখন নানা দোষত্রুটি জমা হয়, তখন সেগুলির নিরসনের জন্য চেষ্টা ক'রে-ক'রে কখনও কখনও ক্লান্তি ও অবসাদ আসে, তারপর একটা wise wind (প্রাজ্ঞ বাতাস) এসে আমাদের সান্ত্বনার বাণী শোনায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে বললেন—ভালবাসার আগ্রহে মানুষের কর্ম্ম ও সেবা ফুটে ওঠে যখন, সে নানাভাবে তাঁকে পূরণ করতে চায় এবং বাস্তবে করেও তেমন, তখনই wise wind (প্রাজ্ঞ বায়ু) অমন ক'রে কানের কাছে গেয়ে যায়। সেই গান, সেই

শব্দ, সেই বাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ হ'লেন তিনি, যিনি চেতনস্মৃতি নিয়ে রক্তমাংস সঙ্কুল নরদেহে আবির্ভূত হ'ন যুগে-যুগে। শব্দই—মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে যা' কিছুতে। মানুষের জীবন্ত মূর্ত্তি ঐ শব্দেরই পরিণতি। যে মানুষের মধ্যে পূর্ব্বাপর সবকিছুর conscious memory (চেতন স্মৃতি) আছে, তিনিই পারেন আমাদের জীবনের পথ দেখাতে।

হাউজারম্যানদা—Conscious memory (চেতন স্মৃতি) থাকা বলতে আপনি কী বলতে চান ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Remembrance of the supreme father (পরমপিতার স্মরণ) যাঁর মধ্যে spontaneous ও incessant (স্বতঃ ও নিরন্তর) হ'য়ে আছে, পরমপিতার স্মৃতি যার মধ্যে যতটুকু জাগরিত থাকে, পরমপিতাও তার মধ্যে ততখানি থাকেন। এটা হ'ল ভক্তির লক্ষণ।

মিসেস স্পেনসার—সেটা কি পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালবাসা সব আগেটাকেই এখন ক'রে তোলে। অকাট্য ভালবাসা থাকলে, প্রিয়ের স্মৃতি তার মধ্যে সর্ব্বদাই জাগ্রত থাকে। পরমপিতাকে যদি মানুষ নিরন্তরতার সঙ্গে স্মরণ-মনন করতে থাকে, তাতে তাঁর স্বভাবই সে পায়। আমাদের এটা চেষ্টা ক'রে করতে হয়, কিন্তু prophet (প্রেরিত)-দের জন্মগত প্রকৃতিই এমনতর।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিছু সময় নীরবে থেকে ভাবমধুর কণ্ঠে বললেন—এই রকম আঁধার জায়গায়—রাস্তাঘাট নেই—পাহাড়ের কাছে কেউ যদি বসে থাকে একলা—মাঝে মাঝে ঝিলিক দিচ্ছে—সে আকুলভাবে প্রিয়ের কথা ভাবছে—এমন সময় প্রিয়ের মুখখানা যদি তাকে চুমু খেয়ে যায়, কেমন লাগে তার ?

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাগুলি এমন গভীর আবেগের সঙ্গে বললেন, যে মনে হচ্ছিল—বাস্তবে আমাদের চোখের সামনে এমন একটি অপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই কথার পর কেউ কোন জবাব দিলেন না, সবাই অন্তরে-অন্তরে এই ভাবটি নিয়ে জাবর কাটতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে যতি-আশ্রমে এসে ব'সে বললেন—প্রেরিত পুরুষদের philosophy (দর্শন) অত্যন্ত practical ও concentric (বাস্তবতাসম্মত ও সুকেন্দ্রিক)। তাঁদের জীবন যদি এইভাবে পরিবেশন করা না হয়, তবে তার ভিতর-দিয়ে ভবিষ্যতে অনেক সর্ব্বনাশের বীজ ঢুকতে পারে সমাজে। জীবনে সার্থক হ'তে গেলে প্রধান জিনিসই হল আদর্শে actively concentric (সক্রিয়ভাবে সুকেন্দ্রিক) হওয়া। তা' বাদ দিয়ে কিছুতেই মানুষ well adjusted (সুনিয়ন্ত্রিত) হ'য়ে চলতে পারে না।

১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণা চতুর্দশী (ইং ২৬। ৫।। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোল তাঁবুর পাশে পশ্চিমাস্য হয়ে একখানি ইজিচেয়ারে

সুখাসীন। অনেকেই কাছে উপস্থিত আছেন। এমন সময় শৈলেশ কুমার চ্যাটার্জ্জী নামক কলকাতার একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক আসলেন। শোনা যায় তিনি অনেক সৎ কাজ করেছেন। বহু মন্দির সংস্কার করিয়েছেন।

তিনি এসে প্রণাম ক'রে বসার পর কথাবার্ত্তা শুরু হ'লো। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে আশ্রমের জন্য উপযুক্ত জমি খুঁজে দিতে বললেন।

তিনিও তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার সুকৃতি আছে, কত সৎ কাজ করেছেন, তাই আপনি পারবেন ব'লে মনে হয়। নাম-কামের আশায় বহু মানুষকে করতে দেখা যায়, কিন্তু সৎ প্রবৃত্তিওয়ালা মানুষ কম দেখা যায়।

শৈলেশবাবু—আমি দেখব, নিশ্চয়ই দেখব। আমার সংসারের কতকগুলি ঝঞ্ঝাট আছে, সেইজন্যই যা' একটু অসুবিধে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুনিয়াই ঝঞ্ঝাটময়। আমরা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যদি তাঁকে পরিপালন করতে পারি, তাহলেই পারা হয়। জীবনটাই ঝঞ্ঝাট অতিক্রম ক'রে বাঁচা।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে এসে বসলেন। যতিবৃন্দ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রথমে বাংলায় একটি বাণী দিলেন, পরে ঐ ভাব অবলম্বনে ইংরেজীতেও একটি বাণী দিলেন।

সুধাংশুদা (মৈত্র) তাঁর এক বন্ধু ও তার ভাইকে সঙ্গে এনে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। দুটি ভাইই খুব শ্রদ্ধাবান।

কথাবার্ত্তা শুরু হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—এখনও একটা মানুষ যদি কৃষ্টির উপর দাঁড়ায়, সে হুঁই দিয়ে আবার সকলকে এককাট্টা ক'রে তুলতে পারে। আমার মনে হয়, নেতারা ঐক্যবদ্ধ না হ'লেও, সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা কঠিন হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশমত প্রফুল্ল বিবাহ ও বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে কয়েকটি বাণী প'ড়ে শোনাল।

উক্ত ভদ্রলোক সেগুলি শুনে সশ্রদ্ধভাবে বললেন—এইটেই আসল জিনিস।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধানের চাষের আগে মানুষ চাষ করা দরকার। কতকগুলি মুরগী জন্মায়ে লাভ কী ? আগে সব সময় বাংলায় মাথার উপর একগুচ্ছ করিৎকর্ম্মা ধীমান মানুষ থাকতই। তাদের নীচেই আর একদল থাকত এবং তারা ঐ প্রবীণরা গত হ'লে পরবর্ত্তীকালে তাদের স্থান অধিকার করত। সাধারণকে চালনা করবার লোকের অভাব হ'ত না। কিন্তু আজ বাংলায় উপযুক্ত লোকের অভাবই বড় বেশী।

পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোক—ব্রাহ্মণ-বিরোধিতা আজ সর্ব্বত্র।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরাও করণীয় করিনি। আগে তো এমনটা ছিল না। আমরা

ব্রাহ্মণের মত চলিনি ব'লেই তো আজ এই অবস্থা। সেদিক থেকে আমাদেরও দেখবার আছে। আমরা করলাম কী দেশের হাওয়া ভাল করবার জন্য? চেষ্টাই তো করিনি। কিছু চেষ্টা করিনি। আবার মানুষগুলিকে সংহত কর এক আদর্শে। কাগজগুলির মারফত নানারকম লেখার ভিতর-দিয়ে নিত্য এই জিনিসগুলি প্রচণ্ড প্রত্যয়দীপী ভঙ্গীতে পরিবেষণ কর। মানুষগুলিকে এমনভাবে মাতিয়ে তোল, নাচিয়ে তোল, পাগল ক'রে তোল, যাতে তারা দেশের কৃষ্টির পুনঃপ্রতিষ্ঠায় প্রাণপণে লেগে যায়। এটা আমাদের রক্তেই আছে। তাই মানুষ এটা ধরবেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু থেমে গভীর অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে ওদের দিকে চেয়ে বললেন—ভাগ্যিস তোমরা এসেছিলে সুধাংশুর সঙ্গে দেখা করতে, তাই তোমাদের কাছে কথাগুলি কওয়া গেল। আর, তোমরা যে এইভাবে ভাবো আজও, তাতে আমি খুব সুখী হ'লাম। এখন গোটাকতক জ্যান্ত মানুষ জোগড় করতে পারলে হয়। মানুষকে সংহত ক'রে তোলা লাগবে। সৎ-সংহতি যত প্রবল হবে আধিপত্যও তত বাড়বে তোমাদের। তাই জ্যান্ত মানুষ চাই। চাঁইরা হয়তো প্রথমে ignore (উপেক্ষা) করবে, তাদের দিয়ে কাম হবে না। তোমাদের অগ্রগতি দেখে পরে তারা বাধ্য হবে yield (নতিস্বীকার) করতে। কথার সাথে চরিত্র চাই, তাকে কয় জ্যান্ত মানুষ। কই এক কথা, চলন অন্যরকম, তাতে চরিত্র জ্যান্ত হয় না। যে ষোলআনা ক'য়ে অন্ততঃ চার আনাও করে এবং পুরোপুরি করার জন্য সচেষ্ট থাকে, সেও টেঁকে কিন্তু।

বর্ণাশ্রমী সমাজ-সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আগে ছিল সামাজিক শাসন। কেউ অন্যায় করলে বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চার সম্প্রদায় অর্থাৎ সমগ্র সমাজ তার শাসন করত। কেউ কাউকে পড়তে দিত না, খারাপ হ'তে দিত না। সব সম্প্রদায় inter-interested (পরস্পর স্বার্থান্বিত) হ'য়ে থাকত। বিপ্ররা ছিল reconciling agent (সামঞ্জস্য বিধায়ক)। তখন ছিল ছোটকে বড় করার বুদ্ধি। তার কারণ তারা জানতো বড় হওয়া মুশকিল, কিন্তু ছোট হওয়া মুশকিল নয়। আর, বড় হওয়ার পথই হ'চ্ছে ধর্ম্ম ও কৃষ্টির প্রতি সুনিষ্ঠ হ'য়ে চলা। প্রবৃত্তির পথে চললে আমরা সহজেই নেমে যেতে পারি। আর, প্রবৃত্তির পথে চলার প্রবণতা মানুষের স্বাভাবিক। তাই মানুষ যাতে অধঃপাতের পথে চলতে না পারে সেজন্য তাদের ধর্ম্ম ও কৃষ্টির পরিপালনে নিরন্তর উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলা হ'তো। সেকালে পণ্যের অভাব ছিল না। নিজেদের দেশের প্রয়োজন মিটিয়ে বিদেশে কত চালান দেওয়া হ'ত। টাকা ছিল আক্রা, জিনিস ছিল সস্তা। মাসে পাঁচ টাকা উপায় ক'রে বাড়িতে দোল-দুর্গোৎসব করত।—আজকাল এত হুজুগ করে, কিন্তু পণপ্রথা লোপ করার চেষ্টা ক'রে না। হোমরা-চোমরারা ভাবে বিভিন্ন বর্ণের বৈশিষ্ট্য লোপ ক'রে দিয়ে সব একাকার করে, অল্প কয়েক দিনের মধ্যে রামরাজত্ব স্থাপন ক'রে ফেলবে। এসব বাতুল বুদ্ধি।

একটু থেমে বললেন—আজকাল অনুলোমের চেয়ে প্রতিলোমের উপর জোর বেশী।

আগে নিয়ম ছিল প্রথমে সবর্ণ বিয়ে ক'রে তারপর অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ করা চলবে। আজকাল বহুবিবাহ নিষিদ্ধ। এখন যদি কাউকে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ করতে হয় তাহলে তাকে সবর্ণ বিবাহ বাদ দিতে হবে। তারমানে, তার বংশের মূল ধারাটা হারাতে হবে, যেটা কিনা সদৃশ ঘরে সবর্ণ বিবাহের ভিতর-দিয়ে বজায় থাকে। অনুলোম বিবাহে নিম্ন বংশ, উচ্চ বংশের আত্মীয়ের সংশ্রবে অনেকখানি উন্নত হ'য়ে ওঠে। কলিতে গুরুর আদর গেছে, কিন্তু জামাইয়ের আদর যায়নি। প্রতিলোম বিয়ে যদি হয়, বামুনের মেয়ে যদি মেথরকে দেয়, তবে ঐ বামুনও ধীরে ধীরে কিছুটা জামাইয়ের রকম ধরতে বাধ্য হয়। আর যে মেয়ে ঐ ঘরে গেল তার তো সেই ঘরের ধাঁচ ধরতেই হবে। উৎকর্ষ না অপকর্ষ—কোনটা আমরা চাই—ভেবে দেখতে হবে তো! ফলকথা, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে আমরা বেহেড হয়ে গেছি, বাওরা হয়ে গেছি। এইসব পাচাল পাড়াই আমার কাজ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ভাবি, এর ভিতর-দিয়ে লোকে যদি সজাগ হয়। তারা যদি নিজেদের চিনতে শেখে। তোমরা চেষ্টা কর —যাতে আবার ভারতকে সোনার ভারত ক'রে তুলতে পার, দেবভূমি ক'রে তুলতে পার। নইলে জগতেরও নিস্তার নেই।

আজ সন্ধ্যেবেলায় স্পেনসারদার স্ত্রী আমেরিকার বোস্টন থেকে আনা একটি শেফার্স কলম আগ্রহের সঙ্গে প্রফুল্লকে উপহার দিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি আশ্রমে এসে বসার পর প্রফুল্ল সেই কলমটি শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতে দিয়ে বলল—মার্গারেট এটা আমাকে দিয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কলম দিয়ে নিজ হাতে লিখে দেখলেন। পরে বললেন—এ কলমের দাম বড় বেশী। আমি মূল্য হিসাবে বলছি না। ভালবাসার দান, কত দূর দেশ থেকে মনে ক'রে নিয়ে এসেছে, তাই এ জিনিস অতি মহার্ঘ্য।

জাতিস্মর-সম্বন্ধে কথা উঠল।

শরৎদা (হালদার) বললেন—জাতিস্মর যা' দেখা যায়, তারা যে খুব উচ্চস্তরের মানুষ, তা' তো মনে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জাতিস্মর হ'তে গেলে যে মহাপুরুষত্ব বা যোগসিদ্ধির দরকার আছে, তা' নয়। ওটা হ'ল একটা attitude of being (সত্তার মনোভাব)—যা' ওইভাবে মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে। এর পিছনে পশ্চাদপসরণী চিন্তা বা এতজ্জাতীয় প্রক্রিয়া থাকতে পারে। ভগবান মনু বলেছেন—বেদাভ্যাস, তপস্যা, মানসিক ও শারীরিক শুচিতা এবং অদ্রোহের অনুশীলন জাতিস্মরতা লাভের সহায়ক।

মৃত্যু-সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মৃত্যুতে মানুষের সবখানি সাবাড় হ'য়ে যায় না। যে-ভাব নিয়ে গত হয়, সেইভাব একটা সূক্ষ্মদেহ অবলম্বন ক'রে টিকে থাকে। এই সূক্ষ্ম শরীরকে আমি বলি—ectoplasmic body, ঐ ভাব আবার স্থূল শরীরের অবলম্বন খোঁজে, যার ভিতর-দিয়ে তা' পুরোপুরি সক্রিয় অভিব্যক্তি লাভ করতে পারে। কোন

দম্পতি যেখানে ঐ ভাবে ভাবিত হ'য়ে মিলিত হয়, তখন tuning-এর (একতানতার) দরুন একটা magnetic pull-এ (চৌম্বক আকর্ষণে) ঐ ভাব সেখানে সন্ততিরূপে দেহায়িত হওয়ার সুযোগ পায়।

যতীনদা (দাস)—আমরা প্রমথদাকে দেখতে পারি না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো কত সময় দেখি, কিন্তু তাতে আমার মন ভরে না। সকলে মিলে দেখা যায় তাহলে তো হয়।

যতীনদা—নামধ্যানের ভিতর-দিয়ে আমাদের সূক্ষ্মবোধশক্তি যখন জাগে, তখন বিগত আত্মাকে দেখা যায় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যায়, তবে witness (সাক্ষী) কে? Scientifically (বৈজ্ঞানিকভাবে) না হওয়া পর্য্যন্ত হ'ল না।

শরৎদা—সাধন-সঞ্চিত শক্তির সাহায্যে তো বহু অসাধ্য সাধন করা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিশোরী করত। ব্যারাম-ট্যারাম সারাত। একজনের রোগ সারিয়ে ওর অণ্ডকোষ ফুলে গেল, ওসব ভাল না। Progress (অগ্রগতি) নষ্ট হ'য়ে যায়।

ননীদা (চক্রবর্ত্তী)—কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পট ক'রে obsessed (অভিভূত) হ'য়ে গেলেই মুশকিল। একদিন দেখলাম, একটা শকুন গরু খাচ্ছে, তখন পরখ করার জন্য ঐ শকুনের মধ্যে ঢুকে গেলাম। আমি যা ভাবি শকুন ঠিক তাই করে। কপ-কপ করে গরু খাওয়ার স্বাদ শকুনের মুখ দিয়ে টের পাচ্ছি। রীতিমত শকুন হয়ে গেছি। তখন হঠাৎ মনে হ'ল—এই অবস্থায় যদি শেষ হয়ে যাই, তাহলে তার পরিণতি তো ভাল না। তাই ওখান থেকে নিজেকে তুলে আনলাম। একদিন এক শেয়ালকে দেখে তারমধ্যে ঢুকে সিঁদ কেটে খেয়ে এলাম। এসে যা' বললাম, গিয়ে দেখল ঠিক তাই। কায়প্রবেশ বলে একে। ধর, তোমার মধ্যে ঢুকে গেলাম। আমার soul (আত্মা) তোমাকে possess করল (পেয়ে বসল)। তখন আমি যা' ভাবি, যা' করি, তোমাকেও তা' ভাবতে ও করতে হবে।

শরৎদা—আপনি তো ইচ্ছা করলে জিন্নার শরীরে ঢুকে তাকে দিয়ে অনেক মঙ্গল কাজ করিয়ে নিতে পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওভাবে করতে যাব কেন? ঐভাবে obsessed (অভিভূত) হ'লে, tuned (একতান) হ'লে পরে ঐ-রকম জন্মের ভয় থাকে। যা' জানি ভাল ব'লে, ক্ষমতা থাকে তো তা' normally (স্বাভাবিকভাবে) করব। ওভাবে কেন করতে যাব, নিজেকে পাপে জড়াতে যাব কেন? কাউকে সাময়িকভাবে পেয়ে বসলে, তারও তো কোন মঙ্গল হয় না তাতে। বরং ব্যক্তিত্ব দুর্ব্বল হয়। অবশ্য, কেউ যদি কাউকে ভালবেসে, নিজ বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী তার ভাবে ভাবিত হ'য়ে, তার ইচ্ছা স্বেচ্ছায় পূরণ করে—বিশেষতঃ শ্রেয় কারও,—তাতে তা'র লাভ বৈ ক্ষতি হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে, ঐ অমনতর হয়ে ওঠাই তো সাধনা। আমি ভাবি কেন্নো, পোকা মাকড় সবই তো আমি। আমার

মতো মানুষ ওরা। ওরা ঐভাবে দুর্ব্বল হ'য়ে আছে প্রবৃত্তির অভিভূতির দরুন। আজ আপনি বিবর্ত্তনের পথে অনেকখানি এগিয়ে গেছেন। এই অবস্থার থেকে নেমে যেয়ে একটা পোকা যদি হন, তাহলে দেখবেন সে কী অবস্থা! চিত্রগুপ্তের খাতায় অর্থাৎ মাথায় অতীতের সব অভিজ্ঞতাগুলি জমা হয়ে আছে। নাম করতে-করতে একটু গভীরে গেলেই কত জিনিস যে রূপ নিয়ে ভেসে আসে তার কি ইয়ত্তা আছে? আপনার ভিতর যা' আছে সেগুলির সাক্ষাৎকার ক'রে এবং ইষ্টের দিকে মোড় ফিরিয়ে, ইষ্টের সঙ্গে অন্বিত ক'রে পরমপিতার দয়ায় কোনোভাবে ভবসমুদ্র অর্থাৎ হওয়ার সমুদ্র পাড়ি দিতে পারলে হয়। ভিতরে ভাল-মন্দ যা'-কিছু আছে তা' দেখতেও হবে, বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে অর্থাৎ নিরখ-পরখ ক'রে ইষ্টানুগ রকমে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতেও হবে। তা' করতে পারলে মৃত্যুর সময় ভয় কম থাকে, আর এমনি চরিত্রের উন্নতি তো হয়ই। ধামা চাপা দিয়ে কোন কাজ হয় না। যে বিষয়ে অজ্ঞ থাকব, অচেতন থাকব, যার ইষ্টানুগ নিয়ন্ত্রণ করব না, মৃত্যুকালে সেই চিন্তা আমাকে পেয়ে ব'সে আমার সর্ব্বনাশ করতে পারে।

হরেনদা (বসু)—নিরখ-পরখ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি হয়তো খগেনকে ধাপ্পি দিয়ে দুটো টাকা নিয়েছ। কেন নিয়েছ—তার পিছনে কী, তার পিছনে কী, তার পিছনে কী—এইভাবে দেখতে-দেখতে শেষটা এমন অবস্থা আসে, যখন নিজের দোষটা ছবির মত ভেসে ওঠে। তখন হয়তো তা' করতে আর ইচ্ছা হয় না, প্রবৃত্তিটার নিরসন হয়। সব জিনিসটা যখন সম্যক উপলব্ধির মধ্যে আসে, তখন চিন্তা ও কাজের ধারা পরিবর্ত্তন করার অমোঘ সঙ্কল্প জাগে। শুভ সঙ্কল্প জাগা সত্ত্বেও পূর্ব্বের অভ্যাস আমাদের অন্য পথে টানতে চায়। কিন্তু চেষ্টা থাকলে কিছুদিনের মধ্যেই সদভ্যাস পাকাপোক্ত হ'য়ে ওঠে এবং বদভ্যাসের শক্তি কমে যায়।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নিরখ-পরখ বা আত্মবিচার বড় জবর জিনিস। পেছনে ঢুঁড়তে-ঢুঁড়তে তুমি হয়তো শেষ কাণ্ডে দেখতে পাবে যে, তোমার হয়তো একটা মেয়ের প্রতি টান ছিল। তার পরিপূরণ না হওয়ায় প্রথমে এসেছে কামজীবনের বিকার এবং তা' হয়তো বাস্তব জীবন-চলনার ক্ষেত্রে ধাপ্পাবাজীতে পর্য্যবসিত হয়েছে। দারুণ ব্যাপার। নিজেকে ধরতে পারাই অত্যন্ত কঠিন জিনিস।

যতীনদা—Distortion of libido (সুরতের বিকৃতি) কেমন ক'রে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একজনকে ভালবেসে, তাকে না পেয়ে আর একজনকে দিয়ে সেটা পরিপূরণ করতে চাইলেন। সেখানে তার মন পেলেন না। তখন আর একজন যাকে আদৌ চান না, দেখাচ্ছেন তাকে খুব ভালবাসেন। আবার, যাকে না পাওয়ায় আপনার মন আপসোসে ভ'রে আছে লোকের কাছে ব'লে বেড়াচ্ছেন, ওকে আমি দু'চক্ষেই দেখতে পারি না। এমনতরভাবে নিজের আদত ভাবটা চেপে রেখে অন্যরকম বোলচাল নিয়ে চলা, এবং যা' বলছি, দেখাচ্ছি বাস্তবতার সঙ্গে তাঁর কোন মিল না থাকা—ইত্যাদি

সব-কিছুই distortion-এর (বিকৃতির) লক্ষণ। এমনি চলতে-চলতে মাথার মধ্যে একটা ফাটল ধ'রে যায়। কিছুদিন পরে নিজেই ধরা যায় না সত্যিই আমরা কী জন্য কী করি। পৈতে জড়া পাকিয়ে গেলে যেমন হয় এও সেইরকম। শেষটা নিজের মনের কাছেই নিজের চাওয়া কোন্‌টা, পছন্দ কোন্‌টা, অপছন্দ কোন্‌টা, অনুরাগ কোথায়, বিরাগ কোথায় এবং কেন, তা' আর ধরা পড়ে না। অত্যন্ত জটিল প্যাঁচালো রকমে মনের ক্রিয়া চলতে থাকে। মানুষ নিজের কাছে নিজেই একটা সং সেজে দাঁড়ায়। আবার, সেই রকমটাকেই হয়তো খুব সমর্থন করে লোকের কাছে। একবার এক পিচ্ছিল পথে পা দিলে তা' থেকে গড়িয়ে-গড়িয়ে নিজেকে ক্রমাগত মিথ্যাচারে লিপ্ত করা ছাড়া আর পথ থাকে না।

যতীনদা—এ থেকে মানুষ উদ্ধার পায় কী ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দু'টো রকমে হয়। এক, ইষ্টের প্রতি সহজ টান ও ঝোঁক নিয়ে বাস্তবভাবে তাঁর সেবা ও প্রীতিজনক কর্ম্মে লেগে থাকতে হয়। আর একটা রকম হ'ল —নাছোড়বান্দা হ'য়ে নিরখ-পরখ ক'রে নিজের মনের কারসাজি যেনতেন প্রকারেণ ধ'রে ফেলা ও সংশোধনের চেষ্টা করা। সেটা করতে গেলেও উপযুক্ত কারও উপর নেশা লাগে। তাঁতে এমন টান চাই যা' কিনা প্রবৃত্তির উপর টানের চাইতেও প্রবলতর হয়।

হরিদাসদা (সিংহ)—পশুপক্ষীদের তো প্রবৃত্তিপরায়ণতা কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তি থেকেই তো ওদের শরীর। ওরা তোমাদের চেয়ে বেশী obsessed (অভিভূত)। ওদের range (পাল্লা) কম, তাই বিপদও কম। তোমাদের range (পাল্লা)-ও বেশী, বিপদও বেশী। তোমাদের কিছুটা স্বাধীনতা আছে কিনা।

শরৎদা—মানুষ তো বড় অসহায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান কাউকে অসহায় ক'রে সৃষ্টি করেননি। আমরা আমাদের টানের নিয়োজনের ভিতর-দিয়ে উপরেও উঠতে পারি আবার নীচেও নামতে পারি। "এক তরী করে পারাপার।" টানটা তাঁর উপর ফেলতে পারলেই হ'ল। তবে তিনি আমাকে কতখানি ভালবাসেন, তা' ভাবতে গেলে সব উল্টে গেল। আমার প্রতি তাঁর ভালবাসাটা আমার সম্পদ নয়। আমি তাঁকে যতখানি ভালবাসি, সেইটুকুই সম্পদ আমার। তাঁর প্রতি আমার ভালবাসা যতই বেড়ে চলে, ততই তাঁর করাটা শতগুণে গুনিত হ'য়ে দেখা দেয় আমার কাছে। তখন তাঁকে মনে হয় অহেতুক কৃপাসিন্ধু।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, শুক্রবার, অমাবস্যা (ইং ২৭। ৫। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে ব'সে একটি বাণী দিলেন। পরে শরৎদা (হালদার), যতীনদা (দাস), নরেনদা (মিত্র), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), সুরেনদা (বিশ্বাস), কালিদাসদা (মজুমদার) প্রভৃতির সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন—ধর, আমাদের ক্ষিধে আছে, তাই সবারই খাওয়ার প্রয়োজন আছেই। কারও বেশী, কারও কম। এখন আমরা

যদি এমন ব্যবস্থা করতে পারি যাতে খাওয়ার প্রয়োজনটা পারস্পরিক সহযোগিতা ডেকে আনে, তাহলেই তো হ'ল। এইটে করতে গিয়ে দেখতে হবে যাতে প্রত্যেকের নিজ বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী করা ও চলার পথে কোন বাধা না হয়। বুদ্ধি রাখা লাগে কেমন ক'রে সবটার সামঞ্জস্য ক'রে চলা যায়। ভিতরে সেই চেষ্টা থাকলে বিরোধের কোন কারণ থাকে না। পারস্পরিক প্রীতি থাকলে পরস্পরকে বোঝার চেষ্টা থাকে। মনে করেন, আমি কিরণের কাছ থেকে কিছু পাই না সরাসরি। কিন্তু আপনি কিরণের কাছ থেকে কিছু পান, আবার আপনার কাছ থেকে আমি পাই। তাই প্রকারান্তরে কিরণের কাছ থেকে আমারও পাওয়া হচ্ছে। আমি ঘাস খাই না, গরু ঘাস খায়, আমি তার দুধ খাই। তাই আমারও প্রয়োজন আছে ঘাসকে বাঁচান, বাড়ান ও রক্ষা করার। পরস্পর স্বার্থান্বিত হ'য়ে, পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হয়ে চললে, প্রীতি ও প্রয়োজন-পূরণ দুই-ই এক সঙ্গে হয়। মানুষের চলাটা যাতে এইভাবে বিন্যস্ত হয়, তেমনতর প্রেরণা যোগানই ধর্ম্মদান। ধর্ম্মদান মানে—ধর্ম্মের মূর্ত্ত বিগ্রহ যিনি তাঁর প্রতি প্রত্যেককে অনুরক্ত ক'রে তোলা। আবার, যারা এই পথে চলার প্রতিবন্ধক-স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়, তাদের সেই প্রচেষ্টা সর্ব্বপ্রযত্নে নিরোধ করা লাগে। মানুষের শুভবুদ্ধি বাড়াতে গেলে আবার লাগে বিহিত বিবাহ, বিহিত জনন ও বিহিত শিক্ষা। বাঁচাবাড়ার জন্য যত কায়দাই করি না কেন, মানুষগুলিকে পরস্পরের বাঁচাবাড়ার সহায়ক ক'রে তুলতে হবেই। যে-কোন দিক দিয়েই যান, ধর্ম্ম অপরিহার্য্য। ধর্ম্ম অপরিহার্য্য মানে আদর্শও অপরিহার্য্য, আদর্শনিষ্ঠাও অপরিহার্য্য। যে-কোন একটা লোক যদি দায়িত্ব সহকারে নিজের মঙ্গল চায়, তাহলে সে সহজেই বুঝতে পারে—কী তার করণীয়। কিন্তু প্রত্যেকের মগজ, চিন্তা-শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি যথেষ্ট developed (বিকশিত) নয় ব'লে, যাজন এন্তার চালান লাগে। আমাদের মনে যেন থাকে, ধর্ম্ম মানে বাঁচাবাড়া। বাঁচাবাড়ার প্রয়োজনের সঙ্গে গ্রথিত ক'রে ধর্ম্মকে যদি পরিবেশন করা না যায়, তবে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বোধটা মজ্জাগত হয় না।

শরৎদা—আপনি তো বলেন বর্ণাশ্রম ঠিক থাকলে দেশে দারিদ্র্য, নিষ্ঠুর প্রতি-যোগিতা, দ্বন্দ্ব-বিরোধ, যুদ্ধ ইত্যাদি থাকে না। কিন্তু সেই প্রাচীন কাল থেকে এ-সব তো আমাদের বর্ণাশ্রমী সমাজে নিতান্ত কম নেই!

শ্রীশ্রীঠাকুর—বর্ণাশ্রমী সমাজে মানুষের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয় না। মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য কিছুটা স্বাধীনতা অপরিহার্য্য। কিন্তু সেই সঙ্গে-সঙ্গে চাই এমন কঠোর সমাজ-শাসন ও রাষ্ট্র-শাসন, যাতে স্বাধীনতার অপ-ব্যবহার হ'য়ে এই সব সমস্যার উদয় না হয়। তবে ধ'রেই নিতে হবে ব্যক্তি-স্বাধীনতার কিছু-কিছু অপব্যবহার হবেই। তাই সব রক্ষাকবচ থাকা সত্ত্বেও সময়-সময় নানা সমস্যার উদয় হবে এবং তার সমাধানও ক'রে চলতে হবে সত্তা-সম্বর্দ্ধনার অনুকূলে।

শরৎদা—যখন যতটুকু তখন ততটুকু। চিরকাল ভালমন্দ মিলিয়েই থাকবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল যতটুকু হবে তা' আবার আরও ভালর পথ পরিষ্কার ক'রে দেবে। সেই অবস্থায় আবার নূতন রকম সমস্যারও উদয় হবে, তার আবার সমাধান করতে হবে। মন্দ যা' তারও মাঙ্গলিক নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। একরকম অবস্থায় চলবে না। পরিবর্ত্তন হ'তেই থাকবে। সত্তা-সম্বর্দ্ধনা ও অসৎ-নিরোধ এই দুই কাজ ধর্ম্মের এ-পিঠ ও-পিঠ। কোনটা বাদ দিলে চলবে না। সব চাইতে সর্ব্বনাশ হয়, যদি বিয়ের মধ্যে গোলমাল হয়। সেটা যেন কিছুতেই না হয়। চলার পথই হ'ল ইষ্ট, ব্যষ্টি ও পারিপার্শ্বিকের সমন্বয় সাধন। সপারিপার্শ্বিক ব্যষ্টিকে অগ্রসর হতে হবে ইষ্টানুগ রকমে। আমরা যদি ইষ্টকে আমাদের পছন্দমত পেতে চাই, তাতে হবে না, তাঁর পছন্দমত হয়ে উঠতে হবে আমাদের।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট। সারাদিন প্রচণ্ড গরমের পর এখন একটু ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে। তাই সকলেই একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলেন। ভক্তগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে ব'সে তাঁর সুমধুর কথাবার্ত্তা শুনছেন। এমন সময় স্পেনসারদা ও তাঁর স্ত্রী আসলেন।

মিসেস স্পেনসার কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—ভারতবর্ষে কত রকমারি সম্প্রদায়, ভাষা, আচার-ব্যবহার ও স্বার্থদ্বন্দ্ব—এর মধ্যে সংহতি কিভাবে হ'তে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষগুলিকে এক আদর্শে যুক্ত ক'রে concentric (এককেন্দ্রিক) ক'রে তুলতে পারলে সব বিভিন্নতা সত্ত্বেও integration (সংহতি) আসতে পারে। সেই আদর্শও আবার এমন হওয়া চাই, যাঁকে দিয়ে প্রত্যেকে পরিপূরিত হ'তে পারে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী। সর্ব্বস্বার্থী ও সর্ব্বপরিপূরক এমনতর একজন থাকলে, তাঁকে কেন্দ্র ক'রে শুধু ভারত কেন, ভারত, পাকিস্তান এবং অন্য সব দেশও পরস্পর বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারে। প্রত্যেকে সকলের জন্য এবং সকলে প্রত্যেকের জন্য, এমনটা না হ'লে freedom (স্বাধীনতা) হয় না। আদর্শে ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে সব দেশ যদি এমনতরভাবে চলতে থাকে in a progressive way (প্রগতিমুখর ছন্দে), তবে একদিন সমগ্র মানব সমাজ unified (একতাবদ্ধ) হ'তে পারে।

মিসেস স্পেনসার—মানুষ তো স্বার্থপর, তাই এমনটা হওয়া কি সম্ভব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হওয়াটা করার উপর নির্ভর করে। আমাদের সবকিছু আদর্শের পরিপূরণে এমনতরভাবে সংন্যস্ত ক'রে তুলতে হবে, যাতে cell to cell (কোষ থেকে কোষে), soul to soul (আত্মা থেকে আত্মায়) এটা সর্ব্বক্ষণ spontaneously (স্বতঃই) radiated (বিকীরিত) হয়—behaviour-এর (ব্যবহারের) ভিতর-দিয়ে। এই ভাবধারা ও কর্ম্মের materialisation-এ (রূপায়ণে) উৎসর্গীকৃতপ্রাণ হওয়া লাগবে। With our relatives, family members and friends (আমাদের

আত্মীয়স্বজন, পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবসহ), behaviour-এর (ব্যবহারের) মাধ্যমে জিনিসটা ফুটিয়ে তুলতে হবে জীবনে। এটা sacrifice (ত্যাগ) নয়—প্রত্যেকের interest (স্বার্থ)—যা' sacred to all (সবার কাছে পবিত্র)। যারা থাকাকে চায় জীবন নিয়ে আর বৃদ্ধি নিয়ে—যারা বাঁচতে চায় জীবনবৃদ্ধিতে—তাদের সবার জন্যই আমার এ কথা।

স্পেনসারদা—আজকাল যে কম্যুনিজম এত জনপ্রিয় তার মানে কি এই যে জনসাধারণের স্বার্থ এখন বেশী ক'রে ব্যাহত হচ্ছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব সম্ভব তাই, এবং সেইজন্যই এটা অনেক সময় রক্তাক্ত সংগ্রাম ডেকে আনে। পারস্পরিক প্রবৃত্তি স্বার্থের প্রবল দ্বন্দ্ব হলেই এমনতর হয়।

স্পেনসারদা—সবারই প্রবৃত্তিস্বার্থ থাকে, তাই তো এমনতর হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাধারণতঃ ঐ conflict (দ্বন্দ্ব) থেকে শুরু হয়। তারপর ধর, একটা মেয়ে একজনকে বিয়ে করবে ব'লে ঠিক ক'রল। হয়ত বহু পুরুষ তাকে চায়, তারা পায় না ব'লে, বলবে women social property (নারী সামাজিক সম্পত্তি) হোক। মেয়েরা যে প্রবৃত্তি-চাহিদা-পূরণের স্বাধীনতা চায়, তার মূলেও থাকে আহত হীনম্মন্যতা। অন্যান্য desire-এর (আকাঙ্ক্ষার) ব্যাপারেও অমনতর।

স্পেনসারদা—প্রবৃত্তি-অনুযায়ী প্রবৃত্তি-চাহিদা-পরিপূরণী যে-সব সমাধান মানুষ করে, তাতে কি কিছু হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Earning, hunger and sex should be adjusted so that they may contribute to the life and growth of all (অর্জ্জন, ক্ষুধা এবং যৌনসম্বেগ এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে এগুলি সবার জীবনবৃদ্ধিদ হয়ে ওঠে)। Unless we are above our complexes (যদি আমরা প্রবৃত্তির ঊর্দ্ধে না উঠি) কোন সমাধান আসতে পারে না। আবার, আমাদের বাইরে একজন প্রবৃত্তিজয়ী central figure (কেন্দ্র পুরুষ) না থাকলে এবং তাঁতে অনুরক্ত না হ'লে, প্রবৃত্তিগুলির জীবনবৃদ্ধিদ নিয়ন্ত্রণও হ'তে পারে না।

স্পেনসারদা—মানুষ ভুল করলেও ধাক্কা খেয়ে ফিরতে পারে। যেমন দুজনে হয়তো একজনকে চায়, কিন্তু পরে যখন একজন বোঝে যে, সেই মেয়েটি অপরজনকে পেলেই সুখী হবে, তখন হয়তো তাকে পাওয়ার জন্য আর জবরদস্তি করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' সাধারণতঃ হয় না, যদি মানুষ প্রবৃত্তি-এলাকার ঊর্দ্ধে আসীন কোন কেন্দ্রপুরুষে concentric (কেন্দ্রান্বিত) না হয়। ভারতে আগে courtship (পূর্ব্বরাগ) ছিল। কিন্তু তার ফল ভাল হয়নি, তাই তা' উঠিয়ে দিয়েছে। সংযুক্তাকে নিয়ে পৃথ্বীরাজ ও জয়চন্দ্রের বিরোধ গেল না, তাই মুসলমান আসার সুযোগ পেল। বেণ রাজার সময় প্রতিলোম আসে। সমাজে প্রতিলোম জাতকের উদ্ভব হ'লে নানারকম সমস্যার সৃষ্টি হয়। প্রবৃত্তিরঙ্গিল ভাবে সেইসব সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে মানুষ অনেক সময় bloody revolution (রক্তাক্ত বিপ্লব)-এর পথ বেছে নেয়।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, শনিবার, শুক্লাপ্রতিপদ (ইং ২৮। ৫। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। যতিবৃন্দ কাছে আছেন। শৈলমা দূরে দাঁড়িয়ে আপন খেয়ালে নানারকম কথা বলছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও হাবে-ভাবে তাঁকে তার মতো ক'রে উত্তর দিলেন।

শরৎদা (হালদার) তাই দেখে বললেন—আমার মনে হয় শৈলমার সঙ্গে শৈলমার মতো, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আপনার ঐ লীলা। বোঝার যো নেই আপনি কে বা কী!

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—গল্প শুনেছি সুবলকে নাকি কেষ্টঠাকুরের মতো দেখাত। সুবল একবার কেষ্টঠাকুরের মতো সেজে গোপীদের কাছে গিয়েছিল। গোপীরা কেউ ধরতে পারল না, একমাত্র রাধাই ধ'রে ফেলল। সুবল যে কেষ্টঠাকুরের মতো মিচকি-মিচকি হাসছিল, কেষ্টঠাকুরের বেশ—তার কথাবার্ত্তাও সেইরকম, তাতে কিন্তু রাধার চোখে ধূলো দিতে পারল না। তাই chaste adherence (সাচ্চা নিষ্ঠা) যদি থাকে, তাহলে তাকে কিছুতেই বিভ্রান্ত করতে পারে না। সে যা' ধরার তা' ধরেই ফেলে। Chaste adherence-এ (সাচ্চা নিষ্ঠায়) মানুষ wise (বিজ্ঞ) হ'য়ে পড়ে। সন্ধিৎসা থাকে, সতর্ক অভিনিবেশ থাকে, প্রণিধান থাকে, প্রত্যয় থাকে, সেইজন্য বিভ্রান্ত করতে পারে না।

শরৎদা—হনুমানের কথা তো পরে আর পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যতীশ ঘোষ ছিল—মাথার মস্ত টিকি ছিল, তাকে দেখে হনুমানের মতো মনে হত। একবার অপারেশনের সময় আমাকে বলল—"আপনি কাছে থাকলে ক্লোরোফরম করা লাগবে না।" আমি ছিলাম। ঐভাবে অপারেশন হয়ে গেল। অপারেশনের সময় চোখ-মুখের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখলাম না। শুধু এক দৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে ছিল। তারপর আমি ওকে খুব নাম করতে বললাম। আমাকে অসম্ভব ভালবাসত। এমনি খুব ভাল—প্রীতি-প্রফুল্ল। কিন্তু কেউ আমাকে কোন অপমান করেছে শুনলে, সেই প্রীতি-প্রফুল্ল মানুষ আক্রোশে অস্থির হ'য়ে যেত। গোপাল সাহা ঐ ধরনের কথা বলেছে শুনে রাগে তার চোখটোখ রথচক্রের মত ঘুরতে লাগল। চুলটুলগুলো খাড়া হ'য়ে গেল। সে এক দা ধার দিয়ে তাই হাতে নিয়ে না-খেয়ে না-দেয়ে তাকে কেটে ফেলবে ব'লে তিনদিন জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরল। একেবারে মরিয়া হ'য়ে গেল তাকে মারবার জন্য। আমি যখন খোঁজ পেয়ে বললাম—"যে-জীবন দিতে পার না সেই জীবন নেওয়ার কি অধিকার আছে তোমার?" এই কথায় সে যেন একেবারে পাগল হয়ে গেল। বলতে লাগল—"ঠাকুর, আপনি আমাকে একেবারে খুন ক'রে ফেললেন। আপনি যখন বারণ করেছেন তখন আর মারতে পারব না। কিন্তু আমি নিজে মারতে না পেরে মরার দাখিল হয়ে গেলাম। ওর মত পাপীকে মারলে কোন ক্ষতি হ'তো না। আপনার প্রতি অপমানে সায় দিয়ে আমার বেঁচে থাকার কোন অর্থ রইল না।"

কতবার ওকে পাগল হরনাথের কাছে পাঠাতে চেয়েছি কিন্তু সে-কথায় কানই দিত না। সে না-চিনত, না-জানত ধারে-কাছে এমন মানুষ কমই ছিল। বড়-ছোট সকলেই ভালবাসত তাকে। কোন সংকোচ ছিল না। হোমরা-চোমরা লোককেও বেপরোয়া হ'য়ে যাজন করত। আমাকে খুব দেওয়ার বুদ্ধি ছিল। কত জায়গা থেকে কত-কিছু জোগাড় ক'রে আনত। বাইরে গেলে খালি হাতে আসত না। খুব সতর্ক-সন্ধানী ছিল। সর্বদিকে নজর ছিল। Normally (স্বাভাবিকভাবে) সম্মান দিত সকলকে—সে একজন বড় অফিসারই হোক্ বা একজন সামান্য কৃষকই হোক্। সে নিজেও খুব ভালবাসত সকলকে। সে যে কী ছিল তার চরিত্রটাই বলে দিত। আমার কোন কথায় যেন বোঝাতে পারছি না। ঐ-রকম মানুষ যখন ছিল তখনকার কথা মনে হ'লে ভাবি, কি মহৎ দিনই চ'লে গেছে। সে যা' করত স্বাভাবিকভাবেই করত। লোক-দেখান ভাব বা আধিক্যতা বা উচ্ছ্বাস কোনরকম ছিল না। আমাকে নানারকম জিনিস খাওয়াবার খুব প্রলোভন ছিল। আমাকে সরটর খাওয়াত। খুব সদাচারী ছিল। আমার কথার সঙ্গে যেখানে তার বাবার কথায় গরমিল হোত তা' শুনত না। বলত—"বাবার এই কথা শুনে চললে বাবারও সর্ব্বনাশ করা হবে, আমারও সর্ব্বনাশ করা হবে।"

দরিদ্র ছিল খুব। কিন্তু তাতেও ছিল মহাখুশী। বলত—"আমার কোন দুঃখ নেই, আমার মত সুখী ক'জন আছে? আপনি আছেন আমার, জীবনটা উপভোগ ক'রে নিলাম। আর চাই কি?" আমাকে ওর interest (স্বার্থ) ক'রে নিয়েছিল। আমার জেতা ওর জেতা। আমার লোকসান ওর লোকসান। আমার এতটুকু ক্ষতি সহ্য করতে পারত না। আমার প্রতি ভালবাসা, আমার প্রতি কারও নেশা এইটে সে খুব পছন্দ করত। মানুষের পেছনে লেগে থেকে খুব সেবা দিত। আমার ইচ্ছা ছিল ওর জীবনীটা লিখিয়ে রাখা, কিন্তু এখন সব ঘটনা মনেও নেই। বুঝ ছিল বড় পরিষ্কার। বলত—"একজনের ভাল হওয়া তার স্বার্থ যতখানি, আমার স্বার্থও ততখানি। সে ভাল থাকুক, সুখী হোক, দশজনকে ভালবাসুক, ভগবানকে ডাকুক, দশে তাকে শ্রদ্ধা করুক—এমনটা হ'লে আমারই সুখ।" এগুলি স্বাভাবিকভাবে তার মধ্যে গজিয়ে উঠেছিল।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, রবিবার, শুক্লাদ্বিতীয়া (ইং ২৯। ৫। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ব'সে বললেন—

> বিবেচনা নিয়ে অভ্যাস
> তাতেই জ্ঞানের অধ্যাস।

তার একটু বাদে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে এসে বসলেন। যতিবৃন্দ উপস্থিত। নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা শুরু হ'ল। সাড়ে আটটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন। তারপর আজকের প্রথম বাণী সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে একজন সেবক

সম্বন্ধে বললেন—সে সেবা করে কিন্তু বিবেচনা করে না—কিসে সুবিধা বা অসুবিধা হ'তে পারে। তাই ভুলই হয়।

প্রফুল্ল—আমার মনে হয়, অনুরাগের অভাব থাকলে মানুষ ভুল করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভ্রান্তি মানে বিপথে যাওয়া। প্রীতি থাকলে বিপথে যায় না। বিরুদ্ধ প্রবৃত্তি সংযত হয়, তাই ভুল আপনিই কমে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

প্রীতির নেশায় ভ্রান্তি কমে
বৃত্তিরাগও তেমনি দমে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভালবাসা জিনিসটারই অভাব। স্বামী হয়তো পেনসন পায়, ম'রে গেল, তখন অনেক স্ত্রী এই ব'লে কাঁদে—"তুমি আমার কী ক'রে গেলে, আমি কী ক'রে বাঁচাব এদের।" তার মানে বুঝে দেখ টান কিসে। ভেবে দেখ আমরা বাস করি শালা কি জগতে, কেউ নেই। তোমার যেমন কেউ নেই, তোমায় যারা অমন করছে তাদেরও আবার কেউ নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর হরেনদা (বসু)-কে জিজ্ঞাসা করলেন—এই কথাটা যখন বললাম তখন তোর কী মনে হ'ল ? বন্ধু-বান্ধব ও আপনজনের কথা মনে পড়ছিল না ?

হরেনদা – সে আমি অনেকদিন আগেই জেনে রেখেছি যে, আপনি ছাড়া আপন কেউ নেই। ভুল করতে পারি, কিন্তু এ বুঝ আমার পাকা যে, আপনি ছাড়া কেউ নেই। ঘা-গুঁতো খেলে সে-বুঝ আরও আঁকড়ে ধরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথা যা' ব'লে গেছে বৈষ্ণবরা, ঐ মোক্ষম কথা। অচ্যুত অনুরাগই আসল কথা। তপস্যার ভিতর-দিয়ে চরিত্র সংশোধনের কথা যে বলে, সে ঐ একই কথা। যেমন নাম করলে মনের চাঞ্চল্য কমে, আপনিই প্রাণায়াম হয়। আবার, প্রাণায়াম করলেও মনস্থির হয়। তবে নাম ক'রে যে প্রাণায়াম হয়, তা হয় normal (স্বাভাবিক)।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

অনুরাগে করলে নাম
আপনিই আসে প্রাণায়াম।

কথা হচ্ছিল—যে-সব আন্দোলন প্রবৃত্তির উসকানি দেয়, সেগুলিতে মানুষ আকৃষ্ট হয় বেশী।

তখন বঙ্কিমদা (রায়) বললেন—আগে যেমন এক-একটা খেয়াল পেয়ে বসত, যেমন গ্রামে পুজো করতে হবে বা লাইব্রেরী করতে হবে ইত্যাদি, তখন কিন্তু তা' না করা পর্য্যন্ত নিস্তার ছিল না। এখন সে-রকম উদ্যম তো বোধ করি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৃত্তির মতন যদি পেয়ে বসত এটা, অর্থাৎ ইষ্টকর্ম্ম, তাহ'লে কাম সারা।

প্রসঙ্গত শরৎদা (হালদার) বললেন—পারস্পরিক প্রীতি, দরদ ও সেবা যদি বাড়ে,

তাহ'লে বোধহয় প্রবৃত্তিমুখী ইষ্টকৃষ্টি-বিরোধী আন্দোলনগুলির প্রয়োজনীয়তা কমে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দীক্ষিতের সংখ্যা খুব বাড়ান লাগে। শুধু তাতেই হবে না, প্রতিলোম-বিবাহের যে ঝোঁক এসেছে তা' রোখা লাগে। তা' সম্ভব হ'বে অনুলোম বিবাহকে প্রচলিত ক'রে। মেয়েদের সময়মত বিয়ে হয় না, এটা বড় খারাপ, তখন তারা যা'-তা একটা ধ'রে নেয়। আগে গ্রামঘরে কোনও মেয়ে বড় হ'লে পাড়ার ও সমাজের দশজনে মিলে চেষ্টা করত, তাকে কিভাবে সৎ-পাত্রস্থ করা যায়। এখন তো অনেক কিছু ওলট-পালট হয়ে গেছে। পণপ্রথার জন্যে সাধারণ মানুষের মেয়ের বিয়ে দেওয়া দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আবার, নীতিজ্ঞানহীন বহু যুবক আছে যারা, মেয়েদের জীবন নষ্ট করে কিন্তু তাদের কোন দায়িত্ব নেয় না। আজকাল অনেকেরই কর্তব্যের উপর ঝোঁক নেই, কিন্তু পাওয়ার নেশা প্রবল। নানাভাবে শয়তানের ব্যাদান সৃষ্টি হ'য়ে আছে। এখনই বিধিমাফিক অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ ও বহুবিবাহ চালান লাগে, যা'তে মেয়েদের বিয়ে হ'তে অসুবিধে না হয়। পণপ্রথা উঠিয়ে দিতে হয়। বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে গৌরীদান চালিয়ে দিতে হয়। যাতে মেয়েরা নষ্ট হ'তে না পারে। আমরা যদি নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে না পারি, তখন বিজাতীয় যে-কোন আন্দোলন আমাদের উপর আধিপত্য করতে সুযোগ পায়। দীক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে পারস্পরিক সেবার ব্যবস্থা এমনভাবে করা লাগে যাতে একটা মানুষও কোনভাবে বিধ্বস্ত হ'তে না পারে। শুধু সাহায্য দেওয়াই বড় কথা নয়, প্রত্যেকের যোগ্যতা যাতে বৃদ্ধি পায় এবং প্রত্যেকে যাতে তার সামর্থ্যমতন কাজকর্ম্ম ক'রে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে পরিবার-পরিজনসহ, তার ব্যবস্থা করা লাগে। আমি তো ভাবি শুধু ভারত কেন, সারা জগৎ পরমপিতার নামে একটা যৌথ পরিবারের মত হয়ে দাঁড়াক—যাতে কেউই নিজেকে অসহায় মনে না করে। এতে একেবারে super communism (পরম সংঘতন্ত্র) হ'য়ে যাবে। আমাদের অধিকাংশের না আছে ইষ্টানুরাগ, না আছে লোকস্বার্থী স্বভাব, তাই আমরা কিছুতেই চেতি না। নাছোড়বান্দা হ'য়ে লাগলেই কিন্তু হ'য়ে যায়।

যতীনদা (দাস)—বর্ণের উৎপত্তি কোন্ সময় কেমন ক'রে হ'ল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ কেউ কারও মতো নয়। গোড়া থেকেই বৈশিষ্ট্য আছে, এবং তার মধ্যে আবার grouping (গুচ্ছ) আছে। কিন্তু আগে সেটা defined and pronounced (ব্যাখ্যাত ও সুব্যক্ত) ছিল না। পরে সেটা discovered ও determined (আবিষ্কৃত ও নির্ণীত) হয়, এবং তখন বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি নামকরণ হয়। নামটা দেওয়া হয় বৈশিষ্ট্যানুপাতিক। নামগুলি গুণেরই ব্যঞ্জক। নামকরণ হওয়ার আগেও এ জিনিস ছিল। সর্ব্বসময় সর্ব্বসমাজে এটা আছে। সৃষ্টির গোড়া থেকেই এটা আছে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পৃথ্বীরাজ-জয়চাঁদের যদি অমনতর অসাধু

অসম্মিলন না থাকত তাহলে দেশের এই অবস্থা হ'তো কিনা সন্দেহ। ভারতের ইতিহাস অন্যরকম হ'য়ে যেত।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর রোহিণী রোডের পাশে মাঠে চেয়ারে উপবিষ্ট। শরৎদা (হালদার), প্রফুল্ল (দাস), উমাদা (বাগচী), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), সরোজিনীমা প্রভৃতি কাছে আছেন। সরোজিনীমা শ্রীশ্রীঠাকুরকে তামাক, জল, সুপারি ইত্যাদি দিচ্ছেন। আবছা জ্যোৎস্নার মধ্যে একটি হ্যারিকেন জ্বলছে। শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে-মাঝে বাণী দিচ্ছেন ও নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করছেন। কখনও বা একেবারে চুপচাপ থাকছেন। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকে তাঁর নীরবতা যেন আরও গভীরভাবে বোধ করা যাচ্ছে। পরিষ্কার আকাশে অনেক তারা উঠেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে-মাঝে দিগন্ত-বিস্তৃত আকাশে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছেন। প্রকৃতির কোলে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে স্তব্ধ ভাবে ব'সে থাকতে অসম্ভব ভালো লাগে। মনে হয় জগৎ ও তার স্রষ্টা কতই না অতল রহস্যঘন।

দুটি বাণী দেওয়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—আমি সরোজিনীদের বলছিলাম, তোমরা এতদিন যে এইভাবে ইন্দ্রিয় উপভোগ করলে কিন্তু তাতে সুবিধা কি হ'ল? তাতে সুবিধা হয়েছে, না অসুবিধা হয়েছে?

সরোজিনীমা—অসুবিধা বৈ সুবিধা হয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে আমরা সাধারণতঃ এমনভাবে ভোগ করি না যা' কিনা শরীর মনের অনুকূল ও পরিপোষক। কামের ভিতর দিয়ে প্রীতি-প্রতিষ্ঠা হয়েছে এমনটা দেখা যায় না। প্রীতি-প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই বরং কামের সুষ্ঠু উপভোগ দেখা গেছে এবং সুজননও হয়েছে। অনিয়ন্ত্রিত কামের ফলে যে সন্তান হয়, সাধারণতঃ সে হয় হাতের বাইরে।

শরৎদা—আপনি যদি আগে থেকে বৈরাগ্যময় জীবনের কথা বলতেন, খুব ভাল হ'তো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার বরাবরই বলা আছে। যখন থেকে লেখা দিতে আরম্ভ করেছি, তখন থেকেই আমার এই কথা। আমার সব কথার মধ্যেই ইষ্ট ও সত্তাকে মুখ্য ক'রে আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে জীবনটাকে উপভোগ করার কথা বলা আছে। প্রকারান্তরে নানাভাবে একই কথা বলেছি আমি।

প্রফুল্ল—আপনি যদি সন্ন্যাস-আশ্রমের প্রবর্ত্তন করতেন, তাহলে কি ভাল হ'তো না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে অন্য দিক দিয়ে অসুবিধে ছিল। মানুষগুলি সংসার থেকে aloof (আলগা) হ'য়ে পড়তো। Aloof (আলগা) হ'য়ে তো লাভ নেই! আমি চাই গৃহী সন্ন্যাসী, যাদের সংসার হবে ইষ্টার্থে। এমন হ'লে তারা successful (সার্থক) গৃহী হয়, অথচ সংসারে বন্ধ হয় না। ইষ্টতপা হ'য়ে সংসার করে।

পুণ্যপুঁথিতে যে কথা বলেছি সে কথা তো জ্ঞানবুদ্ধি ক'রে বলিনি, সেখানেও বলা আছে—আমি সংসারী সন্ন্যাসী চাই, নিতাই চাই।

কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে বললেন—আমার ঐ যে মহারাজ ছিল, কিশোরী ছিল, গোঁসাই ছিল, ওরা পণ্ডিত না হলেও উৎসাহী ছিল। ওরাই তো কাজের ভিত্তি পত্তন করেছে, অবশ্য আমি সঙ্গে ছিলাম।

একটু থেমে বললেন—কাজকর্ম্ম ভালভাবে করতে গেলে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে বেশ হৃদ্য সম্পর্ক গ'ড়ে তোলা লাগে। মানুষের অহং যাতে উত্তেজিত হ'তে না পারে তেমনিভাবে চলা লাগে। শুধু লোকের ভাল করলেই হয় না, তাদের সঙ্গে পরমাত্মীয়ের মতো ব্যবহার করতে হয়। একসঙ্গে উঠতে-বসতে হয়, খোঁজখবর নিতে হয়, প্রীতির সঙ্গে আদান-প্রদান করতে হয়। একসময় আমি হিমায়েতপুরে বাড়ী-বাড়ী বেড়াতাম। সহজভাবে সবার সাথে মিশতাম। গ্রামের লোকে আমাকে তাদেরই পরম আপনজন মনে করত। মানুষ বেশী হওয়ায় তাদের দেখতে গিয়ে, সেই বেড়ান যখন থেমে গেল, তখন থেকেই গ্রামের লোকের বিরূপ ভাব যে হ'তে লাগল, তার আর নিরসন হ'ল না। কেষ্টদা, খ্যাপা ওদের যেতে বলতাম, মিশতে বলতাম, ওরা তা' আর পেরে উঠল না। ঐ মহারাজকে যে আমি ঠিক করেছিলাম, ওর পেছনে কি আমি কম ঘুরেছি? সবসময় ওর পেছনে তাল দিতাম। কিশোরীর পেছনে কি কম ঘুরেছি? কত খেটে-খেটে ওকে ঠিক করতে হয়েছে। বাড়িতে কত মার-ই খেয়েছি ওর সাথে মেশার জন্যে। সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে দেশ ভাগ হ'য়ে। ভারত ও পাকিস্তান, তাদের বেশীরভাগ শক্তি ক্ষয় করছে পরস্পরের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে। এতে দুই দেশের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই ক্ষতি হচ্ছে। সাধারণ মানুষের সুবিধা কিছু হচ্ছে না। এই ব্যাপারটা আমি কিছুতেই ঘটতে দিতাম না, যদি শরীর আমার মনকে বহন করত। মুসলমান কষ্ট পেলেও আমার যেমন লাগে, হিন্দু কষ্ট পেলেও আমার তেমনই লাগে। কেউই আমার পর নয়। সে-বার সেই দুর্ভিক্ষের বছর, পরমপিতার দয়ায় আশ্রমের দশ মাইল এলাকার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান কেউ না খেতে পেয়ে মরেছে বলে শুনিনি। স্থানীয় মুসলমানেরাই বেশী আসত বিপন্ন হ'য়ে। তাদের কাউকেই কিন্তু বিমুখ করা হয়নি। আমি বুঝি হিন্দুই হোক, মুসলমানই হোক, মানুষই আমার সম্পদ, তাদের বাঁচানটাই আমার স্বার্থ।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর গাত্রোত্থান করলেন। তখন আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। টর্চ্চ ধ'রে শ্রীশ্রীঠাকুরকে পথ দেখান হচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়িয়ে মাজায় হাত দিয়ে বললেন—ধর্ম্ম ও কৃষ্টি ignore (উপেক্ষা) করায় সব দেশেরই ক্ষতি হচ্ছে। তা' এশিয়াতেও যেমন, অন্যান্য মহাদেশেও তেমন। সারা পৃথিবীতে বিশেষ মানুষের আবির্ভাব ক'মে যাচ্ছে। বার্ক, শেরিডানের মত লোক আজ কোথায়? রাশিয়াও যে আজ এত হৈ-চৈ করছে কিন্তু পুরনো নেতৃস্থানীয় মানুষগুলি সরে গেলে যে মানুষের সম্পদ কতটুকু থাকবে, তা' খুবই সন্দেহের বিষয়। ওখানেও শুভ সামাজিক প্রথা যত

শিথিল হচ্ছে, আমার মনে হয় উঁচু ধরনের মানুষের অভাবও তত বেড়ে যাচ্ছে। আমার এমনতরই মনে হয়। অবশ্য আমি তো ভিতরের খবর জানি না। আমার মনে হয় জার্ম্মানীকে বিধ্বস্ত না ক'রে, হিটলারকে যদি অন্যভাবে নিরস্ত করা যেত তাহ'লে ভাল হ'ত। আরও বলি, ইংরেজদের মধ্যে যদি দূরদর্শী মানুষ থাকত, তাহ'লে তারা কখনও ভারতকে ভাগ করত না। যারা পৃথিবীকে বাঁচাতে পারে তাদের হতবল করা মানে নিজেদের ও মানবসমাজের ক্ষতিসাধন করা।

শ্রীশ্রীঠাকুর এসে গোল তাঁবুতে বসলেন। খানিকটা বাদে ঝড় আসল। ঝড়ের গতি দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর দালান ঘরে যেয়ে বসলেন।

খানিকটা পরে ঝড় ক'মে গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি আশ্রমে আসলেন। সেখানে এসে বারান্দায় না বসে সেগুন গাছের তলায় একখানি চেয়ারে বসলেন। ব'সে বললেন—মানুষ কৃষ্টি-কৃষ্টি কয়, কিন্তু বোঝে না কৃষ্টি মানে কী।

যতীনদা—সোজা কথায় কৃষ্টি মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কৃষ্টি মানে হ'ল—সপারিপার্শ্বিক নিজে এমনভাবে culture (অনুশীলন) করা, যাতে সম্বর্দ্ধনা হ'তে পারে। কৃষ্টির মধ্যে দরকার আছে ইষ্টের, কারণ আমার বাইরে মহৎ কাউকে যদি না ধরি, তবে becoming (বিবর্দ্ধন) হয় না, evolution (বিবর্ত্তন)-ও হয় না।

ননীদা (চক্রবর্ত্তী)—কম্যুনিষ্টরা heredity (বংশানুক্রমিকতা) মানে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Heredity (বংশানুক্রমিকতা) না মেনে উপায় আছে? Heredity (বংশানুক্রমিকতা) অনুযায়ী বৈশিষ্ট্যানুপাতিক গঠন হয়। আমাদের internal (অন্তর্নিহিত) গঠন যেমনতর, adjustment of system (দেহের বিন্যাস) যেমনতর, পারিপার্শ্বিক থেকে নিইও তেমনতর। একই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে থেকে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন রকমে গ'ড়ে ওঠে। শুধু মানুষ কেন, গাছপালার মধ্যেও heredity (বংশানুক্রমিকতা) আছে—শ্বেত করবী থেকে শ্বেত করবীই হয়, ভুটানী কুকুর ভুটানী কুকুরই হবে. সে তো আর গ্রে-হাউণ্ড হয়ে যাবে না! মেথরের ছেলেও super excellence (চরম উৎকর্ষ) attain (লাভ) করতে পারে, কিন্তু তাতে তার gene-এর (জনির) adjustment (সমাবেশ) ও ধরন বদলে যাবে না।

ননীদা—যে নিম্নস্তরে আছে তারও তো উন্নতি হতে পারে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছোটর যদি বড়র প্রতি গভীর শ্রদ্ধা না থাকে, তবে সে বড়র কাছ থেকে যা' নেওয়ার তা' নিতে পারে না। আর, এই সশ্রদ্ধ উন্মুখতা না থাকলে তার পক্ষে উন্নতিলাভ করা কঠিন হয়।

ননীদা—সকলের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া না-করাটাকে অনেকে ঘৃণার লক্ষণ ব'লে মনে করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খাওয়া-দাওয়া সদাচারের ব্যাপার। শরীর-মনের সুস্থতা রক্ষা করা—সেই হ'ল সদাচারের প্রাণ। একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া না করার মধ্যে ঘৃণা জিনিসটা

নেই। এক মার পেটে জন্মে, এক হাঁড়িতে খেয়ে মিল হয় না, আর মেথরের সঙ্গে খেলেই মিল হ'য়ে যাবে? প্রতিলোম যারা করে, আত্মম্ভরিতা-বশে তারা খুব বাহাদুরি করে। কিন্তু জানে না কী সর্ব্বনাশ করল নিজেদের। অনেকসময় বলে—বামুন তো গেছে। কিন্তু বামুন যদি যেয়েই থাকে, তুই কি সেই সঙ্গে যাবি? তুই থাকলে তো একদিন তাকেও বাঁচাতে পারতিস্।

প্রফুল্ল—ঠাকুর! ইদানীং কিন্তু কৃষ্টি-বান্ধবের চিঠি আর আসছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি না করি, হবে না। যেতে তো বসেছেই সব, সবই যাবে—না যাওয়ার মত তো কিছু করিনি। অথচ এই কাজটা খুব সহজ কাজ ছিল। এটার উপর দাঁড়িয়ে অনেক কিছুই গজিয়ে উঠত।

যতীনদা—এখন কলকাতার কাজে প্রধান ঝোঁক পড়েছে অধিবেশন কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়াবার দিকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেষ্টদা না হয় এদিক নিয়ে engaged (ব্যাপৃত) আছে, আর সবাই তো আছে।

যতীনদা—আর সকলেও ঐ তালে জড়িয়ে পড়ে।

শরৎদা—আপনি নির্দ্দিষ্টভাবে যা' বলেছেন আমাদের দৃষ্টি সেইদিকে কেন্দ্রীভূত করা দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—শুনুন শরৎদা! অনেকদিন নানা রকমে বলেছি, এখন আবার বলছি—আপনিই হোন, আর যেই হোক, যে-পথে আমরা যেতে চাই, যাওয়াটা কিভাবে সম্ভব হ'তে পারে, তার definite scheme (নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা) যা' আমার মাথায় এসেছে with all the steps (সমস্ত উপায়সহ)—রকমারির আবর্ত্তনে গড়িয়ে—তা' বিভিন্ন সময়ে যেমন ক'রে যখন যা' করা যেতে পারে—আমার বুদ্ধিমতো তা' বলার কখনও কিছু কসুর করেছি ব'লে মনে হয় না,—অবশ্য আমার মতো ক'রে। কিন্তু আপনাদের অপরিণামদর্শী ছানি-পড়ার মত ইচ্ছাকৃত অন্তর্দৃষ্টি-বিমুখতা ও প্রবৃত্তি-চোয়ান intellect (বুদ্ধি) আত্মম্ভরী সাহস নিয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের অবতারণা ক'রে আপনাদের তা' সম্পাদন করতে দেয়নি, বরং অনেক করা তাকে অনেকখানি ব্যাহতই করেছে ব'লে মনে হয়। যৌথ সহযোগিতায় দায়িত্ব নিয়ে disciplined (সুশৃঙ্খল) চলনে উদগ্র আগ্রহের ওপর ভর ক'রে ঐ দাঁড়াকে অবলম্বন ক'রে যদি চলতেন, ষোল আনার জায়গায় বার আনা তো কৃতকার্য্য হতেনই হেলেখেলে। আর, চার আনাও গজিয়ে উঠত ফাউ-এর মতো—তার উপর আরও দুই আনার উপঢৌকন নিয়ে। তা' কিন্তু হয় না আর হতেও পারে না, আমার কওয়া যা'—ইচ্ছা যা'—সেগুলি যদি স্বতঃ-উদ্যমে সমাবর্ত্তিত হ'য়ে না ওঠে আপনাদের অন্তরে। সব কথা ছেড়ে দিন, শেষের ব্যাপারটার কথাই বলি। তিন হাজার genuine (খাঁটি) কৃষ্টিবান্ধবের কথা বলেছিলাম—তা' আমি আর প্রফুল্ল (দাস) মিলে পাঁচশ-এর উপরেও—হয়তো আরও কিছু বেশী—এখানে ব'সেই ক'রে দিলাম। কিন্তু অত বলা

সত্ত্বেও, অত চাওয়া সত্ত্বেও, অত ধরা সত্ত্বেও আপনারা সবাই মিলে তার উপরে তিন-চারশ'র বেশী আর করতে পারেননি। আর যা' করা হয়েছে, তার ভিতর অনেকেই genuine (খাঁটি) নয়, তাও হয়তো জানেন। আমি কী বুঝব ? এই কি বুঝতে পারি, আপনারা এটা বোঝেননি ? তা' ভাবতে ইচ্ছা হয় না। মনে হয় আমাদের ইচ্ছা নাই। অথচ এর ভিতর-দিয়ে অনেকখানি এগিয়ে গেলেন, অনেক বিষয়ে খরচের ঘোড়সওয়ার হ'য়ে। এই যে অনেকগুলি খরচ হ'য়ে গেল, তা' profitable (লাভজনক) করার persuit (লাগোয়া চেষ্টা) আপনাদের আছে কিনা, বা কতদিন থাকবে, তা' আপনারাই জানেন। অনেক ফন্দি, অনেক মহড়া হয়ত করলেন, দেশের অবস্থার কথাও হয়তো অনেক ভাবলেন, কইলেন, বললেন। কিন্ত দিন যে আমাদের অপেক্ষায় ব'সে থাকবে না, দুর্দিনের আগেই তাকে নিরোধ করবার পাকা সম্বল যে সংগ্রহ ক'রে রাখতে হয়, তা' আপনারা কেন, অনেক অল্পবুদ্ধির যারা, তারাও জানে। বাঁচার দায়িত্বে—চাহিদার অনুরাগে তারাও সে-সম্বল আহরণে পেছপাও হয় ব'লে মনে হয় না।

ধী কি আমাদের নাই ? খুব আছে। আমার মনে হয় আমাদের কেন্দ্রে প্রীতি ততখানি চনমনে, শক্ত ও সাবুদ নয়কো। তার দরুন ঐ ধেঁায়াটে বুঝের ভিতর-দিয়ে প্রবৃত্তি-চোয়ান বুদ্ধি, এমনতর ক'রে বিভ্রান্ত ক'রে তোলে আমাদিগকে। ফলে, সব পেয়েও বা থেকেও আমরা সবহারা। দুঃখে হতাশ হ'য়ে মুষড়ে থাকতে যাতে না হয়, অকর্মণ্যতা সত্ত্বেও খোশমেজাজে সময়টা কাটাতে পারি যাতে, সেইজন্য কোন্ দেশে কে কী করেছে বা বলেছে সেই গল্প ক'রে হাততালি দিয়ে নিজেদের কৃতার্থ বোধ করি। কিন্তু নিজেরা কতটুকু কী করলাম, কতটুকু কী হ'ল, আর পেলই বা কে কতটুকু, আর তার সার্থকতাই বা কোথায় কেমন ক'রে—এসব হদিসের একটা হুঁশিয়ার চেতনা নিয়ে চিন্তা ক'রে কে কতখানি দেখেছে, তা' ভাবতে পারি না। তাই চলনেও নেই উজ্জ্বলতা, উৎসাহ, কৃতকার্য্যতা আয়ত্ত করবার উদ্যমভরা অবিরাম প্রচেষ্টা।

এ-সব কথা বলতে ইচ্ছা করে না, ভালও লাগে না। তাই বলি—যদি আমার কথা ভালই লাগে. যদি চান-ই, করুন—তা' যেমন করেই পারেন না কেন ? আমিও তৃপ্ত পাব—আপনারাও সুখী হবেন। নতুবা আড়ম্বরেই সমাধান হ'য়ে যাবে সব।

দীর্ঘ সময় কথা বলার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বিষন্নভাবে স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলেন। চতুর্দ্দিকে তখন রাত্রের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। আর্ত্ত জীবের জন্য স্রষ্টার বুকে যে করুণাঘন বেদনাবোধ, তারই অনুরণন আবর্ত্তিত হ'তে লাগল—মৌন বিশ্বপ্রকৃতির বুকে।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, সোমবার, শুক্লাতৃতীয়া (ইং ৩০।৫।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় চৌকিতে উপবিষ্ট। স্পেনসারদা, হাউজারম্যানদা, কাজল ভাই, কৃষ্ণা, মুকুল প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত। আজ একটা টেপ-রেকর্ডার আনা হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর "গুরু গোবিন্দ" থেকে কিছুটা আবৃত্তি

করলেন। তারপরেই সেটা শোনা হ'ল। এরপর স্পেনসারদা একটা গান গাইলেন। সেটাও শোনা হ'ল। এবার শ্রীশ্রীঠাকুর 'সত্তা সচ্চিদানন্দময়' বাণীটা পড়লেন। সেটাও শোনা হ'ল। পরে কাজলভাই, কৃষ্ণা ও মুকুলের আবৃত্তি হ'ল। কাজলভাইয়ের আবৃত্তির সময় 'তারপর' ব'লে দুটো কথা ভুল ক'রে উচ্চারিত হয়েছিল, সেটা টেপে উঠে যাওয়ায় শ্রীশ্রীঠাকুর রহস্য ক'রে বললেন—মেশিন কেমন মুখস্থ করতে জানে দেখ।

সত্যানুসরণের যে ইংরেজী অনুবাদ হচ্ছিল তা' থেকেও কিছু পড়া হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ যন্ত্র সম্পর্কে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—দেখ, sperm ও ovum-এ (শুক্রকীট ও ডিম্বকোষে) সূক্ষ্ম ভাবটা impressed (মুদ্রিত) হয়। যেমন magnetic impulse (চৌম্বক সাড়া) impressed (মুদ্রিত) হয় তারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভোগে ব'সে বললেন—যে-শব্দ mechanism of vibration (স্পন্দনের মরকোচ) unfold (প্রকাশ) করে তা' সবকিছুরই পরিপূরক। কম্পনের মূল mechanism (মরকোচ) জানা থাকলে তা' দিয়ে যে-কোন কম্পন, এক কথায় যে-কোন জিনিস সৃষ্টি করা যায়। কারণ, কম্পনের রকমারি থেকেই যা' কিছুর উদ্ভব।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে মাঠে এসে বসেছেন। স্পেনসারদা, মিসেস স্পেনসার, শরৎদা (হালদার), কিরণদা (মুখার্জ্জী) প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত আছেন। গরমের দিন, তাই বেলা প'ড়ে গেলেও বাতাসের মধ্যে একটা তাপ মিশে আছে। মিসেস স্পেনসার এই ধরনের গরমে আদৌ অভ্যস্ত নন। তাই তাঁর বেশ কষ্ট হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে বললেন—মা গান জানে না?

একটু পরে মিসেস স্পেনসার একটা গান গাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটার মানে কী হ'ল?

স্পেনসারদা এবং মিসেস স্পেনসার বুঝিয়ে দিলেন।

প্রফুল্ল বাংলায় তার ভাবার্থ বলল। সঙ্গে-সঙ্গে বলল—গানটা লিখেছেন স্পেনসারদা, আর সুর দিয়েছেন মার্গারেট।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—খুব ভাল।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভালবাসার ভিতরে সন্দেহ আনতে নেই। সন্দেহ ভালবাসার শত্রু। সন্দেহের ঘাড়ে চ'ড়ে শয়তান আমাদের ভিতরে চ'লে যায়। আমার মনে হয়, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে যেন একটা সত্তা। সেইজন্য ক্রাইষ্ট বলেছেন—divorce (বিবাহ বিচ্ছেদ) জিনিসটা অত্যন্ত বিশ্রী। যেখানে divorce (বিবাহ বিচ্ছেদ) আছে, সেখানে worship of Satan (শয়তানের পূজা) আছে। বাইবেলে এই ধরনের কথা আছে। তাই না স্পেনসার?

স্পেনসারদা—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Prophets are born not by complexes but through complexes (প্রবৃত্তি-পরিচালিত হয়ে মহাপুরুষরা জন্মগ্রহণ করেন না, যদিও প্রবৃত্তিকে আশ্রয় ক'রে তাঁদের আবির্ভাব হয়)। তাই ক্রাইষ্ট বলেছেন—I come from above, ye from below (আমি ঊর্ধ্ব লোক থেকে আসি, তোমরা নিম্নলোক থেকে আস)।

প্রসঙ্গতঃ মিসেস স্পেনসার জিজ্ঞাসা করলেন—প্রেরিত পুরুষ যদি বিবাহিত হ'ন তাঁর সন্তান কেমন হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রেরিত পুরুষ হলেই যে তাঁর ছেলে ভাল হয় তার মানে নেই। এটা নির্ভর করে অনেকটা স্ত্রীর উপর।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমের বারান্দায় দক্ষিণাস্য হ'য়ে ব'সে যতিদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছেন। তিনি হঠাৎ বললেন—আচ্ছা, এইরকম যে ঠেকে—এই চেহারা নয়, এর সঙ্গে কোন সংশ্রব নেই—আলাদা দেশ—আলাদা পরিস্থিতি—আত্মীয়স্বজন এ-সব নয়, তাদের সঙ্গে চলছি, কথাবার্ত্তা বলছি, সে রকমই আলাদা, —এটা কেন হয় ? এর কি কোন মানে আছে ? আপনাদেরও কি এমন হয় ?

যতীনদা (দাস)—না, আমার তো হয় না। আপনার এরকম সাধারণতঃ কখন হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেক সময় ধ্যানের সময় হয়।

নাম-ধ্যান, ভজনের অনুভূতি সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাম করার সময়, অনেক সময় এমন ঊর্ধ্বমুখী টান হয় যে, পুরুষাঙ্গ, অণ্ডকোষ ইত্যাদি একেবারে শরীরের ভিতরে ঢুকে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গতঃ বললেন—আমি বিকেলে একটা কথা বলছিলাম, প্রবোধ (মিত্র) ঠিক ধরতে পারেনি। ওর ব্লাড প্রেসার বোধহয় কম, তাই alert (সজাগ) থেকে সব কথা ধরতে পারে না।

শরৎদা—অনেক সময় আগে একজন মানুষের বেশ জেল্লা দেখা যায়, কিন্তু এখানে আসার পর বাস্তব কাজে ততটা তুখোড় রকম দেখা যায় না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গভীরতর স্তরে যত যাবেন, তত গভীর টান চাই। অনুরাগ, আগ্রহ খুব তীব্র না হলে ঐ স্তরে সমান তালে কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করা যায় না। অনুরাগ, আগ্রহ যত বেশী হয়, তত মানুষ alert ও keen (সজাগ ও তীব্র) হয়। তখন "ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে মন আমার"—এমনতর হয়। মন গভীর হ'তে গভীরতর স্তরে সচেতনভাবে আনন্দের বোধ নিয়ে, নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে যেতে থাকে। যতই সূক্ষ্মস্তরে যাক্ না কেন, চেতনার প্রবাহ ছিন্ন বা খণ্ডিত হয় না। অতলতলে প্রবেশ ক'রেও আরও-আরও সূক্ষ্ম ব্যাপার pursue (অনুসরণ) করার রোখ লেগে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর যতীনদাকে স্পেনসারের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন।

যতীনদা—আমরা দু'জনে এক সঙ্গে বাগানের কাজ করছিলাম। কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন বিশেষ কোন কথা হয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখন যে-কাজই করেন, সে কোদালই কোপান আর যা'ই করেন, তার মধ্যে দিয়ে সংশ্লিষ্ট পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে যাজন চালাতেই হয়। ওতে নিজেরও ভাল, মানুষেরও ভাল।

প্রফুল্ল—নাম-ধ্যানে কি বিজ্ঞানের বিষয় জানা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' না হ'লে আমি কই কি ক'রে? কোয়ান্‌টা, ইলেকট্রন, প্রোটন—এসব নাম তো জানতাম না, তবে জিনিসগুলি দেখা ছিল, তাই বলতাম। পরে ওদের কথায় বুঝলাম কোন্‌টা কি। তাই যখনই কোন কথা ওঠে, দেখে দেখে কই। Vision (দর্শন) আসে।

পরে যতিদের দিকে চেয়ে বললেন—দেখেন, ভগবান কেন দরকার এই কথাটা কি কোথাও পেয়েছেন? আমি বুঝি, আমার আকৃতি যদি আমার ঊর্দ্ধে কোথাও না থাকে, তাহলে আমার বিবর্ত্তন হ'তে পারে না। আমার ঊর্দ্ধে, আমার বাইরেও কারও প্রতি টান থাকলে change (পরিবর্ত্তন)-টা তাঁর দিকে তেমনতর হ'তে পারে। Libidoic urge (সত্তাগত সম্বেগ) বলতে যা' বোঝায়, সেইটে যদি খতম ও নিষ্ক্রিয় ক'রে দেওয়া যায়, তবে জড়ের মত হ'য়ে যায়। রোগীর মত খাচ্ছি, আছি, কোন-কিছু করার ক্ষমতা নাই—এমনতর রকম হয়। সত্তাগত সম্বেগ যার যত কম, তার বিবর্ত্তন বা বিবর্দ্ধন বা পরিবর্ত্তন তত কম,—পাথর বা লোহার যেমন। পরিবর্ত্তন ঘটাতে গেলে অতখানি তাপ অর্থাৎ তপ লাগে। লোহাটার রূপ বদলাতে গেলে, আগুনের তাপে গলিয়ে তবে করা লাগবে। সেইজন্য তপস্যা বলেছে। ভগবান লাভের কথা বলছিলাম—তার মানে, ষড়ৈশ্বর্য্যবান কোন জীবন্ত মানুষে যদি প্রচণ্ড নিঃস্বার্থ ভালবাসার নেশা জাগে এবং ঐ সম্বেগ নিয়ে যদি তাঁর মনোজ্ঞ রকমে ভাবা, বলা ও চলার তপস্যা চলতে থাকে—তাঁর সুখ, স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার ধান্ধা নিয়ে,—তাহ'লে মানুষটারও অমনতর রূপান্তর হ'তে থাকে। তাঁকে তত্ত্বতঃ জানবার জন্যে, আবার তাঁর দীক্ষায় দীক্ষিত হ'য়ে তাঁর নির্দ্দেশমত আত্মিক বিকাশের জন্য সাধনা করা লাগে। ভগবান লাভ মানে প্রত্যেকের স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী তার অন্তর্নিহিত ভগবত্তাকে জাগিয়ে তোলা।

পরে আবার কথাপ্রসঙ্গে বললেন—Science (বিজ্ঞান)-এর মানুষ যদি শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হয়, তবে সে পারে ভাল। তার তো একটা বাস্তব রকমের সঙ্গে পরিচয় থাকে কি না! সম্বেগটা সুকেন্দ্রিক না হ'লে বিবর্ত্তন হয় না। বহুনৈষ্ঠিক হ'লে diffused (বিক্ষিপ্ত) হ'য়ে যায়। Diffused (বিক্ষিপ্ত) হলেই integration (সংহতি) জিনিসটা হয় না। একটা আবোল-তাবোল পাগলাটে রকম হয়। অসতী মেয়েদের দেখলেই পার।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, মঙ্গলবার, শুক্লাচতুর্থী (ইং ৩১। ৫। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে গোল তাঁবুর পাশে পশ্চিমাস্য হ'য়ে ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট।

প্যারীদা (নন্দী) শ্রীশ্রীঠাকুরের পায়ের নখ কেটে দিচ্ছেন। নখ কাটার পর প্যারীদা নখের কোনাগুলিতে হাত বুলিয়ে দেখছেন হাতে বাধে কি না। নখ কাটা হ'য়ে গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে একবার হাত বুলিয়ে দেখে বললেন—এই-এই জায়গায় লাগছে।

তখন প্যারীদা আবার উক্ত জায়গাগুলি মসৃণ ক'রে দিলেন।

রাশিয়া সম্বন্ধে কথা উঠতে সুবিমলদা (পাল) বললেন—ওরা জোর দেয় অর্থনীতির উপর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অর্থনীতি আসে কোথা থেকে? সেটা আসে adjustment of labour (শ্রমের বিন্যাস)-এর ভিতর-দিয়ে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যদি না থাকে, ব্যক্তিগত গুণের যদি বিকাশ না হয় স্বাধীনভাবে,—তাহলে কিছু হবে না। স্বাধীনভাবে বলতে আমি বুঝি, প্রত্যেকের নিজস্ব রকমে—পরিবেশের সত্তাসম্বর্দ্ধনাকে ব্যাহত না ক'রে।

প্রফুল্ল—শিক্ষা ও জীবিকার বেলায় তো ওরা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের বিকাশের সুযোগ দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্টেটের কাজে লাগাবার জন্য একটা যন্ত্রের যেমন উন্নতি বিধান করে, সেইভাবে ব্যক্তির উন্নতি সাধন করলে চলবে না। যন্ত্র যেমন স্টেটের সম্পত্তি, ব্যক্তি কিন্তু তা' নয়কো। ব্যক্তির নিজস্ব একটা সত্তা ও অধিকার আছে। সেটা কেড়ে নেওয়া চলবে না। তবে সে যাতে সমাজের ক্ষতি করতে না পারে, তেমনতর check (বাধা) থাকা ভাল। Indian Socialism (ভারতীয় সমাজতন্ত্র)-ই আমাদের উপযোগী। সেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য জিনিসটা কেড়ে নেওয়া হয় না। সমাজতন্ত্রই হোক আর যাই হোক, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে যা' fulfil (পরিপূরণ) করে তাই আমাদের কাম্য। ব্যক্তিকে বাড়াতে চাই। প্রত্যেকে service (সেবা) দিক সেটা চাই, কিন্তু কাউকে slave (ক্রীতদাস) হ'তে দিতে চাই না। আমি আছি, আমার বৃদ্ধি চাই—তা' সব দিক দিয়ে। আমার কর্ম্মের বাস্তবায়িত ফল হ'ল আমার সম্পদ। সন্তানও যেমন আমার, আমার কর্ম্মফলজাত সম্পদও তেমনি আমার। তাই, সন্তান আমার সম্পদের অধিকারী হবে—এটা স্বাভাবিক। সন্তানরূপে আমি যেন আমার অর্জ্জিত সম্পদ উপভোগ করতে পারি; তবে আমি যেমন ইষ্ট, কৃষ্টি ও পরিবেশের সেবক—আমার সবকিছু নিয়ে,—আমার সন্তানেরও তেমন হওয়া উচিত। সম্পদের অধিকারী ব'লে সে ইষ্ট, কৃষ্টি ও পরিবেশকে উপেক্ষা ক'রে সম্পদের ব্যবহার এমনতরভাবে করতে পারবে না, যা' কিনা সপরিবেশ তার বাঁচাবাড়ার পরিপন্থী।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে এসে বসলেন।

সুবিমলদা, সুধাংশুদা (মৈত্র) প্রমুখ শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে যতি-আশ্রমে আসলেন।

পূর্ব্ব প্রসঙ্গের সূত্রে সুবিমলদা বর্ত্তমান যান্ত্রিক যুগের উৎপাদন ব্যবস্থার কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গার্হস্থ্যযন্ত্রের প্রবর্ত্তন ক'রে যাতে একটা জিনিসের নানা অংশ বিভিন্ন বাড়িতে তৈরী হয় তার ব্যবস্থা করা ভাল। পরে অংশগুলি একত্র সমাবেশ ক'রে বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করা যায়। তাতে সব লোকের কলকারখানার শ্রমিক হওয়া লাগে না। বাড়ীতে-বাড়ীতেই অঢেল উৎপাদন হতে পারে। তাতে শ্রমিক-মালিকের সমস্যা থাকে না। শুনেছি, সুইজারল্যাণ্ডে ঘড়ির নানা অংশ নাকি বাড়ীতে-বাড়ীতে কুটীরশিল্প হিসাবে তৈরী করা হয়। পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে নানারকম খেলার সরঞ্জাম তৈরী হয়। তাও অনেকখানি নাকি কুটীরশিল্পের মত করা হয়। জাপানের কথাও শুনেছি—সেখানকার শিল্পোন্নতির মূলে কুটীরশিল্পের অবদান অনেকখানি। একক কোন ব্যক্তির হাতে বা রাষ্ট্রের হাতে অঢেল অর্থ-সামর্থ্য জমা হোক, আর সাধারণ মানুষ সেই খপ্পরে গিয়ে পড়ুক এবং তার ফলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লোপ পাক, এটা ভারতীয় আর্য্য-সমাজতন্ত্রের কাম্য নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাঠে চেয়ারে বসে ছিলেন। সুধাংশুদা (মৈত্র), চুনীদা (রায়চৌধুরী), শরৎদা (হালদার), কিরণদা (মুখোপাধ্যায়), প্রকাশদা (বসু), পণ্ডিত (ভট্টাচার্য্য), অরুণ (জোয়ার্দ্দার) প্রভৃতি কাছে বসা। পূজনীয় বড়দা আসলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের দেশে যদি কম্যুনিজম্ আসে, তাহলে আমাদের বইগুলি রাখতে দেবে কিনা কি জানি!

একটু পরে বললেন—ওরা যেমন কর্ম্মঠ ও উৎসাহী তেমন খুব কম দেখা যায় আমাদের ভিতর।

শরৎদা—অর্থনৈতিক কম্যুনিজম্ তো সকলেই চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলে কিছু থাকবে না। কম্যুনিজম্ হ'লেই বা কি হবে? স্বদেশী যুগ থেকেই তো ব'লে আসছে—দেশ স্বাধীন হ'লে অমুক হবে, তমুক হবে, কিন্তু স্বাধীনতার পর এখন আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? যাই আসুক আর যাই হোক, মানুষ যদি মানুষ না হয় এবং মানুষের আপনজন না হয়, তাহলে কোন জিনিস শুভবুদ্ধি-প্রণোদিত হলেও, তা' ঠিকভাবে পরিপালিত হ'তে পারবে না। ফলে—দেশের লোকের ভাল হবে না। তাই মানুষ তৈরীর দিকে সবচেয়ে বেশী নজর দিতে হয়।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কম্যুনিস্ট শাসন প্রবর্ত্তিত হ'লে, তার মধ্যে যতই গলদ থাকুক না কেন, শুনেছি সে-সম্বন্ধে কোন সমালোচনা করা চলে না। দোষ থাকলে তার সমালোচনা ও সংশোধন কেন করা যাবে না তা' বোঝা যায় না। মানুষের মঙ্গলের জন্যই তো যা'-কিছু, না একটা বিধান অকল্যাণকর হ'লেও তার

কাছে আত্মবলি দেওয়ার জন্য মানুষের অস্তিত্ব? বিহিত অসৎ-নিরোধের অবকাশ না থাকা মানে অসৎকে কায়েম ক'রে নিজেদের সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত ক'রে তোলা। আমাদের উপর দিয়ে তো কম ঝড়ঝাপটা যায়নি। মুসলমান শাসন গেল, ইংরেজ শাসন গেল, প্রত্যেকেই তাদের মতো আমাদের প্রভাবিত করতে কম চেষ্টা করেনি। আমরা যদি ঠিক-ঠিক ইষ্ট-কৃষ্টিপরায়ণ থাকতাম, তাহলে পরাধীনতা সত্ত্বেও ওদেরই সত্তা-সম্বর্দ্ধনার সম্বল জুগিয়ে আমাদের প্রতি শ্রদ্ধাবনত ক'রে তুলতে পারতাম। কতরকমের ধুয়ো কত সময় উঠল। বামুন-কায়েতের মেয়ে বিয়ে করা যাবে না কেন, এই নিয়ে বৈশ্য শূদ্রদের মধ্যে কত গরম-গরম বক্তৃতা এক সময় দেশে হয়ে গেছে। যদি দেখা যায়, দেখা যাবে—এর মূলেও আছে বামুনেরই প্রচেষ্টা—যেমন দিগীন ভট্টাচার্য্য, সমাধি প্রকাশ আরণ্যক প্রভৃতি। সাধারণ মানুষ জানত না—কোনটার তাৎপর্য্য কী। তাদের একটা শ্রদ্ধা ছিল উচ্চবর্ণের প্রতি, সে-সব ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। প্রবৃত্তির উস্‌কানি, অশ্রদ্ধার চাষ—এগুলি মানুষের মুখরোচক লাগতে পারে—কিন্তু এ দিয়ে মানুষের কল্যাণ হয় না। কোন উচ্চ বর্ণের লোক বা উচ্চপদস্থ লোক খারাপ হ'লে, তার জন্য তার বর্ণের উপর বা ঐ উচ্চপদের উপর অশ্রদ্ধা সঞ্চার করার কোন মানে হয় না। দোষী যে সে দোষীই। একজন বিপ্র বা ধনী যদি উচ্ছৃংখল চলনে চলে, তাহলে বিপ্রত্ব বা ধনাঢ্যতাকে সেই বেচাল চলনের জন্য অপরাধী সাব্যস্ত করা চলে না—যদিও অবশ্য মানুষ এটা ভুল ক'রে ক'রে থাকে। অনেক দোষ আছে, যার প্রতিকার করতে গেলে, মানুষের ভিতর আদর্শানুরাগ ভাল ক'রে চারান লাগে। প্রকৃত শ্রেয়ের প্রতি শ্রদ্ধা-পরায়ণতা যাতে জাগে তাই করাই ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে মাঠ থেকে ফিরে যতি-আশ্রমে এসে বসলেন। সেখানে ব'সে নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

গবেষণাশীলতার কতকগুলি
চরিত্রগত লক্ষণ আছে—যথা :—
শ্রদ্ধাশীলতা, উন্মুখতা,
অনুসন্ধিৎসা, অনুশীলন-প্রবণতা,
প্রণিধানপরতা, নিরন্তরতা,
নিশ্চয়ী-তৎপরতা,
উদ্দেশ্যানুধাবকতা,
বিবেচনা-প্রবণতা,
সংযম, সুচরিত্র—
আর শরীর ও মনের সামঞ্জসী সুস্বাস্থ্য।

বাণী দেওয়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এটা সব ব্যাপারেই প্রয়োজন, বিশেষতঃ গবেষণার কাজে।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, বুধবার, শুক্লাপঞ্চমী (ইং ১।৬।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে উপস্থিত। যতিবৃন্দ ও সুধাংশুদা (মৈত্র) কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে গবেষণা সম্বন্ধীয় লেখাটা সুধাংশুদাকে শোনাতে বললেন।

সুধাংশুদা বাণীটি শুনে বললেন—এই রকম লোকই তো কম দেখা যায়। প্রফেসারদের মধ্যে এক দেখি সতোন বসুকে। তাঁর অনুসন্ধিৎসার শেষ নেই। ফিজিক্স-এর মানুষ হয়েও এখন আবার কেমিষ্ট্রির রিসার্চ করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা যে জানে, জানার মত জানলে, পরে সবটাই জানতে পারে।

বুরব্যাঙ্কের একটা উক্তি আছে—Heredity is the sum of all past environments (বংশগতি যাবতীয় অতীত পরিবেশের যোগফল)।

এই বিষয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—"সংস্কার-সাক্ষাৎকারাৎ পূর্ব্ব-জাতিজ্ঞানম্।" সংস্কার অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য সাক্ষাৎকার করতে পারলে, কোন্ পরিবেশে সেই সংস্কার বা বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হয়েছে—কোন্ পরিবেশের ভিতর প'ড়ে এগুলি লাভ করেছে—প্রত্যেকে তার নিজস্ব রকমে,—তা' বোঝা যায়।

শরৎদা—আমরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য এখনই কী করতে পারি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিক এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে, এখনই আমরা কিছু করতে পারি না। তবে কোন্ ভিত্তিতে কী হ'তে পারে সেটা এমনভাবে ঝক্‌ঝকে জ্বলজ্বলে ক'রে সবার সামনে ধরতে পারি, যাতে মানুষের বুঝতে কিছু বাকী না থাকে।

শরৎদা—আমাদের এই বর্ণাশ্রমী বিধানে সব সময় কি রাজা ছিল, না, বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রও ছিল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাজা থাক আর না থাক, তাতে কিছু এসে যায় না। এই ধরনটা থাকলে কুলপতি, সম্প্রদায়পতি, সমাজপতি ইত্যাদি থাকে। রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সমাজ থাকে। সবার উপরে থাকে রাষ্ট্রপতি। এইসব কুলপতি, সম্প্রদায়পতি, সমাজপতি ইত্যাদি হ'ল tested efficient men (পরীক্ষিত দক্ষ ব্যক্তি)। এদের মধ্যে যে যত practical ও fulfilling (করিৎকর্ম্মা ও পরিপূরণী), সে তত বড়। এদের আবার assistant (সহকারী) থাকে। উপরের একজন এক জায়গা থেকে স'রে যাওয়া মাত্র হাতেকলমে তৈরী আর একজন সে-স্থান অধিকার করে। এইভাবে চলতে থাকে। সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি হয় রাষ্ট্রপতি।

হরিদাসদা (সিংহ)—ভোটের ব্যাপার হ'লেই তো গোলমাল হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভোট স্বাভাবিকভাবেই হয়। পাঁচজন যোগ্য মানুষ আছে, তাদের মধ্যে থেকে তারা নিজেরাই ঠিক ক'রে এক-একজনকে এক-এক কাজের ভার দেয়। ভোট হ'লেও মানুষ নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত তার বাস্তব চরিত্র ও কর্ম্মদক্ষতার ভিত্তিতে। প্রত্যেক পরিবারের যোগ্যতম ব্যক্তিরা নিজে থেকে ঠিক ক'রে দেবে গ্রামের যোগ্যতম

ব্যক্তি কে। কেউ প্রার্থী দাঁড়াবে না। সারা গ্রামের লোকের অধিকাংশের ভোটে জানা যাবে তারা গ্রামের কোন্ বিশেষ ব্যক্তিকে যোগ্যতম ব্যক্তি ব'লে মনে করে। এইভাবে গ্রামের পর থানা, থানার পর মহকুমা, মহকুমার পর জেলা—ইত্যাদি স্থানের বিশিষ্ট লোকদের নির্ব্বাচন হবে। কেউ নিজের ঢাক নিজে পেটাবে না। তার বাস্তব সেবা ও চরিত্র এমন হওয়া চাই যে, লোকে তাকে চায়।

শরৎদা—এক-একজন এক-একভাবে হয়ত সেবা দেয়। যে খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করে তাকে হয়ত সাধারণ লোক শিক্ষাবিদের চাইতে বেশী মর্য্যাদা দেবে। এইভাবে তো দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সমাজের নানারকম প্রয়োজন আছে। যেমন—অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, কৃষ্টি, নিরাপত্তা ইত্যাদি। রাষ্ট্রের মধ্যেও এইসব রকমারি প্রয়োজন ভালভাবে মেটাতে পারে—এমনতর বিভিন্ন ধরনের যোগ্য লোকের দরকার আছে। সব রকমের যোগ্যতাসম্পন্ন লোক যাতে সমাজ ও রাষ্ট্রে উপযুক্ত মর্য্যাদা ও কর্তৃত্ব লাভ করে তার ব্যবস্থা করতে হবে। ধর্ম্ম অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গীণ বাঁচাবাড়ার প্রচেষ্টাই হবে মুখ্য। সেইদিকে লক্ষ্য রেখে যা'-কিছু করতে হবে। এটা দলবাজি বা গলাবাজির ব্যাপার না।

শরৎদা—একটা নৈতিক পরিবেশও তো তৈরী করা দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কম্যুনিষ্টরা যে তাদের ভাবধারা চালু করেছে তার পেছনেও যাজক, শ্রমণ, যতি ইত্যাদি ছিল—তাদের মতো ক'রে। এইভাবে প্রথমে একটা climate ও atmosphere (আবহাওয়া ও পরিমণ্ডল) তৈরী করেছে, তার ফলেই যা' করার করতে পেরেছে। আপনাদেরও আছে সব, এখন সেগুলি পরিবেশন করা লাগবে—climate ও atmosphere (আবহাওয়া ও পরিমণ্ডল) করা লাগবে। মানুষের মাথার একটা রকম আছে, উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারলে, ভাবধারাগুলি শুধু তত্ত্ব-কথায় মানুষের মাথায় ঢোকে না। যার চিন্তায় ও আচরণে ভাব দানা বেঁধে ওঠে তেমনতর একটা মানুষ সামনে হাজির হলেই, তার একটা প্রভাব হয় মানুষের মনের উপর। তাকে দেখে, তার মুখে শুনে মানুষ যা' বোঝে, শুধু বই প'ড়ে বা অনুভূতিহীন মানুষের কাছে তাত্ত্বিক আলোচনা শুনে কিন্তু তা' হয় না।

সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা সম্পর্কে কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আগে বিপ্রদের সর্ব্ব শাস্ত্রে পারদর্শী হওয়া লাগত। তারা ছিল teacher (শিক্ষক)। বহু বিষয় তাদের শিখতে হ'ত এবং অনেক বিষয় হাতেকলমে তালিম নিতে হ'ত। যার জানার বিস্তার ও গভীরতা যত বেশী হ'ত, যাকে দিয়ে সমাজের লোক যত বেশী পরিপূরিত হ'ত, তার সম্মানও ছিল তত বেশী। আশ্রমের ছেলেপেলেরা এক সময় কত বিষয় শিখত। সেইরকম একটা atmosphere (আবহাওয়া) তৈরী করতে হয়, যাতে নানা বিষয়ে একটা কাজ চলার মত জ্ঞান ছাত্র-ছাত্রীরা লাভ করতে পারে—প্রত্যেকে তার নিজস্ব রকমে। আগে ছেলেরা ইলেকট্রিসিটির কাজ শিখত, কাঠের কাজ জানত, লোহার কাজ

শিখত, নিজেরা ছোরা তৈরী করতে পারত, কেউ-কেউ রাজমিস্ত্রীর কাজ শিখত, তরিতরকারীর বাগান করত, গাছে চড়তে জানত, সাইকেল চালাত, সাঁতার কাটত, ফুলের বাগান করত, রোগীর শুশ্রূষা করত, প্রাথমিক চিকিৎসা জানত, দরকার হ'লে রান্না করতে পারত, পরিবেশন করত, বাজার-হাট করত, আরও কত রকম করত। আবার কত সকাল-সকাল পটাপট পাশ ক'রে বেরুত। রাশিয়া হয়ত খুবই করেছে, কিন্তু আপনারা আপনাদের মত ক'রে আরও ভাল ক'রে করতে পারেন না, তা'তো নয়। তারা পারে আপনারা পারেন না—এ-কথায় আমার খুব লাগে, এ-কথা আমি সইতেই পারি না। আমার সংগঠন-মূলক পরিকল্পনার ভিতর কিছুই তো বাদ দিইনি। প্রত্যেকটি মানুষ তার নিজস্ব রকমে যাতে চৌকস ও দক্ষ হ'য়ে ওঠে সেই কথাই তো আমি বরাবর বলি। আর এই যে সব বিষয়ে পারঙ্গম হ'য়ে উঠবে তার মূল লক্ষ্য থাকবে—ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠাপন্ন হওয়া। শুধু দেশ-দেশ, মানুষ-মানুষ করলে হবে না। মানুষকে আদর্শাভিমুখী হয়ে তাঁরই পরিপূরণার্থে পরিবেশের সেবায় তুখোড় হয়ে উঠতে হবে। এইটেই হ'ল ভারতীয় শিক্ষার মূলকথা। শিবহীন দক্ষতা অর্জ্জনের আত্মকেন্দ্রিক উচ্চাশা মোটেই ভাল না। ওতে মানুষ সব শিখে, জেনেও পরস্পর পরস্পরকে দাবিয়ে নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করতে চেষ্টা করে। এটা হ'ল আসুরী ভাব। আসুরী ভাব যাদের মধ্যে মুখ্য, তারা বিপর্য্যয় ও বিধ্বস্তির হোতা হ'য়ে ওঠে। তা' আমাদের লক্ষ্য নয়কো। আমরা এখনও ঐ ভাবে ভাবিত হয়ে আছি। আমরা কি নিজেদের রূপ দেখতে চাইব না?

সর্ব্বহারা সম্পর্কে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর দৃপ্ত ভঙ্গীতে বললেন—মানুষের চরিত্র যদি থাকে, তাহলে সে কখনও সর্ব্বহারা হ'য়ে থাকে না। মহেশ ভট্টাচার্য্যী গরীবের ছেলে, তাকে নাকি কে একশ টাকা দিয়েছিল। তা' দিয়ে ব্যবসা ক'রে দাঁড়িয়ে ঐ সাহায্যকারীর ছেলেপেলেদের দালান-কোঠা ক'রে দিয়েছে, কতরকম সাহায্য করেছে, তবু নাকি তার ঋণ শোধ হয়নি। আবার দেখেন, কতজনকে আপনি হয়ত খেতে-পরতে দিচ্ছেন, কিন্তু তাকে দিয়ে দু-পয়সার কাজ আপনি পাবেন না। একটা কাজের কথা বললে কত রকম ওজর-আপত্তি করবে। তাই চরিত্র যদি না বদলায়, স্বভাব যদি না বদলায়, service (সেবা) যদি না দেয়, তাহলে তাকে দিয়ে কি কিছু করতে পারেন? যাদের সহায় নেই, সম্বল নেই, তারাও চরিত্রের গুণে ঐ অবস্থার মধ্যেও দাঁড়িয়ে যেতে পারে, successful (কৃতকার্য্য) হ'তে পারে। তার জন্য ধর্ম্মদান করা লাগে, যাতে ইষ্টের প্রতি টানে সপরিবেশ নিজেকে ধারণ করার, পালন করার যোগ্যতা অর্জ্জন করতে পারে। এছাড়া কিছু হবে না। মানুষ দিন-দিন অধোগতির দিকে নেমে যাবে। শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও এমন দেখা যায়, যারা কাজ করতে নারাজ, ফাঁকি দিতে ওস্তাদ। এদের সংখ্যা আজ নিতান্ত কম নয়। নিজেদের দাবি-দাওয়া সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে এরা খুব চোস্ত। আমি তো ভাবি, এদের স্বভাবই এদের শত্রু। তা' না বদলালে এদের দিয়ে কিছু করান যাবে না। এই ধরনের মানুষের

জন্য লাগে এমন ব্যবস্থা, যেখানে বেয়নেটের গঁতো দিয়ে তাদের কাজে বাধ্য করা হবে। কম্যুনিজ্‌ম্‌ তো কাউকে বসিয়ে রেখে খাওয়াতে পারে না, সেখানে খেটেই খেতে হয় মানুষকে। আমার কথা হ'ল—নিজের মাথা খাটিয়ে মানুষ যদি একটা কিছু ক'রে খেতে চায়, তার কি কখনও খাওয়ার অভাব হয়? আমাদের শিক্ষাটাই হয়ে গেছে গোলমেলে, যার দরুন চাকরী ছাড়া পথ দেখে না। এইটের আমূল পরিবর্ত্তন করা দরকার, তাহলে কোন মানুষই কখনও নিজেকে সর্ব্বহারা মনে করবে না। তাই তো আমি দীক্ষা ও পারস্পরিক সেবার কথা অত ক'রে কই। মানুষ উপায় করতে শেখা শিক্ষার একটা প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। আর প্রত্যেককে তার নিজ অনুসন্ধিৎসু সেবার মাধ্যমে করতে হবে তা'। সে দায়িত্ব তার নিজের। অপরকে দোষ দেওয়া চলবে না।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, বৃহস্পতিবার, শুক্লাষষ্ঠী (ইং ২।৬।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে যতিবৃন্দের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—জীবনসত্ত্ব বাঁচার ইচ্ছায় আত্মপ্রকাশ করে। পরিবেশের নানা দ্বন্দ্বের সংঘাতে তার ভিতর adaptability grow করে (উপযোজন ক্ষমতা জন্মায়)। এমনি ক'রে তা নানা-ভাবে রূপায়িত হয় বিশিষ্ট সম্বোধি নিয়ে। আমরা যা'-কিছু দেখি তা কিন্তু এই জীবনসত্ত্বেরই বিবর্ত্তনী পরিণয়ন। অবস্থা ও রকমারির ভিতর-দিয়ে আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত যা'-কিছু এইভাবেই প্রকটিত হয়। আর, প্রত্যেকটি এক-এক রূপের মধ্যে নিহিত থাকে এক-একটি বৈশিষ্ট্য। তা' পরিবেশ থেকে আহরণও করে তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী—সংঘাত এড়িয়ে এবং সত্তার পোষণ সঞ্চয় ক'রে। আবার, এই অপরাজেয় জীবনসত্ত্ব আছে ব'লেই পরিস্থিতি-ভেদে তার পরিণাম নানারকম হতে পারে—সংযোগ-বিয়োগের ভিতর দিয়ে। এর ভিতর-দিয়ে বোধিও তদনুযায়ী বিনায়িত হয়, যার দরুন অনুকূল যা' তা' সঞ্চয় করতে পারে—প্রতিকূল যা' তা' প্রত্যাহার ক'রে।

কথা হচ্ছে, এমন সময় শ্রী এস কে চ্যাটার্জ্জী এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে তাঁর আসনের পশ্চিমদিকে মাদুরে যতিদের পাশে বসলেন। তিনি বললেন—পূর্ব্বস্থলীতে আশ্রমের জন্যে জমি পাওয়া যেতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমি বলি—'মৃদু প্রতিকারে হবে না ব্যাধির নিপাত গো।' এখন খুব জোর লাগতে হবে। মানুষের কানের কাছে গিয়ে বারবার শোনান চাই—ইষ্টার্থে বিপুলভাবে লোকসংগ্রহ করতে হবে। তাদের মধ্যে অচ্যুত নিষ্ঠা ও কৃষ্টি-সম্বোধনা জাগিয়ে তুলতে হবে। অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ চালু করতে হবে, প্রতিলোমকে লৌহ হস্তে প্রতিরোধ করতে হবে, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির প্রতিষ্ঠার্থে প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। সত্তা-পোষণী ভাবধারাগুলি সমাজের স্তরে-স্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে। নচেৎ এ জাতকে বাঁচান যাবে না, টেকানো যাবে না। আমরা জানি না আমাদের বৈশিষ্ট্য। আমরা বরাবর নীচুকে উঁচু করতে চেয়েছি, বড়কে

আরও বড় করতে চেয়েছি। আপনার মেয়ে যদি মেথরের সঙ্গে বিয়ে দেন, তার সন্তান হবে প্রতিলোম। প্রতিলোম সন্তান হ'য়ে ওঠে পরিধ্বংসী ও চন্ডাল। ধর্ম্ম ও কৃষ্টির বিরোধী হয় তারা। বামুন কায়েতের মেয়ে অঢেলভাবে চ'লে যাচ্ছে নীচু ঘরে। একটা ছেলে একটু লেখাপড়া জানে, দুটো পয়সা কামাই করে, তাহলেই হ'ল। আমরা ধান-পান চাষ করি, কুকুর চাষ করি, গরু-ভেড়া-ঘোড়ার চাষ করি, কিন্তু মানুষের চাষ না করলে কি হয়? আমাদের ঋষিরা ঘরে-ঘরে ভগবৎকল্প পুরুষ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। সেইটেই তো কাম্য। আজ ধুয়ো উঠেছে—বামুন সর্ব্বনাশ করেছে, কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। বিরুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে নিজেদের কৃষ্টি ঠিক রাখার জন্য তারা হয়তো গোঁড়ামির পথ বেছে নিয়েছে—খাওয়া-দাওয়া, ছোঁওয়া-নাড়া সম্বন্ধে সদাচার পালন ক'রে চলেছে। তার মানে এই নয় যে, তারা নিম্ন বর্ণকে ঘৃণা করতে চেয়েছে। অবশ্য, কিছু-কিছু ভুলত্রুটি যে না হয়েছে তা' আমি বলি না। কিন্তু তারা যে লোকের জন্য যথেষ্ট ভাল করেছে একথাও অস্বীকার করা চলে না। কত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন উপেক্ষা ক'রে ত্যাগ-তপস্যার জীবন নিয়ে কৃষ্টিকে আঁকড়ে ধ'রে চলেছে। চৈতন্যদেব বলেছেন—'চন্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।' তার মানে, হরিভক্তিটাই প্রধান কথা। আমাদের চেষ্টা ছিল মানুষ যাতে হরিভক্তিপরায়ণ হয়ে জীবন সার্থক করতে পারে। সেই ভাবের উদ্বোধনের জন্যই যা কিছু নিয়ম-নিষ্ঠা, বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা ছিল।

আপনার বুদ্ধি আছে, দরদ আছে, দয়া আছে, কর্ম্মশক্তি আছে, মানুষের জন্য বোধ করেন—তাই বলি মানুষগুলিকে বাঁচান। বৃত্রাসুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হ'য়ে দেবগণ কাতর প্রার্থনায় একদিন দেবীর আবির্ভাব সম্ভব ক'রে তুলেছিলেন। অদ্বৈত কাতর হ'য়ে গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে নিত্য ডাকতেন—প্রভু! তুমি এস, গ্লানি দূর কর। তিনি এসেছিলেনও। আজও তেমনতরই দুর্দ্দিন, মানুষ পশুত্ব-কবলিত হ'তে চলেছে, মনুষ্যত্বের ভিত বুঝি বা উপড়ে ফেলবে। Sex and hunger-এর (যৌনলিপ্সা ও ক্ষুধার) তর্পণ মানুষের কাছে মুখ্য হ'য়ে উঠেছে। আমরাও যে sex and hunger (যৌনলিপ্সা ও ক্ষুধা) বাদ দিতে বলছি তা' না। কিন্তু আমরা চাই সেগুলিকে সত্তাপোষণী ক'রে তুলতে। আমরা চাই ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্মের ভিত্তিতে পারস্পরিক প্রীতি ও সেবা নিয়ে মানুষের মতো বাঁচতে।

এমন সময় পূজনীয় বড়দা আসলেন। বড়দা প্রণাম ক'রে বসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীযুক্ত চ্যাটার্জ্জীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীযুত চ্যাটার্জ্জী জিজ্ঞাসা করলেন—আমি যদি সৎসঙ্গী হই তবে পূর্ব্বের যা' কিছু বজায় রাখতে পারব তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ!

শ্রীযুত চ্যাটার্জ্জী—উপাস্য দেবতা কোন্ বিগ্রহ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মান সদগুরু যিনি তিনিই উপাস্য। সদ্‌গুরুর

ভিতর দিয়ে পরম চৈতন্যকে পেতে চাই। আমাদের শাস্ত্রে বলে 'সর্বদেবময়ো গুরুঃ।'

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশমত প্রফুল্ল 'সত্তা সচ্চিদানন্দময়'—বাণীটা প'ড়ে শোনাল।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা মানি এক ও অদ্বিতীয়কে, আর পূরয়মান পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষদের, মানি পিতৃপুরুষ, মানি বর্ণাশ্রম, আর মানি বর্ত্তমান পুরুষোত্তম। তিনি হ'লেন co-ordinating agent (সমন্বয়ী দাঁড়া)। সমস্ত বাদের মূর্ত্ত পরিপূরণ ও সমাধান তিনিই। তিনি কল্পতরু, তাঁর কাছে কিছুরই অভাব নেই, তাঁর কাছে আছে সবার পরিপূরণ। এইগুলি মেনে চললে স্বতঃই সম্বর্দ্ধনা আসে। যারা স্বীকার করে না তারা সত্তাক্ষয়ী ও বৃত্তিধর্ম্মী। প্রবৃত্তির জন্য যারা সত্তাকে বিসর্জ্জন দেয় তাদেরই বলে ম্লেচ্ছ। Hunger-এর (ক্ষুধার) কথা লোকে বলে। ক্ষুধার পূরণ এমন করে করতে হয়, যাতে শরীর, মন, জীবনের পুষ্টি হয়। তা' বাদ দিয়ে যে ক্ষুধার সেবা, তা' ডেকে আনে মৃত্যু। মৃত্যু তো ধর্ম্ম নয়! আমরা চাই মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে অমৃতত্বে উপনীত হতে। ক্রমাগত মানুষ মরা সত্ত্বেও মানুষের অমৃতত্ব চাওয়া স্তব্ধ হয়ে যায়নি, তাই আমাদের ঋষিদের সন্ধান। ভগবান লাভের প্রচেষ্টাকে মানুষ মনে করে একটা পাগলামি। কিন্তু তা' বাদ দিয়ে evolution (বিবর্ত্তন) হয় না। বাঁচতে যদি চাই সর্ব্ববৃত্তির উপর আধিপত্য লাভ করেছেন যিনি, এমনতর একজন আদর্শ পুরুষের উপর concentric urge (সুকেন্দ্রিক আকূতি) চাই-ই। তাঁকে পূরণ করতে গিয়ে, প্রীত করতে গিয়ে আমরা শুধু সত্তা-সম্বর্দ্ধনাকেই অধিগত করি না, তার চাইতেও বেশীকিছু পাই,—জীবনের তাৎপর্য্য কী তা' বুঝতে পারি। এই বোধ ও জ্ঞান শুধু ব্যক্তিজীবনের অনুভূতির ভিতরেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তা' মানুষের চিন্তা, চেতনা ও কর্ম্মশক্তিকে অনেকদূর এগিয়ে দেয়। তা' শুধু ভিতরে নয়, বাইরেও—ব্যক্তির একক জীবনে নয়, তার পরিবেশসহ অনেকের জীবনে। এক-একজন যুগপুরুষোত্তমকে অবলম্বন ক'রে এইভাবে যুগের পর যুগ মানুষের evolution (বিবর্ত্তন) এগিয়ে চলে। শবরী যেমন রামচন্দ্রের জন্য অপেক্ষা করেছিল—সারাজীবন, প্রতিদিন—প্রতি মুহূর্ত্ত সত্তা চোঁয়ান উৎকণ্ঠা, আগ্রহ, আকুলতা ও প্রতীক্ষা নিয়ে। গাছের একটা পাতা নড়লেও সে যেমন চকিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখত—বুঝি বা প্রভু এলেন এবং এই অন্তহীন প্রতীক্ষার শেষে একদিন তার শেষ নিঃশ্বাস যেমন বিলীন হয়ে গেল রামচন্দ্রের কোলে মাথা রেখে—আমরাও তেমনি চলেছি শবরীর মত অমৃতের সন্ধানে। আমাদের মন বলে—আমাদের সত্তার প্রতিষ্ঠা অমৃতত্বে। আমরা কখনও মুছে যাব না, নিভে যাব না—এই আমাদের আত্মিক প্রত্যয়।

অরুণ (জোয়ার্দ্দার) বলল—আমার এক বন্ধু চিঠি লিখেছে—তুমি তো মা'র কাছে গিয়ে আমাদের কথা আর মনেই কর না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লিখতে হয়—আমি আমার মা'র কাছে দাঁড়িয়ে সব মাকেই উপভোগ

করি, ভাবি—তোমরাও এইভাবে তোমাদের মাকে উপভোগ করছ। এর ভিতর-দিয়ে তোমাদেরও বোধ করতে পারি। অনুভব করি—তোমরা সবাই যেমন আমার ভাই, তেমনি তোমাদের সবার মা-ই আমার মা।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন—

প্রত্যেক বস্তু, ব্যাপার বা বিষয়ে
যে অন্তর্নিহিত মরকোচ নিয়ে
বা জীবন-প্রেরণা নিয়ে
সঞ্চালিত—প্রগতিপন্ন,—
সেই মরকোচই হ'চ্ছে তার তত্ত্ব।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট। শরৎদা (হালদার) জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, বাঘ, কুমীর, সাপ, বিছে ইত্যাদির মধ্যে এত বিষ কেন? এর প্রয়োজন কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মরক্ষার জন্য বোধহয় ঐরকম আছে।

যতীনদা (দাস) একজনের সম্বন্ধে বললেন—তা'র এখানে মোটেই ভাল লাগছে না। সে চ'লে যেতে চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর হৃদয়ে বড়শী বাধায়ে ফেলেন। Love and love service (প্রীতি এবং প্রীতিমুখর সেবা)-এর মতো majestic heart winner (মহৎ হৃদয়জয়ী) আর কিছু নেই।

২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, শুক্রবার, শুক্লাসপ্তমী (ইং ৩।৬।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর ভোরে উঠে গোল তাঁবুতে বিছানায় ব'সে তামাক খেতে-খেতে সানন্দে কথাবার্ত্তা বলছেন।

অনেকেই শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শনে এসেছেন। হাউজারম্যানদা একজনের সম্বন্ধে বললেন—সে সৎসঙ্গকে পছন্দ করে না, তার মতে সৎসঙ্গ ভাল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর মধুর হেসে বললেন—যদি কেউ বলে সৎসঙ্গ ভাল না, তাকে বলতে হয়—সৎসঙ্গ ভাল না হতে পারে, কিন্তু সৎসঙ্গ জানে কেমন ক'রে প্রত্যেককে ভালবাসতে হয় এবং প্রত্যেকের মঙ্গল করতে হয়।

হাউজারম্যানদা—যদি সে বলে—আমি মঙ্গল চাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে তা' চায় না, তার পক্ষে কিছুই ভাল না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে বড়ালবাংলোর বারান্দায় তক্তপোষে ব'সে ঔষধ সেবন করলেন। ওখান থেকে নেমে গাড়ী দেখবার জন্য রোহিণী রোডের রাস্তার দিকে এগুচ্ছেন। এমন সময় প্রফুল্ল একজনের সম্পর্কে বলল—অমুক দুনিয়ায় কিছুই ভাল দেখতে পায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাতে বললেন—তা' হ'লেও আমাদের সবার তাকে এমন ভালবাসার স্পর্শ দিয়ে দেওয়া লাগে, যা' সারা পৃথিবীতে আর কোথাও না পায়। Loving

behaviour (প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার) দিয়ে তাকে একেবারে মুগ্ধ ক'রে দেওয়া লাগে, তার হৃদয় একেবারে গলিয়ে দিতে হয়। আর, একটু অনুশীলন করলেই তোমরা তা' পারবে। কারণ, তোমাদের inherent nature (অন্তর্নিহিত প্রকৃতি) ওই, তোমরা মানুষকে ভালই বাস ও তাদের ভালই চাও।

শ্রীশ্রীঠাকুর রোহিণী রোডের পাশে কিছুক্ষণ চেয়ারে বসে রইলেন। গাড়ী যাওয়ার পর, গাড়ী দেখে ওখান থেকে উঠে এসে গোলতাবুর পাশে ইজিচেয়ারে বসলেন। সেখানে আস্তে-আস্তে লোক জড়ো হ'ল।

কালিপদদা (হালদার)-এর স্ত্রী শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে সাংসারিক অভাব-অভিযোগের কথা নিবেদন করলেন।

সুশীলাদি বললেন—কালিপদ পরিশ্রমও তো কম করে না। সকালে ব্যাগ হাতে ক'রে বেরোয়, ঘরে ফিরে আসে দুপুরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাগল! ব্যাগ হাতে করে ঘুরলে কি হয়, ডাক্তারের চাই ব্যবহার।

সুশীলাদি—ডাক্তারিতে তো যুত করতে পারছে না, এমনি একটা ব্যবসা করলে কেমন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে ব্যবসাই করি, চাই—ব্যবহার, উৎসাহ, সেবা।

সুশীলাদি—ওর অনেক গুণ। বেশ কর্ম্মঠ, সেবাও দেয়, আপনাকেও খুব ভালবাসে, অথচ কেন যে পারে না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারে সব, পারে না মানুষকে আপন করতে।

সুশীলাদি—সেটা কি চরিত্রে না থাকলে পারা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওইটে শেখা লাগে, যারা কৃতী মানুষ, তারা কেমন ক'রে মানুষের সাথে মেলামেশা ও ব্যবহার করে, সেগুলি অনুধাবন ক'রে আয়ত্ত করা লাগে। আর, দেখা লাগে এটা করতে গিয়ে বেফাঁস কিছু না ক'রে ফেলে। মানুষকে আপন করার কায়দা না জানলে হয় না। সেবা দিতে হয় কিন্তু দাবি-দাওয়ার ভাব থাকা ভাল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর গত ২রা জুন একজনের কাছে একখানি পত্র লেখেন। তার নকল নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল—

প্রীতিভাজন বান্ধব আমার

শ্রীফণীন্দ্রমোহন চৌধুরী চৌধুরী—

উকিল, রাজসাহী

কেন্দ্রায়িত ও উদ্দীপ্ত আনতি যা' সক্রিয়ভাবে
ইষ্টে সার্থক হ'য়ে ওঠে, তাই হচ্ছে
উন্নতির সক্রিয় নিগূঢ় মন্ত্র
যে তার অনুশীলনে
চরিত্রকে জাজ্জ্বল্যমান ক'রে তোলে,

অবধারিত উৎকর্ষ'
তাকে অভিনন্দিত করেই কি করে।
দীন আমি—
এ অবদান আমার
অকিঞ্চিৎকর যদিও,
কিন্তু জানি,
এর অনুধাবন
তাৎপর্য্যে মহামহিমান্বিত।
ইতি
আপনারই
দীন 'আমি'।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে যতি-আশ্রমে এসে বসলেন।

যতীনদা (দাস) তখন বাগান করছিলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে কথাবার্ত্তা বলার জন্য সকালে মিসেস স্পেনসারের কাছে যেতে বলেছিলেন।

তাই শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে ডাকিয়ে এনে বললেন—আপনি যার মালী, তার বাগান করেন। ও কী করছেন?

যতীনদা তখন হাত-পা ধুয়ে, জামা-কাপড় প'রে সেদিকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন।

ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

ঈশ্বর তোমাদিগকে
ভালবাসার অভিধ্যানেই সৃষ্টি করেছেন,
ভালবাসা তোমাদের অন্তরে
জন্মগতভাবেই অন্তর্নিহিত,
যেই হোক না কেন
আর যাই হোক না কেন,
সত্তা সম্বর্দ্ধনের অন্তরায়ী যা'
তার নিরোধ ক'রে
ভালবাসায় অঢেল ক'রে দাও তাকে,—
আচারে, ব্যবহারে, সেবায়,
সাহচর্য্যে, চাউনিতে, কথায়,
হাসিতে—
বিচ্ছুরিত হ'য়ে উঠুক
তোমার ভালবাসা,
আর সেই বিচ্ছুরণে

অভিদীপ্ত হ'য়ে উঠ্ক সবাই,
আকৃষ্ট হয়ে উঠ্ক তোমাতে—
অচ্যুতভাবে,
আর, সেই আকৃষ্ট হৃদয়গ্নলি
তাঁর আকর্ষণে
উদ্দীপ্ত, উদ্বন্ধ হ'য়ে উঠ্ক—
তোমার ভিতর-দিয়ে ;
জলন্স স্মিত জ্বলনে
সবাইকে দীপক ক'রে তুল্ক,
তুমি বিভোর হ'য়ে থাক তাঁতে,—
বিধৃত হোক সবাই তোমাতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে লেখাটা প'ড়ে যতীনদাকে শোনাতে বললেন। পড়ার পর যতীনদার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—ঠিক হয়েছে ?

যতীনদা—হ্যাঁ, খ্ব ভাল হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন বললেন—এই কথা যেন কখনও বিস্মরণ না হয়। আমার ঠাকুর আমাকে এমনি চান—সর্ব্বত্র সবার সঙ্গে ব্যবহারেই এই স্মৃতি জাগ্রত থাকা চাই। নচেৎ হবে না। কহিতে গিয়ে কথার কথা হৃদয় খ্লিয়া দিয়াছে—এমন হওয়া চাই। তাঁর কথা কইতে গিয়ে, আমি যেন আর আমাতে থাকি না। তিনিময় হয়ে যাই—ভাবের তেমন গভীরতা চাই—মেরী ম্যাগডালিনের যেমন হয়েছিল। সে এমনভাবে ক্রাইস্ট-এর কথা বলত যে, মান্ষ তা শ্নে তাঁর প্রতি ভালবাসায় একেবারে উন্মত্তের মত হয়ে যেত।

শ্রীশ্রীঠাকুর বাগানের দিকে তাকিয়ে স্বগতভাবে বললেন—বীচি ব্নলো শক্ত, তার থেকে অত বড় গাছ হল, বীচির মধ্যে যে গাছ আছে, তা' ঠিকই পাওয়া যায় না—কান্ড একটা বটে !

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর লেখা-সম্বন্ধে বললেন—আমার বলাগ্লি ভালবাসার মনোবিদ্যার উপর দিয়ে আসে বেশী—আমার শাণ্ডিল্য গোত্র কি না ! শাণ্ডিল্য ছিলেন ভাব-ভক্তি প্রধান।

চুনীদা (রায়চৌধ্রী) ও অর্ণ (জোয়ার্দ্দার) প্রভৃতি আসার পর আজ সকালকার শেষ বাণীটি আর একবার পড়া হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তাঁতে বিভোর হ'য়ে না থাকলে ভালবাসার কেন্দ্র আমাদের ভিতরে জীয়ন্ত ও সক্রিয় থাকেন কমই।

শ্রীশ্রীঠাকুর চুনীদাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—তুমি অমনতর বিভোর হ'য়ে থাকলে তোমার সঙ্গে পারার জো ছিল না। ঐ বিভোরতা না থাকলে অন্য টান জল্সগ্লি খেয়ে ফেলে।

শরৎদা (হালদার)—সমাধির সময় কী কী হ'ত তা' কি আপনার মনে আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না। এমনি হয়তো একটা গান করছি, করার সাথে-সাথে ভাবছি। ভাবতে-ভাবতে absorbed (নিবিষ্ট) হয়ে যেতাম কোন্ মুহূর্ত্তে তা' ঠিক পেতাম না। হোক ভাবলে হ'তো না। এমনি কথাবার্ত্তার মধ্যেও হ'তো। কথা বলছি-বলছি, হঠাৎ এসে গেল।

চুনীদা—সমাধির পর কেমন লাগত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন drowsiness-এর (ঘুম-ঘুম ভাবের) মত লাগত।

শরৎদা—সমাধির সময় ইংরেজী ও বাংলা ছাড়া অন্যান্য ভাষায়ও কি বাণী বের হ'ত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' আমার মনে নেই।

এরপর হাউজারম্যানদা ও আউটারব্রিজ আসলেন। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন —ক্রাইস্ট-এর জিনিসগুলি আমরা ঠিকভাবে পরিবেষণ করিনি। তাই দুনিয়া বঞ্চিত হয়েছে, আমরাও হয়েছি।

এরপর স্পেনসারদা আসলেন। হাউজারম্যানদা বললেন—আমাদের দেশ বাইরের জাঁকজমক নিয়ে আছে, তাই ভিতরের দিকে নজর নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Tired (ক্লান্ত) হ'লে তখন চাইবে। তবে বৈষয়িক উন্নতির প্রয়োজন আছে—কিন্তু মূল ঠিক রেখে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের বাণী সম্বন্ধে বললেন—আমি কি বলি তা' বুঝি না, আমি যখন বলি কে যেন বলায়। তাই তার উপর আমার control (অধিকার) নাই।

স্পেনসারদার বাংলা কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর তারিফ ক'রে বললেন—স্পেনসার বেশ বাংলা বলে।

তারপর বললেন—To speek is a coach to language, to do is a coach to work (বলা ভাষা শেখায়, করা কাজ শেখায়)।

তারপর সামনের গাছপালার দিকে চেয়ে বললেন—বীচি যদিও দুর্ব্বল, তবুও তা' পোষণ পেলে মাটি ফেটে বের হয়। তেমনি ভক্তিভাবকে যদি পোষণ দেওয়া যায় তবে, তা' পাহাড়প্রমাণ বাধা ভেদ ক'রে আত্মপ্রকাশ করে। ভক্তি-ভালবাসা তার তীব্রতা অনুযায়ী মানুষকে balanced ও regulated (সাম্যপ্রবণ ও নিয়ন্ত্রিত) করে। ভালবাসার শক্তি নিয়েই আমরা জন্মগ্রহণ করি। এইটের যথাযথ প্রয়োগ করতে পারলেই হয়।

হাউজারম্যানদা—ভালবাসার শক্তি কারও কম, কারও বেশী থাকে কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পোষণ অনুযায়ী তা' বৃদ্ধি পায়। Wise nurture (সুধী সম্পোষণ) চাই।

কাম এবং প্রেম সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবৎ প্রদত্ত ভালবাসা যখন প্রবৃত্তিমুখী হ'য়ে আত্মতৃপ্তি খোঁজে তখন তাকে কয় কাম। যখন তা' সত্তা পোষণে নিয়োজিত হয় তাকে বলে প্রেম। সুকেন্দ্রিক ভালবাসার সঙ্গে একটা আত্মপ্রসাদ থাকে, কিন্তু কামের ভিতর থাকে একটা জ্বালা। যদি তুমি এমনভাবে ভোগ কর, যাতে শরীর-মন পুষ্ট হয় এবং সমতার ভাব বজায় থাকে, তাহলে তাতে কিন্তু তোমার জীবন সমৃদ্ধই হয়। প্রকৃত ভালবাসায় অসমীচীন আপোষরফা বা দ্বন্দ্ব থাকে না। বরং তার প্রতি-পদক্ষেপ থাকে বোধ এবং শান্তিসন্দীপী সহ্য-ধৈর্য্য। কারণ, ভালবাসা থাকলেই সেখানে মস্তিষ্ক সজাগ থাকে।

যতীনদাকে আসতে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বললেন—Arthur coming with sweet love (আর্থার আসছে মিষ্টি ভালবাসা নিয়ে)।

যতীনদা এসে বসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন—কী খবর ?

যতীনদা—মার্গারেট বলে, সে স্পেনসারের একঘেয়ে উপদেশ সহ্য করতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অযাচিত উপদেশ মানুষের স্নায়ুকে উত্তেজিত ক'রে তোলে। মানুষের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করতে হয়। কথা, চাল-চলন, ভাব-ভঙ্গী, পরশ, চাউনি সবটা যেন ভালবাসা-মাখা হয়। এমনতর ব্যবহারই পারস্পরিক প্রীতি-উদ্দীপনী ও সত্তাপোষণী হয়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর দুপুরে ভোগের পর খবর পেলেন জনৈক ডাক্তার ঘোষ এসেছেন ব্রজেনদা (দাস)-এর সঙ্গে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হরিদাসদা (সিংহ)-কে ডেকে পাঠালেন যাতে তিনি ননীমাকে বলেন খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে। তিনি ঘরে ব'সে ছিলেন, উঠে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। এমন সময় ও'রা আসলেন। উভয়ের সাক্ষাতে উভয়ের কি আনন্দ।

শ্রীশ্রীঠাকুর ও ডাক্তার ঘোষ বারান্দায় বসলেন। ডাক্তার ঘোষ জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন আছেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দাঁতে একটু ব্যথা।

ডাক্তার ঘোষ বললেন—আজ সুপ্রভাত যে আপনার সাথে দেখা হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ভাগ্য যে আপনি এসেছেন। শুভক্ষণে আপনি এসেছেন, এইবার আমি সেরে যাব।

ডাক্তার ঘোষ—আমি কতদিন থেকে আপনার নাম শুনছি, আসব আসব ভাবি। যা হোক, এখন তো আপনার আরাম করবার সময়, খেয়ে-দেয়ে উঠেছেন !

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর চাইতে বেশী আরাম আর কি আছে, আপনাকে পেয়েছি কাছে।

ডাক্তার ঘোষ—যতদিন যায় তত কাজ বাড়ে, অবসর কভু হ'ল না—আমার হয়েছে সেই অবস্থা। নিজের কাজ কিছু নেই, একটা হসপিটাল নিয়েই ব্যস্ত থাকি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অবসর ভাল কি না—তাই তো বুঝি না।

ডাক্তার ঘোষ—পুজোর সময় সকলে মিলে এসে দুই-এক দিন থাকব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না'হলে সুখ হয় না। এই যে অযাচিত এসেছেন, এতে বড় সুখ, কিন্তু লোভ যায় না। মনে হয়—আরও আসেন এবং থাকেন।

ডাক্তার ঘোষ—আপনাকে দেখে আজ জীবন সার্থক করলাম।

প্যারীদা (নন্দী) ডাক্তার ঘোষের ছাত্র। তিনি ডাক্তার ঘোষের সম্বন্ধে সশ্রদ্ধভাবে নানা কথা বললেন।

ডাক্তার ঘোষ হেসে বললেন—আমি বকতাম তাই মনে আছে বুঝি!

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বললেন—তার মানে আপনি বকতে শিখেছেন।

এরপর ডাক্তার ঘোষ শ্রীশ্রীবড়মার কাছে খেতে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বাইরে ব'সে থাকলেন। আহারান্তে ডাক্তার ঘোষ শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে বসলেন।

সুধাংশুদা (মৈত্র)—আপনি পান-সুপারি খান না?

ডাক্তার ঘোষ—ওসব বন্ধন আমার নেই। চা পর্য্যন্ত খাই না, ওটা বড়ই বদঅভ্যাস। বিলাতে যেয়েও আমি চা খাইনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজেদের বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়ানই ভাল, তবে কিছু দেওয়া যায় দুনিয়াকে। নচেৎ একজনের লেজ ধ'রে থাকলে নিজেরটাও হারাতে হয়, অপরকেও কিছু দেওয়া যায় না।

ডাক্তার ঘোষকে বিশ্রাম নিতে বলায় তিনি বললেন—এই আমার বিশ্রাম, অবশ্য ওঁর যদি অসুবিধা না হয়।

এই ব'লেই শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার দুপুরে ঘুমাবার অভ্যাস আছে নাকি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার অভ্যাস আছে, কিন্তু আজ আপনি আসার জন্য তার প্রয়োজন বোধ হচ্ছে না।

ডাক্তার ঘোষ—এরপর খবর না দিয়েই চ'লে আসব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও তো সেই লোভ।

ডাক্তার ঘোষ—ধর্ম্ম'টর্ম্ম' জানি না, আর্ত্তের সেবা যদি কিছু করতে পাই, তাই-ই দেখি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম' মানে, যাতে মানুষ বাঁচে-বাড়ে অর্থাৎ যা' মানুষকে ধ'রে রাখে—এই সোজা কথা। আপনিও ধর্ম্ম' বাদ দিয়ে নেই।

ডাক্তার ঘোষ—আজকের দিনটা আমার প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আপনার চেহারাটা দেখব, আপনার সঙ্গে কথা কইব সে আমার কত দিনের কল্পনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও যে কী সুখ হয়েছে—বলতে পারি না। খবর না দিয়ে আসায় আরও enjoyment (উপভোগ) হয়েছে। একটা অবশ-উল্লাস যেন পেয়ে বসেছে। কী বলব, কী করব বুঝতে পারছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্যারীদাকে বললেন—মাস্টার মশাইকে দিয়ে কয়েকজন রোগী দেখিয়ে নিলে পারতে।

ডাক্তার ঘোষ—রোগী আছে নাকি? তাহলে ওঠ, চল, সেই তো আমার rest (বিশ্রাম)। —এই ব'লে রোগী দেখতে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তারপর ঘরে এসে ঘুমোলেন।

ডাক্তার ঘোষ কয়েকজন রোগী দেখে জসিডি গেলেন, কিন্তু গাড়ীর খুব দেরী দেখে ফিরে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঘুম থেকে উঠে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে একখানি ইজিচেয়ারে এসে বসলেন। ডাক্তার ঘোষ একখানি চেয়ারে সামনে বসলেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে কয়েকটি নির্দ্দেশ দিলেন, একটা ব্যায়ামের পদ্ধতি দেখিয়ে দিলেন, বেশী ক'রে জল খেতে বললেন এবং রোজ বেড়াতে বললেন।

পরে তিনি বললেন—আপনি নাকি আশ্রমের জন্য জমি চান, তা কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসল কথা আমার টাকা নেই, তাহলে এতদিনে হ'য়ে যেত।

ডাক্তার ঘোষ—এত কিছু হারালেন!

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, সে আর বলতে! ওখানে ওরা একটা হাসপাতাল করেছে। আমার প্রেসটা নিয়ে নিয়েছে।

ডাক্তার ঘোষ—প্রেসের দাম দেয়নি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না।

ডাক্তার ঘোষ—আইনের আশ্রয় নেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বলি—আমি টাকা চাই না, আমার যা নিয়েছ, নষ্ট করেছ, তা' নূতন ক'রে ক'রে দাও।

ডাক্তার ঘোষ—তা' হয়ত দেবে না, কিন্তু ন্যায্য দাম দেবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু সময় চুপচাপ থাকলেন। পরে বললেন—পরমপিতার কেমন ইচ্ছা গাড়ীই আজ late (দেরী)। আমার খুব ইচ্ছা ছিল আবার দেখা করবার।

ডাক্তার ঘোষ হেসে বললেন—আপনি কী ক'রে দিলেন তাই আর যাওয়া হ'ল না।

ডাক্তার ঘোষ নিম্নলিখিতভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরকে জল খাওয়ার বিধান দিলেন ঃ

সকালে ঘুম থেকে উঠে ২ গ্লাস,
পায়খানা থেকে এসে ২ গ্লাস,
বেলা দশটায় ১ গ্লাস,
খাওয়ার সময় ১ গ্লাস,
ঘুম থেকে উঠে ২ গ্লাস,
বিকাল পাঁচটায় ১ গ্লাস,
সন্ধ্যা সাতটায় ২ গ্লাস,

রাত্রে খাওয়ার সময় ১ গ্লাস,

শোওয়ার আগে ২ গ্লাস।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মানুষের চলতে লাঠি আগে। মা চ'লে গেলেন। একটা মেয়ে ছিল, তাকে খুব ভালবাসতাম, সেও চ'লে গেল। এখন অল্পতেই খুব ব্যথা লাগে।

পরে আবার বললেন—আমার ইচ্ছা বাংলাদেশে কোথাও যাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর ডাক্তারবাবুর ঠিকানা রেখে দিতে বললেন।

ডাক্তারবাবুর ঠিকানা নিম্নরূপ—

রায়বাহাদুর সতীশচন্দ্র ঘোষ, আশারাম হাসপাতাল, ৫৫ কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীট, কলিকাতা। এবং ১২৭বি রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাঠে এসে বসেছেন। সুধাংশুদা (মৈত্র) বললেন—সেমিটিক জাতি যাদের বলে তাদের তো আর্য্যদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় সব এক জায়গায় ছিল। নোয়ার প্লাবনের পর একদল গেল ভূমধ্য সাগরের উপকূল বেয়ে, আর একদল গেল জার্ম্মানীর দিকে। এক দলের নাম হ'ল অ্যাংলো স্যাকসনস্। অ্যাংলোর মধ্যে angel অর্থাৎ দেবজাতি আছে। আরব ইজিপ্ট-এর দিকে যারা গেল তাদের বোধহয় বলতো hemitic বা semitic (হেমিটিক বা সেমিটিক)—এরা বোধহয় অর্দ্ধ আর্য্য। আবার, একদল আছে যাদের বলে জু। জু-র সঙ্গে বোধহয় যবন কথার মিল আছে। যবনের মধ্যে আছে যু-ধাতু। যু-ধাতু মানে মিশ্রণ। সবার মধ্যেই বোধহয় আর্য্যরক্ত আছে তবে তার সঙ্গে মিশ্রণ আছে। অনুলোম ও প্রতিলোম দুরকম মিশ্রণ বা সংস্রবই হয়েছে। Prophet (প্রেরিত)-দের বংশ কতকগুলি আছে। আমাদের যেমন প্রথমে ব্রহ্মা কয়, ওদের তেমনি আছে আব্রাহাম। আমার এইরকম মনে হয়।

সুধাংশুদা—অনার্য্যরা আসলো কোথা থেকে ঠিক পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিগ্রো, অ্যাসটোলয়েড ইত্যাদি জাতি আছে, সাঁওতাল, কোল, ভীল প্রভৃতি আদিবাসী আছে। আলাদা-আলাদা Stock (গোষ্ঠী) আছে, এদের উৎপত্তি আলাদা, পরিবেশ আলাদা, তাই আকৃতিও আলাদা।

হাউজারম্যানদা—যদি কেউ বলে, বাইবেলে এটা আছে তাই তোমাকেও মানতে হবে, অথচ মানার কারণ যদি খুঁজে না পাই তবে মানতে যাব কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কারণ জানা ভাল, কিন্তু কারণ যদি নাও জানতে পারি, তাহলেও সেইটে পালন ক'রে, অর্থাৎ সেই অনুশাসন মান্য ক'রে, তার ভিতর-দিয়ে তার কারণ বুঝতে চেষ্টা করা ভাল। যেমন বিষ খাওয়া ভাল না বলে যদি লেখা থাকে, তবে সে বিধান মেনে তার অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধান করতে হয়। আবার, করার নির্দ্দেশ যেগুলি আছে, সেগুলিও পালন ক'রে বোঝা ভাল—ঐ নির্দ্দেশের যুক্তিযুক্ততা কী? কারণ বুঝি না ব'লে অনুসরণ না ক'রেই তা' বর্জ্জন করা ভাল নয়।

মাছ-খাওয়া সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কাজলের মতো যখন ছিলাম, তখন মনে হ'ত আমার মতো সব প্রাণীর জীবন আছে। আমি যেমন মানুষ হয়েছি, মানুষ না হয়েও তা'রা আলাদা মূর্ত্তিতে মানুষের মতন। বানর বা বনমানুষ ঐ ধরনেরই। সব জীবই ঐ। সব জীবেরই আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন ইত্যাদি আছে। প্রত্যেকটি জীবই ভগবানের এক বিশেষ সৃষ্টি। তাই, নিজের পালন-পোষণে আমরা যেমন যত্নবান হই, প্রত্যেকটি জীবের পালন-পোষণে আমাদের ঠিক তেমনতর চেষ্টা করা দরকার। ছেলেবেলা থেকে মেয়েদের উপর আমার অসাধারণ শ্রদ্ধা। কারণ, ছেলে ও মেয়ে দুই-ই তার পেটে হয়। আমার এখনও মনে হয় তাদের উপর ভগবানের আশীর্ব্বাদ বুঝি বেশী। ছেলেবেলার কথা এখন ঠিক মনে নেই, কিন্তু আমি যখনই যা'-কিছু দেখতাম তার মূলে কি আছে তা' স্পষ্টভাবে না বোঝা পর্য্যন্ত মনে শান্তি পেতাম না। যত সূক্ষ্ম কারণই জানি না কেন, একেবারে আদি কারণ কী, তা' কার্য্যকারণ পরম্পরায় জানতে ইচ্ছা করত এবং এখনও করে। নানানটা নানাভাবে দেখতে-দেখতে, বুঝতে-বুঝতে শেষ খেই পেলাম নামের মধ্যে। সূক্ষ্মের মধ্যে-দিয়ে রকমারি স্থূল কি ক'রে আসলো, আবার জড় জগতের যা'-কিছু তা' কেমন ক'রে নামের মরকোচের সঙ্গে জড়ানো আছে, তা' সোজা-সুজি চোখে দেখা যায়। আমার মনে হয়—যা' মস্তিষ্ক-যন্ত্রে ধরা পড়ে তা' অতি সূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কার করেও গবেষণাগারে দেখানো যেতে পারে। সাধন-জীবনের অনুভূতি বিজ্ঞান-জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন আলাদা একটা-কিছু ব'লে আমার মনে হয় না। সাধনা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা যদি অঙ্গাঙ্গীভাবে চালানো যায়, তা'হলে বিজ্ঞানের এমনতর উন্নতি হ'তে পারে, যা জগৎকে এক ভিন্ন স্তরে পেঁাছে দিতে পারে।

২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, শনিবার (ইং ৪।৬।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোল তাঁবুর পাশে ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট। গোঁসাইদা, দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), ধূর্জ্জটিদা (নিয়োগী), অনিল (চক্রবর্ত্তী), দুলালীমা, সুশীলাদি প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত।

গোঁসাইদা বললেন—উপনয়ন নিতে গিয়ে অনেকেই দক্ষিণা সম্বন্ধে কার্পণ্য করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বল্প দক্ষিণা ভাল না, ওতে কাজ সিদ্ধ হয় না। এত কষ্ট ক'রে সবাই প্রাজাপত্য করে, কিন্তু দক্ষিণার বেলায় যদি ব্যাঙের মুতে আছাড় খায়, তাহ'লে সবই তো পণ্ড হ'ল। নামই দক্ষিণা—সামর্থ্যকে সঙ্কুচিত করলে দক্ষিণা হয় না।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর গোঁসাইদার দিকে চেয়ে বললেন—ওরা কি জানে? আপনার ব'লে দিতে হয়। ওদের ধরিয়ে দিতে হয়। ওরা কি শাস্ত্র-টাস্ত্র কিছু জানে? ওদের ব'লে দিতে হয়। আমি কতবার বলেছি—ওদের ক্ষতি করবেন না, ওদের

করণীয় সম্বন্ধে সচেতন ক'রে দেবেন। এমনি দক্ষিণা যেমন দেবে, তেমনি সদক্ষিণা ভোজ্য দেওয়ার কথাও বুঝিয়ে দিতে হয়।

পূর্ণদা উপস্থিত ছিলেন। তিনি খুব কম দক্ষিণা দিয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—দক্ষিণাবাক্য ক'রে গোঁসাইদাকে যথাসাধ্য দক্ষিণা দিতে হয়, সদক্ষিণা ভোজ্যও দান করতে হয়।

দুলালীমা—আমরা আপনার কাছে চাই কেন? নিজের জন্য আপনাকে বিরক্ত করি কেন? আপনার কাছে তো জাগতিক কিছু চাইতে নেই, আর সে-জন্য আপনি দায়ীও নন। আপনি তো চরম জিনিস দিয়েছেন, যা' মানুষ বহু তপস্যায় পায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পার না তাই চাও।

দুলালীমা—চাওয়া তো ঠিক নয়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত নিজে করা যায় ততই ভাল, ওতে নিজের শক্তি বাড়ে।

দুলালীমা—নিজের জাগতিক প্রয়োজনের জন্য গুরুকে কেন বিরক্ত করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজে পারি না তাই অপরকে বলি। অনেক সময় স্বাস্থ্য ঠিক থাকে না, অন্য অসুবিধা থাকে।

সুধাংশুদা (মৈত্র) আসলেন। তিনি বললেন—শ্রীশ্রীঠাকুর নাকি গোঁসাইদাকে বলেছেন, মরা মানুষকে যে-সময় পোড়ায় তখনও নাকি সে কষ্ট বোধ করে, কারণ মরার পরও নাকি অনেক সময় পর্য্যন্ত তার cell (কোষ)-গুলি জীবিত থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাটি শুনে সম্মতিসূচক ভাব প্রকাশ করলেন।

একটি চিঠি এসেছে—স্বস্ত্যয়নীর উদ্বৃত্ত অর্থ ভাঙ্গার পর একজনের মাথা খারাপ হয়েছে, তার একটি ছেলে মারা গেছে এবং আরও নানা বিপর্য্যয় ঘটেছে।

এই প্রসঙ্গে প্রফুল্ল বলল—স্বস্ত্যয়নী আগ্রহ ক'রে নিয়ে, বৃত্তিবশে কিংবা অন্য কোন কারণে তাতে ব্যত্যয় ঘটলে যদি এই রকম mishap (দুর্ঘটনা) ঘটে, তাহলে বরং স্বস্ত্যয়নী না নেওয়াই তো ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এত বড় mishap (দুর্ঘটনা) ঘটে, আবার বহু বড় mishap (দুর্ঘটনা) ঠেকায়ও। যে-ওষুধের curative force (রোগ আরোগ্যকারী শক্তি) যত বেশি, তার অপব্যবহারে ক্ষতিও ততখানি।

প্রফুল্ল—আচ্ছা, স্বস্ত্যয়নী-ইষ্টভৃতির গোলমালে এত বিপদ হয় কেন? এটা কি পূর্ব্ব-সংস্কার ও মানসিক ভীতিবিহ্বলতার জন্য হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের ভিতর থাকে প্রবৃত্তি, আর প্রবৃত্তির প্রতি থাকে তার আবেগ। আর, সেই আবেগগুলি অবাঞ্ছিতভাবে চলে, অপকর্ম্ম অর্থাৎ সত্তাসম্বর্দ্ধনার পরিপন্থী কর্ম্মের দিকে প্রধাবিত করে তাকে। প্রবৃত্তিস্বার্থী হয়ে চললে, ঐটেই পেয়ে বসতে চায়, আমাদের বুদ্ধিও তেমন হয়, চলনও তেমন হয়। যাতে বিপদ, বিধ্বস্তি, অমঙ্গল আসে তেমনভাবেই চলি আমরা। নারায়ণের জিনিস খেয়ে ফেলল মানে প্রবৃত্তির আবেগ তাকে অতখানি অভিভূত ক'রে তুলেছে, তার inner adjust-

ment (আভ্যন্তরীণ বিন্যাস) অতখানি ভেঙ্গে গেছে। তার ফল যা হওয়ার তা হতে বাধ্য। কতকগুলি অরিষ্ট লক্ষণ আছে। মরণ যখন এগিয়ে আসে, তখন অকরণীয় যা' তাই করে, সেই ধরনের কথা, ব্যবহার ও সঙ্গ করে, সঙ্গীরা এমন জোটে যাদের প্রভাবে হয়ত মৃত্যুমুখী পরিস্থিতির মধ্যে গিয়ে পড়ে। এ সবের ফল আপনা আপনিই এগিয়ে আসে।

শশাংকদা (গুহ)—কারও যদি খুব টান থাকে তাহলে কি হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—টানের দুটো রকম আছে। এক হল স্বার্থ চাহিদা নিয়ে টান। মনে করলাম শশাংকর টাকা আছে, ওকে যদি বাগাতে পারি, তাহলে ওর টাকাগুলি পাব। এইভাবে তোমার কাছে ভিড়লাম। সেখানে টান তোমার উপর নয়, টান তোমার টাকার উপর। টাকা যেদিন পাব না, ভালবাসা সেদিন ছুটে যাবে। কিন্তু তোমার উপর স্বাভাবিক অনুরাগ যদি হয়, তোমারই পরিরক্ষণ, পরিপূরণ, পরিপোষণ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যদি আমার চাহিদা হয়, তবে সে-ভালবাসা আর ছোটে না। তোমার অস্তিত্ব ও সত্তার সঙ্গে সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠে কি না! তাই সর্ব অবস্থায় তোমার মঙ্গল যাতে হয় তা' নাছোড়বান্দা হয়ে করতে থাকি। এই মুহূর্ত্তে খুব ভালবাসা, খুব ভাব, খুব সুখ্যাতি করি একজনকে—পরক্ষণে উল্টো। তার মানে তাকে ভালবাসিনি, ভালবাসার রকম দেখিয়েছি স্বার্থ-প্রত্যাশায়।

শশাংকদা—আপনি তো ধ'রে রাখেন তা' সত্ত্বেও।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতা তো সকলকে ধ'রে রাখেনই। কিন্তু আমরা যদি তাঁকে ধ'রে না রাখি, তাহলে তিনি রক্ষা করবেন কি করে? তুমি বিষ্ঠাই হও আর স্বর্গের ফুলই হও, ভালই হও আর মন্দই হও, তুমি ত'রে যাবে, যদি তাঁর প্রতি তোমার অকাট্য ভালবাসা হয়।

শশাংকদা—পারিপার্শ্বিকও তো চাই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রধানত নিজের উপর নির্ভর করে। আমরা যত এগুব আগুনের কাছে, আগুনের তাপ তত পাব। আমার যেমন go towards the centre (কেন্দ্রের দিকে গতি), তেমনি হব। যেমন করা, তেমনি হওয়া, তেমনি পাওয়া। আমার অনুরাগ যতখানি সক্রিয় তাঁর সত্তাসম্বর্দ্ধনায়, ততখানি আমি সেই পরিবেশ খুঁজে নেব, যেখানে এই ভাবের পোষণ পাই। আমি যদি গেঁজেল হই, তবে এই পরিবেশের ভিতর থেকে গেঁজেলই বেছে নেব। আবার, আমি যদি সাধু হই, সাধুই খুঁজে নেব পারিপার্শ্বিক থেকে। আমরা যেমন, আমাদের পারিপার্শ্বিকও জোটে তেমনি। আর, তাদের কাছ থেকে আহরণও করি তেমনতর।

শশাংকদা—ভারত সরকারের কাজকর্ম্ম সম্পর্কে আপনার কী মনে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ঠিক বুঝি না। আমাদের নিজ বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়ানই ভাল। নিজেদের কৃষ্টি বাদ দিয়ে, বৈশিষ্ট্যকে ছেড়ে যত দাঁড়াতে চাইব, তত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব, সংহত হতে পারব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর এর পর যতি-আশ্রমে এসে বসলেন। একটু পরেই স্পেনসারদা ও হাউজারম্যানদা প্রমুখ আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—স্পেনসার যদি "মহাসিন্ধুর ওপার হতে ভেসে আসে কি সঙ্গীত"—এই ধরনের একটা গান লেখে তাহলে ভাল হয়।

প্রফুল্ল ইংরেজীতে কথাটা বুঝিয়ে বলার পর স্পেনসারদা সহাস্য বদনে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখেও মধুর হাসি ফুটে উঠল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সত্যানুসরণের ইংরেজী অনুবাদ প'ড়ে শোনান হল। প্রথমে বাংলা সত্যানুসরণ পড়া হচ্ছিল, পরে তার ইংরেজী অনুবাদ পড়া হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রয়োজনমতো দুই-এক জায়গায় পরিবর্ত্তন ক'রে দিচ্ছিলেন।

এমন সময় এস কে চ্যাটার্জী ও বিনয়দা (মুখাজ্জী) আসলেন।

প'ড়ে যেয়ে সুরেশদা (মুখাজ্জী)-র পা ভেঙ্গে গেছে। তাই বিনয়দা সুরেশদাকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন। সুরেশদার অনেক বয়স হয়েছে। একজন বললেন—সুরেশদার তো ভৃগুর কোষ্ঠীর বয়স পেরিয়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তবু চাই যে তিনি আরও দীর্ঘ দিন সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকুন। যারা সদগুরুর প্রতি টান নিয়ে রীতিমত সাধনভজন করে, তাদের অনেকেরই আয়ু বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বিনয়ের ভাগ্য খুব ভাল, মা-বাপের উপর ভক্তি যা' থাকা লাগে তা' আছে।

আজ সত্যানুসরণের অনুবাদ শোনার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—মায়ের অপভ্রংশ থেকে matter (বস্তু) হয়নি তো? Material (ভৌতিক) কথার মানে মনে হয় motherial অর্থাৎ motherly (মাতৃসুলভ)।

তখন বিভিন্ন অভিধান ঘেঁটে দেখা গেল যে কথাটি সমর্থনযোগ্য।

২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, রবিবার (ইং ৫। ৬। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে মাঠে বড়দার সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন—মানুষের উদ্যমের প্রথম জিনিস হ'ল, লোকলোলুপতা। আর, সেইটে কমে গেলে মানুষ static (স্থবির) হয়ে যায়।

সুধাংশুদা (মৈত্র) জিজ্ঞাসা করলেন—মানুষের দলবদ্ধ হয়ে থাকার সংস্কার আছে, আবার তার ভিতর অর্জ্জনের বুদ্ধিও আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ যত সমাজের ভিতর বিস্তার লাভ করতে চায়, তত তার herd instinct (দলবদ্ধ থাকার সংস্কার) সলীল হয়ে ওঠে। অর্জ্জনের বুদ্ধি ভাল, কিন্তু মানুষ যদি স্বার্থপর হয়ে ওঠে, তখন তার অর্জ্জনবুদ্ধি তাকে বিস্তারের দিকে না নিয়ে আত্মকেন্দ্রিক বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ক'রে তোলে। সে তখন পরিবেশের স্বার্থের সঙ্গে

নিজের স্বার্থকে যুক্ত ক'রে দেখতে পারে না। এইভাবে স্বার্থবুদ্ধি মানুষকে সংকীর্ণ ও স্থবির ক'রে তোলে।

বড়দা বললেন—হেনরী ব্যাংকক থেকে চিঠি লিখেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার আগে নানা জায়গায় যাওয়ার ইচ্ছা করত। মা যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সে ইচ্ছা প্রায় লোপ পেয়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে এসে বসলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শরৎদা বললেন—অনেকগুলি ব্যাপার অবশ্যম্ভাবী বলে মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অবশ্যম্ভাবী যে হয় তাও আমরা করে তুলি।

প্রফুল্ল—মানুষ তো বৃহত্তর পরিবেশের সঙ্গে জড়িত। পরিবেশ যদি নিয়ন্ত্রিত না হয়, কেউ আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে কতটুকু করতে পারে? আর, তার পরিবেশ এতই বিরাট যে, সেই পরিবেশকে আয়ত্তে আনা একক ব্যক্তির পক্ষে তো প্রায় অসম্ভব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজ যে পরিবেশকে যত বড় এবং অনায়ত্ত মনে হচ্ছে, তোমার নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা বেড়ে গেলে তাকে আর তত বড় মনে হবে না। তোমার নিয়ন্ত্রণের পাল্লার মধ্যে যতখানি আসবে, তার 'পর দাঁড়িয়ে আরো-আরো এগিয়ে যেতে পারবে, এর কোন ইতি নেই। পরমপিতা আমাদের যে শক্তি দিয়েছেন তার সদ্ব্যবহার যত করতে থাকব ততই তা' বেড়ে যাবে।

শরৎদা জ্যোতি দেখা-সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ফাঁকা জায়গায় চেয়ে দেখেন তো কি দেখা যায়।

আজ শুক্লানবমী তিথি এবং আশ্রম-প্রাঙ্গণে আলোও জ্বলছিল।

শরৎদা একটু সময় চেয়ে থেকে বললেন—একটা হিজিবিজি মতো দেখা যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উপর থেকে নীচে খুব সূক্ষ্ম বৃষ্টির মতো পড়তে দেখা যায় না?

প্রফুল্ল খুব ভাল ক'রে লক্ষ্য করে দেখে বলল—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই ফাঁকা ব'লে কিছু নেই। ফাঁকা বলে যা' দেখছ তা ফাঁকা নয়। ঐ যা দেখছ সূক্ষ্মতরভাবে ঐ জিনিসের ক্রিয়া চলছে সর্বত্র। নাম করলে দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের পৈতেটো জড়া পাকিয়ে গেছিল, সেটা নিজে-নিজে ঠিক করলেন। তারপর বললেন—পৈতেটো খুব জড়িয়ে গিয়েছিল, কয়েকটা গাঁট ধ'রে তাড়াতাড়ি ঠিক করে ফেললাম। Complex-এর (প্রবৃত্তির) ব্যাপারও ঐ-রকম। গাঁট ধ'রে না করলে ঠিক করা যায় না সহজে। আত্মবিশ্লেষণও অভ্যাস-সাপেক্ষ ব্যাপার। আমাদের মন যখন প্রবৃত্তির ঘোরে এলোমেলো ও বিশৃংখল হয়ে থাকে, তখন আমরা পট ক'রে ঠিক পাই না কি জন্যে অমনটা হল। কিন্তু সাধারণতঃ এর পিছনে প্রবৃত্তি-জনিত ভুল চিন্তা ও চলন থাকে। ইষ্টনিষ্ঠার ভিতর-দিয়ে যে চিত্তশুদ্ধির দিকে যত অগ্রসর হয়, সে তত তাড়াতাড়ি ধরতে পারে চলার পথে কখন কোন্ প্রবৃত্তিকে আশ্রয় ক'রে তার মনে ঐ জট-পাকান অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ সুখ-সুখ করে, কিন্তু

মন যদি ইষ্টব্যাপৃতির ভিতর-দিয়ে অনেকখানি স্বচ্ছ ও প্রবৃত্তিমুক্ত না থাকে, তাহলে মানসিক সুখ বা শান্তির সন্ধান মেলে না। প্রবৃত্তিমুখী মানুষ অন্তরে একটা নরক পুষে রাখে এবং অন্তর্পবিস্তর নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে। মানুষ এই সোজা কথাটা বোঝে না, তাই জীবনটাকে উপভোগও করতে পারে না। বেশীর ভাগ মানুষেরই তাই জীবনটা কাটে ভিতরে-ভিতরে কষ্ট পেয়ে ও অন্যাকে কষ্ট দিয়ে।

প্রফুল্ল—আচ্ছা ফাঁকা কোথাও নেই—ব্যাপারটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Positive (ঋজী) ও negative-এর (রিচীর) আকর্ষণ-বিকর্ষণ এবং মিলন-বিচ্ছেদের থেকে নিরন্তর রকমারি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুকণার কেবলই সৃষ্টি হয়ে চলেছে। এগুলি যেন রকমারি তরঙ্গ-বিশেষ। তার একটার সঙ্গে আর-একটার সংঘাতে আর-এক রকম তরঙ্গের উদ্ভব হয়। প্রত্যেকটা রকম হচ্ছে, আর তার থেকে আর-একটা বিকিরণ বা বিচ্ছুরণ এসে পড়ছে। এরকমভাবে সৃষ্টি চক্রে অনন্ত অণুকণার সৃষ্টি হয়ে চলেছে, যা' কিনা বস্তু প্রবাহের মূলীভূত উপাদান। এর বিরাম নাই। আমি তো দেখি শূন্য বলতে যা' বলি তা' কোথাও নাই। স্থূলতর যা' তার তুলনায় সূক্ষ্মতর যা' তা যেন ফাঁকা, এই যা'। আমরা হয়তো ইথারের সমুদ্রের মধ্যে পড়ে আছি, কিন্তু তা অনুভব করতে পারছি না। নামের মতো এমন জিনিস নেই, অবশ্য তা concentric (সুকেন্দ্রিক) হওয়া চাই। নামে আমাদের এমন সাড়াপ্রবণ ক'রে তোলে যে, সাদা চোখে অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপার ধরা পড়ে, কানেও অনেক-কিছু শোনা যায়। আজ্ঞাচক্রে মনঃসংযোগ ক'রে নাম করা মানে, জ্ঞানের চক্রে মনোনিবেশ ক'রে নাম করা। এতে base of the brain (মস্তিষ্কের অধোদেশ) excited (উদ্দীপিত) হ'য়ে ওঠে। ফলে, cell (কোষ) গুলি active (সক্রিয়) ও receptive (গ্রহণক্ষম) হয়। নামের সঙ্গে ধ্যান চাই। ধ্যানে প্রত্যেকটি বস্তু ও বিষয়ের ইষ্টানুগ নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য ও সমাধানের প্রচেষ্টা লেগে থাকে। ইষ্ট ব্যক্তিটি হলেন, জাগ্রত সমন্বয় মূর্ত্তি। তাঁর আলোকে যখন আমরা কোন-কিছুকে দেখতে ও বুঝতে চেষ্টা করি, তখন সবকিছুর অন্তর্নিহিত পারস্পরিক সঙ্গতি ধরা পড়ে। তখন আমরা বুঝতে পারি যে, পৃথিবীর যা-কিছুই interfulfilling (পারস্পরিকভাবে পূরণপ্রবণ)! এই বোধ-অনুযায়ী যত আমরা চলি, ততই সমাধানী চলন আমাদের মধ্যে সহজ হ'য়ে ওঠে। এটা হয় বৃত্তি-প্রবৃত্তিগুলির ইষ্টানুগ নিয়ন্ত্রণ হওয়ায়। মানুষ যত প্রবৃত্তিবশ থাকে, ততই নিজের ও অপরের জীবনে জটিলতাকে গুণিত করে। কিন্তু সেগুলির জীবনবৃদ্ধিদ বিন্যাস করতে পারে না। তাই, নাম-ধ্যান যতই করা যাক না কেন মানুষ যদি ইষ্টনিষ্ঠ ও ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন না হয়, তবে তার চিন্তা ও চলনে ধর্ম্ম মূর্ত্ত হয় কমই। ইষ্টই হলেন ধর্ম্মের মূর্ত্তি। তাঁর জন্য তাঁতে টান না হ'লে বুঝতে হবে আমাদের ভিতর ধর্ম্মের বীজ উপ্ত হয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর অভিধান থেকে আজ্ঞাচক্রের মানে দেখতে বললেন। কাছে আশুতোষ

দেবের অভিধান ছিল। শরৎদা সেটা দেখতে আরম্ভ করায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভাল dictionary (অভিধান) না হলে মুশকিল। Intent of the word (শব্দটির মূল অভিপ্রায়) যতক্ষণ না ধরা যাচ্ছে, ততক্ষণ আমাদের মামুলি ধারণামতো যদি একটা মানে ক'রে নিই তাহলে ভুল করব। আমার প্রথম একদিন খেয়াল হ'ল। আগে গীতাটীতার ব্যাখ্যা শুনতাম, কিন্তু বুঝতে পারতাম না। পরে হঠাৎ একদিন একটা কথার মানে ঠিক বুঝতে না পেরে বললাম—'আচ্ছা root (ধাতু) কী?' তখন root (ধাতু) দেখার পর দেখলাম, ঠিক মিলে যায়, সেই থেকে root meaning (ধাতুগত অর্থ) দেখা শুরু করলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—গুরুজনকে বা বিশিষ্ট লোককে যে আমরা শ্রদ্ধা দেখাই, প্রণাম করি, দেখলে উঠে দাঁড়াই এই সব করার ফলে এমন একটা প্রস্তুতির ভাব আমাদের ভিতর গজিয়ে ওঠে যে, আমরা আমাদের মনের ভাব অনুযায়ী তৎক্ষণাৎ বাস্তবে তা' করতে পারি। এটা বিশেষ প্রয়োজন। চিন্তা এবং কর্ম্মের সঙ্গতি না থাকলে, চরিত্র সঙ্গতিশীল ও বলিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে না। যাদের চিন্তা ও কর্ম্মে মিল আছে, তাদের ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তদনুযায়ী কাজ করার শক্তিও জাগ্রত হয়।

শরৎদা—সূর্য্য যদি পনেরো দিন না থাকে তাহলে কী অবস্থা হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পনেরো দিন লাগে না, তার আগেই শেষ হয়ে যায়। যে উপাদানের সাহায্যে আমাদের অস্তিত্ব সংহত হ'য়ে ওঠে সেই উপাদানটা যদি ছুটে যায়, তাহলে সংহতিটা ভেঙ্গে যায়।

যতীনদা, স্পেনসারদার মানসিক অবসাদ সম্বন্ধে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের সত্তা-সম্বর্দ্ধনী প্রবৃত্তি যদি প্রবল হয়, তাহলে ভুলের দরুন আমরা অভিভূত ও অবসন্ন হ'য়ে পড়ি কম। ভুল হলেও তা' শুধরিয়ে ও অতিক্রম ক'রে বাঁচাবাড়ার পথেই এগিয়ে যেতে চেষ্টা করি। ভুলটা আসলেও তা' আমাদের চলাকে রুদ্ধ করতে পারে না।

যতীনদা—বিষয়টা আর একটু বুঝিয়ে বলুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অজ্ঞতা ও অসামর্থ্যের দরুন আমরা ভুল করি। তাই অজ্ঞতা ও অসামর্থ্য যখন আমাদের ঘিরে ধরে এবং তার দরুন আমরা যখন ভুল করি তখন যেন সামনে পথ দেখতে পাই না। একটা নৈরাশ্যের মতো আসে। কিন্তু যত নৈরাশ্যই আসুক, বাঁচাবাড়ার সম্বেগ প্রবল হলে আমরা কখনও বাঁচাবাড়ামুখী প্রয়াস স্থগিত করতে চাই না। সুকৌশলে চেষ্টা করি যাতে বেঘোরে না পড়ি। বাধাকে অতিক্রম করার বুদ্ধি তখন জোরদার হয়ে ওঠে। একটা বাধাকে জয় করলে তা' আবার মনে প্রভূত সাহস ও উৎসাহ যোগায়। ফল কথা, জীবনে যতই হতাশা আসুক না কেন, হাতের লাঠি যদি ঠিক থাকে তখন সেই শ্রেয় অনুরাগের যষ্ঠির উপর ভর ক'রে খাড়া হয়ে দাঁড়াই। মনে মনে বলি—'Depression! (অবসাদ) তুমি আমাকে কাবেজ করবে? তা হতে দিচ্ছি না।' তখন ফন্দী বের ক'রে নেতিবাচক ভাবের পরিবর্ত্তে

কঠোর সংকল্প নিয়ে লেগে যাই কৃতকার্য্যতার সংবাদ প্রিয়-পরমকে দিয়ে তাঁর মুখে হাসি ফোটাবার আগ্রহে।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, সোমবার (ইং ৬। ৬। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে রোহিণী রোডের এক পাশে চেয়ারে বসলেন গাড়ী দেখবার জন্যে। কাছে অনেকেই ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছিলেন। এমন সময় পাবনার একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর দূর থেকে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন, এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করলেন এবং সাগ্রহে কুশল-প্রশ্নাদি করতে লাগলেন। পরে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর চেয়ারে ভদ্রলোককে বসতে অনুরোধ জানালেন। তিনি বসতে চাইলেন না। যা' হোক আর একখানা চেয়ার এনে দেওয়া হল এবং তখন উভয়ে বসলেন।

উক্ত ভদ্রলোক কথাপ্রসংগে বললেন—রজোগুণ জিনিসটা ভাল না। তীর্থ করার আকাংক্ষাও একটা রজোগুণ। তবে এর সুফল এই যে তাতে তীর্থের কথা স্মরণ-মনন হয়, কিন্তু আদত বস্তুর ধারণা হয় না। এইসব কথা চিন্তা করতে-করতে আসছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—হ্যাঁ।

একটু পরে ভদ্রলোক উঠে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখনও বিনম্রভাবে উঠে দাঁড়ালেন।

এরপরে তিনি যতি-আশ্রমে এসে বসলেন।

এস. কে. চ্যাটার্জ্জী এসে প্রণাম করলেন। তিনি বললেন যে—কলকাতায় গিয়ে একদিনের মধ্যে সুরেশদাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি ক'রে, সারা কলকাতা ঘুরে চার-পাঁচটা জমির খবর নিয়ে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর খুশী হয়ে বললেন—শিবাজীর শুনেছিলাম পায়ে পাখা আছে।

পরে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি বলি, কলকাতার ওখানে জমি ক'রে দেন, কিন্তু পূর্বস্থলীও হাতছাড়া করবেন না। পরমপিতার দয়া হ'লে রাশিয়ান, ফ্রেঞ্চ ও জার্ম্মান স্কলার-রা যদি আসে, ওখানে বড় একটা কলেজ করা যাবে। আমার স্ফূর্ত্তি ও চিন্তা দুই-ই হয়েছে। ভাবছি জমির ব্যবস্থা যদি হয়ও, এত টাকা পাওয়া যাবে কোথায়?

শ্রীযুত চ্যাটার্জ্জী—আটকাবে না, আপনার ইচ্ছা থাকলে হয়ে যাবে। কতই তো করেছেন!

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' আসে বাড়ী ভাড়া দিয়ে ও খেয়েদেয়েই ফুরিয়ে যায়। অবশ্য আমি ফেরাইও না, সব বেঁচে থাকলেই হল।...পরমপিতার দয়ায় আপনি সুস্থ ও সুদীর্ঘজীবী হন।

শ্রীযুত চ্যাটার্জ্জী—আপনার সুস্থ থাকাই বেশী প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি সুস্থ থাকলেই আমার সুস্থ থাকার পথ হয়।

পরে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মাসে হাজার চারেক টাকা বাড়ীভাড়া লাগে।

শ্রীযুত চ্যাটাজ্জী—তিন বছরে তাহলে দেড় লাখ টাকা বাড়ী ভাড়াই লাগল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারস্পরিক সহযোগিতায় বেঁচে আছি। ও থাকলে অসম্ভব কাণ্ড হয়। কিছু মানুষের মধ্যে এই ভাবটা জাগায় কত কিছু করা যাচ্ছে। ভারত একদিন ছিল দুনিয়ার গুরু, আবার সে দুনিয়ার গুরু হতে পারে—যদি কিনা ধর্ম্মের ভিত্তিতে আবার এই সহযোগিতা জাগিয়ে তোলা যায়। যে দেবজাতি ছিল সেই দেবজাতিই আবার গ'ড়ে তোলা যায়। আমাদের মূল দোষ হয়েছে, আমরা আজ শতধা বিভক্ত। মাথাটা যদি উড়িয়ে দেওয়া যায়, তবে ধড়টাই প'ড়ে থাকে জীবনহীন হ'য়ে। ধর্ম্ম ও কৃষ্টিই আমাদের প্রাণ, তা বাদ দিয়ে আমরা দাঁড়াব কি নিয়ে? ধর্ম্মই আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি। আর্য্য ভারতবাসী মাত্রেরই জীবন ঐ ধর্ম্ম। আদর্শনিষ্ঠ হয়ে ওটাকে জাগিয়ে তোলা লাগে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের কিছু বাণী প'ড়ে শোনানো হল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের একখানা লাঠি লাগে। লাঠিহারা হ'লে মুশকিল। ইষ্টই হলেন আমাদের লাঠি।

কথায়-কথায় শরৎদা প্রভৃতি পাবনা আশ্রমের বিবরণ দিলেন।

শ্রীযুত চ্যাটাজ্জী এই সব বিবরণ শুনে সশ্রদ্ধ বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার এগুলি যদি ক'রে দিতে পারেন, তাহলে আমি একটু তৃপ্তি পাই।

শ্রীযুত চ্যাটাজ্জী তার কর্ম্মময় জীবনের কথা বললেন। প্রসঙ্গত বললেন—এখন বয়স বাড়ছে আগের মত পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার তো জঞ্জাল বাড়ায়ে নিলেন। আমার জন্যেই তো আপনাকে অনেক খাটতে হবে।

শ্রীযুত চ্যাটাজ্জী—আমি তো এগুলি পছন্দই করি। যা' একটু সুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল, তা হয়ত জেগে যাবে আবার।

শ্রীশ্রীঠাকুর জনসাধারণের ধর্ম্ম ও কৃষ্টি বিমুখ মনোভাব সম্বন্ধে নানা কথা বললেন।

শ্রীযুত চ্যাটাজ্জী—খুব খারাপ সময় আসছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দ্রুত এগিয়ে আসছে। তবে হাল ছেড়ে দিলে তো চলবে না! যাতে প্রতিকার হয় তা' করতেই হবে। অর্থ সংগ্রহ করে, কাগজ বের ক'রে ভাবধারাগুলি ঘরে-ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে। শ্রমণ, ঋত্বিক দিয়ে গোটা দেশটা flood (প্লাবিত) ক'রে দিতে হবে। যাত্রা, সিনেমা, থিয়েটারের মধ্যে-দিয়ে জীবনীয় যা-কিছু তা' চারিয়ে দিতে হবে। নূতন ক'রে কথকতার প্রবর্ত্তন করতে হবে। উপন্যাস, গল্প ইত্যাদি এইভাবে লিখতে হবে। যে বেগে পতন হচ্ছে তার দশগুণ জোর দিয়ে ফিঙ্গে

হয়ে লাগতে হবে। এর জন্য চাই মানুষ, চাই টাকা, চাই সংগঠন। কিছু লোক পাগল হয়ে লাগলেই পরমপিতার দয়ায় সব হ'য়ে যাবে। শুধু আমাদের নিজেদের বাঁচার জন্যেই এটার প্রয়োজন নয়। দুনিয়াকে যদি টিকে থাকতে হয়, তাহলে পরমপিতার এই মহা-অবদান সর্বত্র ঘরে-ঘরে পৌঁছে দিতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে এসে বসলেন। যতিবৃন্দ, হরেনদা (বসু), কিরণদা (মুখোপাধ্যায়), খগেনদা (তপাদার) প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

যতীনদা (দাস) বললেন—আজ স্পেনসার ও মার্গারেট উভয়েরই মন খুব ভাল। সকালে গান গাওয়ার পর থেকেই ধীরে-ধীরে স্পেনসারের মেজাজটা ভালর দিকে গিয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মধুখেপা ছিল সে বলত—সংসারটাই একটা চাল। পেটেও চাল লাগে আর চলতেও লাগে চাল, অর্থাৎ একটা কল্যাণকর ভাব আশ্রয় করে চলায়-বলায় সেইভাব বজায় রেখে চলা লাগে।

প্রফুল্লকে লিখতে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওর জন্মই এই জন্য। ওর কান দুটো দেখেছেন ? ও যা' করছে মানুষ পরে বুঝবে এ জিনিসের দাম কী। কত কথা, কত আলোচনা হয়ে গেছে, এতদিন বরাবর যদি লেখা হত একটা লাইব্রেরী হ'য়ে যেত।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে শরৎদাকে বললেন—বেদ, উপনিষদ ইত্যাদি দেখে বের করা লাগে তাতে বর্ণাশ্রম, অনুলোম ও বহুবিবাহ সম্বন্ধে কী কী support (সমর্থন) কোথায় আছে। এগুলি খুঁজে বের করতে হয়।

রাত্রি পৌনে এগারটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে ভোগের পর গোল তাঁবুতে ব'সে আছেন। গরমকাল ব'লে রাত এগারটার পরও লোকজন বেশ আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শৈলমাকে খাওয়ার কথা বলায় তিনি বললেন—অম্বল হয়েছে, খাব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন বললেন—ঋজুতায় যে মানুষের শ্রদ্ধা পায়, এই কথাটা বোঝে না, তাই কপটতা করে। কপটতা থাকলে কপাট পড়ে যায়। ক্ষুধা না থাকলে বলা ভাল —ক্ষুধা নাই, খাওয়ার ইচ্ছা আছে তবে খাব না। অল্প খেতে ইচ্ছা হলে, সেইভাবে ব'লে অল্পই খাওয়া ভাল। ক্ষুধা থাকলে, খাওয়ার ইচ্ছা থাকলে, তাও সোজাসুজি বলা ভাল। সরলতা না থাকলে ভাল হয় না।

শৈলমা—সত্যিই আজ অম্বল হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অম্বল আগে ছিল না। অম্বল না থাকা অবস্থায়, অম্বল হয়েছে বলে-বলেই অম্বল ডেকে আনলি। ওরকমভাবে বলা ভাল না।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, মঙ্গলবার (ইং ৭। ৬। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে রোহিনী রোডের পাশে এসে বসেছেন গাড়ী দেখার জন্য। ভক্তদের মধ্যে অনেকেই উপস্থিত।

শৈলেশবাবুর কথিত উল্টোডাঙ্গার জমি সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। সুধাংশুদা (মৈত্র) মাটির উপর দাগ কেটে জমির position (অবস্থান) বোঝাচ্ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আগে যখন শেয়ালদা থেকে বাড়ীতে পাবনার দিক যেতাম, তখন উল্টোডাঙ্গা স্টেশনের অদূরে যেখানে বড় লাইনের পাশ দিয়ে ছোট লাইন যেতে দেখা যায়—সেই জায়গাটা দেখতাম আর খুব ভাল লাগত।

শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে উঠে এসে গোল তাঁবুর পাশে বসলেন। নূতন আশ্রম সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে বললেন—এ-সব করতে গেলে tenacious enthusiasm (লাগোয়া উদ্যম) চাই। আবার কিছু লোক চাই, যারা লোককে চালনা করতে পারে। Tussling attitude (দ্বন্দ্বপ্রবণ মনোবৃত্তি) থাকলে মানুষ সহকর্ম্মী নিয়ে চলতে পারে না। মানুষকে নিয়ে চলতে সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যাবসায় লাগে—তাদের আপন ক'রে নিতে হয়। বেশী দোষ ধরতে নেই কিন্তু সদ্‌গুণ যা' আছে তার তারিফ করতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু পরে যতি-আশ্রমে আসলেন। সেখানে ব'সে কথাপ্রসঙ্গে নাম করা সম্বন্ধে বললেন—আমরা মনে-মনে নাম জপ করি কিন্তু ঐ জপ প্রসব করে একটা inner vibration (ভিতরের কম্পন)।

এই কথা বলতে-বলতেই শ্রীশ্রীঠাকুর নাম-ধ্যান, ভজন সম্পর্কে একটি বিরাট বাণী দিলেন।

বাণীটি দেওয়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর স্পেনসারদাকে বললেন—শুনেছি রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন—চাবিকাঠি আমার কাছে রইল। কিন্তু এবার আমি তোমাদের হাতে চাবি দিয়ে দিলাম। তোমরা এই মত চললেই সবকিছুর হদিস পাবে।

শরৎদা (হালদার)—নামের অর্থ-চিন্তা মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির সম্পর্ক কী, সৃষ্টি কেমন ক'রে হল, এর মরকোচ কী, নামীর সঙ্গে নামের সম্পর্ক কী, নাম ও নামীর সঙ্গে আমার ও জগতের সম্পর্ক কী, কেমনভাবে সৃষ্টিচক্র চলছে, আমার জীবনের মূলে কী, আমার গন্তব্য কী এইগুলি সম্বন্ধে অন্তর্ম্মুখী হয়ে অনুধ্যানই অর্থচিন্তা। মনে-মনে নাম করতে হয়, আর নামের অর্থ অর্থাৎ গন্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা করতে হয়। 'তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।' নাম সার্থক হয় নামীতে। নাম নামীকেই সূচিত করে। নামীর প্রতি অনুরাগ না হ'লে নাম সার্থক হয় না। অবশ্য নাম করতে-করতে আবার নামীর উপর অনুরাগ জাগে। নাম করতে-করতে উপলব্ধি জাগে যে, নাম-ই আছে আমার এবং যা'-কিছুর সৃষ্টির মূলে। এটা একটা ধ'রে নেওয়া ব্যাপার নয়। বাস্তবেই এমনতর, তাই নাম করতে-করতে নাম যেন পেয়ে বসে। কারণ, নামই আমাদের সত্তা। আবার, নামী ছাড়া নাম নাই। নাম নামী অভেদ। অর্থ চিন্তার মধ্য-দিয়ে আমাদের উপলব্ধির মধ্যে আসে যে, নাম-নামীর সঙ্গে আমাদের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। এইটে যখন বোধের মধ্যে

আসে, তখন এর তুলনায় আর সব কিছুই আলুনি লাগে। নাম-নামীতে রতি হলেই হ'য়ে গেল, তখন জগতের কোন আকর্ষণই মানুষকে বিচলিত করতে পারে না।)

শরৎদা—এখন যদি কেউ রামকৃষ্ণদেবকে অনুসরণ করতে চায় এবং ঐ মতে দীক্ষা গ্রহণ করে তবে সে কার ধ্যান করবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রামকৃষ্ণদেবেরই ধ্যান করা উচিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে বড়াল-বাংলোর মাঠে ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট। এমন সময় শ্রী এস. কে. চ্যাটার্জী আসলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কৃষ্টি যদি না বাঁচে, জাত বাঁচবে না। মুরগী হয়ে যাবে সব। আমরা নিজেদের সম্পদ ও বৈশিষ্ট্য হারায়ে—'হারায়ে মারায়ে কাশ্যপ গোত্র' হয়ে গেছি, না কি হয়েছি ঠিক পাই না। মানুষের চাষ লাগে, উন্নতির চাষ লাগে। বিয়েটা শুধু ইন্দ্রিয়-উপভোগের জন্য নয়। যেমন-তেমন ক'রে বিয়ে করলে, প্রতিলোম করলে সন্তানের বৈধানিক সংস্থিতি নষ্ট হয়ে যায়। সে পিতামাতা কারও ভাল জিনিসটা পায় না। আমরা এ সব জানিও না, মানিও না, তাই পদে পদে ক্ষতিগ্রস্ত হই। Cultural conquest (কৃষ্টিগত পরাভব) হলে যা হয়, আমাদের হয়েছে সেই দশা।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে উপস্থিত।

কয়েকজনের ক্রুর দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে কথা উঠল।

শরৎদা বললেন—আপনি আগে থাকতে ঠেকা দিলে ভাল হত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কতকগুলি ঠেকা আমি দিতে পারি, কতকগুলি অন্যে পারে।

কথায় কথায় শরৎদা বললেন—হরিদাসের ছেলের মার মত চেহারা। এ রকম হয় কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরটা বীজ, ওর স্ত্রীরটা ভূমি। স্ত্রী পোষণ দিয়ে স্বামীর বীজটাকে গজিয়ে তোলে, তাই মায়ের রকমটাও কিছুটা পায়। কথায় বলে—নরাণাং মাতুলক্রমঃ। Intelligence (বুদ্ধি), Brain (মস্তিষ্ক) ইত্যাদি বাপের থেকে পায়।

শরৎদা—সন্তানের মধ্যে মারও অবদান থাকে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—থাকে বৈকি।

হরিদাসদা (সিংহ)—একজন সাধনায় উন্নতি লাভ ক'রেও পতন হয় কি করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মূল থেকে টানটা স'রে গেলে যা' হওয়ার তা' হয়।

হরিদাসদা—সাধন-ভজনে অত উন্নতি সত্ত্বেও ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাধন ভজনের গোড়ায় অনুরাগ থাকে, তা' কেটে গেলে যা হয়।

হরিদাসদা—অতখানি হতে তো অনুরাগ লাগে, তা' নষ্ট হয় কি করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকৃত অনুরাগ হলে তা' ছোটে না। অনুরাগ ছাড়া শুধু কসরতে বিশেষ কিছু হয় না।

হরিদাসদা—তাহলে তো আশার কোন কারণ দেখি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুরাগ যার আছে, আশা-ভরসা তার আছে।

হরিদাসদা—কিছু অনুরাগ না থাকলে মানুষ এ পথে অগ্রসর হয় কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভেবে দেখতে হবে তার উদ্দেশ্য কি। অর্থলোভ, ভগবৎপ্রাপ্তির লোভ, নাম যশ ইত্যাদি কোনটার লোভে আসলে অনুরাগ হয় না। ব্রহ্মত্ব লাভ, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ইত্যাদি আকাঙ্ক্ষা থাকলে তা' পায় না। কারণ, ততক্ষণ পর্য্যন্ত legared (যুক্ত) থাকে ঐ আকাঙ্ক্ষার সাথে।

শরৎদা—শুধু ভাবধারা দেখে যারা আসে, তারা তাহলে পায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাধারণতঃ প্রথমে থাকে সকাম। তারপর মানুষটির উপর যখন ভালবাসা গজায়, তখন ধীরে-ধীরে নিষ্কাম হয়ে ওঠে। চৈতন্যদেব এসেছিলেন, মাত্র সাড়ে তিনজন ভক্ত ছিল। বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূলে তারা। প্রত্যেক মহাপুরুষের ক্ষেত্রেই এমনতর। প্রকৃত ভক্ত যারা, তারাই মর্ম্ম বোঝে এবং তাদের থেকেই খাঁটি জিনিসটা সঞ্চারিত হয়।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একজন আপনাকে খুব ভালবাসে এবং ভালবাসার কথা বলেও খুব। আপনি বললেন—'পাটনায় যেয়ে পাঁচসের টমেটো পাঠিও।' পাটনায় যেয়ে ঢের কাম করবে, কিন্তু ওটা পারবে না। সে যদি আপনাকে প্রকৃতই ভালবাসে, তার পাটনায় যাওয়ার উদ্দেশ্যই হবে টমেটো আনা। তা' তো আনবেই এমন কি গন্ধমাদন এনে হাজির করবে। বই লিখতে বললাম, পারলেন না। নিজের খেয়াল মত পঁচিশ খানা বই লিখলেন। পঁচিশখানা পারলেন, সেখানে প্রবৃত্তি আপনাকে চালনা করছে তাই পারলেন, কিন্তু এটা পারলেন না।

কিরণদা—মানুষ একটা sentiment (ভাবানুকম্পিতা) নিয়েই ইষ্টের পথে চলে তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Complex-এর (প্রবৃত্তির) sentiment (ভাবানুকম্পিতা) থাকে। Real sentiment (প্রকৃত ভাবানুকম্পিতা) থাকলে তার চেহারা অন্য রকম হয়। শৈল যখন নিজের কথা ব'লে support (সমর্থন), sympathy (সহানুভূতি) পেতে চায়, তার কেমন যুক্তি-বুদ্ধি খেলে যায়। ঐটে ইষ্টের ওপর হলে কেমন সার্থক ও বলশালী হ'ত!

কিরণদা—মানুষ এত ঘা খায় তবু বোঝে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Complex-এ (প্রবৃত্তিতে) obsessed (অভিভূত) হ'য়ে থাকে। তাই বোঝে না।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, বুধবার (ইং ৮।৬।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোল তাঁবুর পাশে ইজি চেয়ারে উপবিষ্ট। গোঁসাইদা, উমাদা (বাগচী), গোপেনদা (রায়), মহিমদা (দে), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), ধূর্জ্জটিদা (নিয়োগী), রমেশদা (চক্রবর্ত্তী) প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত।

রমেশদা জিজ্ঞাসা করলেন—সত্তা ও আত্মায় তফাৎ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তা মানে বিদ্যমানতা—অস্তিত্ব। অস্তিত্বের অধিগমন যা' দিয়ে হয় তাই আত্মা। সত্তার conscious motive-power (চেতন চালক শক্তি)-ই আত্মা।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে আসলেন।

প্রফুল্ল—অনেকের চিঠি দেখে মনে হয় কৃষ্টিবান্ধবের কথা তাদের মাথা থেকে স'রে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Fundament (মূল)-কে বাদ দিলে অন্য পথে বিভ্রান্ত হ'য়ে যেতে হয়। গৌণ কোন-কিছুতে concentrate (মনোনিবেশ) করলে তা' থেকে fundament (মূল) আসে না। Fundament (মূল) নিয়ে চললে সবটাই থাকে সেই সঙ্গে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর একটি বাণী দিলেন।

তখন কথাপ্রসঙ্গে বললেন—ভালবাসা থাকলেই, নিন্দার ছলেও ব্যাজস্তুতি হয়, যেমন—কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন। আবার, ভালবাসা না থাকলে, সুখ্যাতি করছে তার মধ্যেও নিন্দার ভাব ফুটে বেরোয়।

পূজনীয় বড়দা, সুধাংশুদা (মৈত্র), স্পেনসারদা, হাউজারম্যানদা প্রভৃতি আসলেন সত্যানুসরণের ইংরেজী অনুবাদ শ্রীশ্রীঠাকুরকে শোনাবার জন্য।

একটু পরে স্পেনসারদার মাথার দিকে চেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—স্পেনসারের চুল কাটা ব্রাহ্মণের মতো হয়েছে। ওর চলা, চাউনি, চুল কাটা সবটাই typical (আদর্শ) বামুনের মত। ধুতি-চাদর পরিয়ে দিলে পার্থক্য করা মুশকিল আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাঠে বসে একটি বাণী দিলেন।

তারপর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—যাযাবরের জীবন বেশ।

সেই প্রসঙ্গে ইরানীদের কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ছেলেবেলায় তখন বার-চোদ্দ বছর বয়স। ভবানী পালের সঙ্গে বেড়াতে গেছি প্রতাপপুর কালীবাড়ী। একদল ইরানী এসেছে। একটা ইরানী মেয়ে আমাকে দেখিয়ে বলে—'হাম উনকো সাদী করুঙ্গী।' সে নাছোড়বান্দা, কিছুতেই যেতে চায় না। ওকে জোর করে নিয়ে যেতে চাইলে বলে—'হাম কভী নেহি যাউঙ্গী, জান্ টুট্ দেও, তব ভি নেহি যাউঙ্গী।' একটা পুরুষ ওকে যে কি মারতে লাগল, তবু যাবে না। আমার ভয় করতে লাগল।

মনে পড়ে, হেম চৌধুরীর বাড়ীর কাছে ওখানে একজন অঘোর সন্ন্যাসী ছিল। সে আমাকে খুব ভালবাসত, কাঁধে করে নিয়ে ঘুরত, বাঙ্গাল ছিল। আমাকে দেখলে বলত—'আইও, আইও।' আমি তার সঙ্গে তুই-মুই ক'রে কথা বলতাম। রোজ সন্ধ্যায় সে শ্মশানে যেত। একদিন তার পেছনে-পেছনে শ্মশানে গেলাম। দেখি, সে জলে নেমে মড়া খাচ্ছে। আমার সেইরকম মনে হল। আসলে আমি বললাম—আমি ব'লে দেব

তুমি মড়া খাও। সে কথার উত্তর দেয় না। বলে—'মুড়কি খাবা ?' আমাকে ক'লো — 'কাঁধে চড়বা ?' আমি আর চড়লাম না। ব'লে দেব বলাতে সেই রাত্রেই কোথায় চ'লে গেল। আর আসেনি।—কেউ দেখল না—কোন দিক দিয়ে দিয়ে যেন চ'লে গেল। জীবনে আর দেখলাম না তাকে।

ঐ লোকটা রাত্রে চিৎকার করত—'ধলা বাবু! কালা বাবু! ডাক পাড়ে ডাক পাড়ে।' একদিন শ্যাম চৌধুরী, হেম চৌধুরীর বাবা তার ধলা বাবুকে দেখতে চাইলে লহমার জন্য দেখায়। দেখে শ্যাম চৌধুরীর ভয়ে অজ্ঞান হ'য়ে যাওয়ার মত অবস্থা। তখন আমার বয়স সোনাদের মত। ঐ বয়সে দেখেছিলাম একটা মোটা বেজী আর বড় সাপ। কেষ্ট বৈরাগীর স্কুল থেকে আসছি, বেলা সাড় চারটে আন্দাজ হবে। বিকালে ছায়া-ছায়া পড়ে গেছে। সাপ বিরাট ফণা ধরে উঠছে, যেই ছোবল দিতে যায়, বেজী যেন কেমন করে। সাপটা বেহাল হ'য়ে যাওয়ার মত অবস্থা। তখন বেজী সাপের উপর দিয়ে ক'বার এদিক গেল, ক'বার ওদিক গেল। দেখি ততগুলি খণ্ড হয়ে গেল—এপার লাফ, ওপার লাফ তাতেই অমন হয়ে গেল, কতকগুলি বিচ্ছিন্ন খণ্ড প'ড়ে রইল। পরে অনেক লোকজন আসল। এটা নিজে দেখা না থাকলে হয়ত সন্দেহ থাকত।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইসব গল্প করার পর চৌকিতে অর্ধশায়িত অবস্থায় বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন। বড়দা প্রভৃতি সাপের গল্প করছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সেই সব গল্প শুনছিলেন।

জ্যোৎস্না রাত। দূরে একজনকে আসতে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—কে দূরে প্রাচীরের কাছ দিয়ে আসছে, দেখে যেন হঠাৎ মনে হল মা আসছে। আমার মাঝে-মাঝেই এ-রকম মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে ফিরে শৈল মার জন্য খিচুড়ি করার নির্দেশ দিলেন—চাল, ডাল, তেল, ঘি, মশলা, জল ইত্যাদি কোন্‌টা কি পরিমাণ দিতে হবে, কতক্ষণ জ্বাল দিতে হবে সব কিছুই খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বললেন। বললেন—আদা-মৌরি দেওয়া ভাল, তা' নাহলে পেটে বায়ু হতে পারে।

পরে আবার হিং ভেজে অল্প পরিমাণ দিতে বললেন।

কালীষষ্ঠীমার বাড়ী থেকে মাষকলাই আনার ব্যবস্থা করলেন।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, বৃহস্পতিবার (ইং ৯।৬।১৯৪৯)

আজ সকালে মন্মথদা (ব্যানার্জ্জী) ও পাঁচুদা (চক্রবর্ত্তী) ভূপেশ চন্দ্র মজুমদার নামক এক ভদ্রলোককে নিয়ে কলকাতা থেকে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভূপেশদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমরা যে চালে চলছি তাতে সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। আমরা আমাদের কৃষ্টি জানিও না, মানিও না। যে-জিনিস

জানি না, সেটা পট ক'রে নাকচ করে দেওয়ার বুদ্ধি ভাল না। সৃষ্টির মধ্যে জীবন্ত কোন-কিছুই নেই যা'র কোন বৈশিষ্ট্য নেই। প্রতিটি যা-কিছুর বৈশিষ্ট্যই হল তার জীবনদাঁড়া। এই বৈশিষ্ট্য নষ্ট করলে সে আর সে থাকে না। বৈশিষ্ট্য ঠিক থাকলে সে পারিপার্শ্বিক থেকে নিতেও পারে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী, আবার পারিপার্শ্বিককে পোষণও জোগাতে পারে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী। এইভাবে পারস্পরিক আদান-প্রদানের ভিতর-দিয়ে প্রত্যেকেই উপকৃত হয়। বর্ণাশ্রমের উদ্দেশ্য হ'ল—এই বৈশিষ্ট্যকে পুষ্ট করা। তাতে প্রত্যেকেই লাভবান হতে পারে।

আবার, মানুষগুলিকে সংহত করে তুলতে গেলে চাই Common Ideal-এ (একই আদর্শে) আনতি। আর, চাই পরস্পরের মধ্যে সত্তা-সম্বর্দ্ধনী সহযোগিতা। আমাদের ধারাটা ছিল অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক। জন্ম, কর্ম্ম, দীক্ষা, শিক্ষা, ধর্ম্ম, অর্থ, বিবাহ, সমাজ, রাষ্ট্র সবকিছুর মধ্যে একটা গভীর সঙ্গতি ও সমন্বয় ছিল। সেই গড়া জিনিস আমরা ভেঙে দিতে চাচ্ছি। আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ছিল নিজের ও পরিবেশের ইষ্টানুগ কল্যাণ সাধনের জন্য। এখন একাকার করার বুদ্ধি প্রবল হচ্ছে। কিন্তু নিজত্ব না থাকলে কি অন্যত্বের বোধ মানুষের গজায়? কম্যুনিজম্ বলতে কী বোঝায় আমি ঠিক বুঝতে পারি না। আমার মনে হয়—প্রত্যেকের বাঁচাবাড়া, সার্ব্বিক উন্নতি ও পারস্পরিক সহযোগিতা যদি আমাদের কাম্য হয়, তাহলে ঋষি-শাসিত বর্ণাশ্রমকে যুগোপযোগীভাবে বিন্যস্ত ক'রেই তা' সহজে হ'তে পারে। বর্ণাশ্রম মানুষ গড়ার যে কৌশল আমাদের দেখিয়েছে, তার তুলনা হয় না। ভাল সংস্কার-সম্পন্ন মানুষের জন্ম যদি না হয়, তাহলে কিন্তু কিছুতেই কিছু করা সম্ভব নয়। তাই বিয়েটা ঠিক হওয়া কিন্তু একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মানুষ জন্মের সময়ই Zygote (জাইগট) নিয়ে দাঁড়ায়। সেই সুর যদি না থাকে, তবে শরীর গজাবে কি সুরে? মানুষ, গরু, ছাগল সবারই evolution (বিবর্ত্তন) আছে। Evolution (বিবর্ত্তন) হয় ভিতরের urge (আকূতি) থেকে। তা' যত concentric (সুকেন্দ্রিক) হয়, ততই growth (বৃদ্ধি) হয়। আমাদের বাইরে প্রবৃত্তির উপর আধিপত্যসম্পন্ন কোন জীবন্ত কেন্দ্রে যুক্ত হওয়ার ভিতর-দিয়েই আমরা প্রবৃত্তির উপর আধিপত্য লাভ ক'রে সত্তা-সম্বর্দ্ধনার দিকে অগ্রসর হ'তে পারি। প্রবৃত্তির অধীন হলে সত্তা হ'য়ে যায় দুর্ব্বল। সত্তা যদি সবল না হয়, তবে আমাদের বাঁচাবাড়াই তো কঠিন হয়ে পড়ে।

ভূপেশদা—সবাই তো সমান সবল হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে যতখানি প্রবৃত্তির উপর আধিপত্য লাভ করে, সে তেমন সবল হয়। প্রবৃত্তির উপর পরিপূর্ণ আধিপত্য লাভ করেছেন যিনি, তাঁকেই আমরা বলি Ideal (আদর্শ)।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি হোমিওপ্যাথ তো?

ভূপেশদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হোমিওপ্যাথ যখন রোগীর মানসিক লক্ষণ সম্বন্ধে খোঁজ করে, এ্যালোপাথরা তখন হাসে, বলে—ও দিয়ে কী হবে ?

ভূপেশদা—ওরা বলে রোগ তাড়াও, আমরা চাই মনোবল বাড়াতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুই-ই চাই, কোন খাঁকতিই রেহাই দেয় না। শরীর-মন দুটোকেই ঠিক করা লাগে। রোগীর বোধ একটা বড় কথা।

ভূপেশদা—আপনি যে-সব বলেছেন, সে-সব ঠিক করতে অনেক সময় লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তা' মনে হয় না। ঠিক পথে চলতে শুরু করলে, তার সাথে-সাথে সবকিছুই গজিয়ে ওঠে। তোমাদের চাই চরিত্র। চরিত্র থাকলে তা' দেখে মানুষ যত সহজে আকৃষ্ট হয় অমন আর কিছুতে হয় না। ওতেই কাজ এগিয়ে যায়। আদর্শ চাই, দীক্ষাও চাই। ট্রাম গাড়ী চলতে-চলতে যেমন আলো বিচ্ছুরণ করে, ইষ্টানুরাগী মানুষের চলার মধ্য-দিয়েও তেমনি আলো বিচ্ছুরিত হয়। তপ চাই, মানে হাতে-কলমে করা চাই। এমনি ক'রে দাঁড়ালে দেখ ক'দিন লাগে! লেংটি এঁটে জঙ্গলে গেলে কিন্তু ধৰ্ম্ম হবে না। পারিপার্শ্বিককে বাদ দিয়ে কেউ বাঁচতে পারে না, বাঁচতে হবে সপারিপার্শ্বিক। প্রবৃত্তিগুলিকে, যৌনসম্বেগকে, টাকা পয়সাকে এক কথায় সবকিছুকে সত্তা-সম্বৰ্দ্ধনী ক'রে তোলা লাগবে। আর, তাকেই বলে ধৰ্ম্ম। আমরা hunger এবং sex-এর (ক্ষুধা এবং যৌন প্রবৃত্তির) দাস হব না, কিন্তু সেগুলিকে এমন করে নিয়ন্ত্রিত করব, যাতে তারা বাঁচাবাড়ার সহায়ক হয়। শরীর পোষণের জন্যে যা' দরকার তাই খাব। খেতে গিয়ে যদি শরীর ঘায়েল হয়ে যায়, তাহলে hunger-এর (ক্ষুধার) উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে গেল। যৌন প্রবৃত্তিকেও ততটুকু আমল দেব, যতটুকু সত্তা-সম্বৰ্দ্ধনার জন্য প্রয়োজন। নচেৎ অমানুষ হ'য়ে যাব, নিউরাস্থেনিয়া হবে, ভিরমি খেয়ে রাস্তায় প'ড়ে যাব। সব ব্যাপারেই এই মাত্রা ঠিক রেখে চলা লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে যতি-আশ্রমে এসে বসলেন।

ভূপেশদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমরা সেবাদল করছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেবাদল করছ খুব ভাল কথা। সেবা যদি করতে চাও কর। তবে আগে সেবার প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর। Concentric Urge (সুকেন্দ্রিক আকৃতি) হ'ল সেবার প্রাণ।

বিবাহ সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সত্তা-সম্বৰ্দ্ধনী অনুপোষক কুলসংস্কৃতি ও ব্যক্তিগত প্রকৃতি-ওয়ালা মেয়ে বিবাহ করাই বিধি। হোমিওপ্যাথিতে যেমন complementary (পরিপূরক) ওষুধ দেওয়ার কথা আছে, এও কতকটা সেই রকমের। সবর্ণ এবং অনুলোম—দুই রকম বিবাহের ক্ষেত্রেই এদিকে নজর রেখে চলা লাগবে। তাতে স্ত্রী হবে মনোবৃত্ত্যনুসারিণী এবং দাম্পত্য প্রণয় হবে গভীর। তাতে সন্তানও ভাল হবে।

পুরুষ যদি ইষ্টপ্রাণ না হয়, তাহলে তার মেয়েমুখী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মেয়েরা কখনও মেয়েমুখী পুরুষকে পছন্দ করে না। পুরুষের চাই আদর্শপ্রাণতা ও পৌরুষ। চরিত্র ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষকেই সাধারণতঃ মেয়েরা পছন্দ করে। পুরুষ যত শ্রদ্ধার্হ চরিত্র সম্পন্ন হয় এবং মেয়েদের তাদের প্রতি যতখানি শ্রদ্ধা থাকে ততই ভাল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এয়ারী ভাব ভাল না। প্রত্যেকে যাতে ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী হয় সেইদিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে।

দুটো জিনিস আছে—প্রবৃত্তি-ঔদার্য্য আর সত্তা-ঔদার্য্য। আমার লোভ হলো, যা ইচ্ছা খেলাম। কামের বেগ হল যেখানে ইচ্ছা সেখানেই তা চরিতার্থ করলাম, স্থান, পাত্র, কালাকাল কিছু বিচার করলাম না। রাগ হল যা খুশী তাই বলে ফেললাম, যথেচ্ছ ব্যবহার করলাম—এগুলি হ'ল প্রবৃত্তি-ঔদার্য্যের ব্যাপার। এতে সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত হয়। আর, প্রতি মুহূর্ত্তে খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা, আচার-আচরণ সবকিছু এমনভাবে করা লাগবে, যাতে জীবনটা বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত হয়। তেমনতর চলাই সত্তা-ঔদার্য্য বা ধর্ম্ম।

শ্রীশ্রীঠাকুর এখন একবার তামাক খেলেন।

তারপর নিজে থেকে বললেন—ধর্ম্মই হল solution of all isms (সমস্ত বাদের সমাধান)। যেনাত্মনস্তথান্যেষাং জীবনং বর্দ্ধনঞ্চাপি ধ্রিয়েতে সধর্ম্মঃ। সপরিবেশ বাঁচাবাড়া যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য যদি উদ্বর্দ্ধনশীল হয়, তাহলে আর চাই কী? ধর্ম্মের সংগেই আছে আবার অসৎনিরোধ। কেউ যাতে কারও বাঁচাবাড়ার প্রতিকূল না হ'তে পারে সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। তাই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হলেই সবদিক বজায় থাকে।

রাষ্ট্র সম্বন্ধে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

শরৎদা—তাতে তো ঋষি লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের ঋষি হওয়া লাগে—কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে, তপের ভিতর-দিয়ে। Concentric (সুকেন্দ্রিক) না হলে একটা মানুষ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী হ'য়েও কিছু করে উঠতে পারবে না। তার জ্ঞান সার্থকভাবে বিন্যস্ত হবে না। Universal library (বিশ্বজনীন লাইব্রেরী) যার মাথায় আছে, সে নাম সই করতে না পারলেও, তার ধী-র সাথে কারও পারার জো নেই॥ শিবাজী কী করল?

শ্রীশ্রীঠাকুর স্নানের আগে বড়াল-বাংলোর পিছনের বারান্দায় তেল মাখছিলেন। কাছে অনেকে ছিলেন।

মন্মথদা (ব্যানার্জ্জী) একজনের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন—তাকে দিয়ে কাজ করাতে তার পিছনে কি খাটার প্রয়োজন হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মালী হওয়া কি সোজা কথা? বাগান করলে দেখতে হয় যাতে গাছ-গুলিতে পোকা-মাকড় না লাগে, জল দিতে হয়, সার দিতে হয়, নিড়েন দিয়ে

খুঁচিয়ে দিতে হয়। কত খাটতে হয়, না হলে কি হয়? মানুষ চালান কি চাট্টিখানি কথা?

শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নানের সময় রেণুমা একটা ব্যাপার নিয়ে কথা-প্রসঙ্গে কাশীদাকে বললেন—তোমার তখন যেমন মেজাজ দেখেছিলাম, মনে হচ্ছিল তুমি আমাকে মেরে দিতে পার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও কথাটা বলা ঠিক হল না। ঐভাবে বলতে নেই, তাতে ওর মধ্যে যদি ঐরকম প্রবৃত্তি থাকে, তাকে উসকে দেওয়া হয়। সেইজন্য মানুষের উপর খারাপ কিছু আরোপ করতে নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট।

—মন্মথদা ও ভূপেশদা কলকাতায় যাওয়ার প্রাক্কালে বিদায় নিচ্ছেন।

ভূপেশদা বিকালে দীক্ষা নিয়েছেন।

যাওয়ার আগে মন্মথদা ও ভূপেশদার ভাব দেখে মনে হচ্ছিল যেন, শ্রীশ্রীঠাকুরকে ছেড়ে যেতে ওঁদের কষ্ট হচ্ছে।

ওঁরা একটু সরে যাওয়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর ভূপেশদার সম্বন্ধে বললেন—ওবেলায় একরকম ভাব ছিল আর এবেলায় দেখেন ভাবের কত তফাৎ। দীক্ষা না হ'লে এই ধরনটা আসে না।

একটু পরে শরৎদা জিজ্ঞাসা করলেন—দুনিয়ার সব কিছুই তো পরমপিতা থেকে উদ্ভূত। যে-মানুষটা বিশ্বাসঘাতক সেও তো তাঁরই এক রূপ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গাছ-পালা, পোকা-মাকড়, শূকর-গরু, আকাশ-বাতাস, মানুষ—সবই তাঁরই পরিণতি—বিধিকে অনুসরণ ক'রে। কেউ যদি বিশ্বাসঘাতক হ'য়ে থাকে তারও একটা কারণ আছে। তবে তার ঐ চরিত্র যদি আমার জীবনের পক্ষে প্রতিকূল হয়, তবে তো আমি বিপন্ন হ'য়ে পড়ি। আমার মধ্যে সত্তারূপে পরমপিতাই তো বর্ত্তমান, আবার ওর মধ্যেও তাই। সুতরাং সে যাতে তা'র, তা'র পরিবেশের ও তা'র ইষ্টের অনুকূল চলনে চলতে পারে, সেইভাবে তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে চেষ্টা করাই তো আমার কর্ত্তব্য। তাই, আমরা দোষকে ঘৃণা করলেও দোষীকে ঘৃণা করতে পারি না। দোষীকে পরিশুদ্ধ করে দোষমুক্ত করাই আমাদের কাজ—অবশ্য যতখানি সম্ভব। আবার, কারও যদি এমন কোন দোষ থাকে, যার নিরাকরণ সম্ভব নয়, অথচ সে-দোষ সপরিবেশ ও আমার সত্তাঘাতী হ'য়ে উঠতে পারে, সেখানে সে যাতে আমার ও অপরের পক্ষে ক্ষতিকর না হয়, তেমনতর ব্যবস্থা করে চলতে হবে।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, শুক্রবার (ইং ১০।৬।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোল তাঁবুর পাশে ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হ'য়ে ইজিচেয়ারে ব'সে আছেন।

কলকাতা থেকে পি এস ভাণ্ডারীদা এসেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—হিরণ্যলোক কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হিরণ্যগর্ভ কয়। একটা region (লোক) আছে, যেখান থেকে প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি উৎসারিত হচ্ছে। ত্রিকুটি ও দশম দ্বারের মাঝখানে dark stage (অন্ধকার স্তর) আছে, সেখানে অনেকে merge ক'রে (লয় হয়ে) যায়। সেটা অতিক্রম ক'রে গেলে হিরণ্যলোক, সেটা bright like morning Sun (প্রাতঃসূর্য্যের মত উজ্জ্বল)।

কথাপ্রসঙ্গে তিনি আরও বললেন—সাধনার ভিতর-দিয়ে মানুষ যত উচ্চলোকে যায়, ততই ভাল। সংক্ষেপে বলছি—পিন্ডলোক থেকে সোঽহম পুরুষ অতিক্রম ক'রে সত্যলোকে যায়। সেখানে আছে Seed of everything (সব-কিছুর বীজ)। সেখান থেকে অগম, অলখ লোকের দিকে গতি হয়। সমস্ত বীজই শব্দাত্মক নামের অঙ্গীভুত। এক-একটা বীজ এক-একটা বিরাট লোকের প্রতীক। সৎ নাম হ'ল অনামী নাম, এর মধ্যে আছে mechanism of vibration (স্পন্দনের মরকোচ)। এই নাম বিধিমত করলে এমন প্রেরণার সৃষ্টি হয়, যাতে বিভিন্ন স্তরের বীজাত্মক নামের অনুভূতি জাগে। আমাদের এই নাম শব্দরূপে অনুভব করা যায় না। কিন্তু সমস্ত সত্তার ভিতর-দিয়ে যে অনুভবটা হয় এটা তার শাব্দিক প্রকাশ। কতকটা পেঁয়াজের খোসার মত। একের পর এক খোসা থাকে। পর-পর খুলতে-খুলতে যেখানে আর খোসা নেই, সেখানে final (চরম)।

প্রবোধদা (মিত্র)—খুব দ্রুত নাম করা কি ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার যে-রকম তার সে-রকম ভাল। সবার দ্রুতত্ব এক রকম নয়।

কথাপ্রসঙ্গে তিনি আরও বললেন—সোঽহমস্তরে যা' দেখা যায় তার সঙ্গেই নিজেকে identified (একীভূত) মনে হয়। আমিই সব হয়েছি, গাছ-পালা, জীবজন্তু সবই যেন আমি, এমনতর অনুভব হয়। এই অনুভূতির ভিতর-দিয়ে সর্ব্বভূতে আত্মবোধ আসে। তখন কারও ক্ষতি হ'লে মনে হয় আমারই ক্ষতি হ'ল, লাভ হ'লে মনে হয় আমারই লাভ হ'ল। তাই, সবাইকে ভালবাসা ও সবার ভাল করা অনিবার্য্য হয়ে ওঠে। স্বার্থবোধই অনন্ত বিস্তার লাভ করে।

প্রবোধদা—বিভিন্ন স্তরের নাম কি সেইসব স্তরের বোধ-অনুসারে হয়েছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কর, ক'রে বোঝ। শোনা কথায় মসগুল হ'য়ে থাকা ভাল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে ভজন সম্বন্ধে বললেন—বাঁদিকের শব্দে নজর দিতে নেই। ওটা নীচে নিয়ে আসে, প্রবৃত্তির দিকে নিয়ে যায়। বাঁদিকের শব্দ অনেক সময় আকৃষ্ট করে, কিন্তু তা প্রতিলোম। দক্ষিণ দিকের শব্দ অনুলোম। দক্ষিণ মানে, যাতে দক্ষতা অনুস্যূত আছে। আমরা শব্দ অনুসরণ করি গুরুর প্রতি অনুরাগে। তার মধ্যে-দিয়ে গুরুকে খুঁজি মণ্ডলে-মণ্ডলে। শব্দ যেন গুরুর শব্দায়িত মূর্ত্তি। শব্দকে অনুসরণ করতে হয়, আবার অনুসন্ধান করতে হয়।

ভাণ্ডারীদা—শব্দের রাজ্য খুব চিত্তাকর্ষক তাই না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব অবস্থাগুলি চিত্তাকর্ষক নয়। অনেক সময় কিছুই পাওয়া যায় না, যেন একেবারে ফাঁকা। তখনও জোর করে লেগে থেকে penetrate (ভেদ) ক'রে যেতে হয়। যখন নীরস লাগে, তখন ধৈর্য্য ধ'রে চালিয়ে যাওয়াই কঠিন হয়। বাঁদিকের শব্দ অনেক সময় বেশ চিত্তাকর্ষক মনে হয়, কিন্তু সেদিকে আকৃষ্ট হতে নেই, তাতে খারাপ হয়। ওটা যেন প্রতিলোম। সামাজিক জীবনেও বিয়ে-থাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে প্রতিলোম সম্বন্ধ খুব খারাপ। তাই, পূর্ব্বতন সন্তরা অর্থাৎ ঋষিরা তা বারণ করে গেছেন। বিবাহ-বিধি জীবনবৃদ্ধির প্রতিকূল হওয়া ভাল না।

দুলালীমা—গুরু সঙ্গে থেকে তো আমাদের সাধন-পথের বাধা দূর ক'রে দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি তো সঙ্গে থাকেন। তবে আমরা যদি সঙ্গে রাখি তাহলেই হয়।

দুলালীমা—জীবের দোষ নেই, আবরণের উপর আবরণ চাপান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দোষ মানে, যা' করলে আমাদের খারাপ হয়। তাঁর প্রতি অনুরাগ যদি কম থাকে এবং প্রবৃত্তির ঝোঁকে আমরা যদি চলি তাহলেই খারাপ হয়।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এমনতর দেখা যায়, কেউ হয়ত কালী বা বিষ্ণু ভজনা করে, তা করেও যদি নাম ভজনা করে, তবে তা' করা সত্ত্বেও যা হচ্ছিল না, সে-সব অনুভূতি, দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি তাড়াতাড়ি এবং পরিষ্কারভাবে হয়।

ভাণ্ডারীদা—যারা সাধনরত, প্রবৃত্তির টান সাধারণ লোকের থেকে তাদের উপরে বোধহয় বেশী জোর খাটায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা অনুরাগ নিয়ে সাধনা করে প্রবৃত্তির টান তাদের বেশী ঘায়েল করতে পারে না। তার কারণ, তারা এতে যে আনন্দ পায়, প্রবৃত্তি সে আনন্দ দিতে পারে না। সাধনার ভিতর যদি অনুরাগ না থাকে, শুধু কসরত চলতে থাকে, প্রবৃত্তির দিকে মন প'ড়ে থাকে, তাহলেই মুশকিল হয়। ইষ্টানুরাগই আমাদের উদ্ধাতা।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আগ্রা থেকে একজন সৎসঙ্গী এসেছিলেন। তিনি বলছিলেন—সৎসঙ্গীদের মধ্যে প্রতিলোম বিবাহ হলে কোন দোষ নেই। আমি বলি—সৎসঙ্গী হলে তো রূপ বদলে যায় না। কোন ব্যাপারে আমাদের এমন কিছু করা ভাল না যাতে আমাদের গতি উর্দ্ধমুখী না হয়ে নিম্নমুখী হয়।

ভাণ্ডারীদা—তাদের পরবর্ত্তী বংশধরদের পক্ষে খারাপ হতে পারে, কিন্তু তাদের খারাপ হবে কি করে? তাদের তো গুরু টেনে নেবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাদেরও ক্ষতি হয়। বাঁদিকের শব্দ শুনতে থাকলে যেমন সাধকের ক্ষতি হয়, এতেও তেমনি হয়। আমরা যদি দৈনন্দিন জীবনে প্রতি ব্যাপারে, প্রতিটি কাজের ভিতর-দিয়ে ধর্ম্মকে প্রতিপালন না করি, তাহলে ধর্ম্ম আমাদের কাছে মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে না, জীবন্ত হ'য়ে ওঠে না। সেইজন্য এর রোশনি চরিত্রে ফোটে না।

ভাণ্ডারীদা—বংশানুক্রমিক সংস্কার মানুষ পিতৃপুরুষ থেকে পায়, তার সঙ্গে তো আত্মার কোন সম্পর্ক নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পিতৃপুরুষের চলনার মধ্যে যদি পবিত্রতা না থাকে তবে সন্তানের জৈবী-সংস্থিতি আধ্যাত্মিক চলনের পক্ষে অনুকূল হয় না। সেখানে গোলমাল হ'লে এগোন যায় না। কথায় বলে—পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে। আমাদের বৈধানিক সংস্থিতি যেমন, বোধ এবং চলনও হয় তেমনতর। কোন-কিছু করতে গেলে ত দনুরূপ জৈবী-সংস্থিতি দরকার। চোখ না থাকলে কি আমরা দেখতে পারি ?

ভাণ্ডারীদা—শূদ্রও তো আধ্যাত্মিক জীবনে বড় হ'তে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা পারবে না কেন ? প্রত্যেকের মধ্যে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্য ঠিক রাখা চাই। তাহলেই সম্ভাবনা থাকে। বিয়ে-থাওয়ার গোলমাল হ'লে এই বৈশিষ্ট্যটাই ভেঙ্গে যায়।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সব মহাপুরুষই এক কথা ব'লে গেছেন। তাঁরা বিভিন্ন জন বিভিন্ন স্তরের হ'তে পারেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ, মূল বস্তু এক। সবাই এক কথা বলেন, তাই বলে বিজ্ঞান। আমেরিকা, ইউরোপ, ভারতবর্ষ এইসব দেশের বিজ্ঞান আলাদা নয়। সব দেশেই তা এক। তাই কোন হিন্দু যদি মুসলমান সন্তের কাছ থেকে নাম নেয়, তাহলে তার জাত যায় না। কোন মুসলমান যদি হিন্দু সন্তের কাছ থেকে নাম নেয়, তাহলেও সেই একই কথা। যারা ধর্ম্মের পথে চলে তারা কখনও পতিত বা ম্লেচ্ছ ব'লে পরিগণিত হতে পারে না। অবশ্য, পিতৃপুরুষ বা পিতৃকৃষ্টি কখনও অস্বীকার করা ভাল না।

ভাণ্ডারীদা—কবীর সাহেব বলেছেন—সত্যলোকে জাত-বর্ণ-কুল নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, যে-কোন জাত, বর্ণ বা কুলের লোকই বিধিমাফিক সাধনা ক'রে সত্যলোকের অনুভূতিতে পৌঁছাতে পারে। তার মানে এ নয় যে, সমাজে জাত-বর্ণ-কুলের কোন স্থান নাই। যে প্রসঙ্গে যে-কথা বলেছেন অন্য জায়গায় তা' খাটাতে গেলে চলবে না।

ভাণ্ডারীদা—সৃষ্টি এখানে যেমন, সেখানে কি তেমনি নেই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানে যা' আছে, ওখানে তার মূল। একই ধারা দয়ালদেশ থেকে নেমে ব্রহ্মাণ্ডলোকের মধ্য-দিয়ে যখন নিম্নাভিমুখী হ'য়ে সৃষ্টি করতে লাগল তখন থেকেই রকমারি শুরু হল। সব-কিছুর উৎস কিন্তু সৎ-পুরুষ। বহুত্ব যেখানে এসেছে সেখানে বহুর প্রত্যেকটি কিন্তু বিশিষ্ট। কোনটা কোনটার মত নয়। সৃষ্টির মধ্যে বৈচিত্র্য আছেই। এই বৈচিত্র্যকে বাদ দিলে সৃষ্টি থাকে না। বিচিত্র যা-কিছুকে টিকিয়ে রাখতে গেলে, প্রত্যেককে পোষণ দিতে হবে তার মত ক'রে। তোমার প্রকৃতি অনুযায়ী তোমাকে, আমার প্রকৃতি অনুযায়ী আমাকে। আমার হয়তো একরকম খাদ্যখানা পোষায়, তোমার হয়তো অন্যরকম। জোর ক'রে কারওটা কারও উপরে চাপান ঠিক নয়।

ভাণ্ডারীদা—সত্যলোকের কেন্দ্রে তো পুষ্প !

শ্রীশ্রীঠাকুর—পুষ্প মানে, যা বিকশিত হয়ে ওঠে। আমি সন্তদের বই পড়িনি। আমি যা বলি তা' একদম আমার personal experience (ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা)।

কোনকিছুর সঙ্গে মেলে তো আমি blessed (ধন্য), না মিললে can't help (অসহায়)। শুনি—মেলে বলে। সন্তদের কোন বই পড়িনি তবে শুনেছি মাঝে-মাঝে। অবশ্য পড়ার ক্ষমতাও আমার নেই।

ভাণ্ডারীদা—মা জানতেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ তিনি জানতেন।

অন্য কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শ্রীকৃষ্ণ তো শব্দযোগী ছিলেনই। আমার ধারণা ক্রাইস্টও শব্দযোগী ছিলেন। তাঁর সব কথাই সন্তদের সঙ্গে মেলে। ঠিকভাবে পরিবেশন না হলে গোলমাল হয়। কোন পিছটান বা সংস্কারে আবদ্ধ থাকলে upper motion (ঊর্ধ্বগতি) stopped (রুদ্ধ) হ'য়ে যায়। বর্ত্তমান সন্তের মধ্যে পূর্ব্বতন সব সন্তই সঞ্জীবিত থাকেন। তাঁকে ভালবাসলে, তাঁর ভিতর-দিয়ে সবাইকেই পাওয়া যায়। সন্ত ব'লে যাঁরা অভিহিত হন, তাঁদের সবাই কিন্তু সন্ত নন। একজন যাওয়ার পর পরবর্তী যোগ্যতম ব্যক্তি হয়ত নির্ব্বাচিত হলেন, তিনি সন্ত নাও হতে পারেন। ইউনিভারসিটি যেমন সম্মানসূচক ডিগ্রী দেয়, এও কতকটা সেইরকম। কোন ভাল ভক্তকে বলা হ'ল—তুমি চালাও। তার চলনা ঠিক না থাকলে follower (অনুসরণ-কারী)-দের মধ্যে গলতি ঢুকে যায়। সাধারণ মানুষও কয়েদ হ'য়ে থাকে তাতে।

ভাণ্ডারীদা—একজন প্রকৃত সন্ত আসার পর, তাঁর পরবর্ত্তীকালে হয়ত সন্ত নন এমনতর লোক সন্ত ব'লে পূজিত হন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐভাবে গোল আসে। এরা হল সাজা সন্ত, বাস্তব চরিত্রে হয়তো তা' নয়।

ভাণ্ডারীদা স্বর্গ-নরক ইত্যাদি সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেখানে সত্তায় ক্ষমতা নেই, প্রেম-প্রীতি নেই, ঐক্য নেই সেখানে স্বর্গ নেই। মানুষ যত প্রবৃত্তির কয়েদখানায় থাকে, ততই অপরের প্রতি দ্রোহ-বুদ্ধি ও বিরোধ নিয়ে চলে। প্রবৃত্তিপরামৃষ্ট হ'য়ে সঙ্কীর্ণ জীবনযাপন করাই নরক বাসের সামিল।

ভাণ্ডারীদা—কখনও-কখনও আমরা মৃত আত্মীয়-বন্ধুদের স্বপ্ন দেখি এবং তাদের নূতন চেহারায় দেখতে পাই, এগুলি কেমন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কখনও ঐ দেখা-মূর্ত্তির পেছনে আমাদের মন ক্রিয়া করে, কখনও আবার tuning (একতানতা) থাকার দরুন বাস্তবে যা ঘটেছে তা feel (অনুভব) করি।

ভাণ্ডারীদা—মৃত্যুর পর আমরা কোন্ অবস্থায় কোন্-রূপে থাকি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ম'রে আমরা আমাদের অনুরূপ প্রবৃত্তিতে সমাহিত হ'য়ে থাকি। পুনরায় জন্ম না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ অবস্থাই চলে। তাই, মানুষ হয়ে না জন্মালে further (আরও) evolution (বিবর্ত্তন) বা improvement (উন্নতি) হয় না।

শরৎদা—Energy ও consciousness (শক্তি ও চেতনা) কি এক ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Energy-র (শক্তির)-ই একটা form (রূপ) হ'ল consciousness (চেতনা)—responsiveness (চিৎশক্তি)।

শরৎদা—Wave (তরঙ্গ)-গুলি তো ধাক্কা খেয়ে হয়, conscious agent (সচেতন কর্ত্তা) না থাকলে ধাক্কা কে দেবে গোড়ায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—থাকে যে একটা। ঐ যে positive-এর (ঋজীর) কথা বলেছি। Positive centre (ঋজী কেন্দ্র) যেখানেই থাকে তার opposite pole-এ (বিপরীত মেরুতে) negative centre (রিচী কেন্দ্র) থাকেই। এটা আপনা-আপনি হয়, তাই চিন্ময়ী প্রকৃতি কয়। দুটো পরস্পরের দিকে টানে, টেনে যখন একত্র হ'তে চায়, তখন আবার ছিটকে দেয়। এই যে গতি এর থেকেই সৃষ্টি শুরু হয়। এই চলল আর কি। এইসব অনুভব করতে-করতে আমরা এমন একটা অবস্থায় পেঁছোই, যেখানে না আছে আলো না আছে অন্ধকার। এটা যেন neutral zone (নিরপেক্ষ ভূমি), যেখানে সৃষ্টি স্তব্ধ হ'য়ে গেছে।

শরৎদা—পরস্পর টানার শক্তিটা কি অন্তর্নিহিত ? টানটা সৃষ্টি করে কে ? Matter (বস্তু) কি তা' করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার বৈশিষ্ট্যই হ'ল ঐ টানার শক্তি। Matter ও Spirit (বস্তু ও আত্মা) আলাদা নয়। হয় ক'ন সব matter (বস্তু), না হয় সব (spirit) আত্মা। স্ব-অয়নস্যূত বৃত্ত্যভিধ্যানতপস্যায় গতি ও অস্তি অধিজাত হইল—কথাটা ঠিক।

অরুণ (জোয়ার্দ্দার)—যখন ইতস্ততঃ গতি থাকে না, তখন কি আলো অন্ধকার থাকে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধধঃকার বলে। ধধঃকার মানে—neither light nor darkness (আলোও নয়, অন্ধকারও নয়)।

অরুণ—Positive (ঋজী) ও negative (রিচী) পরস্পর আকর্ষণ ক'রে আবার বিকর্ষণ করে কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Positive (ঋজী) যখন negative-এর (রিচীর) দিকে যায়, তখন positive (ঋজী)-টা negativised (রিচীভাবাপন্ন) হয়ে ওঠে, আর negative (রিচী)-টা যখন positive-এর (ঋজীর) দিকে যায়, তখন positivised (ঋজীভাবাপন্ন) হ'য়ে ওঠে। তাই repulsion (বিকর্ষণ) আসে। কারণ, সমজাতীয়দের মধ্যে পারস্পরিক বিকর্ষণ থাকে।

কথা উঠল বর্ত্তমান পরিপূরণী মহাপুরুষকে অনেক ধর্ম্মপ্রাণ লোকও কেন ধরতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পিছলি টেক থাকলে হয় না। এটা কালের অর্থাৎ শয়তানের খেলা। শয়তান মানে যা' ছেদন করে, পাতিত করে, বধ করে। আর, এগুলি করে মানুষকে প্রবৃত্তিতে বন্দী ক'রে রেখে। কোন ধারণাবদ্ধ সংস্কারে আবদ্ধ থাকলে বর্ত্তমান মহাপুরুষকে ধরা কঠিন হয়।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অনেক সময় মানুষ করণীয় সম্বন্ধে এমনভাবে প্রশ্ন করে যাতে, সেই প্রশ্নের ভিতর-দিয়ে বোঝা যায় সে তার প্রবৃত্তি-অনুযায়ী কি উত্তরটা পেতে চাচ্ছে। ঐভাবে প্রশ্ন করলে অনেক সময় যা' কল্যাণকর তা' সোজাসুজি বলা যায় না। বিশেষ ক্ষতি না হয় এমন ক'রে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কতকটা তার রকম ক'রে উত্তর দিতে হয়।

শরৎদা—এভাবে বললেও তো তার ক্ষতি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে নিজেই তো invite (আমন্ত্রণ) করে ক্ষতি। নিজের ঝোঁকের দরুন definitely (নির্দ্দিষ্টভাবে) কিছু করতে বললেও যদি না শোনে, তবে কথা না শোনার habit (অভ্যাস) হয়। সেটাও তার অধিকতর ক্ষতির কারণ হয়। আবার, অনেক সময় তার মত মতো খানিকটা চলবার সুযোগ না দেওয়ায়, তার আবার দোষদৃষ্টি বাড়ে। তাতেও তার ক্ষতি হয় বেশী। আগে সোজাসুজি কথা ব'লে দেখেছি, কিন্তু অনেক সময় তার ফল ভাল হ'তো না। ওর চাইতে নিজের মতো চ'লে, যদি ভুল বোঝে তাহ'লে অনেক সময় পরে অনুতাপ করেও শোধরায়। অবশ্য, যাদের ক্ষেত্রে বুঝি যে আন্তরিকভাবে আমার নির্দেশ চায় এবং তা' অনুসরণ করতে উন্মুখ, সেখানে খোলাখুলি বলতে আমার আটকায় না। প্রবৃত্তিপরায়ণতাই যত অসুবিধার সৃষ্টি করে। প্রবৃত্তি যেভাবে খেলে, মানুষের বুদ্ধিও হয় সেরকম। তাই প্রবৃত্তির কবলে থাকলে, মানুষের মাথা খাটিয়ে ঠিক পথে চলা মুশকিল হয়। আবার, তখন যদি কেউ ঠিক পথ বাতলেও দেয়, তাহ'লেও প্রবৃত্তির ঝোঁকের দরুন সে-পথে চলতে পারে কমই।

এরপর হাউজারম্যানদা বললেন যে, জার্ম্মানীতে কিছু সংখ্যক গুণী refugee (উদ্বাস্তু) আছেন যাঁরা উপযুক্ত সুযোগ পেলে ভারতবর্ষে আসতে আগ্রহী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Chemist (রসায়নবিদ্), physicist (পদার্থবিজ্ঞানী), biologist (জীববিজ্ঞানী), technician (প্রযুক্তিবিদ্), good professors (ভাল অধ্যাপক) দরকার, যারা আস্‌লে, আমরা self-sufficient (স্বয়ং-সম্পূর্ণ) হ'য়ে উঠতে পারি। কলোনি হওয়ার আগেই তারা আস্‌লে ভাল হয়। কারণ, আমাদের এই ভাবধারার সাথে পরিচয় হতেও তো খানিকটা সময় লাগবে।

হাউজারম্যানদা—ওরা কাজকর্ম্ম খুব পছন্দ করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাজ যে করবে, তার fundament (মূল) যদি ঠিক না থাকে, তবে scattered (বিক্ষিপ্ত) হ'য়ে যাবে। কী জন্য কী করছে সে-সম্বন্ধে যদি বুঝ থাকে, তাহ'লে কাজে লেগে থাকতে পারবে। প্রথমে বোঝা চাই মূল লক্ষ্য কী, তার পরে সিদ্ধান্ত ঠিক থাকা চাই যে, ঐ লক্ষ্যের পরিপূরণের জন্য কী করতে হবে এবং এটাও বোঝা চাই যে, বাস্তবে তা কিভাবে করতে হবে।

হাউজারম্যানদা—অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে যে, ভারতীয় জীবনধারার মধ্যে এত নীরবতা কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভারতবর্ষ বরাবরই চেষ্টা করেছে সুকেন্দ্রিক আত্মনিয়ন্ত্রণের পথে

চলতে এবং সমস্ত কাজকর্ম্মকে তারই অনুপূরক ক'রে তুলতে। তাই আত্মপ্রতিষ্ঠা-মূলক হই-চই ও আড়ম্বর এখানে কম, অথচ ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞানের কোনটাই কম নেই এখানে। আগের তুলনায় ভারত দুর্ব্বল হ'য়ে গেছে, কিন্তু আবার যদি তাকে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী জাগিয়ে তোলা যায়, তাহ'লে সে সারা জগৎকে জীবনের এক নূতন পথ দেখাতে পারবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে ইজি চেয়ারে উপবিষ্ট। কান্তিদা (বিশ্বাস) যশোহর থেকে আগত একটি মুসলমান ভাইকে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে আলাপ করছিলেন। উক্ত দাদা বললেন—অনেক কাজ আছে, কাল বাড়ী যাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' ভাল। কাজের মধ্য-দিয়ে ধর্ম্মকে পালন করতে হয়। ধর্ম্মের চলা, ধর্ম্মের বলা, ধর্ম্মের করা, ধর্ম্মের ভাবা তোমার মধ্যে মূর্ত্ত ক'রে তোল।

কান্তিদা—নাম নেওয়ার জন্য ওকে ওর সমাজের তরফ থেকে নিন্দা করে না, কিন্তু হিন্দুরাই খারাপ বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওতে কিছু এসে-যায় না। তবে এ-কথা ঠিকই যে হিন্দুই হোক, মুসলমানই হোক আর যেই হোক, যদি কারও অচ্যুত নেশা থাকে পরমপিতার উপর, তাকে দিয়ে যে কত লোক উদ্ধার হ'য়ে যায় তার ঠিক নেই। একে দিয়েও বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজন যখন জীবনের পথে চলার প্রেরণা পাবে, তখন মানুষের মুখে আবার এর সুখ্যাতির অন্ত থাকবে না।

উক্ত দাদা একজনের ফাঁকিবাজী সম্বন্ধে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার প্রতি শ্রদ্ধার ভিতর-দিয়ে তার ঐ প্রবৃত্তি যেন ঘুচে যায়। ফাঁকিবাজ হয়ে থাকলে ফাঁকি কিন্তু তাকে রেহাই দেবে না।

দাদাটি পরে পরিবেশের নানা প্রতিকূলতা সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর উদ্দীপ্ত ভঙ্গীতে বললেন—এমন হওয়া চাই, মানুষ যদি পিষেই ফেলে বা জ্যান্ত আগুনেই দেয়, আমি নাম করতেই থাকব—আমার জীবনের গতিই খোদা, তা' স্বর্গেই যাই বা নরকেই পচি।

এক মিনিট থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর ছড়ার আকারে বললেন—

যত থাকবে অটুট টানে
বলও পাবে তেমনি প্রাণে।

বনগাঁর জনৈক দাদার সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে বললেন—জীবনের প্রত্যেকটি নিঃশ্বাসে ভগবান যেন জাগ্রত থাকেন আমাদের ভিতর, তবেই তো চ'লে স্ফূর্ত্তি, ক'য়ে স্ফূর্ত্তি, ক'রে স্ফূর্ত্তি।

দাদাটি বললেন—আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই তো আমার বুক ভরা প্রার্থনা তোমাদের জন্য।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে যেয়ে বসলেন।

সেখানে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুর হরেনদাকে (বসু) একজনের সঙ্গে তার ব্যবহার সম্পর্কে বললেন—তুমি তখন যে তার সঙ্গে কথা বলছিলে, তখন আমি লক্ষ্য করলাম তোমার মাত্রাটা ঠিক ছিল না। মানুষের ভিতর কোন্ ভাবটা উৎসাহিত করতে হবে, বাড়িয়ে দিতে হবে, কোন্ ভাবটা নিরুদ্ধ করতে হবে সেটা ঠিক থাকা চাই। নিরুদ্ধ করতে হ'লেও আবার untussling (নির্বিরোধ) হওয়া চাই। তোমার চরিত্র ও সেবার ভিতর-দিয়ে এমনতর বিনয় প্রকাশ পাওয়া চাই, যা' অন্যকেও বিনীত ক'রে তোলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—দুর্গানাথদার (সান্যালের) কথা আমি তার সাক্ষাতেও বলি, অসাক্ষাতেও বলি। কিন্তু সাক্ষাতে যখন বলি, তখন এমনভাবে বলি, যে তার খারাপ effect (ফল) হয় না। ঐ অসময়ে দুর্গানাথদা যা' করেছে তার তুলনা হয় না। মডেল কোম্পানি যখন আমাদের সম্পত্তি নিলাম করল তখন তো লোকের কাছে আমার বিশেষ কোন পরিচিতি ছিল না। কোন প্রত্যাশা না রেখে সে সময় অতগুলি টাকা দিয়ে দিল।

হরেনদা—আপনি কী করেছেন তাও তো দেখেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে তার ঐ জিনিসের কি প্রতিদান হয়? আমি বরাবর ভাবি—অন্ততঃ পাঁচশ টাকা ক'রে আমি যদি তাকে প্রতি মাসে দিতে পারতাম!

২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, শনিবার (ইং ১১। ৬। ১৯৪৯)

কাল রাত থেকে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে বিছানায় উপবিষ্ট। সুধাংশুদা (মৈত্র), হরেনদা (বসু), প্রবোধদা (মিত্র), খগেনদা তপাদার এবং ননীমা প্রভৃতি কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আসামের একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক, ভাল ডাক্তার (ধীরেন ভট্টাচার্য্যদা) বিশ্বম্ভরের সাথে কথা ব'লে একেবারে charmed (মুগ্ধ) হয়ে গেছে। যেভাবে প্রশংসা করতে লাগল, শুনে আমি অবাক। ভদ্রলোক বলছিল—একজন সাধারণ ক্ষৌরকারের কি সুন্দর conception (ধারণা)! অত্যন্ত charming ও rational (মনোমুগ্ধকর ও যুক্তিযুক্ত)। আমি এইরকম educated (শিক্ষিত) কম দেখেছি। আমার বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে দেখাতে ইচ্ছে করে—এখানকার একজন সাধারণ মানুষ কত জ্ঞানী। হারাণ মিস্ত্রী একবার নওগাঁ গিয়েছিল। একজন এস ডি ও তার সঙ্গে কথা ব'লে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেল, বারবার ওকে খোঁজ করে, ওর কাছে কথা শোনে।

সুধাংশুদা—এখানকার একজন ছোট ছেলে যা' জানে, তাও অসম্ভব। বাইরের লোকের ধারণা যে আমাদের সঙ্গে তর্কে পারার জো নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা তর্ক ক'রে জিততে চাই না, কিন্তু মানুষকে convince (প্রত্যয়দীপ্ত) ক'রে exalted (উন্নীত) ক'রে তুলতে চাই। ভুল বুঝে থাকা আমারও লোকসান, তারও লোকসান। ভুল যদি ভাল হ'তো, সুখের হ'তো, তাহ'লে ভুল

নিয়ে চলায় দোষ ছিল না। ভুল যখন দুঃখের, তাতে নিজের ও অপরের সুখ-শান্তি যখন ব্যাহত হয়, তখন সে ভুল পুষে রাখা চলে না। কারণ, সেটা সবারই মঙ্গলের পরিপন্থী। তাই আমি বুঝি, তর্কে জেতার বালাই আমাদের থাকা উচিত নয়।

প্রফুল্ল—এখানে ছেলেপেলেদের পর্য্যন্ত আপনার এবং আপনার পরিবারবর্গের উপর একটা সহজ টান আছে। আমার ছেলে ফুল্লেন্দু পিসবোর্ড দিয়ে দু'খানা ঘর করেছিল, আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কার ঘর? বলল—এটা ঠাকুরের, ওটা বড়দা-ওদের।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড়খোকা-ওদের পরে সবারই একটা স্বাভাবিক টান আছে। ওদেরও ঐ রকম normal interest (স্বাভাবিক স্বার্থবোধ) আছে ওদের সম্পদ যারা তাদের উপর।

এরপর পূজনীয় খেপুদা আসলেন। তিনি কথায়-কথায় দুজন কর্ম্মীর মধ্যে বচসার এক বিবরণ দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই কথা শুনে বললেন—বলতে পারা যায় অনেক কথাই, বলাও হয়ত ভাল। কিন্তু বচন, ব্যবহার, চলন এমনভাবে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা ভাল, যাতে মানুষ pleased (সন্তুষ্ট) হয় ও convinced (প্রত্যয়দীপ্ত) হয়। মানুষের সত্তাটাকে মুগ্ধ ও উদ্বুদ্ধ করাই বড় কাজ।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন।

বহুদিন পরে সত্যেনদা (বসু) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে দেখে খুব খুশী হ'লেন এবং নানা বিষয়ে খবরাখবর নিতে লাগলেন।

সত্যেনদা—এবার কিছুদিন থাকবার ইচ্ছা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—হ্যাঁ! যতদিন আর যতক্ষণ প্রাণ চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর দুপুরে ভোগের পর বড়াল-বাংলোর ঘরে বিছানায় বসে তামাক সেবন করছেন।

তিনি যখন বাণী দেন, তখন স্থানীয় অনেকেই ফিসফিস ক'রে কথা বলেন এবং তাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের রীতিমত অসুবিধা হয়—সেই প্রসঙ্গে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এতদিন আছে অথচ বোঝে না। প্রকৃতপক্ষে আমার কাছে তো ওরা নেই, ওরা আছে ওদের কাছে।

সারাদিন অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরেই আছেন।

সন্ধ্যাবেলায় জ্ঞানদা (চ্যাটার্জ্জী) আসলেন। তিনি কেমিস্ট। ক্যান্সারের কোন ওষুধ বের করা যায় কিনা সেই সম্বন্ধে তিনি গবেষণা করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই প্রসঙ্গে বললেন—আঁশ শেওড়া ও কায়াফলার গাছ এ ব্যাপারে effective (কার্য্যকরী) হতে পারে।

কথাপ্রসঙ্গে জ্ঞানদা বললেন—আমার আপাততঃ একটু অভাব আছে, কিন্তু যে-ওষুধের কাজ নিয়ে আছি তাতে বহু টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—তোমার service (সেবা)-ই তোমাকে টাকা দেবে। টাকার জন্য অস্থির হয়ে লাভ নেই। তুমি যদি দশ-বার লাখ টাকাই পাও আর তাতে যদি অভিভূত না হও, তুমি যেমন বামুনের ছেলে আছ তেমনিই থাক, তবেই ঠিক হয়। আমি বলি—তুমি টাকার পিছনে ছুটো না, বরং টাকাই তোমাকে পূজা করুক। জায়গাটায়গা পেলে আবার সেই ল্যাবরেটরি করবার ইচ্ছা আছে। তখন সপ্তর্ষি মণ্ডলের দরকার হবে। আমাদের কাজকর্ম্ম শুরু করবার পক্ষে কলকাতা সুবিধাজনক নয়। সেটা বাইরেই ভাল হবে। প্রস্তুত থেক যাতে প্রয়োজন হলেই সেখানে আসতে পার। টাকায় অভিভূত হ'য়ো না। আমি কখনও টাকায় অভিভূত হইনি। তুমি service (সেবা) দিয়ে যাও, টাকা তোমাকে পূজা করবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—বিয়ে-থাওয়ার নীতি সম্পর্কে World Convincing (জগৎকে প্রত্যয়দীপ্ত ক'রে তুলতে পারে এমনতর) একটা গবেষণা যদি ক'রে দেখাতে পার, তাহ'লে আমার জীবনের একটা সার্থকতা হয়। ল্যাবরেটরি ও রিসার্চ আমার খুব প্রাণের জিনিস। ও ছাড়া আমি আরামও পাই না; ও থাকলে যেন ডুবে থাকতে পারি। জায়গা পেলেই আমার করবার ইচ্ছা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে ইদানীং খুব জল খেতে দেওয়া হচ্ছে। তাতে তাঁর প্রস্রাব খুব বেড়েছে, কেবল প্রস্রাব হয়, অথচ শরীরের অন্যদিক থেকে বিশেষ কোন উপকার বোধ করেন না।

ঐ সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার কি যে কর্ম্মফল, আমি পড়েছি একদল মূর্খের মধ্যে। কেউ বোঝে না। আমার দশা হয়েছে ক্রাইস্টের মতো।

রাত সাড়ে আটটার পর শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

"মানুষ যা' ব্যবহার ক'রে উপকৃত হয়,
অথচ তার সৌষ্ঠব ও সুস্থির উপর
নজর রাখে না—
খিদমৎ করে না তার
অচিরেই সে বঞ্চিত হয় তা' হতে।"

রেণুমা উক্ত বাণীর মানে বুঝতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যেমন রান্নাঘর তোমার পক্ষে কত প্রয়োজন, অথচ যদি রান্নাঘরের টিনটা পরিষ্কার না রাখ, তাহ'লে রান্নাঘর কতকাল ঠিক থাকবে?

রেণুমা—সব সময় তো তা' পারা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারার পরিচর্য্যা কর না, তাই পারাও বাড়ে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর প্রথমে একটি বড় বাণী দিলেন, পরে রাত পৌনে বারটার সময় আর একটি বাণী দিলেন। তখন আলো নিভিয়ে দেওয়া হ'ল এবং তিনি ঘুমোবার চেষ্টা করলেন।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, রবিবার (ইং ১২ । ৬ । ১৯৪৯)

আজও সমানে ঝড়বৃষ্টি চলেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে আছেন। মন্মথদা (ব্যানার্জ্জী) কলকাতা থেকে ব্যানার্জ্জীদা নামক কলকাতার একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকসহ আসলেন। তাঁরা উভয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করার পর শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন—রাস্তায় কষ্ট হয়নি তো ?

ব্যানার্জ্জীদা—না।

সুধাংশুদা (মৈত্র)—বাতাস খুব, কিন্তু মেঘ কাটছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিচ্ছিন্ন বাতাসে মেঘ কি কাটে ?

একটু বাদে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষ মেঘলা মন নিয়ে দুনিয়াটা উপভোগ করতে পারে না।

সুধাংশুদা—কী রকম ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তি জুড়ে থাকে মনে, আর মনের হাওয়াটাও থাকে বিচ্ছিন্ন। একটানা হাওয়া হ'লে হয়তো বা প্রবৃত্তির মেঘ কিছুটা উড়িয়ে নিতে পারে। কিন্তু নানা চাওয়া আমাদের নানা দিকে টানে, তাই মনের মেঘ আর কাটে না। তাই দুঃখ ভারাক্রান্ত হ'য়ে থাকে। আমরা কিন্তু সুখই চাই, দুঃখ চাই না। বাঁচতেই চাই, বাড়তেই চাই, মরতে চাই না। ধর্ম্ম মানেও তাই, যা' সপারিপার্শ্বিক আমাদের ধ'রে রাখে। নানা রকম আবহাওয়ার মধ্যে প'ড়ে ধর্ম্মের ধারণা আমাদের দেশে আজ বদলে গেছে। একদিন পর্ণকুটীর থেকে রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। এখন বহু ওলট-পালট হ'য়ে গেছে। ধর্ম্ম হ'ল আচরণের জিনিস। যারা তা' আচরণ করে না, তারা যদি ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করতে যায়, তাহ'লে যা' হওয়ার তাই হয়েছে।

সুধাংশুদা—আজকাল ধর্ম্মের কথা বলতে গিয়ে অনেকে না ক'রে পাওয়ার লোভ দেখান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' কি হয় ? যাতে আমরা যেমন আত্মনিয়োগ করি, আমরা হইও তেমনি, পাইও তেমনি। হওয়াটাই পাওয়া। আমরা অনেকে বড়লোক হতে চাই, কিন্তু করাটা তেমন না হওয়ায় পাই না। ক'রেও পাওয়া যায় না, এমনতর একটা নেতিবাচক দর্শন তখন আমরা সৃষ্টি করি। করায় খাঁকতি থাকলে বা বিধিমাফিক না করলে যে পাওয়া যায় না, সে-সম্বন্ধে আমরা খতাই না। তার মানে আমরা কোন অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করি না, ভাগ্য ইত্যাদির নাম দিয়ে একটা আজগবি ধারণা নিয়ে ব'সে থাকি। তাতে নিজেদের করাটা, হওয়াটা, পাওয়াটা আরও নষ্ট হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে মন্মথদার দিকে চেয়ে প্রীতিভরে বললেন—আমার মন্মথ লাঠেল মানুষ আছে। এই ঝড়জলের মধ্যে আবার এক বন্ধুকে নিয়ে এসে হাজির হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যানার্জ্জীদার দিকে চেয়ে হাসতে-হাসতে বললেন—আপনাকে দেখেই মনে হ'ল—এক কল্কের মানুষ বোধহয় পাওয়া গেল একজন। কল্কের মানুষের সাথে বড়-ছোট, উঁচু-নীচু নেই।

ব্যানার্জ্জীদা শ্রীশ্রীঠাকুরের আত্মীয়সুলভ ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আজকাল অনেকে কয়—ধর্ম্মটর্ম্ম কিছু না। ধর্ম্মটর্ম্ম কিছু না এ কথার মানে দাঁড়ায়—বেঁচে থাকা কিছু না। আবার অনেকে কয়—বয়স হোক পরে ধর্ম্ম করা যাবে। অথচ একদিন আমাদের ছিল, যখন আমরা দৈনন্দিন জীবনে ধর্ম্মকে পরিপালন করতাম। আর, তার training (শিক্ষা) শুরু হ'তো অতি শৈশবে। ছেলেবেলায় আচার্য্যকে গ্রহণ ক'রে, আচার্য্যের সান্নিধ্যে থেকে করতে হ'ত চরিত্র গঠন। আর তাকেই কয় ব্রহ্মচর্য্য—বৃদ্ধির আচরণ। গুরুর কাছে থেকে ভাবা, করা, জানার ভিতর-দিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করা হ'ত জীবনের জন্য। গার্হস্থ্য জীবনে সেই জ্ঞান apply (প্রয়োগ) করা হ'ত। আবার, বানপ্রস্থে আরম্ভ হ'তো আরও বিরাট সংসার। বানপ্রস্থে পাশ করলে তবে হ'ত সন্ন্যাস। এইভাবে প্রত্যেকটা মানুষের একটা normal evolution (স্বাভাবিক বিবর্ত্তন) হ'ত।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নিজের বা অপরের কারও ক্ষতি না ক'রে বরং পরস্পরের পোষণ জুগিয়ে আমরা সত্তাটাকে বজায় রাখতে চাই—প্রবৃত্তির বশ না হ'য়ে বরং প্রবৃত্তিকে বশীভূত ক'রে ;—আর তাকেই কয় ধর্ম্মাচরণ। সেটা শিখতে হয়। সাঁতার শিখে তো জলে নামে না। সাঁতার শিখতে গেলে, জলে নেমে সাঁতারুর কাছে তা' শিখতে হয়। জীবনযাপন সম্বন্ধেও ঐ কথা। বেত্তার কাছ থেকে তার কৌশল জেনে নিতে হয়। বিপর্য্যস্ত মানুষ বুঝেও বোঝে না। বহুদিন পরিচয় নেই নিজের জিনিসের সঙ্গে। পূর্ব্বপুরুষকে আমাদের জীবনে জাগ্রত ক'রে রাখে আমাদের আভিজাত্য। আভিজাত্য হ'ল পূর্ব্বপুরুষকে স্মরণ ক'রে, তাদের অনুসরণ করা—আচরণে। কাউকে ঘেন্না করা নয়, অভিমান নয়। 'বামুনের ছেলে আমাকে মানবে না কেন'—এমনতর দাবীও নয়। আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অনেকে খেঁকি কুত্তার মতো হ'য়ে যায়। কেবলই মানুষের সঙ্গে বিরোধ বাধায়। কিন্তু মানুষের ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র না থাকলে, সে লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে না।

ভবসমুদ্র কয়। তার মানে হওয়ার সমুদ্র, চলার সমুদ্র। এই সমুদ্রের মধ্যে সাঁতার কাটতে গেলে ডাঙ্গায় খুটোর সঙ্গে নিজেকে অচ্যুত অনুরাগের রজ্জুতে বেঁধে তবে তা' ক'রতে হয়। নইলে স্রোতে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। ডাঙ্গার ঐ খুটো হ'লেন গুরু। তিনি প্রবৃত্তিকে চালনা করেন কিন্তু প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হন না।

এই সব কথা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যানার্জ্জীদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কি অভিমান আছে ?

ব্যানার্জ্জীদা—নেই বলি কি ক'রে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' কি ভাল ?

ব্যানাজ্জীদা—তা' নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তুমি ব'লে ফেলি, এতে কষ্ট হবে না তো ?

ব্যানাজ্জীদা—তা' কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাউকে মিষ্টি লাগলে, তার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তুমি এসে যায়।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দু-রকম অভিমান আছে। সব অভিমান যে খারাপ তা' নয়। এক রকম আছে, তাতে ওজো, সুরত, লিবিডো, তেজ খুব তরতরে থাকে। মানুষ তা' খাটিয়ে জীবনে খুব বড় হ'তে পারে। এতে এমন আত্মপ্রত্যয় হয় যে মানুষ সহজে হাল ছাড়ে না। যা' সমীচীন ও সত্য ব'লে বোঝে, নিষ্ঠার সঙ্গে তার পিছনে লেগে থাকে। আর-এক রকম অভিমান আছে, তার দাঁত আছে, তা' অপরকে কামড়ায়। তাকেই বলে—'নরক কী মূল অভিমান।'

সামাজিক জীবন সম্বন্ধে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বিয়ে থাওয়া খুব ঠিক মত হওয়া দরকার। ছেলের কুল সংস্কৃতি ও প্রকৃতি, মেয়ের কুল-সংস্কৃতি ও প্রকৃতির পরিপূরণী হওয়া চাই। আবার, মেয়ের কুল সংস্কৃতি ও প্রকৃতি, ছেলের কুলসংস্কৃতি ও প্রকৃতির পরিপোষণী হওয়া চাই। এতে দাম্পত্য জীবনের সঙ্গতি ও সন্তান দুই-ই ভাল হয়। আগের কালের ঘটকরা ছিল eugenic science-এর (সুপ্রজনন বিজ্ঞানের) মাষ্টার। এ-সব যতদিন ঠিক ছিল জাতি বীর্য্যে, বিভবে, বিভূতিতে উচ্ছল হ'য়ে ছিল। আমরা শিক্ষিত হ'য়ে যখন ঘটকদের decision (সিদ্ধান্ত) অবজ্ঞা করতে শিখলাম, তখন থেকে আমাদের অধঃপতন শুরু হ'ল। তারা জানত মিলন কোথায় সার্থক হবে, সত্তাপোষণী হবে। সে-সব science (বিজ্ঞান), সে-সব specialist (বিশেষজ্ঞ) এখন কি আছে ?

ব্যানাজ্জীদা—দেখি না তো !

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেষ্টদা কয় এখনও আছে, খুঁজলে পাওয়া যায়।

এখন বাইরের লোকজন বিশেষ নেই। শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যানাজ্জীদাকে বললেন—দেখি তোমার বুক দেখি।

ব্যানাজ্জীদা জামা উঁচু ক'রে দেখালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেখে সাদরে বললেন—সুলক্ষণ আছে তোমার। ভাল লক্ষণ নিয়েই জন্মেছ। পরমপিতা তোমাকে সুখে-স্বচ্ছন্দে সুদীর্ঘকাল বাঁচায়ে রাখুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যানাজ্জীদাকে বললেন—সদাচারী হওয়া ভাল। সদাচার মানে—যে আচারে মানুষ বাঁচে-বাড়ে। সদাচারে শরীর-মন শুদ্ধ ও সুস্থ থাকে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি সদাচার কর না ?

ব্যানাজ্জীদা—করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সকলেরই সদাচার পালন করা ভাল।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি বলি—ম'রোও না, মেরোও না, যদি পার মরণকে অবলুপ্ত ক'রে দাও।

জীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষ খায়-দায়, টাকাকড়ি উপায় করে, নানারকম ভোগ-টোগ করে কিন্তু শেষকালে সব ফাঁকা। আমি বলি—অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ হও, নাম কর, কাম কর। ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠাই যেন তোমার একমাত্র স্বার্থ হ'য়ে ওঠে। নচেৎ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে উঠবে নানা প্রবৃত্তির হাতছানিতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যানার্জীদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—গীতা ভাল লাগে না?

ব্যানার্জীদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জ্যান্ত ভগবানের জ্যান্ত কথা।

ব্যানার্জীদা—গীতার কথা মেনে তো চলতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটু অভ্যাস করলেই পারবে। আসল কথা অচ্যুত অনুরাগ। অনুরাগ থাকলে বেতালে পা পড়ে না। ঐ যে বলছিলাম দড়ি মাজায় বেঁধে রাখার কথা—তখন গীতা spontaneously (স্বতঃই) ফুটে ওঠে।

কিছু সময় নীরব থাকার পর শ্রীশ্রীঠাকুর গভীর আবেগের সঙ্গে বললেন—বাংলার বুকে বামুন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য যদি থাকে, এখনও কি ঘুমিয়ে থাকবে তারা? আমরা তো এখন সর্ব্বনাশের সমুদ্রের মধ্যে আছি।

ব্যানার্জীদা—বাংলার কথা ভাবলে মন খারাপ হয়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাংলায় কোন দিনই লোকের অভাব হ'তো না। সব সময় এমন একদল থাকত, যারা শুধু বাংলার নয় ভারতের ও সারা জগতের গৌরব। রবীন্দ্রনাথে যেন সেই ধারাটা শেষ হ'য়ে গেল। আজকাল নেতাই পাওয়া যায় না। যে নীত নয়, গুরুই যার সর্ব্বস্ব হ'য়ে ওঠেনি সে কি নেতা হ'তে পারে? শিবাজীর কথা ভেবে দেখ না! রামদাস স্বামীর প্রতি নিষ্ঠা নিয়ে সংগঠন ও চাতুর্য্য বলে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবকে সে নাস্তানাবুদ ক'রে ছেড়েছে। তাই বলি—যদি চাও, কর, আর কর এখনই। দাঁড়াতে, করতে যা' লওয়াজিমা লাগে, এখন থেকেই তা' সংগ্রহ কর। চলা বলতে আমি বুঝি—চলতে যা' যা' লাগে, সেগুলি নিখুঁতভাবে সামঞ্জস্যে সংগ্রহ ক'রে বিধিমাফিক কৃতকার্য্যতার পথে অগ্রসর হওয়া। পাকা রাঁধুনি তেল-নুন-মশলা সব ঠিক রাখে, রান্না চাড়িয়ে বাজারে ছোটে না সে।

প্রাপ্তি সম্বন্ধে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর সহজভাবে বললেন—যাঁকে পেলে সব পাওয়া যায়, তাঁকে পাওয়াই তো পাওয়া।

'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা' শুচঃ।'

মামেকং শরণং ব্রজ মানে—আমাকেই রক্ষা ক'রে চল। আমাদের ভাল-মন্দ সব-কিছুকেই ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠার কাজে লাগাতে হবে। সেইটে পারলে আর ভাবনা

নেই। তা' বাদ দিয়ে আর সবকিছুই আমাদের বন্ধনের কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠাই মুক্তির রাজপথ।

ব্যানার্জীদা—আমাদের জাগতিক জীবনে এই পরাজয় আসলো কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য বিষয়ে আমাদের অজ্ঞ ক'রে রাখার কম প্রচেষ্টা হয়নি। মহাপুরুষরা এসে দিয়ে গেছেন একরকম, তাঁর অনুসরণকারী যারা, তারা ইচ্ছা ক'রে তার মধ্যে অনেক বিকৃতি ঢুকিয়েছে এবং সেই বিকৃতিগুলিকেই চালু করেছে। সাধারণ মানুষ তো অজ্ঞান, তারা নানাভাবে বিভ্রান্ত হয়েছে। শুনেছি বুদ্ধদেব বর্ণাশ্রমের মূল নীতি মানতেন। কিন্তু পরে হীনযান সৃষ্টি ক'রে সে-সব ভেঙ্গে দিল। সেই সব ধাঁজ-ধরন আজও প্রশ্রয় পাচ্ছে। আমি বুঝি রাষ্ট্রের কাজ হ'ল এইটে দেখা, যাতে প্রত্যেকেই ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিয়ে বাঁচতে পারে, বাড়তে পারে। এই মূল ব্যাপারটার দিকেই আজ আমাদের লক্ষ্য নেই। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে, যে বাঁচাবাড়ার বিধিকে বাদ দিয়ে আমরা কিছুতেই বাঁচতে-বাড়তে পারব না। ধর্ম্ম-আচরণ করা মানে সেই বিধি-অনুযায়ী চলা। আমরা জানি না—কেন আমরা হিন্দু, কী আমাদের জানতে হবে, কী আমাদের মানতে হবে, কী আমাদের করতে হবে। সেইজন্য পঞ্চবর্হি পালন করবার কথা আমি অত ক'রে বলি। পঞ্চবর্হি যদি আমরা অনুসরণ না করি, তাহ'লে আমরা পতিত হ'য়ে যাব। আর, পঞ্চবর্হি শুধু হিন্দুর অনুসরণীয় নয় যে যে-কোন সম্প্রদায়েরই হোক না কেন তাকেই এটা অনুসরণ ক'রে চলতে হবে তার মতো ক'রে। বর্ণাশ্রম মানে হচ্ছে—সহজাত-সংস্কার-অনুযায়ী বৃত্তি নির্ব্বাচন। এটা একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। যারাই জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকতে চায় তাদেরই এটা অনুসরণ করতে হবে স্থান, কাল, পরিস্থিতি অনুযায়ী।

ব্যানার্জীদা—সাম্প্রদায়িক বিরোধ একটা মস্ত বড় সমস্যা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক-একজন মহাপুরুষকে নিয়ে এক-একটা গণ্ডী হ'য়ে গেছে। কিন্তু আমরা যদি পূর্ব্বতন প্রত্যেককে এবং পূর্ব্বপূরয়মান বর্ত্তমান মহাপুরুষকে মেনে চলি, তাহ'লে লাখ সম্প্রদায় থাকা সত্ত্বেও কোন অসুবিধার কারণ নেই। এদের মূল কথাগুলির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। আমি তো দেখি সব শেয়ালের এক রা। নানা ভাষায় সব মহাপুরুষরা একই কথা ব'লে গেছেন। প্রত্যেকেই পূর্ব্বতনকে তুলে ধরেছেন এবং পরবর্ত্তীকে মান্য করার কথাও সবার মধ্যেই আছে। এই যে পঞ্চবর্হি এইটে ভাল ক'রে খতিয়ে দেখলে বিরোধের কোন স্থান থাকে না। আমি যদি বাঁচতে চাই পরিবেশকে বাঁচান চাই, পরিবেশকে বাঁচাতে হলে দেশকে বাঁচান চাই। বাঁচার পথই হ'ল অপরকে বাঁচান। আমরা যদি মনে ক'রে থাকি যে, অন্যকে মেরে আমরা বাঁচব তাহ'লে সেটা কিন্তু একটা নিতান্তই আত্মঘাতী ব্যাপার। অপরের বাঁচার এমন সহায়ক হয়ে উঠতে হবে যাতে সে নিজে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর হয়, এই ধর্ম্মভাবের জাগরণের জন্যে চাই দীক্ষা, চাই যজন,

যাজন, ইষ্টভৃতির অনুশীলন। এগুলি এন্তারভাবে চারিয়ে দাও।

ব্যানার্জ্জীদা—বর্ত্তমানে এই যে বিকৃতি এসেছে সেটা কি তাঁর ইচ্ছা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের ইচ্ছা যদি হয় পরমপিতাকে ভালবাসা ও পরমপিতার পথে চলা, তাতে আমরা মঙ্গলেরই অধিকারী হই। আবার, ঐ ইচ্ছা যদি প্রবৃত্তিপরতন্ত্রী হয়, তাহ'লে তার যা' ফল তাও অনিবার্য্য।

ব্যানার্জ্জীদা—তাঁর ইচ্ছা নাই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের ইচ্ছাই তাঁর ইচ্ছা। আলো জ্বলে, আলোর রীতিই জ্বলা। সে জ্বলবেই। যে তার কাছে যত এগোয়, সে তত আলো পায়। কিন্তু আমরা তার থেকে যত দূরে যাব, প্রবৃত্তির আড়াল দিয়ে নিজেদের ঘিরে রাখব, ততই আমরা তাঁর আলো থেকে বঞ্চিত হব। আমাদের লাভ হ'ল এগোন। তাঁর থেকে দূরে গেলে প্রবৃত্তিকে দিয়ে সত্তাকে শোষণ করব। এখন আমাদের যেমন ইচ্ছা তেমনি চলতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর ঘরে তাঁর শয্যায় উপবিষ্ট। শ্রীযুত ব্যানার্জ্জীদা ও মন্মথদা (ব্যানার্জ্জী) আবার এসে প্রণাম ক'রে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—Materialism (জড়বাদ), Spiritualism (অধ্যাত্মবাদ) যাই বলি, সত্তা-সম্বর্দ্ধনা বাদ দিয়ে কোন ism-এর (বাদের) কোন মূল্য নেই। যাতে মানুষের ভাল হয়, তাই কর। এমন ছল, কল, কৌশল কোর না যাতে মানুষের খারাপ হয়। আবার, সত্যের নাম ক'রেও, ধর্ম্মের নাম ক'রেও এমন কিছু করা সঙ্গত নয়, যাতে মানুষের মঙ্গল ব্যাহত হয়। তা আছে—"সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তং ন যথার্থভিভাষণম্।"

ব্যানার্জ্জীদা—অহিংসা তো ধর্ম্ম ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তা-সম্বর্দ্ধনার জন্য আমাদের তাই করতে হবে, যাতে সত্তা-সম্বর্দ্ধনার পরিপন্থী যা' তা' প্রশ্রয় না পায়। সত্তাঘাতী যা' তার নিরোধ না করলে, তাকে হিংসা না করলে অহিংসা পালন করা হবে না।

ব্যানার্জ্জীদা—রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সুস্থ না করতে পারলে হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে নিজে শুদ্ধ হওয়া লাগবে, আর, সেটা ভাবা, বলা, করা, চলা সবটার মধ্যে ফুটে ওঠা চাই। লাখ সৎ কথা কই, সেটা চরিত্রে যদি মূর্ত্ত না হয়, তবে জীবন্ত হয় না। শ্রেয় শ্রদ্ধার যে সংস্কার আমাদের আছে তা' সঞ্জীবিত ক'রে দুনিয়াকে আলোকিত ক'রে তোলা যায়। চাই চরিত্র ও দক্ষ পরিবেশন। আর আমার মতে বহুবিবাহ বন্ধ করা ভাল না। তাতে প্রতিলোম বেড়ে যেতে পারে। পণপ্রথা বন্ধ করা বরং ভাল। আমি বলি—এক পরিণয়কে উৎসাহিত কর, উপযুক্ত ক্ষেত্রে বহুবিবাহ প্রচলন কর। অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ বন্ধ হওয়ায় আমাদের মেয়েরা বাইরে চ'লে যাচ্ছে। বাইরে থেকে আজ কেউ আসতে চাইলেও একটা সুষ্ঠু

সৌজন্যের মধ্যে তাকে আমরা সমাজের অঙ্গীভূত ক'রে নিতে পারি না।

ব্যানাজ্জী'দা—ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ইত্যাদি জিনিসগুলি কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যা'ই কিছু করি আসল জিনিসই ঐ অনুরাগ। যাকে ভালবাসি তাকে তুষ্ট করার প্রবৃত্তি হয়। এই থেকেই আসে কর্ম্ম। কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে আসে জ্ঞান। তাহ'লে, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। গোড়ায় চাই ভক্তি।

ব্যানাজ্জী'দা—ভক্তি তো একটা emotion (আবেগ) !

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু emotion (আবেগ) নয়, active emotion (সক্রিয় আবেগ)। ভক্তি যদি সক্রিয় না হয়, সেবা যদি উপচে না ওঠে তাতে, তবে তা' ভক্তি নয়। ভক্তি এসেছে ভজ্-ধাতু থেকে। ভজন অর্থাৎ সেবা যেমন ভাগ্যও তেমন। ভক্তির ভিতর-দিয়ে যার যেমন ভাব, তা' ফুটে ওঠে একটা সমন্বয়ী সামঞ্জস্যে। অনুরাগই আমাদের জীবনের আসল সম্পদ। সক্রিয় অনুরাগের পাত্র যার যেমন, তার চরিত্রও অনুরঞ্জিত হ'য়ে ওঠে তেমনভাবে। আসল কথা—আকাশের ভগবানে অনুরাগ হ'লে চলবে না। আমার বাইরে একটা মানুষ চাই। তাঁতে অনুরক্ত হ'লে আমার ভিতর একটা adjustment (নিয়ন্ত্রণ) আসে, তা' থেকে আসে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। বিভিন্ন প্রবৃত্তির মধ্যে একটা সার্থক সামঞ্জস্য না আস্‌লে প্রজ্ঞা জিনিসটা গজায় না। কোন্‌টা কোথায় সার্থক হয় সে-সম্বন্ধে একটা বিহিত দর্শন থাকা চাই। মহাত্মাজী যদি প্রত্যেককে ইষ্টনিষ্ঠ ক'রে তোলার উপর জোর দিতেন, তাহ'লে দেশের অবস্থা অন্যরকম হ'ত।

ব্যানাজ্জী'দা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—অনেকে ধর্ম্মের নামে অলৌকিকতার অবতারণা করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অলৌকিকতা ব'লে কোন জিনিস নেই, আছে ignorance (অজ্ঞতা)। জানি না, বুঝতে পারি না, তাই একটা নাম ক'রে দিই।

ব্যানাজ্জী'দা—বড় কিছুতে আসক্ত না হ'লে মানুষ অনাসক্ত হ'তে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিরাসক্তি মানে, বোধহীন হ'য়ে যাওয়া নয়। মহতের প্রতি অনুরাগে প্রবৃত্তির প্রতি নিরাসক্তি living (জীবন্ত) হয়। তথাকথিত কসরৎ ক'রে নিরাসক্তি আনতে গেলে সে নিরাসক্তি টেকে না। প্রধান জিনিসই হচ্ছে ইষ্টে অচ্যুত অনুরাগ।

ব্যানাজ্জী'দা—সুখ, দুঃখ, লাভ, লোকসান, জয়, পরাজয়, ইত্যাদিতে সমভাবাপন্ন হওয়ার কথা গীতায় আছে। শ্রীকৃষ্ণের জীবনেও এই আদর্শ মূর্ত্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর আদর্শে আসক্তি না থাকলে কি তিনি অত বিঘ্ন, বিপদ, সংগ্রামের মধ্যে অবিচলিত থেকে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারতেন ? আমাদের পক্ষে অবশ্য শ্রীকৃষ্ণই অনুসরণীয়। তাই গীতায় আছে—

"বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।"

আবার আছে—

"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"

তাঁর শরণাগত না হ'লে আমাদের কোন পথ নেই। আমরা যে পরিবেশের সেবা করব সে সেবাও হওয়া চাই ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠার্থে। নইলে প্রবৃত্তির কবলে প'ড়ে যাব। ইষ্টের উপর অকাট্য টান থাকলে তখন মানুষ সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্বের মধ্যে balance (সমতা) বজায় রেখে চলতে পারে। সমস্ত ধর্ম্মের মূল কথা হ'ল অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠা।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথা প্রসঙ্গে বললেন—আমরা কনৌজী। কিন্তু ওদের সঙ্গে আমাদের সংশ্রব নেই, এটা ভাল হয়নি। বাংলার বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ভারতের বৃহত্তর সমাজ থেকে আজ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেছে। এতে সমাজটা ছোট হ'য়ে গেছে। আমার মনে হয় বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দুদের মধ্যে যদি শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশ অনুযায়ী বিয়ে-থাওয়া চালু হয়, তাহ'লে সমাজের গণ্ডী অনেকখানি বাড়ে এবং প্রাদেশিক বিরোধের অনেকখানি সমাধান হয়। মধ্যবিত্তদের মেয়ে থাকলে আজ মহা বিপদ। এক-একটা বিয়েতে অজস্র টাকা লাগে। এখানে সব জায়গার লোক আসে। কত যে প্রতিলোম বিয়ের সংবাদ শুনি তার শেষ নেই। বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সবার মধ্যেই এই ধাঁজটা চারাচ্ছে। কিন্তু বামুনের মধ্যে যেন একটু বেশী। বর্ণাশ্রম ভেঙ্গে দিতে বলে, অথচ এই ভাঙ্গা বর্ণাশ্রমের দৌলতে তুই আছিস। ভাঙ্গলে তুই আর তুই থাকবি না, কী ছিলি তাও জানতে পারবি না। Structure (গঠন) বদলায়ে যাবে। যে জৈবী-সংস্থিতি থাকলে জিনিসের মর্ম্ম বোঝা যায়, সেই জৈবী-সংস্থিতি নষ্ট হ'য়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এ-সব কথা বলতে-বলতে চুপ ক'রে গেলেন।

সরোজিনীমা তামাক সেজে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক সেবন করতে-করতে বললেন—সারা ভারতের কথা যখন ভাবি তখন মাঝে মাঝে আমার মনটা খারাপ হ'য়ে যায়। আমি ভাবি, যারা দুনিয়াকে বাঁচাতে পারে তারা যদি আজ নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়, তাহ'লে তো পৃথিবীর পক্ষে মহাদুর্দ্দিন। তাই আমরা যারা বুঝি, তাদের প্রাণপণ লাগতে হবে—যাতে পেছটান বা পিছনের বিবেচনা আমাদের রুখতে না পারে। লহমার জন্য যদি আমাদের সংকল্পবদ্ধ চেষ্টা রুদ্ধ হয়, প্রগতিও ব্যাহত হবে ততখানি—তা' যেমনি মনে, তেমনি শরীরে, তেমনি চলনে। আমাদের মনে যদি ভাবাবেগ আসে, আর তদনুপাতিক কর্ম্ম যদি না করি, ব্যর্থ হয় তা, হারিয়ে ফেলি সে সম্বেগ। সেইজন্য যা' ভাল, তা তখনই করা লাগে। আবার ভাল কিছু করতে গেলে, হ'তে গেলে একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, চলতি চলনের সঙ্গে। সেইজন্য বলে—"শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি।" সুতরাং করতে গেলে সে-সব overcome (জয়) ক'রেই করা লাগবে।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, মঙ্গলবার (ইং ১৪। ৬। ১৯৪৯)

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর মাঠে চৌকিতে উপবিষ্ট। পূজনীয় খেপুদা শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছেন। শরৎদা (হালদার), কিরণদা (মুখাজ্জী), কাশীদা (রায়চৌধুরী), চুনীদা (রায়চৌধুরী), সরোজিনীমা প্রভৃতি কাছে আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে খেপুদা বললেন—হয়তো মারামারি বেশীদিন চললে দেশের লোকের সংহতির দিকে নজর যেত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মারামারি-পাড়াপাড়ি করলে যে সংহতি হতো তা' কথা নয়। যা' করলে সংহতি হয় অর্থাৎ একাদর্শে সংহত হওয়া,—তা' না করলে সংহতি হয় না।

খেপুদা—প্রচণ্ড বেগে কাজ করতে পারলে হয়ত তাড়াতাড়ি হতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সময়কে ধরা চাই। প্রত্যেকটা কাজের একটা সময় আছে। সেই সময়ের মধ্যে সেটা যদি করা না যায়, তাহ'লে পরে তা' পারা কঠিন হয়ে পড়ে। একবার এই ভাবাদর্শে জাতটাকে যদি গ'ড়ে তোলা যায় তখন কোন বিরুদ্ধ শক্তির পেরে ওঠা মুশকিল আছে। প্রবৃত্তিপরায়ণতা যতই প্রবল হোক না কেন, মানুষ কিন্তু চায় বাঁচতে-বাড়তে। বাঁচাবাড়ার নেশা যদি ধরায়ে দেওয়া যায় তখন মানুষ অযথা অশান্তির মধ্যে যেতে চায় না। ইষ্ট ও কৃষ্টির এন্তার যাজন চাই। কিছু লোকের এই কাজ অর্থাৎ ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা একমাত্র নেশা হওয়া চাই। তাদের চরিত্র আবার এমন হওয়া চাই, যাতে মানুষের শ্রদ্ধা স্বতঃই তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে, এমনতর চরিত্রবান কর্ম্মী ছাড়া হয় না। আদর্শ যেমন অভ্রান্ত হওয়া চাই তেমনি শ্রদ্ধার্হ চরিত্রসম্পন্ন বিপুল-সংখ্যক কর্ম্মী চাই। তাদের পরস্পরের মধ্যে মিল থাকা চাই। কর্ম্মীদের মধ্যে যদি সংহতি না থাকে, তাহ'লে তারা কখনও দেশকে সংহত ক'রে তুলতে পারে না। কর্ম্মীদের মধ্যে পারস্পরিকতা একান্ত প্রয়োজন। তাদের একমাত্র নেশা হওয়া চাই ইষ্ট। অন্য কোন ব্যক্তিগত ধান্ধা যদি থাকে এবং তার দরুন কর্ম্মীরা যদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকে, তাহ'লে তারা কখনও সংহতির দৃষ্টান্ত-স্বরূপ হ'য়ে উঠতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে আছেন। শাণ্ডিল্যের ভক্তিসূত্র বইটি পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হচ্ছিল। একটা জায়গায় আছে—ভক্তি হ'লে জ্ঞান ক্ষীণ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই সম্পর্কে বললেন—ভক্তি হ'লে জ্ঞান ক্ষীণ হয় মানে, জ্ঞানাভিমান ক্ষীণ হয়। প্রকৃত ভক্ত বা জ্ঞানী হ'লে তার ভিতর হীনম্মন্য অহঙ্কার ঠাঁই পায় না। হীনম্মন্য অহমিকা হ'ল সেই জিনিস যা' মানুষকে ইষ্ট ও পরিবেশ থেকে এবং আত্মজ্ঞান থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। কিন্তু ভক্তি বা জ্ঞান হ'লে মানুষ যেমন ইষ্ট বা স্বরূপের সঙ্গে যোগযুক্ত হয় তেমনি সে এমন নিরভিমান হয়, যে সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে সে স্বতঃই একাত্মতা বোধ করে। তার কাছে আসলে মানুষ স্বতঃই তার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং শুধু তার প্রতি আকৃষ্ট হয় না, সে যে পরম উৎসে যোগানত তাঁর প্রতিও স্বতঃই

সক্রিয়ভাবে গ্রন্থান্বিত হয়ে ওঠে। তাই চরিত্রের মতো যাজক হয় না। আমাদের চাই সেই চরিত্র যা' নিয়ত সর্ব্বপ্রকারে ইষ্টকে পরিবেশের মধ্যে সঞ্চারিত ও বিঘোষিত ক'রে চলে।

ভারত বিভাগের মূলে যে বৃটিশের কুটনীতি অমোঘভাবে সক্রিয় ছিল সেই সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের নিজেদের মধ্যে দুর্ব্বলতা ছিল ব'লেই আমরা তাদের কুটনীতির শিকার হয়েছি। আমাদের যদি দুর্ব্বলতা না থাকত, তাহ'লে ওদের ভেদনীতি আমাদের উপর কার্য্যকরী হ'তো না। আবার, ওদের দেশে যদি দূর-দৃষ্টিসম্পন্ন নেতা থাকত, তাহ'লে সে কখনও ভারতকে খণ্ডিত ও দুর্ব্বল করার বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিত না। এটা আমার কোন গোঁড়ামি নয়, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভারতের সনাতনী প্রজ্ঞার মধ্যে এমন কোন অমর শক্তি লুকিয়ে আছে, যা' সমগ্র জগৎকে প্রকৃত কল্যাণের পথ দেখাতে পারে। ভারত যদি বাঁচে সে শুধু নিজের জন্য বাঁচবে না, সে জগৎকেও বাঁচার পথ দেখাবে। ভারতের বরাবরই চেষ্টা হচ্ছে যাতে জগতের প্রত্যেকের সত্তা অক্ষুণ্ণ থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর গোল তাঁবুতে এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর কতিপয় মায়ের আচরণ সম্পর্কে বললেন—ওদের একটা মস্ত দোষ—ওরা কখনও evil (অসৎ)-কে resist (নিরোধ) করে না। বরং যারা evil (অসৎ)-কে resist (নিরোধ) করে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। তাই, তাদের প্রতি যখন কেউ অবিচার করে, তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এমনতর কাউকে পায় না, আর নিন্দা করতে থাকে।

এ সম্পর্কে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর একটু পরে বললেন—মা থাকতে আশ্রমে কড়া শাসন ছিল—পুরুষ-মেয়ে কারও ফুটানি খাটত না। একবার স্ত্রীকে মারার দরুন মা দত্ত-সাহেবকেই মেরে বকে দিয়েছিলেন।

শরৎদা—এই যারা আপনার কাছে আছে, আমার তো মনে হয় এদের একটা সুকৃতি আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—সুকৃতি না থাকলে আসলো কি ক'রে? তবে এখন সেই সুকৃতির ফল এইভাবে উসুল করছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে কথা ওঠায় তিনি বললেন—আমার মনে হয় আমার এমন পরিবেশ হ'য়ে গেছে যে তাদের কিছু-কিছু লোকের কাছ থেকে কিছুতেই justice (সুবিচার) পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এদের ব্যবহার আবার আমার শরীরকেও বেতাল ক'রে তোলে। স্নায়ু একটু পোষণ পেলেই মন চাঙ্গা হ'য়ে ওঠে, মাথাটাথা তরতরে হ'য়ে ওঠে। পরিবেশ ঠিক হ'লে আমি অনেকখানি ভাল থাকতে পারি।

১লা আষাঢ় ১৩৫৬, বুধবার (ইং ১৫। ৬। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে উপস্থিত।

পূজনীয় খেপূদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রত্যেকটি মানুষই প্রত্যেকটি মানুষের স্বার্থ। তাই, প্রত্যেককে এমনভাবে চলতে হবে, যাতে তার চলন তার নিজের এবং অপর প্রত্যেকের সত্তাকে পরিপুষ্ট ক'রে তোলে। তাহ'লেই এমন সবকিছুকে নিরোধ করতে হবে, যা' সপারিবেশ নিজের সত্তা-সম্বর্দ্ধনার পরিপন্থী। বিভিন্ন ব্যক্তি, সম্প্রদায়, সমাজ, প্রদেশ বা দেশের মধ্যে যদি অবাঞ্ছনীয় বিরোধ থাকে তাও তাকে নিরোধ করতে চেষ্টা করতে হবে। অনেককিছুই হয়তো ব্যক্তির হাতের বাইরে, কিন্তু প্রত্যেকটি ব্যক্তি যদি তার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়, তাহ'লে সে তার পরিবেশকে সেই অনুযায়ী অনেকখানি ভাবিত ক'রে তুলতে পারে। আমি চাই যে, সৎসঙ্গের কর্ম্মীরা এমনভাবে সচেতন হোক, যাতে তারা এক অখণ্ড বিশ্ব গ'ড়ে তুলতে পারে। অবশ্য এই অখণ্ড বিশ্ব গ'ড়ে তুলতে গেলে প্রত্যেকটি মানুষকেই তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী অখণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে। সেটা হওয়া সম্ভব অখণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মান আদর্শের অনুসরণের ভিতর-দিয়ে। কারও ভাবে ব্যাঘাত করলে হবে না। প্রত্যেককে চলতে দিতে হবে তার নিজস্ব বিশিষ্ট পথে—সত্তা-সম্বর্দ্ধনার দিকে। মানুষের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, বর্ণগত বৈশিষ্ট্য, ভাবগত বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখার দিকে লক্ষ্য না রাখলে, উপর থেকে কোন-একটা রকম তার উপর চাপাতে গেলে তার স্বাভাবিক বিকাশ কিন্তু ব্যাহত হবে এবং অপরেও বঞ্চিত হবে তাতে। কারণ, তার কাছ থেকে যা পাওয়ার তা' পাবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে উপস্থিত।

কথাপ্রসঙ্গে শরৎদা বললেন—শ্রেণীহীন সমাজ হ'লে, সেখানে কোন সংঘাত থাকবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সংঘাতই যদি না হয়, তাহ'লে evolution (বিবর্ত্তন)-ও হবে না, efficiency (দক্ষতা)-ও বাড়বে না। মানুষের জীবনে যদি খুব বেশী রকমের বাধা থাকে সেটা যেমন তার অস্তিত্বের পক্ষে ক্ষতিকর হয়, তেমনি আদৌ যদি বাধা না থাকে, তাহ'লে সেটাও তার পক্ষে ক্ষতির কারণ হয়। বাধাকে অতিক্রম করতে গিয়েই মানুষ তার অন্তর্নিহিত শক্তির সন্ধান পায়। তাই, সংঘাত একদম না থাকলে সেটা ভাল হয় না। প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা, বাধা ও আনুকূল্য ইত্যাদির এমনতর বিন্যাস হওয়া ভাল, যাতে মানুষ বাঁচাবাড়ার পথে এগিয়ে যেতে পারে। বর্ণাশ্রমের মধ্যে বৃত্তি-অপহরণের স্থান ছিল না। তাই প্রতিযোগিতা একটা অস্বাভাবিক পর্য্যায়ে গিয়ে দাঁড়াতে পারত না। কিন্তু প্রত্যেক বর্ণের অন্তর্গত লোকদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা ছিল। স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করতে গেলেই মানুষের

ভিতর বিশেষ কতকগুলি গুণের প্রয়োজন হয়। বর্ণাশ্রমের মধ্যে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনকে বরাবরই উৎসাহিত করা হ'তো। এতে মানুষের ব্যক্তিত্ব অনেকখানি বেড়ে যায়। মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা অধিকার যদি না থাকে, সবই যদি রাষ্ট্রের হাতে চলে যায় এবং রাষ্ট্রের পরিচালনাধীন হ'য়ে লোকগুলি কাজকর্ম্ম করে ও খায়দায়, তাহ'লে ধীরে-ধীরে প্রত্যেকেই রাষ্ট্রের দাস হয়ে উঠতে থাকে। এ জিনিসটা কাম্য নয়।

শরৎদা—বিবর্ত্তনের বিধি এবং মহাপুরুষের জন্ম এই দুই-এর মধ্যে সঙ্গতি কী? মেরী এবং যোশেফ থেকে ক্রাইস্ট-এর মতো মানুষের আবির্ভাব হয় কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের চাহিদা থাকলেই সে তার পরিপূরণ চায়। যীশুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে বহু মানুষের মনে একটা আকুল সমস্যা জেগেছিল, যে তখনকার প্রতিকূল রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং নৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে কিভাবে টিকে থাকা যায়। একজন উদ্ধাতা কেউ এসে তাদের বাঁচার পথ ক'রে দেবেন, এমনতর একটা প্রার্থনা ও বিশ্বাসের আবহাওয়া তখন সৃষ্টি হয়েছিল। বহু মানুষের মধ্যে তখন একটা আর্ত্তি দেখা দিয়েছিল। যোশেফ ও মেরী যেন সেই ভাবের একটা tuning centre (সমতান কেন্দ্র) হ'য়ে দাঁড়ালেন। তাই যীশু সেখানে আবির্ভূত হওয়ার সুযোগ পেলেন।

একটা বিশেষ সময়ে, একটা বিশেষ পরিবেশে যে বিশেষ ভাব দানা বেঁধে ওঠে, তা' যেন কোন উপযুক্ত মাধ্যমকে আশ্রয় ক'রে জীবনে বিবর্ত্তিত হ'য়ে উঠতে চায়। এই-ভাবেই সমষ্টির সম্বেগ কেন্দ্রীভূত হ'য়ে যখন রূপ পরিগ্রহ করে, তখন কোন মহানের আবির্ভাব হয় যিনি সাধারণের থেকে অনেক বড়। মানুষ এই ব্যাপারটাকেই ঈশ্বরীয় শক্তির অবতরণ ব'লে মনে করে। এইসব অবতারকল্প পুরুষ মানুষের কাছে একটা নূতন জীবনের আদর্শ তুলে ধরেন। মানুষ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে যত তাঁকে অনুসরণ করে ততই তার সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি বিবর্ত্তিত হ'য়ে চলে।

শরৎদা—বিবর্ত্তনের যে সাধারণ বিধি তা' দিয়ে অবতার মহাপুরুষের আবির্ভাবের কারণটা ঠিক বোঝা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিবর্ত্তনের বিধির পিছনে যদি urge ও energy (আকুতি ও শক্তি) না থাকে, তবে তা' effective (কার্য্যকরী) হয় কি ক'রে? যোশেফের বিবর্ত্তন তো চলছিলই। তিনি যা' নিয়ে জন্মেছিলেন তার উপর দাঁড়িয়ে তাঁর সাধনাও চলছিল, তিনি যে পরিবেশের প্রভাবে ঐ উচ্চ ভাবভূমিতে অধিরূঢ় হ'তে পারলেন, সেইটেই যেন হ'য়ে দাঁড়াল তাঁর evolved form (বিবর্ত্তিত রূপ)। তিনি যে ঐভাবে tuned (সমতান) হ'লেন, তাও সম্ভব হ'ল তাঁর ভিতর সেই শক্তি ছিল ব'লে। রেডিয়ো যন্ত্রে বিশেষ tuning (একতানতা) থাকে ব'লে বিশেষ তরঙ্গ ধরা পড়ে। শূন্যস্থানে তা' কি ধরা পড়ে?

শরৎদা—এটা বোঝা যাচ্ছে যে বিবর্ত্তনের ক্ষেত্রে শুধু ভৌতিক শক্তি ক্রিয়া করে না, তার পিছনে মানসিক একটা দিক আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Psychical (মানসিক)-টা বাদ দিয়ে physical (ভৌতিক) নয়। এটা একটা lifeless (প্রাণহীন) ব্যাপার নয়।

শরৎদা—গাছগুলির বেলায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গাছগুলিরও রীতিমত feeling (বোধ) আছে, urge (আকুতি) আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু পরে বললেন—ম'রে গিয়ে আবার জন্ম না হ'লে যে evolution (বিবর্ত্তন) হয় না, তার মানে হচ্ছে energy, intelligence ও muscle-এর (শক্তি, বুদ্ধি ও পেশীর) সঙ্গে adjustment (সামঞ্জস্য) না হ'লে, actively (সক্রিয়ভাবে) progress (উন্নতি) করতে পারে না।

শরৎদা—দীক্ষা দিতে কি খুব বেশী সময় নেওয়া ভাল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধৈর্য্য হারাবার মত lengthy (দীর্ঘ) হওয়া ভাল না, আবার impression (ধারণা) হ'লো না এমন short (সংক্ষিপ্ত) হওয়াও ভাল না। Impressive (আকর্ষণী) করার কতকগুলি technique (কৌশল) আছে।

২রা আষাঢ় ১৩৫৬, বৃহস্পতিবার (ইং ১৬।৬।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে উপস্থিত।

বস্তা সুরেনদা (বিশ্বাস) কলকাতা থেকে আসলেন। কলকাতায় কেষ্টদার সঙ্গে সুরেশ দাস নামক একজন কংগ্রেস নেতার বিতর্ক কিছুটা উগ্র রূপ ধারণ করে—এমনতর কথা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইকথা শুনে আক্ষেপের সুরে বললেন—এখনও যে অবস্থাটা আয়ত্তে আনতে পারলাম না—এইটেই আশ্চর্য্য। কেষ্টদা যা' করেছে, সে তো কিছুই না, এতটুকু ব্যাপার, এই মামুলি জিনিস যদি আমরা tackle (পরিচালনা) করতে না পারি তো কি হ'ল ? এ তো একটা ব্যাপারই না। কত মারামারি হাতাহাতি হয় না ? তাও তো adjust ক'রে (মিটিয়ে) ফেলা যায় লহমায়। তোমরা পার না, অথচ কিশোরীর মত মানুষকে দিয়ে আমি কত complex situation (জটিল পরিস্থিতি) tackle (পরিচালনা) করিয়েছি। পাবনায় তখন দাঙ্গা, ওকাই-এর ভাই পাঁচু মারা গেল, তাকে পোড়াতে যেয়ে নফর মার খেল। সেই অবস্থায় রাত্রে কিশোরীকে পাঠিয়ে দিলাম মুসলমান সর্দারদের বাড়ীতে। সে যেয়ে, আমি যা' বলে দিয়েছিলাম—তা' হুবহু ওদের কাছে বলল। সেই কথা শোনার পর ওরা সবাই বন্ধুর মতো হ'য়ে গেল। আশ্রমের সবাইকে রক্ষা করবার জন্য তখন তাদের সে কি অসাধারণ আগ্রহ! আর একবার কুষ্ঠিয়ার এক ডি এস পি আমাকে ধ'রে নিয়ে যেয়ে দারুণ harass (হয়রান) করতে লাগল। একটু বসতে পর্যন্ত দেয় না, অভদ্রভাবে জেরা করতে লাগল। পরে আমি যখন কথার উত্তর দিলাম, তখন সে একেবারে জল হ'য়ে গেল। অনুতপ্ত হ'য়ে

আকুলভাবে ক্ষমা চাইতে লাগল। পরে নিজে দু'বেলা কত জিনিসপত্র নিয়ে আসত, ব'সে থাকত, কথাবার্ত্তা শুনত। যাই ঘটুক, কোন মানুষের হৃদয় জয় করা খুব কঠিন কথা নয়। সংযম ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে যে-কেউ একটু চেষ্টা করলেই হয়।

সুরেশ দাসের সঙ্গে যে কথা কাটাকাটি হয়েছে, সেইজন্য আমি কিছুই মনে করি না। ওরকম কতই হ'য়ে থাকে। কিন্তু আমি depressed (অবসন্ন) হ'য়ে পড়ি এই ভেবে যে, এখনও শুনতে পারলাম না অবস্থাটা আয়ত্তে আনা হয়েছে। এটা আমাদের একটা মস্ত বড় inefficiency (অযোগ্যতা)।

এরপর স্পেনসারদা আসলেন। শরৎদা এবং স্পেনসারদার মধ্যে একটা বিষয়ে কথা হচ্ছিল। সেই প্রসঙ্গে স্পেনসারদা বললেন—শুধু theory (তত্ত্ব) ভাল হলে হবে না, সেটার practice (প্রয়োগ) চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Theory (তত্ত্ব)-কে practicable (সুকর) ক'রে তোলা লাগে, all complete (সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ) করা লাগে। পরে সেটা সবার মধ্যে infuse (সঞ্চারিত) ক'রে বাস্তব প্রয়োগে আনা যায়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মানে, ব্যক্তির becoming (বিবর্দ্ধন)। তন-ধাতু মানে বিস্তার। তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মানে ব্যক্তির বিস্তার। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে গেলে এমন কিছু করা যাবে না যা' ব্যক্তিত্বের বিস্তারের পরিপন্থী। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলতে যদি কেউ বোঝে যে আমাদের যথেচ্ছ চলনে চলার অধিকার আছে, তবে তা' কিন্তু ভুল। প্রত্যেককে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তেমনভাবে বজায় রাখতে হবে, যাতে তা' অপরের সাত্বত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিকুল না হয়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে—"অপরের প্রতি কর সেই আচরণ, নিজে তুমি পেতে যাহা কর আকিঞ্চন"—এই নীতিটার কথা। এই জিনিসটা স্মরণ রেখে চলতে পারলে মানুষের সঙ্গে বিরোধ এড়িয়ে চলা তো যায়ই, তাছাড়া সবাইকে আপন ক'রে তোলা সহজেই সম্ভব হয়। অবশ্য এর সঙ্গে-সঙ্গে ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য রেখে চলতে হয়।

সুরেনদা বললেন—ব্যবহার-সম্বন্ধে এই সব নীতি থাকা সত্ত্বেও কেন যে আমাদের এত গণ্ডগোল হয়ে যায়, তা' ঠিক বুঝতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গণ্ডগোল হয়, যখন নীতির দিকে নজর না রেখে Self-centric (আত্মকেন্দ্রিক) হ'য়ে পড়ি।

যাজন-সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল।

শরৎদা বললেন—কার কাছে কোন্ কথা যে কার্য্যকরী হয়, তা' বোঝা যায় না। অনেকে ভাল কথাও বাঁকাভাবে নেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাজন করতে গেলে বোধ, বিবেচনা ও চাতুর্য্য চাই।

শরৎদা—সেটা কীরকম?

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

একজন প্রবৃত্তি পরতন্ত্রী স্বার্থসন্ধিৎসু

তোমার কথা কেমন ক'রে নিয়ে
উন্মাদনায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে—
তোমার আদর্শে—
তাতে লক্ষ্য রেখে
তুমি তোমার কথা ও ব্যবহারকে
যেমনতর নিয়োগ করতে পারবে,
আর, সেই নিয়োগ যেমনতর
যত স্বল্প সময়ে
কৃতকার্য্য হ'য়ে উঠবে সুষ্ঠুভাবে—
একটা বাস্তব সক্রিয়তা নিয়ে :—
তাই হচ্ছে কিন্তু প্রকৃষ্ট প্রমাণ—
তুমি কেমন চতুর।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার প্রাক্কালে মাঠে চৌকিতে তাকিয়া ঠেস দিয়ে পূর্ব্বাস্য হ'য়ে ব'সে তামাক সেবন করছিলেন। তাঁর ডান পা-টা বাঁ হাঁটুর উপর তোলা—বাঁ হাতটা ডান হাতের 'পর।

পূজনীয় খেপুদা প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

ভূষণদার অভাবের কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহানুভূতির সঙ্গে বললেন—আজকাল যে বাজার তাতে পারাও মুশকিল।

খেপুদা—আজকাল কলকাতায় একটা লোকের শুধু খাওয়া অন্ততঃ তিরিশ টাকার কমে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে আট-দশ টাকায় হ'য়ে যেত। আমি যখন কলকাতায় পড়তাম তখন মাসে দশ টাকা ক'রে পেতাম—তাও অনিয়মিতভাবে। তার ভিতর-দিয়েই সব খরচ চালাতে হ'ত। কলকাতায় পড়ার সময় কি কষ্টই গেছে।

খেপুদা—তুমি তো মেসে বিশেষ থাকনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ মেসে ছিলাম তো! মেসটা কোথায় ছিল, রাস্তার নাম মনে পড়ছে না। তখন মেসে সাতটাকা ক'রে নিত। সেখানে অনেক ছাগল-টাগল থাকত।

শ্রীশ্রীঠাকুর যেখানে ব'সে ছিলেন তার পাশে একটি জায়গা দেখে মনে হয়, সেখানে একটি পাথর ক্রমান্বয়ে জমে উঠছে। তাই দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—cohesion (সংশক্তি) আছে ব'লেই ঐভাবে জমছে।

৩রা আষাঢ় ১৩৫৬, শুক্রবার (ইং ১৭। ৬। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট। যতিগণ আছেন।

শরৎদা দেশের শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ধর্ম্মাদর্শের ভিত্তিতে মান, দান, ভেদ, দণ্ড—এগুলির বিহিত প্রয়োগ দরকার। স্থান-কাল-পাত্র-অনুযায়ী আইন কখন, কোথায়, কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে সে-সম্বন্ধে বোধ থাকা চাই। শুধু লেখাপড়া জানলেই এ কাজ সুষ্ঠুভাবে করা যায় না। প্রত্যেক কাজ ঠিকভাবে করতে গেলে সেই ব্যাপারে একটা জন্মগত সংস্কার ও ঝোঁক আছে কিনা, সেটা দেখতে হয়। কাকে কোন্ কাজে নিয়োগ করতে হবে সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞ লোক চাই। দেশে যদি উপযুক্ত মানুষ না জন্মায়, তাহ'লে উন্নতি, শান্তি ও শৃঙ্খলা সুদূরপরাহত ব্যাপার।

কিছু সময় পরে শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই উভয়ের প্রতি করণীয় আছে। স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি তার কর্ত্তব্য না করে, তাহ'লে সেটা যেমন তার পক্ষে অন্যায়, আবার স্ত্রী যদি স্বামীর প্রতি তার করণীয় না করে সেটাও তার পক্ষে অন্যায়। ইদানীং কোথাও কোথাও মেয়েদের মধ্যে এমন একটা ধারণা জন্মে গেছে, যে তারা যাই করুক, পুরুষ তাদের খোরপোষ দিতে বাধ্য। এতে কোন-কোন পুরুষের মনে মেয়েদের সম্বন্ধে যেন একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। একটা কারণ, টাকা-পয়সার অভাব-অভিযোগ, ও দ্বিতীয় কারণ মেয়েদের ঐ মনোভাব—এতে পুরুষ বিয়ে করতে ভয় পায়। অবশ্য, সব ক্ষেত্রেই যে এমনতর তা' আমি বলি না। যা হোক, ঐ জাতীয় মেয়েছেলে বল হয় না, হয় ভার। অনেক সময় তারা আবার পুরুষকে উত্যক্ত করে। পুরুষের জন্য যে কিছু তাদের করবার আছে, সেও যে অক্ষম হ'য়ে পড়তে পারে, সে অবস্থায় তাকে যে বহন করতে হবে—এ কথা তারা ভাবে কম। তবে আমি দেখেছি, মেয়েরা নারকেল গাছ লাগায়, সুপারি গাছ লাগায়, কলা গাছ লাগায়, বেগুনের ক্ষেত করে, গরু পালে, গুড় তৈরী করে, ঘি তৈরী করে—এসব বিক্রী ক'রে পয়সা করে। পুরুষের একটা ভরসা থাকে, ভাবে—আমি অশক্ত হ'য়ে পড়লে একটা আশ্বাস পাব, আসান পাব। ঐ মেয়েরা আবার হিসাব জানত—কোন্ মাসে, কোন্ পর্য্যায়ে, কিভাবে গাছ লাগালে বার মাস ফসল পাওয়া যায়। চাকরকে দিয়ে কত কাজ করিয়ে নিত। ঐভাবে নানারকম ক'রে মাসে-মাসে পঞ্চাশ ষাট টাকা আয় করত। তারা আবার ছেলে মেয়েদেরও শেখাত। কৃষ্টি পরিচর্য্যার ধরন যেমন শিথিল হয়ে চলেছে, এইভাবে যদি চলে, তাহলে কয়েক পুরুষ পরে কি হবে বলা মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদাকে লক্ষ্য করে বললেন—আপনার মা-র মধ্যে যা ছিল, আপনার স্ত্রীর মধ্যে তা' পাবেন না, মেয়ের মধ্যে আরও কম পাবেন। আগের কালে পানের থেকে একটু চুণ খসলে শাশুড়ি, দিদি-শাশুড়ি ব'কে ভূত ছাড়ায়ে দিত, তবু বৌরা হাসিমুখে সব সহ্য ক'রে যেত। এই বড়বৌ কর্ত্তামার কাছে কি কম গাল খেয়েছে। কর্ত্তামার ছিল ঐ ধরন—"না বলিতে কাজ বুঝিয়া করিবে।" কর্ত্তামা ভোর চারটের সময় উঠে ছড়া-ঝাঁট দিতেন। সেই সময় কেউ যদি ছড়ার হাঁড়ি হাত থেকে কেড়ে না নিত, তাহ'লে চ'টে যেতেন, সারাদিন ধোলাই করতেন। আবার ঐ সময় উঠে হাতের থেকে হাঁড়ি কেড়ে নিতে গেলেও বলতেন—থাক্, থাক্, এত সকালে উঠলে কেন?

কিন্তু ভিতরে-ভিতরে খুশী হতেন খুব, সেদিন আর বকতেন না। ফলকথা, আগে প্রত্যেকটা গৃহস্থাশ্রম ছিল একটা practical school (বাস্তব শিক্ষায়তন)। আর হওয়াও উচিত তাই।

কথাপ্রসঙ্গে শরৎদা বললেন—দেখা যায়, যে-চাকরটা প্রাণের সঙ্গে খাটে, দাবি দাওয়া করে না, সেখানে বেশী দেওয়া আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্যে ভগবানের সঙ্গেও contract (চুক্তি) করতে নেই। Love has no contract (ভালবাসার মধ্যে চুক্তি নেই)।

স্পেনসারদা—ব্যবসা বা রাজনীতির ক্ষেত্রে তো এটা না হ'লে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Give and take (দেওয়া-নেওয়া) যেখানে, সেখানে contract (চুক্তি)। ভালবাসায় তা' নয়।

হরিপদদা (সাহা)—লীলা মানে তো দান ও গ্রহণ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—লীলা মানে আলিঙ্গন ও গ্রহণ।

স্পেনসারদা—আমার কথা হচ্ছে, ব্যবসার ক্ষেত্রে চুক্তি বাদ দিয়ে পারা যায় কিনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত faith, love and service (বিশ্বাস, ভালবাসা এবং সেবা) আনতে পারবে এ-সব ব্যাপারে, ততই contract (চুক্তি) ক'মে যাবে। তবে এ-সব ক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা থাকা ভাল, যাতে এক পক্ষ আর এক পক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে। ঠকান যেমন পাপ, ঠকাও তেমন পাপ। বিশ্বাস ক'রে ঠকলাম এমনতর আপসোস করার অবকাশ থাকা ভাল না।

প্রফুল্ল—আপনার কথাই ঠিক। ভালবাসায় কোন প্রত্যাশা থাকে না। তাই হতাশা আসে না। কিন্তু ব্যবসাক্ষেত্রে চুক্তি বাদ দিতে গেলে তো হতাশার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালবাসাতেও প্রীতি-প্রত্যাশা থাকে। তবে কেউ ভালবেসে একখানা কাপড় দিলে, সে যে একখানা কাপড়ই ফিরিয়ে চায় তার কাছ থেকে এবং তাই পেলেই খুশী হয়, তা' নয়। সে হয়ত দুটো আম তার কাছ থেকে পেলেই মহাখুশী। সেটা হ'ল token of love (প্রীতি নিদর্শন)। আম-ই যে চায় তাও কথা নয়, ভালবাসার প্রতিদান চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর রোজকার মত আজও সন্ধ্যায় মাঠে উন্মুক্ত আকাশতলে তক্তপোষে এসে বসেছেন। কতিপয় ভক্ত কাছে আছেন।

এস. কে. চ্যাটাজ্জী আসলেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে বললেন—কলকাতায় কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং কংগ্রেস দুই দলের মধ্যে খুব গোলমাল চলছে এবং কোন-কোন নেতার বাড়ীও আক্রান্ত হচ্ছে।

এই সংবাদে শ্রীশ্রীঠাকুর উদ্বিগ্ন হ'য়ে বললেন—কথাটা শুনে আমার মনটা বড়ই খারাপ হ'য়ে গেছে। আজকাল চারিদিকে chaos (বিশৃঙ্খলা)-ই সৃষ্টি হচ্ছে। প্রতিলোম চলছে, বিবাহ-বিচ্ছেদও জলভাত হ'য়ে যাচ্ছে। আজ বাড়ী যেয়ে যদি দেখেন

আপনার মেয়েটা কারও সঙ্গে বেরিয়ে গেছে, তাহ'লে আশ্চর্যে্যর কিছু না। প্রবৃত্তিতে উসকানি দিলে তার ফল যে কতদিকে কিভাবে গড়ায়, তার ঠিক নেই। সব জেনে-শুনেও আজ যেন পথ নেই। আজ বিপদের সময় পাশে এসে কম লোকই দাঁড়ায়। পরস্পরের মধ্যে সঙ্গতি নেই। আদর্শ না থাকলে সঙ্গতি থাকবে কি ক'রে? সঙ্গতি না থাকলে unity (ঐক্য)-ই বা থাকবে কি ক'রে?

আমাদের অর্থসঙ্গতি না থাকা সত্ত্বেও যে টিকে আছি, সে কেবল কেন্দ্রায়িত আছি ব'লে। নিজেদের মধ্যে একটা sympathy (সহানুভূতি) আছে, প্রত্যেকে feel (অনুভব) করে, তার যতটুকু সামর্থ্য আছে তাই নিয়েই করে। এতেই যদি এতখানি হয়, তাহ'লে আমাদের ঋষিরা যেমন বলেছেন—দেশগতভাবে যদি আমরা আদর্শে তেমন ক'রে integrated (সংহত) হ'তে পারতাম, তবে কেমন হ'তো!

শৈলেশবাবুও হতাশার ভাব প্রকাশ করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা আমাদের সত্তা দিয়ে কৃতার্থতা উপভোগ করতে চাই। কেমন ক'রে সেটা বাস্তবে সম্ভব ক'রে তোলা যায় সেইটেই হ'ল কথা। অনেকে বলে—golden-age (স্বর্ণ-যুগ) আসবে, এ-সব থাকবে না। তবু বলি, এই demon-age-এর (আসুর-যুগের) প্রয়োজন ছিল কী? আর, এভাবে চললে সেই স্বর্ণ-যুগ আসবে কী? শোনা যায়, বৃত্রাসুরের অত্যাচারে দেবতারা যখন অস্থির, তখন তাঁরা নাকি ক্ষীরোদ সমুদ্রের কাছে গিয়ে মহাশক্তির আবির্ভাবের জন্য প্রার্থনা করতে শুরু করলেন। তখন তাঁদের প্রত্যেকের শরীর থেকে শক্তিধারা নির্গত হয়ে গিয়ে দেবীর আবির্ভাবকে সম্ভব ক'রে তুলেছিল। তাই বলি—আমাদের individual energy and effort (ব্যক্তিগত শক্তি ও চেষ্টা) যদি concentric (কেন্দ্রায়িত) ক'রে না তুলি, তাহ'লে আমরা কিন্তু প্রবৃত্তিমুখী আসুর শক্তির বিরুদ্ধে জয়ী হ'তে পারব না। আমরা কোন দলকেই ভাল বা খারাপ কিছু বলি না। কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা যদি না থাকে, তবে আমাদের ভিতরে পশুভাবই প্রবল হবে এবং তাই-ই আমাদের সর্ব্বনাশ ডেকে আনবে।

৪ঠা আষাঢ় ১৩৫৬, শনিবার (ইং ১৮।৬।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে রোহিণী রোডের পাশে চেয়ারে বসেছেন গাড়ী দেখবার জন্যে। খানিকটা পর গাড়ী দেখে উঠে পড়লেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর গোল তাঁবুর পাশে ইজিচেয়ারে এসে বসলেন। অনেকেই উপস্থিত হ'লেন।

জনৈক দাদা জিজ্ঞাসা করলেন—আমাদের বাড়ীতে পরপর বহু লোক মারা যাচ্ছে। অনেকে বলে অপদেবতা ভর করেছে, কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাড়ীতে টি বি-র infection (সংক্রমণ) হয়েছে কিনা দেখা লাগে। বাড়ীটা ভাল করে disinfect (রোগজীবাণুমুক্ত) করা লাগে। কোনটায় কোন কাজ

না হলে অগত্যা অন্যত্র চ'লে গেলে হয়। অবশ্য আগুনে যেমন জ্বলে যায়, তেমনি জোর নাম করলে, নামের আগুনে সব পাপ-তাপ, আধিব্যাধি জ্বলে যায়। আগুনের তাপ খুব না বাড়ালে পোড়ে না, তাই নাম খুব জোর চালান লাগে।

রামগোপালদা (দে) এক মাকে নিয়ে এসে বললেন—এই মার একটি ছেলে বড়ই অবাধ্য ও বহির্মুখ। এরা সব দীক্ষিত, কিন্তু তাকে বললেও সে এদিকে আসতে চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এদিকে আনার চেষ্টা না করা ভাল। মা-বাপের 'পর যতক্ষণ নেশা না হবে, ততক্ষণ কিছু করা যাবে না।

রামগোপালদা—কী করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাতে ওদের 'পর নেশা হয় তাই করা লাগে। ওদের নেশা তার 'পর হলে হবে না, তার নেশা হওয়া চাই ওদের উপর। ওদের আচার, ব্যবহার, চলন, চরিত্র যাতে তার শ্রদ্ধার উদ্দীপন করে তাই করা লাগে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার সত্তার পক্ষে যা' প্রয়োজন তার চাইতে বেশী যদি উপভোগ করতে যাই, তাহ'লে অসুস্থ হ'য়ে পড়ব। আমার অসুখটা প্রকৃতির শাসন। আমি যদি সপারিপার্শ্বিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, কৃষ্টি, আত্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সব দিক দিয়ে উন্নত হ'তে না পারি, তাহ'লে আমার উপর শাস্তি আসবেই। বেয়নেট আমরা অতিক্রম করতে পারি না। সপরিবেশ বাঁচাবাড়ার জন্য যা' করণীয় তা' যদি না করি, তাহ'লে আমরা কেউই রেহাই পাব না। তাই প্রত্যেককে তার করণীয় করার ব্যাপারে সচেতন ও সক্রিয় ক'রে তোলা আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য। আমরা যতই আচরণশীল হই না কেন, সঙ্গে-সঙ্গে সঞ্চারণা বা যাজনের দিকে লক্ষ্য রাখাই লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যাবেলায় মাঠে এসে বসেছেন। পূজনীয় খেপুদা এবং আরও কয়েকজন উপস্থিত।

কথাপ্রসঙ্গে কাশীদা (রায়চৌধুরী) জিজ্ঞাসা করলেন—মানুষের কি free will (স্বাধীন ইচ্ছা) আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Free will (স্বাধীন ইচ্ছা) যদি না থাকে, তাহ'লে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন-ই বা কেন? আর পাঁচ রকম করাই বা কেন?

কাশীদা—দৈব-ই তো জয়ী হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দৈবটাও পুরুষকার। করার ফল যেটা দীপ্ত হ'য়ে আছে, সেইটে হ'ল দৈব। মানুষ দৈব-পুরুষকারের মানে বোঝে না, তাই একটাকে আর একটার উল্টো মনে করে।

কাজ-কর্ম্মের সম্বন্ধে খেপুদা বললেন—হুজুগে করা এক জিনিস আর সত্যিকার লেগে-বেঁধে কাজ করা আলাদা। তেমনতর কর্ম্মীই কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হুজুগের মানুষ পরিস্থিতির পুতুল, পরিস্থিতি যেভাবে চালায় সেইভাবে চলে।

খেপুদা—Sincerity of purpose (উদ্দেশ্যের আন্তরিকতা) না থাকলে মানুষ পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ concentric (সুকেন্দ্রিক) না হ'লে ব্যক্তিত্বই ফোটে না, ব্যক্তিত্ব যার না থাকে, তার sincerity of purpose (উদ্দেশ্যের আন্তরিকতা) জাগে না।

কাশীদা—কত লোক আছে যারা খুব ধনী হয়। তাদের জীবনে কোন আদর্শ আছে ব'লে দেখা যায় না। তারা বড় হয় কি ক'রে? তারা কি টাকায় concentric (সুকেন্দ্রিক)?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হ'তে পারে। কিন্তু আদর্শ না থাকার দরুন পতনও হয়। আমার বাইরে একজন যদি না থাকেন এবং আমার সমগ্র সত্তা যদি তাঁতে কেন্দ্রায়িত না হয়, তাহ'লে ভুল হয়—পতন হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোল তাঁবুর পাশে নূতন তাঁবুর নীচে চৌকিতে বিছানায় শুয়ে আছেন।

ব্যানাজ্জীদা শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে একখানি বেঞ্চিতে এসে বসলেন। আজ খুব গরম পড়েছে। হরিদাসদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বাতাস করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—ঐ জায়গায় দাঁড়িয়ে বাতাস করলে সবাই উপভোগ করতে পারত।

তাই হরিদাসদা একটু স'রে দাঁড়িয়ে বাতাস করতে লাগলেন।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দেশের লোকের মধ্যে ভাবধারার প্রচার চাই। তার জন্য মানুষ চাই, টাকা চাই, কাগজ চাই। কর্ম্মীরা লোভের মানুষ হ'লে হবে না। তারা যতি-সন্ন্যাসীর মত হওয়া চাই। এগুলি করতে না পারলে উপায় নাই।

ব্যানাজ্জীদা—আপনার আশীর্ব্বাদ হ'লে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার একান্ত আগ্রহ। অন্যান্য পত্রিকায় প্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে নিজেদেরও কাগজ বের করা দরকার।

ব্যানাজ্জীদা—একটা প্রেস করা দরকার। অন্য পত্রিকার অকুণ্ঠ সাহায্য পাওয়া কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজেদের প্রেস হলেও অন্যান্য পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার দরকার।

ব্যানাজ্জীদা—কলকাতায় একটা বড় প্রেস বিক্রী হচ্ছে।

প্রফুল্ল—আমাদের যে টাকা নেই।

ব্যানাজ্জীদা—টাকা লোকের বহু আছে, টাকা কী করবে ঠিক পায় না। নেতারা এক-একজন এমন ভাষণ দেন যে, মানুষ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়ে। কখনও শ্রমিকদের এমন উসকে দেন যে, তারা হয়ত কাজই বন্ধ ক'রে দিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নেতাদের পরিচালনা ঠিক না থাকায় অবস্থা আরও ঘোরালো ক'রে ফেলেছে।

ব্যানাজ্জীদা—আপনি আমাদের দিয়ে করিয়ে নিন। করা একান্ত দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেশ ভাগ করায় ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের পক্ষেই ক্ষতি হয়েছে। অযথা এক উদ্বাস্তু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। আরও অগণিত সমস্যা গজিয়ে তোলা হয়েছে। এখন চাই দীক্ষিতের সংখ্যা বাড়ান। দীক্ষিত হ'লে তাদের ভিতর একটা আত্মনিয়ন্ত্রণের আগ্রহ জাগে। সে লোকগুলির উপর অনেকখানি নির্ভর করা যায়। ধর্ম্মের উপর দাঁড়াতে হয়। ধর্ম্মই হওয়া উচিত আমাদের basis (ভিত্তি)। ধর্ম্ম মানে মানুষের বাঁচাবাড়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—কটা বেজেছে?

প্রফুল্ল—পৌনে এগারটা।

প্রফুল্ল পরে বলল—আমার ঘড়ি অনেক সময় বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু আন্দাজে মিল ক'রে দিয়ে দেখি প্রায়ই কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক হয়। এখনও আপনার ঘড়ি গিয়ে দেখে আসলাম সে ঘড়ির সঙ্গে সময় ঠিক আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ আন্দাজ করতে-করতে অমন হয়। Intuition (অন্তর্দৃষ্টি) ঐভাবে বাড়ে। মনে কর, একটা ডালে কতগুলি পাতা আছে আন্দাজ ক'রে বললে, তারপর গুনে দেখলে। এরকম পর-পর করতে থাকলে। এইভাবে হয়। মানুষকে দেখেও ঐভাবে ঠিক পাওয়া যায়। সবকিছু সম্বন্ধেই এ-কথা খাটে। ভাল ক'রে নামটাম কর, আর কাজ ক'রে যাও। ভিতরের শক্তি আপনা থেকেই জেগে উঠবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে ব্যানাজ্জীদাকে বললেন—Selfless worker (নিঃস্বার্থ কর্ম্মী) জোগাড় কর—যারা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে ভালবাসে। প্রদেশের পর প্রদেশে কর্ম্মী ও কাগজ ঠিক করা লাগে। শ্রমণের দল সর্ব্বত্র ছড়িয়ে দিতে হয়। তারা নিজেরা তপস্যা করবে, মুখে বলবে, সাধারণের মধ্যে কাজ করবে, তাদের সংগঠিত ক'রে তুলবে। এইসব এক যোগে চলতে থাকবে। যেমন ক'রে যা' করার তেমন ক'রে তা না করলে হয় না।

একদল চাই বই লেখার জন্যে। তারা যাত্রা, সিনেমা, থিয়েটার ইত্যাদির জন্য নূতন ধরনের নাটক লিখবে, যার ভিতর-দিয়ে ভাবধারাগুলি তাড়াতাড়ি লোকের মধ্যে চারিয়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যানাজ্জীদা ও মন্মথদাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—পরমপিতার দয়ায় তুমি বিয়ে থাওয়া করনি, ও-ও করেনি। বেশ ভালই হয়েছে, পিছটান নেই, কেউ আটকাবে না। নেংটেকে নেংটে, রাজাকে রাজা। সুলক্ষণ সব আছে, পরমপিতার দয়া আছে। এমনভাবে কাজ করা লাগবে, যাতে এ আগুন সব জায়গায় ছড়িয়ে যায়। যে বিশিষ্ট দেড়লাখ লোক দীক্ষা দেওয়ার কথা বলেছি, তা' কলকাতার উপর থেকেই করা অসম্ভব কিছু নয়। তোমরা সারা বাংলা, সারা ভারত, সারা দুনিয়ার উদ্গাতা হ'য়ে উঠতে

পার। লাগলেই হয়। খুব earnestly (আগ্রহ সহকারে) লাগ। অচ্যুত না হ'লে পারার জো নাই। নিরন্তরতা চাই। তেমন ক'রে লাগলে ক'দিন লাগে? তোমরা দুজনেই কাম সেরে ফেলতে পার।

ব্যানার্জ্জীদা—অনেক বাধা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যারা করব তাদের এতখানি শক্ত প্রস্তুতি থাকা দরকার, যাতে সমস্ত বাধার সম্মুখীন হ'তে পারি, বাধাকে বাধ্য ক'রে ফেলতে পারি। আমাদের এতখানি আকুতি থাকা চাই, শক্তি থাকা চাই, ব্যক্তিত্ব থাকা চাই যাতে প্রতিকূল পরিস্থিতির ভিতর থেকেও পুষ্টি সংগ্রহ ক'রে নিতে পারি। সংহতি থাকলে এ-সব পারা যাবে। তা' যদি ভেঙ্গে যায় তাহ'লে কোন করার দাম হবে না। বহু দিন থেকে concentric (সুকেন্দ্রিক) রকমটা নাই। ছেলেপেলেদের disobedience (অবাধ্যতা) শেখান হয়েছে। এসবের প্রতিকার করা লাগে। এক লহমা যদি সময় থাকে তারই সুযোগ গ্রহণ করা ভাল। আমরা বাঁচতে চাই। বাঁচাই পুণ্য। সব কাজের মধ্যে লক্ষ্য রাখতে হয়, যাতে প্রতিলোম না চারায়।

৫ই আষাঢ় ১৩৫৬, রবিবার (ইং ১৯।৬।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। শৈলেশদা (চ্যাটার্জ্জী) আসলেন। তিনি একজন সৎসঙ্গীর অপকর্ম্মের বিষয় শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সৎসঙ্গী হ'লে তখন-তখনই যে দেবতা হ'য়ে যায় তা' তো নয়। অনুরাগ মানুষকে দেবতা করে। সৎসঙ্গী হ'লেও তার মধ্যে অসৎ-প্রবণতা যা' আছে, তা' নিরোধ করাই ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মানুষের একটা উপায় আছে অনুরাগ। তা' ছাড়া মানুষের উপায় নেই। তা' আবার কাটা-কাটা হ'লে হবে না। নিরবচ্ছিন্ন অচ্যুত অনুরাগ চাই। মান, অভিমান, চাহিদা ইত্যাদি নিয়ে অনুরক্ত হ'লে তা' সব সময় টেকে না। কিছু চাই না, তুমি আছ আর আমি আছি, আমি তোমার উপভোগ্য হ'য়ে জীবনটা সার্থক করতে চাই, আর কিছু চাই না—এই হ'লো right attitude (ঠিক ভাব)। মুক্তির কামনা পর্য্যন্ত রাখতে নেই। তাই বলে—"মুক্তি বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।" প্রবৃত্তি, যশ, লোভ ইত্যাদির আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ভালবাসতে গেলে ইষ্ট, ভগবান বা ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক হয় না, সম্পর্ক হয় ঐগুলির সঙ্গে। কামনার বস্তু প্রধান হ'য়ে দাঁড়ায়, তা' পর্দ্দার মত হ'য়ে ওঠে।

শরৎদা—আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলে কাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনিই একমাত্র কাম্য হবেন। সেবা মানে, তাঁকে পরিপালন, পরিপোষণ, পরিপূরণ করা। যাতে তিনি আমার মধ্যে জাগ্রত থাকেন এবং আমার দ্বারা পুষ্ট ও পরিপূরিত হন, তাই করাই সেবা। "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—তার মানে প্রবৃত্তি-ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিয়ে আমাকে রক্ষা ক'রে চল, পালন ক'রে

চল, প্রবৃত্তি-প্ররোচনায় আমাকে sacrifice (পরিত্যাগ) ক'রো না। এই হ'ল মুক্তির পথ। এটা হ'ল বিধি—এই করলে এই হয়। কেউ-কেউ একে contract (চুক্তি) ব'লে মনে করে, কিন্তু তা' নয়। জিহ্বায় লংকা দিলে যেমন ঝাল লাগেই—যদি জিহ্বায় কোন দোষ না থাকে এবং লংকা ঠিক হয়,—এও তেমন। বৈষ্ণবরা জ্ঞানের কথা বিশেষ শুনতে চায় না মানে তারা জ্ঞানাভিমান পছন্দ করে না। অনেকে অভিমানে আটকে থাকে, তাই বস্তু লাভ করতে পারে না।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

"মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।"

তার মানে ইষ্টগতপ্রাণ হ'য়ে যদি কেউ সর্ব্বতোভাবে ইষ্টকে নিয়ে ব্যাপৃত হয়, তাহ'লে সে যে তাঁকে পাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাই শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন যে—এই নিশ্চিত সত্য সম্বন্ধে তিনি প্রতিজ্ঞা ক'রে বলছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে খেপুদাকে বললেন—কাল বিষ্টুদা (ব্যানার্জ্জীদা)-কে বললাম, খুব আগ্রহ, বলে—যেয়েই লাগব। বামুন এখনও উঁকি মারে। যাই হোক, এখনও বামুনের মধ্যে যা' পাওয়া যায়, তাতে আশা হয়।

খেপুদা আজ দুপুরে কলকাতায় যাবেন। শৈলেশদা (চ্যাটার্জ্জী) যাবেন রাত্রে। ও'রা কাল সকালে কলকাতায় মিলিত হবেন। সেখান থেকে জমি দেখতে যাবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তিন বামুন, এক শূদ্র যেন যেও না। আমার কর্ত্তামা এমনতর বলতেন। এমন সমাবেশে বোধ হয় দ্বন্দ্ব হয়। তাই অভিজ্ঞতার ফলে হয়ত এমন প্রবাদ বেরিয়েছে। কোথাও যাওয়ার সময় সাধারণতঃ আমাদের একটা আগ্রহ হয়। এমনতর adjustment (ব্যবস্থা) করতে হয়, যাতে আগ্রহটা বাড়ে, সেটা ভেঙ্গে না যায়। সেই জন্য কোথাও যাওয়ার সময় পিছ ডাক দিতে নেই। হাঁচি, টিক্‌টিকিও ঐ জন্য মানে। ওতে adjustment (বিন্যাস)-টা ভেংগে যায়। সকালে উঠে সুদর্শন, শুভদর্শন কিছু দেখলে সাধারণতঃ দিনটা ভাল যায়, কারণ মনের আগ্রহ তাতে সুস্থ-স্বস্থ থাকে এবং আরও keen (তীব্র) হয়। চন্দ্র শুদ্ধ দেখে যাত্রা করে। চন্দ্র শুদ্ধ মানে মন শুদ্ধ। একনিষ্ঠ আবেগ থাকাকে বলে মন শুদ্ধ থাকা।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে জিজ্ঞাসা করলেন—আলাপ-আলোচনা যা লিখছিস, তা' ছাপান হবে নাকি ?

প্রফুল্ল—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আলোচনায় এসব যা' ছাপান হচ্ছে তা' প'ড়ে ভাল হবে বোঝা যায় ?

শৈলেশদা—হ্যাঁ খুব বোঝা যায়। আপনারা সর্ব্বাংগ সুন্দর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ "সত্যং শিবং সুন্দরম্‌"-এর প্রকাশ। আর মানুষ হ'ল মূলতঃ সচ্চিদানন্দ ঘন বিগ্রহ।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু পরে বললেন—ভাবি, পরমপিতার দয়ায়, আপনাদের অনুগ্রহে যদি একটা জমি হ'ত, সেখানে গিয়ে যদি খড়ের ঘর তুলে থাকা যেত, ভাল থাকতাম। ভাবি তো তাই, অবশ্য মন ভাল না থাকলে কোথাও গিয়ে ভাল লাগে না। নিজের যা কষ্ট তা'তো আছেই, কিন্তু পরিস্থিতির দরুনও বড় কষ্ট পাই। আমার মন ভাল না, মনটা বড় নরম। মনই আমাকে সাজা দেয়। ঐ যে প্রতাপ গুহরায় ও সুরেন ঘোষের বাড়ী কি ব্যাপার হয়েছে, তা' কিছুতেই আমি ভুলতে পারি না। ঘুমের থেকে ওঠা মাত্রই মনে জেগে ওঠে।

সুধাংশুদা (মৈত্র) তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ব'সে ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শৈলেশদাকে বললেন—ও আমার বড় মেয়ে বিয়ে করেছিল, ওর ছোট ভাই আর-এক মেয়ে বিয়ে করেছে। আমার মেয়ে গেছে, কিন্তু মেয়েটাকে ছেলে ক'রে পেয়েছি। আমায় এত ভালবাসে, যত্ন করে—ঠিকই পাওয়া যায় না আমার ছেলে কিনা। ওর বাবাও অতি ভদ্রলোক।

শ্রীশ্রীঠাকুর দুপুরে ভোগের পর বড়াল-বাংলোর ঘরে বিছানায় ব'সে আছেন।

পাঁচুদা (চক্রবর্ত্তী) বিদায় নেবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—খুব tactfully (সুকৌশলে) চ'লো। যেখানে যেমন চলতে হয়, বলতে হয় তেমনি ক'রো।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে বিষ্টুদা (ব্যানার্জ্জী)-কে বললেন—ইষ্টভৃতির সুফল যে কত, ব'লে শেষ করা যায় না। এতে অসম্ভব কাণ্ড ঘটে। যুদ্ধের সময় বার্ম্মায়, কলকাতার দাঙ্গায়, নোয়াখালির গোলমালের সময় কত লোক যে ইষ্টভৃতি করার ফলে অসম্ভবভাবে বেঁচে গেছে তার হিসেব নেই। তাই ব'লে আমরা যদি ইষ্টভৃতির ফল সম্বন্ধে সন্ধিহান হ'য়ে পরীক্ষা করতে যাই, তাহ'লে কিন্তু ইষ্টভৃতিই ঠিক-ঠিক করা হবে না। তাই ফলের দিক দিয়েও বঞ্চিত হব। Spontaneous urge (স্বতঃস্ফূর্ত্ত আকুতি) থেকে করাতেই ঠিক-ঠিক করা হয় এবং বিপদ-আপদের সময় তার ফলটা টের পাওয়া যায়। ইষ্টভৃতি ক'রে বেরুলে নিকুম্ভিলা যজ্ঞ ক'রে বেরুবার মত হয়। তখন একেবারে invincible (অজেয়)। কলকাতায় যেয়ে লাগ। অসম্ভব কাণ্ড ক'রে ফেলতে পারবে। কোন্ বনে কোন্ বাঘ আছে ঠিক কি ?

মন্মথদা (ব্যানার্জ্জী)—আমি দেখেছি যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি ঠিকভাবে না করলে, কোন কাজ ভাল ক'রে করা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অচ্যুত নিষ্ঠা না থাকলে প্রবৃত্তি মানুষকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। প্রবৃত্তির সঙ্গে জড়ান থাকে হীনম্মন্য অহং। তা' যে কাকে কখন কোন্ দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তার ঠিক নেই। কিন্তু নিষ্ঠা থাকলে তার সার্থক বিন্যাস হ'তে থাকে, তা' ধীরে-ধীরে সুনিয়ন্ত্রিত হ'তে থাকে। নীত না হ'লে কেউ নেতা হ'তে পারে না। কেষ্টঠাকুর স্বয়ং ভগবান, তিনিও গুরুগ্রহণ করেছিলেন। আদর্শকে না ধরে সত্যিকার বড় কাজ কৃতকার্য্যতার সঙ্গে করা মুশকিল। অশোক গুরুনিষ্ঠ হয়ে কি বিরাট কাজ

করেছিল তা'ত কারও অজানা নয়। অটল বিশ্বাস এবং নিষ্ঠা এই আমাদের সম্পদ। এই সম্পদ থাকলে মানুষ বাইরের সবকিছুকে balanced way-তে (সাম্যসঙ্গতভাবে) utilise (সদ্‌ব্যবহার) করতে পারে। Environment (পরিবেশ) সুখের সাড়াও যেমন দেয়, দুঃখেরও তেমনি দেয়। নিষ্ঠা থাকলে দুটোই adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারে। নচেৎ সাম্য বজায় রেখে চ'লে বড় হওয়া ঘ'টে ওঠে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর উত্তর দিকের বারান্দায় উপবিষ্ট। শরৎদা প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—খুব ভাল ভাল কর্ম্মী সংগ্রহ করা চাই। ভাল কর্ম্মীর কতকগুলি চরিত্রগত লক্ষণ আছে। প্রথম ও প্রধান হ'ল, অচ্যুত নিষ্ঠা, ঐটেই মূল। ওইটেই মানুষকে concentric (সুকেন্দ্রিক) ক'রে রাখে।

দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে উপস্থিত বুদ্ধি। তাও দেখতে হয়, যে তা' কতটা ক্ষিপ্র বা বিলম্বিত। ক্ষিপ্র হ'লেও দেখতে হয় সেই বুদ্ধি অনুযায়ী সংকল্প নিয়ে কাজে লেগে থাকতে পারে কিনা। তা' পারলে তারা কিন্তু পয়লা নম্বরের লোক। যাদের উপস্থিত বুদ্ধি একটু বিলম্বিত, তাদের যদি সুষ্ঠু ধারণা থাকে এবং সেই অনুযায়ী চলতে চেষ্টা করে তারা কিছুটা ন্যূন হ'লেও ভাল।

তৃতীয়তঃ দেখতে হবে, বুদ্ধিমান কেমন—কোন একটা ব্যাপারকে খুঁটিনাটি সহ সব দিক দিয়ে ধারণা করতে পারে কেমন এবং সেই সঙ্গে কর্ম্মোৎসাহ আছে কিনা।

চতুর্থ যা দেখতে হবে, তা' হ'ল—তার প্রকৃতি নির্বিরোধ কিনা। যে যত বিরোধ-প্রবণ সে তত রাগী হয়, মানুষকে বোঝাতে পারেও তত কম। তাদের হীনম্মন্য অহং এমনভাবে মাথা তোলা দিয়ে থাকে যে, যে-কাজ তাড়াতাড়ি হাসিল করা সম্ভব, তাকেই তারা একটুতেই ভণ্ডুল ক'রে তোলে। নির্বিরোধ ভাব এবং উচ্চেতনী প্রেরণা নিয়ে যারা পরিবেশকে নিয়ে অক্লান্তভাবে চলে তারা কিন্তু পয়লা নম্বরের। আবার, যারা কিছুটা দ্বন্দ্বপ্রবণ হওয়া সত্ত্বেও বিনীত, আত্মবিশ্লেষণ-পরায়ণ এবং অপরকে উন্নত করতে প্রয়াসশীল তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর হ'লেও ভাল।

পঞ্চম হ'ল—সহ্য ধৈর্য্যশীল, অধ্যবসায় এবং কষ্টসহিষ্ণুতা কেমনতর। দুঃখ—ধান্ধায় ঘাবড়ে যায়, না নিষ্পাদনী উৎসাহ নিয়ে চলে, যার দরুন দুঃখ-কষ্টকে আমল দেয় কম।

ষষ্ঠ হ'ল—অর্জ্জন পটুতা। তার মানে যা' করতে যা' যা' লাগে তা' কাউকে ব্যতিব্যস্ত না ক'রে বিহিত উদ্দীপনা সহকারে সংগ্রহ করতে পারা—সময় মাফিক, সুযোগ ও সুবিধাকে না হারিয়ে। এটা ভাল স্বভাব।

কেউ যদি ভাল চলনদুরস্তও হয়, কিন্তু আত্মস্বার্থী দাঁও মারার বুদ্ধি ছাড়তে না পারে, তার মুখপাত যতই সুন্দর হোক না কেন, বুঝতে হবে তার অন্তর্নিহিত সত্তা প্রবৃত্তি-অভিভূত। সে কাজ নষ্ট করবেই। তাই বাজিয়ে নেওয়া ভাল।

তারপর দেখতে হবে তাদের সাধারণ শিক্ষা কেমনতর, এম-এ, এম-এসসি হ'লে

ভাল হয়। সেই সঙ্গে লেখার ক্ষমতা, বলার ক্ষমতা এবং মনোমুগ্ধকর অভিব্যক্তি যাদের যত বেশী থাকে তারা তত উপযুক্ত। এগুলি হ'ল pilot man (চালক) যারা তাদের qualification (গুণ)। এইসব গুণ থাকলেই মানুষ বহু রকম দ্বন্দ্বের ভিতর পড়েও সবটাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে পারে।

শরৎদা—আপনি যেমন চান, তেমন মানুষ পাওয়াই তো দুষ্কর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমনি খুব কঠিন নয়, কিন্তু obsession-এর (অভিভূতির) দরুন বহু মানুষ পারে না। আবার, অনেকের আছে চাকর মনোবৃত্তি। একটা বই লিখবে, গোড়াতেই এসে হয়ত বলল—"কত টাকা দেবেন?" তাহ'লে তাকে দিয়ে হবে না জানবেন। কিন্তু যে টাকার কথা না ভেবে কাজে লেগে যায়, সে কিন্তু টাকাও পায় এবং তার লেখাও খুলে যায়। তার ভাষার ভিতর দিয়ে জীবন বেরিয়ে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার প্রাক্কালে মাঠে তক্তপোষে উপবিষ্ট। ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে। তিনি খালিগায়ে বসে আছেন এবং একটু একটু হাসছেন। কখনও বা একটু গম্ভীর থাকছেন।

শরৎদা (হালদার), চুনীদা (রায়চৌধুরী), কান্তিদা (বিশ্বাস) প্রভৃতি কাছে আছেন।

পূজনীয় খেপুদা এবং সেই সঙ্গে সুরেনদা (বিশ্বাস), পাঁচুদা (চক্রবর্ত্তী), কিশোরীদা (চৌধুরী) আজ দুপুরে কলকাতায় রওনা হ'য়ে গেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আজ ওরা চলে গেছে, ভাল লাগছে না।

চুনীদা—সকলে থাকলে ভাল লাগে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ।

একটু পরে বললেন—জীবনে অনেক কষ্ট। কান্তিদা যাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করে, পট ক'রে হ্যাঁ বলতে ইচ্ছা করে না, অথচ না-ও বলা যায় না। পড়ে গেছি বেকায়দায়।

এরপর বিষ্টুদা (ব্যানাজ্জী) ও মন্মথদা (ব্যানাজ্জী) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে কর্ম্মী সম্বন্ধে প্রদত্ত নির্দ্দেশগুলি পড়ে শোনাতে বললেন।

পড়া হ'লো।

এরপর কোন একটা প্রসঙ্গে অদ্বৈতভাব সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অদ্বৈত বল আর যাই বল, অচ্যুত গুরুনিষ্ঠার মত জিনিস নেই। "অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু নাদ্বৈতং গুরুণা সহ"। বোঁটাটা ছিঁড়ে ফেললে ফলটা গাছের সঙ্গে থাকে কি ক'রে? গুরুনিষ্ঠাকে আশ্রয় করেই যা' কিছু গজিয়ে ওঠে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—লেখাপড়া, আত্মশুদ্ধি, ধান-পান ইত্যাদির জন্য যেমন চাষ লাগে, ভাল মানুষের জন্মের জন্য তেমনি চাষ অর্থাৎ সক্রিয় বিধি ব্যবস্থা লাগে। সাধারণ মানুষ মনে করে, যে এর বিশেষ প্রয়োজন নেই। কিন্তু এটা একটা মস্ত বড়

ভুল। মানুষ প্রবৃত্তির ঘোরে চলে, রাশ টানতে জানে না। কোথায় রাশ টানতে হয় বোঝে না। গুরুর সঙ্গে যুক্ত না হ'লে, এ বুদ্ধি ফোটে না।

উদার নীতি সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উদারতা মানে বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জ্জন দিয়ে চলা নয়। উদার মানে উর্দ্ধে গমন, অর্থাৎ আদর্শের পথে চলা। মুক্তমনা হ'য়েও আদর্শে চলৎশীল থাকা এবং সবকিছুকে আদর্শের অনুকূল ক'রে তোলা এই হ'ল ঔদার্য্য। মন খোলা না থাকলে, কী উদ্দেশ্যে কে কী করছে, তা' বোঝা যায় না। কেষ্টঠাকুরের মন খুব খোলা ছিল। তাই কৌরবদের সঙ্গে মিলনের কত চেষ্টা করেছেন। যদিও তিনি জানতেন, যে তাঁর চেষ্টা ফলবতী নাও হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে বড়াল-বাংলোয় এসে বিষ্টুদাকে বললেন—প্রত্যেকটি চলন, বলন, হাসি এমন ঝলকওয়ালা হওয়া চাই, যে মানুষ যেন শ্রদ্ধা না ক'রে পারে না। সবচেয়ে বড় শত্রুও মনে করবে—শ্রদ্ধা না করলে ঠ'কে যাব। চরিত্রের মধ্যে একটা চৌম্বক আকর্ষণ থাকা চাই। আমরা শুধু নীতি-শিক্ষক হ'লে চলবে না। ঠাকুর আমাদের জীবনে জ্যান্ত হ'য়ে থাকা চাই।

বিষ্টুদা নাম-ধ্যান সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাধারণতঃ রোজ দুবার আসন ক'রে ব'সে যতটা পারা যায় নাম-ধ্যান করতে হয়। তা'ছাড়া সবসময় সব কাজের মধ্যে নাম করতে হয়, যেমন শিস দিতে-দিতে, গান করতে-করতে কাজ করে। নাম করলে তজ্জাতীয় কম্পনের সৃষ্টি হয় কোষের ভিতর এবং আমাদের মনও ঐ স্তরে উন্নীত হ'তে থাকে। অনুরাগের সঙ্গে নাম করতে হয়। নাম-ধ্যান ঠিক মত করলে মনের চাঞ্চল্য ক'মে যায়।

বিষ্টুদা—সকালে উঠতে দেরী হয়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভোরে ওঠার অভ্যাস ক'রে ফেলতে হয়। সমস্ত কাজগুলি এমন ভাবে বিন্যস্ত ক'রে ফেলতে হয়, যাতে সময়মত শোওয়া যায় এবং ভোর বেলায় ওঠা যায়। আবার, এমন হয় অনেক রাত্রে শুয়েও ঠিক সময় ওঠা যায়।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি মুখ্যু মানুষ, বই-টই কিছু পড়িনি, শাস্ত্র-টাস্ত্র কিছু জানি না, যা' জানি তাই কই।

হরিদাসদা (সিংহ)—সবার মুখে তো শুনি আপনার কথাগুলি শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের সঙ্গে মেলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইটেই একটা miracle (অলৌকিক ব্যাপার) ব'লে মনে হয়।

৬ই আষাঢ় ১৩৫৬, সোমবার (ইং ২০। ৬। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। যতিবৃন্দ এবং চুনীদা (রায়-চৌধুরী) প্রভৃতি উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকে বললেন—দেখেন আমি বই পড়লাম না, স্কুলে ভাল ছাত্র ছিলাম না। লেখাপড়ার সঙ্গে, মা সরস্বতীর সঙ্গে কেমন যেন দ্বন্দ্ব বেধে গেল ছেলেবেলাতেই। মানুষ গীতাখানা পড়ে, তাও পড়লাম না। কুমারনাথের গীতাটা একটু পড়েছিলাম—দেখবার জন্য। বিদ্যার বহর তো ওই। রামকৃষ্ণ কথামৃত বা বিবেকানন্দের বইটইও পড়লাম না। কোন-কিছু জানতাম না তেমন, প্রয়োজনবোধও ছিল না। নিজের মতো করতাম। যা' পেলাম তা'র যে কোন দাম ছিল তা' বুঝতাম না। প্রথম ঠিক পেলাম হরিতকী বাগানে যখন গেলাম। লোকে বলত—ওমুকের সঙ্গে মেলে, তমুক এই বলেন, ইত্যাদি। তখন অবাক হ'য়ে যেতাম। তবে অনেকে বইটই প'ড়ে যা' অর্থ করত, তা' ঠিক ব'লে মনে হ'ত না। বাস্তবের সঙ্গে মিলত না। হঠাৎ একদিন একটা শব্দের ধাতুগত অর্থ একজন বলল। তাতে দেখলাম, বাস্তবের সঙ্গে ধারণাটা মেলে। সেই থেকে ধাতুগত অর্থ দেখা শুরু করলাম।

শরৎদা—তাঁর কথা তিনি না বোঝালে বোঝা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, ধারণাটা অনেকদিন আগে থেকেই বিকৃত হ'য়ে গেছে। বহু ভুল ধারণা চারিয়ে গেছে।

চুনীদা—বহু জিনিস ভোলান লাগবে, আর সেইটেই কঠিন কাজ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই টীকা আদৌও যদি না থাকত, তাহ'লে ভাল ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—কালী মানে, কাল-বারিণী। গমনাগমনের ধারা যিনি নিঃশেষ করেন, কালের হাত থেকে অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় যাঁকে ধ'রে, তিনিই কালী।

কুলকুণ্ডলিনী-জাগরণ সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অনেক সময় নাম করতে-করতে থার্ম্মোমিটারের যেমন পারা ওঠানামা করে, মেরুদণ্ডের ভিতরকার তরল পদার্থের ওঠানামা তেমনি বোধ করা যায়। তখন সমস্ত সত্তার মধ্যে একটা সুখকর অনুভূতি ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে। একে বলে কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ। ওর বিভিন্ন স্তর আছে। অনেকে ওর খানিকটা হ'লেই তা' নিয়ে দুনিয়া ফাটিয়ে দেয়। ওর সঙ্গে যদি একটা blessed conception (সার্থক ধারণা) থাকে, সেই urge (আকূতি) নিয়ে মহাপুরুষের মত কাজ ক'রে যান।

ননীদা—নাম করতে-করতে অনেক সময় ঘুম-ঘুম পায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার অনেক সময় উল্টোও হয়, এক বোতল মদ খাওয়ার পর যেমন চাঙ্গা লাগে, তেমনি চাঙ্গা বোধ হয়।

হরেনদা—নিরখ-পরখ যে আপনি করতে বলেন, কিন্তু বড়জোর ছেলেবেলার স্মৃতি পর্য্যন্ত না হয় গেলাম, তারপর তো অন্ধকার। অথচ গোড়া ধরতে না পারলে তো নিরখ-পরখ করা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুঁটিনাটি সব ধরা চাই। যতদূর ধরলে, ততদূর adjust (নিয়ন্ত্রণ)

করতে থাকলে। এই ভাবে চলতে থাকলে তারও পিছনে যেটা আছে, সেটা ধরার ক্ষমতা জন্মে।

শরৎদা—হরেনদা কাল বলছিলেন—নিরখ-পরখ করা মানে, নিজের খারাপটা ভাবা। খারাপটা ভাবতে-ভাবতে তো খারাপ হ'য়ে যাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু খারাপটা ভাবতে থাকলে অমন হ'তে পারে। কিন্তু খারাপটা ধ'রে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে সচেষ্ট থাকলে তা' হয় না।

হরেনদা—নিরখ-পরখ করতে গেলে তো দেখি, ভাল ব'লে যা' মনে করি তাও ভাল নয়, সেটাও মূলতঃ খারাপ।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—তোর ঘাটে হাত পড়েছে বোধ হয়। এটা একটা practical (বাস্তব) কথা বলেছিস্। প্রায়ই এ রকম হয়। ভাল ব'লে মানুষ যা' মনে করে, তা' হয়ত প্রকৃতপক্ষে খারাপ। নিজে দেখতে চেষ্টা করছিস ব'লে, অমন খাঁটি কথাটা বলতে পেরেছিস। নচেৎ হয়তো philosophy (দার্শনিকতা) আসত, আদত কথা বেরুত না।

হরেনদা—আত্মবিশ্লেষণ খুব ক'রেও তো দেখা যায়—বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হ'লে বিচার-বুদ্ধি ধোপে টেকে না, পা পিছলে আলুর দম হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন্দটা ধরা পড়তে-পড়তে, মন্দটার নিরসন করা ও ভালটা বাড়িয়ে তোলবার ইচ্ছা হয়। নিজেকে পড়তে-পড়তে, ধরতে-ধরতে, দুনিয়ার সবাইকে পড়া যায়, ধরা যায়। চোখ দেখলেই মানুষকে চেনা যায়।

হরেনদা—কাল আমাদের মধ্যে কথা হচ্ছিল—ইষ্টপ্রাণ বিবাহিত জীবন থেকে ইষ্টপ্রাণ অবিবাহিত জীবন ভাল কি না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার কোন কথা নেই। বিয়ে ক'রেও হ'তে পারে, তবে বিয়ে না করলে পিছটান থাকে না সেই যা' সুবিধা।

হরেনদা—স্ত্রী যদি সহায়ক হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো ভালই। কিন্তু সহায়ক না হ'লে তার জন্য তোমাকে খানিকটা বেগ পোহাতে হবে।

হরেনদা—স্ত্রী যদি ইষ্টকাজে সহায়তা করে, সে-ক্ষেত্রে বিবাহিত জীবন তো অবিবাহিত জীবন থেকে ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—থেকে ব'লো না। এও ভাল, ও-ও ভাল। দুই-ই ভাল হ'তে পারে। এক-একজনের এক-এক বৈশিষ্ট্য।

যতীনদা—যাজ্ঞবল্ক্য ইত্যাদির যেমন মর্য্যাদা, অবিবাহিত ঋষিদের তেমন মর্য্যাদা কি দেখা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুকদেব, নারদ আরও কত আছেন। কে বেশী ভাল, কে কম ভাল তা' কথা নয়। যে ভাল সে ভাল। অবিবাহিত অবস্থায় একটা 'যদি', বিবাহিত অবস্থায় দু'টো 'যদি'। অবিবাহিত অবস্থায় সে নিজে যদি ভাল থাকে, তাহ'লে হ'ল।

বিবাহিত অবস্থায় সে নিজে 'যদি' ভাল ভাবে চলে, সেই সঙ্গে তার স্ত্রীও 'যদি' ইষ্টমুখী পরিপোষণী হ'য়ে চলে, তবে হয়। এখানে দু'টো 'যদি'। অবিবাহিত জীবন একটা সার্ব্বজনীন আদর্শ হ'তে পারে না। অবিবাহিত যারা থাকবে, তারা বরং চেষ্টা করবে, সমাজে বিবাহিত যারা, তারা যাতে আদর্শ দাম্পত্য-জীবন যাপন করতে পারে।

প্রফুল্ল—মানুষের ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি মুক্তির জন্য পরিবেশের উন্নতি, সংগঠন-কর্ম্ম ইত্যাদি বড়-বড় কাজের মধ্যে যাওয়ার দরকার কি? তা' না ক'রেও তো এটা হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তিগুলি ঠিক-ঠিক ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্ন হ'লে, তদ্বার নিবৃত্তি হ'লে, তখনই মানুষ মুক্তভাবে ভাল ক'রে কাজ করতে পারে। কেষ্টঠাকুর যেমন বলেছেন—ত্রিজগতে আমার কিছু করবার নেই, পাওয়ারও নেই, তবু আমি করি। তাঁর প্রতি অনুরাগ হ'লে লোকলিপ্সা বেড়ে যায়, সকলের মঙ্গল নিজের মঙ্গল ব'লে মনে করে। পারিপার্শ্বিকের কথা আমি গোড়া থেকেই বলেছি। কেমন জানি এসে গেছে। ভেবেচিন্তে করিনি। ধর্ম্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়েও বলেছি—যেনাত্ম-নস্তথান্যেষাং জীবনং বর্দ্ধনঞ্চাপি ধ্রিয়তে স ধর্ম্মঃ। পরিবেশ বাদ দিয়ে করলে, টেনে হুড়হুড় ক'রে নামাবে। নিজের কাছে মুক্ত হ'লেও, দুনিয়ার কাছে কিন্তু তুমি তখনও বদ্ধ। দুনিয়ার পরীক্ষায় তুমি কিন্তু পাস হওনি। পরিবেশসুদ্ধ চলার কথা কেমন ক'রে জানি, স্বাভাবিকভাবে এসে গেছে। এখন তো যুক্তি-বুদ্ধির কথা বলছি, কিন্তু কিভাবে যে কথাগুলি গোড়ায় বেরুল তা' বলতে পারি না। আমার মনে হয়, ইষ্টানুরাগ যত বাড়ে লোকলিপ্সাও তত বাড়ে। পরিবেশসহ মুক্তি না হ'লে, মুক্তি সম্পূর্ণ হয় না।

যতীনদা—কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ভালটায় আমার ভাল হ'ল না, যত সময় আপনার ভাল না হ'চ্ছে। এই আমি যে জিনিসের পরিণাম, আপনিও তারই আর এক পরিণাম। ও-আমির কি হ'ল? ঐ-আমি তো কষ্ট পাচ্ছি।

শরৎদা—আমি খেলাম, আপনি অভুক্ত—এই রকম একটা বোধ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা sympathetic consideration (সহানুভূতিসূচক বিবেচনা) থেকে বলছেন। আমার কথা কিন্তু বুদ্ধি করা নয়। নিজে ঐরূপে কষ্ট পাচ্ছি বোধ হয়।

যতীনদা—গাছের ডাল ভাঙ্গলে আপনি নিজের হাড় ভাঙ্গার মতো কষ্ট বোধ করতেন। আবার ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারার পর আপনার পিঠে দাগ প'ড়ে গেল, হ্যাঁদ ঘটনা তো শুনেছি।

স্মৃতি পশ্রীঠাকুর—এখনও আমি ঐ ধরনের বোধ করি, তবে বোধটা এখন খানিকটা তো নিরঙ্কুমত।

শ্রীশ্রীতীনদা—লোকলিপ্সা কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজেই যেন কষ্ট পাই। কারও খারাপ দেখলে বোধ করি, যেন ঐ ভাবে ভুগছি নিজে। মানুষের ভাল দেখলে ভাল লাগে, খারাপ দেখলে শঙ্কিত হ'য়ে পড়ি। তাইতো আপনাদের পিছনে-পিছনে ছুটি। আপনাদের জন্য কি কম কষ্ট পাই? এ কষ্ট বাড়ে বই কমে না। আগে মা ছিলেন, তাঁর আঁচল-ধরা হ'য়ে ছিলাম। একরকম ছিলাম ভাল, এখন কেবল কষ্ট। আমার কথা আমিই ধারণা করি, আমিই টের পাই। আর কেউ বুঝতে পারে কিনা সন্দেহ।

হরেনদা—অশ্বিনীবাবু বলেছিলেন—যে যত sympathetic and sweet (সহানুভূতিপ্রবণ এবং মিষ্ট), সে তত বড়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার যে কোন sympathy (সহানুভূতি) আছে, তা' নয়। বেঘোরে প'ড়ে গেছি। নিজে অসুস্থ হ'য়ে পড়লে যেমন out of sympathy (সহানুভূতি বশে) করি না, এমনি অস্থির হ'য়ে পড়ি সুস্থ হ'য়ে ওঠার জন্য, প্রত্যেকের বেলাতেই তাই হয়। মানুষ দঃখ পায়, মরে—মনে হয় আমি কত কষ্ট পাচ্ছি, কত মরছি। মা ম্রিয়স্ব, মা জহি, শক্যতে চেৎ মৃত্যুমবলোপয়—কথা এইভাবে বেরিয়ে এসেছে। ঐ কথা থেকে বুঝতে পারে লোকে—কিসের থেকে, কেন, কেমন ক'রে ও কথা আসে।

হরেনদা—সুখ কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শাণ্ডিল্যের ভক্তি সূত্রে আছে—'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।' তাঁতে নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ অনুরাগ থাকলে, তাকে বলে ভক্তি। ভক্তি থাকলে, তা' থেকে আসে সুখ-শান্তি। সুখ ছিল মা থাকতে, একটা মত্ততা ছিল, এখন মত্ততা নেই, সত্ত্বতা রয়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট। বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), দক্ষিণাদা (সেনগপ্ত), মণিদা (ভাদুড়ী), উমাশংকরদা (চরণ) প্রভৃতি তাঁর শ্রীচরণতলে উপস্থিত।

উমাশংকরদা জিজ্ঞাসা করলেন—প্ল্যানচেট জিনিসটা কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি দেখেছিলাম অনেকদিন আগে, কিন্তু মনে হয় মাথার ছাপগুলি ধরা পড়ে। তা'ছাড়া ঐ জিনিসের নির্ভরযোগ্য কোন সাক্ষী মেলে না।

উমাশংকরদা—কিন্তু উত্তর কখনও কখনও নির্ভুল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কখনও-কখনও হয়, আবার কখনও কখনও হয় না।—গভীর ধ্যানের সময়, অনেক সময় বহু ব্যাপার সিনেমার মতো ছবি ও কথাসহ হুবহু ধরা পড়ে।

আজ স্পেনসারদার জন্মদিন। সন্ধ্যার পর স্পেনসারদা, মিসেস স্পেনসার, আউটারব্রীজ ও হাউজারম্যানদা শ্রীশ্রীবড়মার কাছে পায়েস ও রাজভোগ খেয়ে যতি-আশ্রমের দিকে যাচ্ছিলেন। যাওয়ার সময় আউটারব্রীজ একটা গর্ত্তে প'ড়ে যান। তখনই প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—গর্ত্তটা তাড়াতাড়ি বুজিয়ে ফেলা লাগে।

হরেনদা বললেন—আর-একটা জায়গায় একটা কুয়োর মত গর্ত্ত খুব বিপজ্জনক অবস্থায় আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাল ভাল ক'রে বেড়া দিয়ে দিও। নিজের স্বার্থেই এটা করা লাগে। মনে করতে হয়, তোমার ছেলেটা, মেয়েটা বা গরুটা প'ড়ে যেতে পারে। প্যারীর মেয়েকে কতবার দেখেছি ঐদিকে যায়।

৭ই আষাঢ় ১৩৫৬, মঙ্গলবার (ইং ২১। ৬। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট। যতিবৃন্দ আছেন। ভাগলপুর থেকে এক দাদা এসেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—মানুষের পরের স্তর কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের পর শ্রেষ্ঠতর মানুষ। ভগবান মানুষ-দেহের মধ্যেই আরো-আরো বিবর্ত্তিত হ'য়ে ওঠেন। তাঁকে অনুসরণ করতে গিয়ে মানুষ উন্নততর হয় ও তার বোধ বাড়ে। একটা গরু বা ছাগল ঠিক আমাদেরই মতো। তারও ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, মৈথুন, অস্মিতা, সুখ, দুঃখ-বোধ সবকিছু আছে। তার প্রবৃত্তির দরুন তার ঐ চেহারা। তবে তার বিবর্ত্তন মানুষের তুলনায় অনেক সীমিত।

উক্ত দাদা—পূর্ব্ব জন্মের কথা জানা যায় কী ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচার্য্যকে গ্রহণ কর। কর, হও, পাও।

উক্ত দাদা—একই জিনিস এক সময় পাপ, এক সময় পুণ্য হ'য়ে দাঁড়ায়, এর মানদণ্ড কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা মানুষের বাঁচা-বাড়াকে ক্ষুণ্ণ করে, তা' থেকে বঞ্চিত করে, তাই পাপ। সপারিপার্শ্বিক নিজের বাঁচাবাড়া যাতে উন্নীত হয়, তাই পুণ্য।

ভগবান-সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি সব কিছুর মূল উপাদান। তুমি, আমি, সবকিছু তাঁরই পরিণাম। গুড়কে যদি মূল কারণ হিসাবে ধরা যায়, তার থেকে মিছরি, কদমা, বাতাসা যাই হোক, সবটার মধ্যে গুড় কিন্তু থাকেই। পুরুষ ও প্রকৃতির আকর্ষণ, বিকর্ষণ ও সংঘাতের ভিতর-দিয়ে যা'-কিছু বিবর্ত্তিত হ'য়ে উঠেছে। নানা অবস্থার ভিতর-দিয়ে তা' রকমারি পরিণাম নিয়েছে। যে ঐ পরিণাম নিল, সে কিন্তু সব কিছু পরিণামের মধ্যেই থেকে গেল। পরিণামগুলি আবার নানাভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে। একটার পর একটা বেড়ে চলে। পরিণামগুলি যদি বিকৃত চলনে চলে, তবে তার ফল যা' হওয়ার তা' হ'তে বাধ্য। আবার, ঠিক পথে চললে তার ফলও অবধারিত।

উক্ত দাদা—বাংলা ও পাঞ্জাবে কত লোক মারা গেল। ভগবানের রাজ্যে এটা হ'ল কিভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন ইতিমধ্যে কত সাপ মরল ইউ পি-তে, তার মানে এমন একটা কারণ ঘটেছিল যাতে সাপ মরে। এত লোক যে মরল, তার পিছনে একটা কারণ আছে তো, যার দরুন মৃত্যুটা হ'ল।

উক্ত দাদা—এটা কি নিয়তি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা প্রতিরোধ করার মত ক্ষমতা আমাদের রইল না, তাই ব্যাপারটা ঘটল।

প্রশ্ন—অল্প কয়েকজন নেতা ভারত বিভাগে রাজী হওয়ায় এটা হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কয়েকজন নেতার জন্য যদি এটা হ'য়ে থাকে, আমরা তাদের প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে ক্ষমতা দিয়েছি ব'লে তা'রা এটা করেছে। আমরা তাদের ইচ্ছার কাছে সবদিক দিয়ে নতি স্বীকার করলাম। তার মানে তাদের ভুল ও শুদ্ধের কাছে সমভাবে আত্মসমর্পণ করলাম। তাদের সিদ্ধান্ত শুদ্ধ হ'লে, কল্যাণকর হ'লে আমরা তা' উপভোগ করতাম। তাই আমরাই দায়ী।

উক্ত দাদা—আমার এক পিসিমা যেমন ক'রে স্বামী-পুত্রাদি হারালেন, তাতে মনে হয় ভগবান বড় নিষ্ঠুর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান যখন জীবন-স্বরূপ, তিনি কখনও নিষ্ঠুর হ'তে পারেন না। পিসিমাই হোক আর যেই হ'ই, এমন ক'রে এসেছি, যার দরুন অমন হ'ল। তবু তিনি নিশ্চিন্ত ন'ন। নূতন ক'রে সৃষ্টি ক'রে তিনি আবার অন্যভাবে রক্ষা করতে চেষ্টা করেন। আমরা সামান্য একটু দেখে অভিভূত হ'য়ে পড়ি। কিন্তু কেন, কেমনভাবে কী হ'ল, তার একটা বিধি আছে তো! ভগবানের আর এক নাম কয় বিধি। তুমি যেমন পাঁচ বছর বয়সের সময় জানতে না ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কথা, কিন্তু তোমার বৈশিষ্ট্যমাফিক চলনে চ'লে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছ। সবাই কিন্তু তা' হয় না। তুমি যা' হয়েছ তার পিছনে কার্য্য-কারণ আছে। বিধিকে এড়াতে পার না। যেমন, রসগোল্লা বেশী খেয়ে পেট খারাপ হ'ল। সেখানে রসগোল্লার দোষ নয়, বেশী খেলেই অমন হয়। আমরা নিজেদের কৃষ্টির প্রতি উদাসীন হ'য়ে বহুদিন অন্ধ হ'য়ে আছি। এর দরুন আমরা নানাভাবে বিপন্ন হচ্ছি।

কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কয়েকজন হিন্দী-জানা লোক যদি কাছে থেকে হিন্দীটিন্দী বলে, তেমন একটা atmosphere (আবহাওয়া) যদি হয়, তবে হয়তো সহজে হিন্দী বলা সম্ভব হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর মাঠে ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট। ভক্তবৃন্দ কাছে আছেন।

নগেনদা (বসু) শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে দশটি টাকা চাইলেন।

হরিদাসদা (সিংহ) বললেন—আর পাঁচজনের কাছে চাইলেই তো পারেন।

নগেনদা—আমি ভিক্ষা করতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভিক্ষা করতে যে পারেন না বলেন, ওটাও একটা অহংকার। নিজে যদি মানুষের জন্য করা যায়, তবে মানুষের কাছে চাইতেও গ্লানি বোধ হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর আপন মনে বললেন—'ওরা চাহিতে জানে না দয়াময়।'

নগেনদা বললেন—আমি এ বছর এখনও আম খাইনি। কাল আপনাকে আম-দুধ দিয়ে আজ খেলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাকে না দিয়ে আর কাউকে যদি দিতেন, ভাল ছিল। আমাকে দেওয়ার পিছনে প্রত্যাশা ছিল—আমাকে দিলে আপনি আম খেতে পারবেন।

নগেনদা—আপনাকে না দিলে ভাল লাগে না।

কথায়-কথায় নগেনদা বললেন—আমি অনেককে পড়াই, কিন্তু টাকা দেওয়ার লোক কম। অনেকে ফাঁকি দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনাকে ফাঁকি দিয়েছে যে বলেন, কিন্তু আপনার জীবন যে একেবারে ফাঁকিশূন্য ছিল তা' কি বলতে পারেন? তবে আমি কেন মানুষের প্রতি ও ভগবানের প্রতি এতখানি অকৃতজ্ঞ হব যে বলব—আমাকে তারা দেয়নি। আমি যদি কাউকে বলি যে দশটা টাকা দাও নগেনদাকে। সে তো পরমপিতারই দান আপনাকে। তা' না হ'লে আমি কোন্ মারকুট যে আমার কথায় মানুষ আপনাকে দেয়? আপনি চাইলেও হয়তো ঐভাবে দেয়, যদি আবার আপনি অপরের জন্য মুক্তহস্ত হন। আপনি তেমনভাবে exercise (অনুশীলন) করলে, আমার চাইতে হয়তো ভাল পারেন।

শরৎদা—প্রত্যাশারহিত হ'য়ে যার দেওয়া যত বেশী, অপ্রত্যাশিতভাবে তার পাওয়াও তত বেশী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অমনি দান করলে হবে না, প্রীতিসম্বেগে দেওয়া চাই।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

প্রত্যাশারহিত প্রীতি-সম্বেগে
দরদীহস্তে মানুষকে দাও—যেমন পার,
এই অনুকম্পী দানই
জীবন্ত হ'য়ে তোমার দৈন্যকে
দণ্ডিত করতে কার্পণ্য করবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার প্রাক্কালে মাঠে তক্তপোষে ব'সে উপস্থিত ভক্তদের বললেন—বাপ-মা যতদিন বেঁচে থাকে, ততদিন মানুষের ফূর্তি। আর, যার গুরু থাকে তারও তেমনি ফূর্তি। আবার, তেমন গুরু হওয়া চাই।

খানিকটা পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—লোক দেখলেই আমার মনে অনেক কথা ভেসে ওঠে।

শরৎদা—কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখেই মনে হয়, এ এই করতে পারে, সে তা' করতে পারে, তার প্রকৃতি কী, সে কী করতে পারে—সবই ভেসে ওঠে। সবই বোঝা যায়, কিন্তু তা' বুঝেও উপায় কী? ভাবি, সে তো ঐরকম করবেই। কিন্তু আমার তো তাকে ছাড়বার উপায় নেই। বরং তাকে tackle (চালনা) করা যায় কিভাবে তাই খতাই। দেখেন না, কতজন কতরকম করে, সবই তো বুঝি, কিন্তু উপায় কী? কাউকে ছাড়ার জো নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—কতকগুলি দেওয়ায় সুখ আছে, কতকগুলি দেওয়ায় সুখ নেই মোটেই। কারণ, তা' আদৌ উপচয়ী হবে না তার পক্ষে। তার ability (সামর্থ্য) যদি বাড়ত, তাহ'লেও একটু তৃপ্তি ছিল। কিছু লোক আছে, যারা সবকিছুই এখান থেকে পেতে চায়, কিন্তু নিজের জন্য বা এখানকার জন্য কিছুই করবে না। আপনারও satisfaction (তৃপ্তি) নেই, সেও ever dissatisfied (সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট)।

কিরণদা (মুখার্জ্জী)—এর সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেশের অবস্থা যেমন তাতে বাড়বে বই কী? কিন্তু তাতে তুমিও রেহাই পাবে না, আমিও রেহাই পাব না। সে যদি বিপন্ন হয়, তাহ'লে তুমিও বিপন্ন হ'লে। তবে আমার সাহায্যে একজনের ability (সামর্থ্য) যদি বাড়ে, তাতে একটা আত্মপ্রসাদ হয়, যে সে আবার পাঁচজনের পক্ষেও হয়তো helpful (সহায়ক) হ'য়ে উঠতে পারবে।

সংগ্রহ-সম্পর্কে কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোমার ঘরে হয়তো এক সের চাল আছে। জোর ক'রে কায়দা ক'রে তাই হয়তো একজনের জন্যে আদায় ক'রে নিলাম। কিন্তু তোমার ছেলেপেলেদের কথা ভাবলাম না। বরং লোকের কাছে বললাম—মানুষটা বেকুব, তাই কায়দা ক'রে আদায় করেছি—এমনতর সংগ্রহ ও মনোভাব খুব বিশ্রী।

প্রফুল্ল—আপনি টাকা চাইলে মানুষের কাছ থেকে নিই, অথচ তাদের যদি পূরণ না করি, তবে তো দোষ হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' বইকী! আমি যেভাবে করি, সেই ভাবে ক'রে দেখ—পাওয়া তোমাদের অফুরন্ত হবে। মানুষের পকেটই হল আমার ব্যাঙ্ক। মানুষের জীবনই আমার ঐশ্বর্য্য। মানুষই আমার সম্পদ। আমার সম্পদ যদি সুস্থ ও পুষ্ট না থাকে, তবে আমার চলাই তো রুদ্ধ হ'য়ে যাবে। কারও কাছ থেকে সামান্য কিছু নিলেও, আমার সব সময় বুদ্ধি থাকে—কত ভাবে তার পাওয়াটা বেড়ে যায়। সব সময় চেষ্টা ক'রো—যাতে তুমি উন্নতিমুখর হ'য়ে চলতে পার প্রতি পদক্ষেপে। তোমার ability (সামর্থ্য) যাতে আরও আরও বেড়ে চলে। কৃষ্টিবান্ধব ইত্যাদি থেকে যাতে স্খলিত না হও সে-চেষ্টাও ক'রো। তোমার যোগ্যতা যত বাড়বে, ততই আমি খুশী হব।

প্রফুল্ল—আমি তো চিঠিপত্র লিখি, আমি তার ভিতর-দিয়ে কী করতে পারি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষকে উৎসাহ দেবে, প্রেরণা দেবে, কর্ম্মে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলবে। এইভাবে লিখতে হয়—তুমি মানুষ, তুমি কেন দুঃখ-নিপীড়িত হবে? এইভাবে এইভাবে কর, ক'রে কৃতকার্য্য হও। পরের চিঠিতে যেন তোমার কৃতকার্য্যতার খবর পাই। সেই সুখবরের আশায় পথপানে চেয়ে থাকলাম। পথ ধরিয়ে দিতে হয়। একটা মানুষও যেন পিছে হ'টে না আসে। প্রত্যেকেই যেন উপচয়ে চলতে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে বললেন—কেমিক্যাল ইত্যাদি যে করলাম, আমার কি কিছু ছিল ? এর বাড়ীর হাঁড়ি, ওর বাড়ীর ড্যাগ নিয়ে বাগানের গাছগাছড়া দিয়ে কাজ শুরু করলাম। আর ছিল বঙ্কিম। সে efficient (দক্ষ)-ও ছিল খুব। সি. আর. দাশ বলেছেন—অমন পাঁচটা মানুষ পেলেই হ'তো। কর্ম্মীদের টাকা দিতে সুরু ক'রে তখন থেকেই গোলমাল হ'য়ে গেল।

৮ই আষাঢ় ১৩৫৬, বুধবার (ইং ২২। ৬। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হ'য়ে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট। ভাগলপুর থেকে দুজন অফিসার আসলেন। তাঁরা প্রণাম ক'রে বসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—কবে এসেছেন ?

জনৈক অফিসার—পরশু।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কতদিন থাকবেন ?

অফিসার—কয়েকদিন। আপনি কত দিন এসেছেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—১৯৪৬ সালে এসেছি স্বাস্থ্যের জন্যে।

অফিসার—আশ্রমের সম্পত্তির ক্ষতি-পূরণ দেবে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে আর কি দেয় ? আমি তো চাই, যাতে উপযুক্ত সময়ে আশ্রমে ফিরে যেতে পারি।

অফিসার—বিহারে একটা কলোনি করেন না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দাঁড়া করিয়ে নিতে হবে তো!

অফিসার—সরকারের সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। "অধিক খাদ্য ফলাও" প্রকল্পে সাহায্য খুব দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষকে ব্যাপৃত রাখাই দরকার। আর, তাই মানুষের চাহিদা। তবে চাহিদা আবার অনেক সময় indolent (অলস)।

অফিসার—চাহিদা তো দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চাহিদায়ই তো বাড়ে, becoming (বৃদ্ধি) হয়।

অফিসার—এখানে আপনাদের কোন হস্‌পিটাল আছে ?

কাশীদা (রায়চৌধুরী) উত্তর দিলেন—না! আমাদের ওখানে সব ছিল।

অফিসার—এখানে আপনাদের ল্যাবরেটরী মতো একটা আছে ?

কাশীদা—ওষুধপত্রের খুব চাহিদা। সেগুলি বের করবার জন্য যতটুকু দরকার হয়, তার ব্যবস্থা আছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেসক্রিপসন ও ফর্ম্মুলা থেকে অনেক ওষুধ বেরিয়েছে। তাও এ্যালকোহলের অভাব।

অফিসার—এ্যালকোহল তো সহজেই পেতে পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা ঘাতঘুতই জানি না।

অফিসার—আপনাদের চলে কি ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাইরে থেকে দশজনে যা' পাঠায়। দশজনের সহযোগিতা ও দয়ার 'পর আপাততঃ আছি। পরের দয়া চিরকাল লাগে। মানুষ পরের কোলে জন্মে। পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়।

কাশীদা—আমাদের এখানে কতকগুলি লোককে দিয়ে দোকান করাবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু দোকানঘর তোলার জিনিসপত্র না পাওয়ায়, তা' পারা গেল না। এখন ঠাকুর দিচ্ছেন, সবাই খাচ্ছে। লোকগুলি ব'সে থাকলে তারাও অক্ষম হ'য়ে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি দিচ্ছি না। ভালবেসে ওরাই আমাকে দেয়। পরমপিতার দয়ায় দশজনের সহযোগিতায় পরস্পর টিকে আছি।

অফিসার—আপনারা বিনোদাবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করলে সাহায্য পেতেন। তিনি খুব ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল হ'লেও পারা কঠিন। আমাদের মতো কত আছে। ভালর সমুদ্র হ'লেও পারা মুশকিল।

অফিসার—আজকাল এমন হ'য়েছে যে, লোকের মুখে রসগোল্লা পুরে দিলেও, তা' খেতে পারে না। গভর্ণমেণ্টের সাহায্যের উপর দাঁড়িয়ে যে মানুষ লাভবান হবে, তাও পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তির obsession (অভিভূতি) থাকলে মানুষ কোন-কিছুকেই লাভজনকভাবে ব্যবহার করতে পারে না। আমরা সত্তাকে বাদ দিয়ে প্রবৃত্তির হিল্লোতেই ঘুরছি। সত্তা-সম্বর্দ্ধনাকে নিয়েই ছিল আমাদের culture (কৃষ্টি)। আমরা নিজেদের culture (কৃষ্টি) ভুলে গেছি। আজ আমাদের প্রভূত জানা থাকলেও, জানাগুলি সব scattered (বিক্ষিপ্ত)—কোনটার সঙ্গে কোনটার সম্পর্ক নেই। আমাদের যে-ধরন ছিল—শ্রেয়ের পরিপূরণার্থে করার ভিতর-দিয়ে জানা, সেইরকম থাকলে জানাগুলি ও চরিত্র integrated (সংহত) হ'তো। সেই ভাল ছিল।

অফিসার—সেটা তো থাকল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা করিনি, সে-পথে চলিনি। আমাদের চোখ ঢেকে ফেলা হয়েছিল। আমরা educated (শিক্ষিত) হই নি—literated (অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন) হ'য়েছি।

বিবাহ-সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের বৈশিষ্ট্য যাতে nurtured (পরিপুষ্ট) হয়, বিকশিত হয়, তেমনভাবে বিয়ে থাওয়া দেওয়া লাগবে। যা' করলে যা' হয়, তা' করলে তা' হয়—একে কয় বিধি। আমাদের বৈশিষ্ট্যকে মেজে-ঘষে ঝকঝকে ক'রে তোলা লাগবে।

অফিসার—যা' আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর, তেমন কিছু থাকলে তা' নষ্ট ক'রে ফেলাই ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের কৃষ্টির মেরুদণ্ড যা', সেটা ভাল ক'রে জেনে, তাকেই উপচে

তোলা উচিত। তা' নষ্ট করলে, পরে জানব না কী ছিল। সত্যটা অস্বীকার করা যায় না, তা' আছেই। তা' বিবর্দ্ধনমুখর হ'য়ে চলে যাতে ঐতিহ্যসম্মতভাবে, তারই ব্যবস্থা করতে হবে।

অফিসার—এইভাবে সময় বেশী লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো বুঝি আপনারা যতটা বিধ্বস্ত হচ্ছেন, ততটা হ'তে হবে না। এটা আমাদের রক্তের মধ্যে সহজ হ'য়ে আছে। এ নিয়ে দাঁড়ালে সংহতি গজিয়ে উঠবে, কিছুতেই ভাঙ্গবে না।

অফিসার—তা' বলা যায় কি ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৈধানিক সংস্থিতি ঠিক থাকলে তা' অনন্ত প্রস্রবণ নিয়ে চলতে থাকে।

অফিসার—পরিবেশ দিয়েই মানুষের সব রকম উন্নতি হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরিবেশ তখনই ক্রিয়া করতে পারে, যেখানে সত্তা ব'লে কিছু থাকে। প্রত্যেকে impulse (সাড়া) দেয় তার বৈশিষ্ট্য মতো, নেয়ও তেমন। বৈশিষ্ট্যহীন কোন সত্তা নেই।

অফিসার—বৈশিষ্ট্য যদি নিকৃষ্ট হ'য়ে যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ন্যাংড়া আমের নিকৃষ্ট যেটা তাকে পোষণের ভিতর-দিয়ে কালক্রমে উৎকৃষ্ট ন্যাংড়া করা যায়। আমরা করেছি। কিন্তু ফজ্‌লিকে ন্যাংড়া করা যায় না।

অফিসার—গুণের জন্যই ন্যাংড়ার আদর। গুণ থাকলেই তো হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুণের জন্যই structure (কাঠামো) দরকার। Structure (কাঠামো) ছাড়া গুণ হয় না।

অফিসার—সমাজে ব্রাহ্মণদেরই তো আদর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সকলেই ব্রাহ্মণ হ'তে পারে। বৈশিষ্ট্যানুপাতিক সাধনার ভিতর-দিয়েই তা' হয়। বর্ণোচিত কর্ম্মের ভিতর-দিয়েই মানুষ ব্রাহ্মণ হ'তে পারে। এর মধ্যে হীনম্মন্যতার কোন স্থান নেই। ব্রাহ্মণ হওয়া মানে ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া।

অফিসার—হিন্দুদের অবনতি দেখে দুঃখ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের অবনতির জন্য আমরাই দায়ী। তার প্রতিকারও করা লাগবে আমাদেরই। ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্মকে ধ'রেই আমাদের দাঁড়াতে হবে।

অফিসার—হিন্দুধর্ম্মের বহু কথা practical (বাস্তবতাসম্মত) নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐটা একটা ভুল কথা। এ জিনিসটা অত্যন্ত practical (বাস্তবতা-সম্মত)। না করার দরুন কঠিন মনে হয়।

ওঁরা এবার বিদায় নেবেন। প্রসঙ্গতঃ বললেন—আমরা অনেক জিনিস জানি না, তাই প্রশ্ন করছিলাম। কিছু মনে করবেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ভালই লাগছিল। এখনই চ'লে যাবেন শুনে কষ্ট লাগছে। মনে হচ্ছে—পিছে-পিছেই না হয় যাই।

অফিসারদ্বয় শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন।

সিউড়ি থেকে কতিপয় দাদা এসেছেন, তাঁরা ফরিদপুরের লোক। তাঁরা পুনর্ব্বাসনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে কিছু সাহায্য পেয়েছেন, সেই কথা জানালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—টাকাগুলি হিসেব ক'রে খরচ ক'রো—উপচয়ে। একটা পয়সাও যেন নষ্ট না হয়। এখন বড় সঙ্কটজনক সময়। এখন যদি তোমরা দাঁড়াতে পার, তাহ'লে আমরাও বাঁচব। পরিস্থিতির সঙ্গে সংঘর্ষ যাতে না বাধে, সেদিকে লক্ষ্য রেখ। এখনও তোমাদের হাড় গজায়নি, তোমাদের খুব হিসাব ক'রে চলতে হবে। আর, এখন ব'লে কথা নয়—বরাবরই পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রেখে চলবে। স্থানীয় লোক যাতে ভাবতে পারে—তোমরা এসে তাদেরও একটা বল হয়েছে। অফিসাররা যেমন তোমাদের শ্রদ্ধা করে, পরিস্থিতিও যেন তেমন শ্রদ্ধা করে—তোমাদের আচার-আচরণ, চাল-চলন যেন তেমনতর হয়।

জনৈক দাদা—আমরা আপনার দয়ায় ভালই আছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার কাছে প্রার্থনা করি—তোমরা উন্নতি কর। নিজেরা খাও, দশজনকে খাওয়াও। মানুষ যেন তোমাদের ভক্তি না ক'রেই পারে না, ভক্তি ক'রে সুখী হয়। তোমাদের ভাগ্য খুব ভাল। পরমপিতার দয়ায় অকাট্য অনুরাগসম্পন্ন হও, দেখ কী হয়। ঐ দেখ স্পেন্সার বাগানে জল দিচ্ছে। হারভার্ডের এম-এ, সে এখানে এসে দেখ কী করছে। মোটকথা, কেউ যেন তোমাদের হীন ভাবতে না পারে, ছোট ভাবতে না পারে, এমনতর রকমে চলাই চাই, এমনতর হওয়াই চাই।

৯ই আষাঢ় ১৩৫৬, বৃহস্পতিবার (ইং ২৩। ৬। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হ'য়ে নতুন তাঁবুতে তক্তপোষে শুভ্রশয্যায় আসীন।

বহিরাগত এক দাদা বললেন—আমার এখন গ্রহ খুব খারাপ যাচ্ছে। কেউ-কেউ বলেন, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করলে ভাল হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুরাগের সঙ্গে খুব ক'রে নাম করলে হয়।

উক্ত দাদা—স্থানাভাব, পরিবেশের অভাব এবং অন্যরকম অসুবিধা বহু আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্থানাভাব হবে, অন্য অসুবিধা হবে, তার মধ্যেই নাম করা লাগে। চলা-ফেরা সব অবস্থার মধ্যেই নাম করা লাগে। আর, সঙ্গী বাড়ান লাগে, যাজন করা লাগে, দীক্ষিতের সংখ্যা বাড়ান লাগে। এতে সংহতি ও শক্তি দুই-ই বাড়ে। যাই করতে চাও, এ চাই-ই।

শ্রীশ্রীঠাকুর মণি চক্রবর্ত্তীদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মানুষের ভিতর সুকেন্দ্রিক আগ্রহ থাকলে তার থেকে আসে অনুসন্ধিৎসা, কুশল-কৌশলী চলন এবং তার দরুন সে সাধারণত কৃতকার্য্য হয়।

অন্য প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের জৈবী-সংস্থিতি যেমনতর, তার শরীর মনের বিন্যাস ও গুণও হয় তেমনতর। তাই, আগেকার দিনের মুনি-ঋষিরা বিজ্ঞানের

অন্যান্য ব্যাপারের প্রতি নজর দেওয়ার থেকে মানুষের অন্তর্নিহিত জৈবী-বিধানের দিকে বেশি নজর দিতেন। এতে মানুষকে দেখবার এবং দেখে চিনবার দৃষ্টি আপনিই খুলে যায়।

মণিদা—সেটা হয়তো বিরল ক্ষমতা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তোমার পক্ষেও সম্ভব, যদি দেখবার চেষ্টা কর।

মণিদা—আত্মবিশ্লেষণের ভিতর-দিয়ে তো সব ধরা যায়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টের উপর অনুরাগ থাকলে ভাল আত্মবিশ্লেষণ হয়।

মণিদা—আপনি চিত্তরঞ্জনকে দেখেই তো চিনতে পেরেছিলেন!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তাঁকে চিনতাম না। দু'চার কথা হওয়ার পরেই তিনি দীক্ষা নিতে চাইলেন। আমি মা'র কাছে পাঠালাম। মা এ. সি. পালের উপর চ'টে ছিলেন, তাই প্রথমটা রাজী হচ্ছিলেন না। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের আন্তরিকতাপূর্ণ কথায় মা'র চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেল এবং তিনি পরে দীক্ষা দিলেন।

বিবাহ-সম্পর্কের কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর মণিদাকে বললেন—তুমি যে আছ, তোমার একটা inner mechanism (অন্তর্নিহিত মরকোচ) আছে। তোমার বিয়ে এমন হওয়া চাই, যাতে তোমার ভিতরে যা' আছে তার পোষণ দিতে পারে। আমি আমার বাবার কাছে শুনেছি—ঘটকরা বলতে পারতো, কোন্ ছেলের কোন্ মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হ'লে কেমন সন্তান হবে। সূক্ষ্ম যন্ত্রের থেকেও নিখুঁত ছিল তাদের observation (পর্য্যবেক্ষণ)। রামকৃষ্ণদেব যেমন বলেছেন সুতো চেনার কথা। সুতোর ব্যবসায়ী দেখা মাত্র বলে দিতে পারে—কোন্‌টা কত নম্বরের সুতো। আবার, বলেছেন নাড়ী দেখতে গেলে বদ্যির সঙ্গ করা লাগে। ঘটকদের সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। রামকৃষ্ণ-দেবের মতো অমন কথা বলতে আজকাল শোনা যায় না।

শরৎদা—আজকাল লোকে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ যাতে হবে, সে-সব বিষয়ে গল্পও করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গল্প ক'রে যে উপকার করবে একটু, তা'ও করে না।

মণিদা—আপনার ভাবধারার মূল্য মানুষ এক'শ বছর পরে বুঝবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেকে তাই বলে। অনেকে বলে সময় নেবে। কিন্তু আমি বলি সময় এতেই কম নেবে। কারণ, এটা রক্তে আছে। কিছুটা আগ্রহ আছে ব'লে লোকে শোনে। আবার, অনেকে এমন বিকৃত হ'য়ে গেছে, যে বেঘোরে না পড়লে মাথায় ঢুকবে না। আমাদের লাইন পাতাই আছে। এতকাল ধ'রে রক্তের ভিতর-দিয়ে ব'য়ে আসছে। শিক্ষিত থেকে সাধারণ পর্য্যন্ত যাদের মধ্যে রক্তের ধারা ঠিক আছে, তারা এইসব কথা শুনে লাফ দিয়ে ওঠে। প্রচার চালাতে পারলে এক বিরাট জনসংখ্যা সঙ্গে পাওয়া যেত। কয়েকটা চালাক ছেলে হ'লে সারা দেশ মাতিয়ে তুলতে পারত। সাধারণ লোক পতঙ্গের মত ছুটে আসত।

অন্ধকারে মণিদার বাড়ি যেতে অসুবিধা হবে বলে শ্রীশ্রীঠাকুর মণিদাকে একটি টর্চ্চ

দিয়ে দিলেন। বললেন—পরে চুনীর হাতে দেবে। চুনীর হাতে ছাড়া আর কারও হাতে দেবে না।

মণিদা চ'লে যাওয়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের কর্ম্মীদের অনেকেরই নিষ্ঠা ও সাধনায় গলদ আছে। এটা বলছি এই জন্যে যে, একমাত্র এই নেশা নিয়ে যে চলবে, এই কাজই যে তাদের যথাসর্ব্বস্ব, তা' নয়কো।

১০ই আষাঢ় ১৩৫৬, শুক্রবার (ইং ২৪।৬।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে বসে আলোচনা করছিলেন। তিনি বললেন—প্রচণ্ড যাজন ও দীক্ষা চাই। তখন জাল গুটালে ধীরে-ধীরে সব হাতে এসে পড়বে।—শামুক, মাছ ইত্যাদি যা' আছে সবসুদ্ধ।

মণিদা (চক্রবর্ত্তী) কথায়-কথায় বালানন্দ স্বামীর কথা বললেন—তিনি নাকি অনেক উচ্চাঙ্গের কথা বলতে-বলতে, ক্ষেতে একটা ছাগল গেলে তাও লক্ষ্য রাখতেন। কাউকে যদি বাজার করতে চার আনা পয়সা দিতেন, তার হিসাব চেয়ে ঠিক ক'রে নিতেন। দুটো পয়সার হিসাবে গণ্ডগোল হ'লেও খুব চ'টে যেতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওতে যে character (চরিত্র) নষ্ট হয়ে যায়। টাকার জন্য মমতা, নেই, চরিত্রের জন্য মমতা।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বালানন্দ স্বামী, ভোলানন্দ গিরি, রামঠাকুর ইত্যাদি সাধুদের আমার ভাল লাগে। যাঁদের একনিষ্ঠ নির্দ্বন্দ্ব ভক্তিভাব আছে তাঁদেরই আমার ভাল লাগে। আর, রামকৃষ্ণঠাকুর বড় ভাল। কত ছোট-ছোট কথার মধ্য-দিয়ে তিনি সত্যগুলি বলেছেন। আমার দুর্ভাগ্য এঁদের কাউকে দেখিনি। মা'র মৃত্যুর পর আনন্দময়ী-মা একবার আশ্রমে এসেছিলেন ব'লে মনে হয়। মা'র কথা বলাতে তিনি বললেন—তিনি তো ঘটে-ঘটে আছেন। আমি তখন বোধহয় বলেছিলাম—আছেন ঠিকই, কিন্তু ঐ মা না থাকলে অন্য সব বোঝা যায় না। ঐ মা বিশ্বমায়ের কেন্দ্রায়িত সংহত মূর্ত্তি।

কতিপয় কর্ম্মী-সম্বন্ধে কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এক-একজনের এক-একটা ফুটো আছে, নিজেরা ইচ্ছা ক'রেই ফুটোর গায়ে হাত দেয় না। নিজে ইচ্ছা না করলে কেউ কারও ভাল ক'রে দিতে পারে না।

১১ই আষাঢ় ১৩৫৬, শনিবার (ইং ২৫।৬।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোল তাঁবুর পাশে ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট।

সুধাংশুদা (মৈত্র) কথাপ্রসঙ্গে বললেন—ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষ তাঁর বইয়ে লিখেছেন—আমাদের ভারতীয় কৃষ্টির উপর দাঁড়াতে হবে, কিন্তু প্রাচীনের কঙ্কাল পুরোপুরি গ্রহণ করা চলবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রাচীনের কঙ্কাল কী ? প্রাচীনের বীজকোষই বিবর্ত্তিত হ'য়ে চলেছে।

সেগুলিকে দেশকাল-পাত্রোপযোগী ক'রে প্রয়োগ করতে হবে। সত্তাসম্বর্দ্ধনী নয় যা', তা' বাদ দিতে হবে। দোষগুলি মেজে-ঘ'সে ঠিক করা লাগবে।

সুধাংশুদা—উনি বলেছেন, হুবহু তার অনুকরণ করা চলবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুকরণ করার কখনও দরকার নেই, অনুসরণের মধ্যে যতটুকু অনুকরণ আছে, তাছাড়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে যতি-আশ্রমে আসলেন।

সেখানে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মানুষ চায় যে, সে প্রবৃত্তির পথে চলবে, কিন্তু তা' সত্ত্বেও সত্তাসম্বর্দ্ধনার অধিকারী হবে। তার বুদ্ধিই অমনতর, ignorant (অজ্ঞ) কিনা, তাই অমন চায়। কিন্তু বিধিমত চলা ও করা ছাড়া উপায় নাই। বিহিতভাবে পুরুষকারের পথ না ধরলে কিছুতেই পারা যাবে না।

দুঃখ, কষ্ট, দুর্ভোগ নিরসন সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভক্তি জিনিসটাই ভাল, যদি ভাগ্য গুণে গজায়। অকর্ম্ম-কুকর্ম্ম তো মানুষ কম করে না, তার ফলও ফলে। কিন্তু ভক্তিতে, ইষ্টমুখী সক্রিয় নিষ্ঠায় ভক্ত যদি তন্ময় হ'য়ে থাকে, তখন কোন দুঃখকষ্টই তার গায়ে লাগে না। ক্লোরোফর্ম্ম করা অবস্থায় কারও শরীরে অস্ত্রোপচার হ'লে যেমন টের পায় না। রত্নাকরের গায়ের উপর যেমন উই-এর ঢিবি হ'য়ে গেল, সে কিন্তু ঠিকই পেল না।

প্রফুল্ল—সৃষ্টিটা উপভোগ করতে পারে দু'চার জন জ্ঞানী ভক্তলোক। তা'ছাড়া পৃথিবীর কোটি-কোটি লোক তো বদ্ধজীব হিসাবে শুধু কষ্ট পায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর গান ধরলেন—"দোষ কারও নয় মা শ্যামা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি।" দোষ দেব কা'র ?

কিরণদা (মুখোপাধ্যায়)—মানুষ ইষ্টমুখী হ'লে, কর্ম্মফল তাকে বোধ হয় ততো পীড়া দিতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনকে সের ভর, শূলকে কাঁটা। নেশা থাকলে তো হয়!

হরিদাসদা (সিংহ)—বুদ্ধদেবের কাছে এসে কারও সাতদিনে, কারও বা চৌদ্দ দিনে, আবার কারও একদিনে অর্হত্ব লাভ হ'ত। তার কারণ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাধারণতঃ সময় লাগে। তবে খুব সম্বেগ থাকলে অল্প সময়েও হয়। ছাত্রজীবনে দুটো কথা আমার মাথায় খুব ঢুকে গিয়েছিল। তার একটা হ'ল নিজে যেমন পছন্দ করি, অন্যের প্রতিও তেমনতর ব্যবহার করা উচিত। আর একটা কথা হ'ল—একটা পোকাও ভগবানের সৃষ্টি। আমার জীবনের যেমন দাম, ওরও তেমনি। তাই, কারও যেন ক্ষতির কারণ না হই। আমি আজও তা' ভুলে যাইনি। কথা দুটো আমার মনের মধ্যে গেঁথে গেছে এবং আমার প্রতি মুহূর্ত্তের চলনা সেই স্মৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ঐ ভাবে মনকে অধিকার যদি করে, তাহ'লে তাড়াতাড়ি হয় এবং ভুল হয় কম।

হরিপদদা (সাহা)—বুঝে-শুনেও হয় না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি এদিক চল, ওদিক চল, প্রবৃত্তি তোমাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। কিন্তু ইষ্টানুরাগ যেই তোমার চলনার নিয়ামক হ'ল, সেই তোমার ভাব ও বোধ বদলে গেল। ধৃতি নষ্ট করে প্রবৃত্তিতে, আর বোধেরও ব্যত্যয় হ'য়ে যায় তেমনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর উপমাচ্ছলে বললেন—হরিদাস যেমন কাল টর্চ আনতে গেল। কিন্তু আজও গেল, কালও গেল। কত পরিশ্রম ও করল, চেষ্টা করল, কিন্তু ওর ধৃতি, প্রণিধান ও সন্ধিৎসা এত প্রখর নয়, যে চাহিদামত জিনিসটা ঠিকমত বুঝে তাড়াতাড়ি আনতে পারে।

শরৎদা (হালদার)—আচ্ছা, এত কথা শুনলাম, বুঝলাম, কিন্তু যখন যেটা মনে পড়া দরকার, তা' পড়ে না কেন ? কিছু করার পর হয়তো খেয়াল হয়, এইভাবে করা উচিত ছিল, ভুল হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সময়-সম্বন্ধে আমাদের ঠিক বোধ নেই। সময়ের সাথে, করার সাথে, চলার সাথে, পরিস্থিতির সাথে সঙ্গীত গজিয়ে ওঠেনি আমাদের জীবনে। আপনি যেটা বললেন, সেটা তারই লক্ষণ। প্রতিটি যা'-কিছু সময়মতো করার অভ্যাস হ'লে, ওটা অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হয়। যতক্ষণ বাস্তবে নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাধান নিয়ে বাস্তবে বিনায়িত না হচ্ছেন—সময়ের সঙ্গে সঙ্গীত রেখে, তত সময় রকমটা ছুটবে না।

শরৎদা—হরিদাসের সামনেই বলছি, হরিদাসকে আপনি যেমন বললেন তা'তে ও চটল না। কিন্তু অন্য কেউ ভালভাবে বললেও ও হয়ত চ'টে যেত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ তখনই চটে, যখনই তার সত্তাটা প্রবৃত্তির দ্বারা রঙিল হয়। ঠাকুরকে ঠাকুর ব'লে ধ'রে নিয়েছে, স্বীকৃতি আছে, জানে ঠাকুর তার সত্তা, আর সত্তা হ'ল প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে, তাই চটেনি। কিন্তু নিজের চলনার মধ্যে সাত্বত বোধটা পাকাপাকিভাবে গেঁথে গেলে আরও সুবিধা হয়। তখন অনুকূল যা, তা' সবার কাছ থেকেই গ্রহণ করে।

প্রফুল্ল—সময়ানুবর্ত্তিতা যাদের যত বেশী, তাদের বোধ-অনুপাতিক কর্ম্মপ্রবৃত্তি কি তত বেশী ? তাদের কি ভুল কম হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সময়ানুবর্ত্তিতা একটা সদ্‌গুণ, কিন্তু তার সঙ্গেও বুদ্ধি চাই, কৌশল চাই।

হরেনদা (বসু)—সবগুলি কাঁটায়-কাঁটায় করতে তো বহুদিক সামাল রাখা লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অভ্যাসই অমন হ'য়ে যায়। নইলে রাঁধতে গিয়ে যদি তেল আছে তো নুন নেই, চাল আছে তো ডাল নেই—এমন অবস্থা হয়, তাহ'লে তো মুশকিল। সবগুলি সুশৃঙ্খল না হ'লে রান্না কিছু ঠিক মতো হয় না। তাই, সব গুণেরই সমাবেশ চাই।

শরৎদা—কেউ কোন ভুল ধরিয়ে দিলে আমরা যে ক্ষেপে উঠি, এটা তো খুবই খারাপ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক্ষেপে ওঠা যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ বুঝতে হবে টি-বি ব্যাসিলি যেমন শরীরের মধ্যে থাকে, চারিত্রিক দুর্ব্বলতাও তেমনি মজুত আছে এবং আমরা রাখতেও চাই তাকে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কাম-প্রবৃত্তির অবদমন থাকলে সে তখন সংকীর্ণ থেকে সঙ্কীর্ণতর মনোভূমিতে নেমে আসে। এরা মাতৃজাতিকে সহজে মা বলে ডাকতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট। উমাশঙ্করদা (চরণ), ভূষণদা (চক্রবর্ত্তী), কাশীদা (রায়চৌধুরী) প্রভৃতি কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—ব্যাধির মূলে থাকে বিকৃত চিন্তা। উমাশঙ্কর যেমন এখানে আছে, ক'দিনের মধ্যেই কার্ত্তিকের মত চেহারা হ'য়ে গেছে। তার মানে ঐ চিন্তার পরিবর্ত্তন হয়েছে। কিন্তু ওখানে গেলে আবার হয়ত গোলমাল হ'য়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বেড়াতে যাবেন ব'লে উঠলেন। হঠাৎ টিপ্‌টিপ্‌ ক'রে বৃষ্টি পড়তে লাগল। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন নতুন তাঁবুতে এসে বসলেন।

কালিদাসদার (মজুমদার) কাজকর্ম্ম খুব ভাল হচ্ছে, এই খবর শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর গেয়ে উঠলেন—

"উঠাও সন্ন্যাসী, উঠাও সে তান
হিমাদ্রি শিখরে উঠিল যে গান।"

তার পর বললেন—যতি চরিত্র মানুষকে জ্যোতিষ্মান ক'রে তোলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কালিদাসদার মাকে বললেন—পঙ্গপালের মতো মানুষ ছুটে-ছুটে আসছে, মানুষ নাকি পাগল হ'য়ে যাচ্ছে।

মা—সে আপনার আশীর্ব্বাদ, আপনার সন্তান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুনলে সুখ লাগে না?

মা হেসে ফেলে বললেন—তা তো একটু লাগে।

স্পেনসারদা যতি-আশ্রমের বাগানে কাজ করার পর কুয়োর পাশে বেদীর উপর বসে কুয়োর গায়ে হেলান দিয়ে উদাস দৃষ্টিতে ব'সে ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—স্পেন্সার বৃষ্টিটা উপভোগ করছে।

এরপর একটা ছাতা দিয়ে লোক পাঠিয়ে দিলেন স্পেন্সারদাকে ডেকে আনতে।

একজন গিয়ে ছাতার তলে স্পেন্সারদাকে নিয়ে আসলেন। স্পেন্সারদা এসে বসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—স্পেন্সারকে দেখাচ্ছিল যেন একজন শ্রান্ত কৃষক, দিনের শ্রমের পর ক্লান্ত দেহে ব'সে আছে—Almighty Beloved (সর্ব্বশক্তিমান প্রিয়পরম)-কে

খুঁজছে। বৃষ্টি পড়ছে, এমনতর বসা বসেছে, প্রকৃতির কোলে, প্রকৃতির বাচ্চার মতো, যে-কোন চালাক মানুষ থাকলে পরে চুপ ক'রে ছবি তুলে নিত।

প্রবোধদা (মিত্র)—Natural pose (স্বাভাবিক ভঙ্গী) ভাল, না artistic pose (কলাসম্মত ভঙ্গী) ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তো Natural (স্বাভাবিক)-ই ভাল লাগে।

প্রবোধদা—তবু যে artistic (কলাসম্মত) করার চেষ্টা করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Natural (স্বাভাবিক) করাই তো artistic (কলাসম্মত)।

এরপর পূর্ব্ববঙ্গের আমিরাবাদের এক ভদ্রলোক আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পিতৃদেব সেখানকার কাছারীতে কাজ করতেন। সেখানকার অনেকের কথা শ্রীশ্রীঠাকুর খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

ভদ্রলোকও সেখানকার খবর যা' জানেন বললেন। ও'রাও সেখান থেকে চলে এসেছেন বেশ কিছুদিন আগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাছারী ঘরটা আগে যেখানে ছিল সেখানেই আছে?

ভদ্রলোক—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর পূবের দিকে ছিল পোস্ট অফিস।

ভদ্রলোক—পোস্ট অফিস এখন নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নালাটা এখনও আছে? যে নালাটা মেঘনায় গিয়ে পড়েছে, যা'র পাড়ে ক্যাফলা গাছগুলি ছিল?

ভদ্রলোক—ঠিক আছে। ক্যাফলা গাছগুলি নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওখানকার অবস্থা এখন কেমন?

ভদ্রলোক—সংখ্যালঘুদের ওখানে থাকাই মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী যে কাণ্ড হ'য়ে গেল। বাংলা সোনার জায়গা ছিল। একসময় কোন সাম্প্রদায়িক বিক্ষোভ ছিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু পরে জিজ্ঞাসা করলেন—হাটটা এখনও আছে?

ভদ্রলোক—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাছারীর দক্ষিণ দিকে মাঠের মধ্যে একটা শেওড়া গাছ ছিল, তা'কি আছে?

ভদ্রলোক—হ্যাঁ, আছে। তবে ডাল-টাল অনেক কেটে ফেলেছে। গাছটা পুরোন গাছ। আপনার দেখছি সব মনে আছে।

ভদ্রলোক পরে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার ভাই ফণীবাবু কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কলকাতায়।

প্রফুল্ল—ফণী কে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খ্যাপার আর এক নাম ছিল ফণিভূষণ।

ভদ্রলোক—আমাদের আর ওঁদের বাড়ী পাশাপাশি ছিল। উনি সর্ব্বদা আমাদের

বাড়ী যাতায়াত করতেন। আমাদের দুই বাসার মধ্যে সুতো ও কৌটো দিয়ে ফোন ক'রে কথাবার্ত্তা বলতেন।

প্রফুল্ল—ঠাকুরের তখন বয়স কত ছিল ?

ভদ্রলোক—পনের-ষোল বছর।

কেউ-কেউ বললেন—সুতোর ফোন খাটিয়ে কথাবার্ত্তা বলা যখন চলত, সেটা দশ-বার বৎসর বয়সের উপর হবে না বোধহয়।

ভদ্রলোক—তা' হতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নদীর ধারে যে একটা হাট মিলত তা' আছে ?

ভদ্রলোক—আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হাটের ধারে বটগাছের তলায় একজন সাধু থাকত ?

ভদ্রলোক—এখন নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লালবিহারী ঠাকুর ছিল।

ভদ্রলোক—নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওঁর ঘরের পিছনের দিকে একটা পেয়ারা গাছ ছিল।

পান্ডাজী এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে মন্দিরের স্নানজল দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাত ধুয়ে ভক্তিভ'রে গ্রহণ করলেন। পরে আবার হাত ধুলেন।

আমাদের সকলকেও হাত ধোয়ার জন্য জল দিতে বললেন সরোজিনী মাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—নালার পাড়ে কাছারীর দক্ষিণ দিকে যে গ্রামটা ছিল, কি নাম ছিল তো ?

ভদ্রলোক—সোনাকান্দী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর কিছুদূরে মুন্সেফি চৌকি ছিল ওদিকে কোথায় তো ?

ভদ্রলোক—নবিনগর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওখানে একটা স্টীমার স্টেশান ছিল।

নবিনগরের আশপাশের অন্যান্য বহু স্টীমার স্টেশানের নাম শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন।

ভদ্রলোক—ওদিকে বাড়ী হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছেলেবেলায় কল্পনা করতাম যদি ওদিকে বাড়ী হয়।

ভদ্রলোক—তাই হ'য়ে গেল।

ভদ্রলোক বিদায় নেওয়ার আগে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ছোটকালকার পরিচিত কাউকে দেখলে মনে হয়, নিজে যেন আবার ছোট হ'য়ে গেছি, অর্থাৎ সেই ছোটকাল ফিরে পেয়েছি।

কিছু সময় আগে আলো জ্বলে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে তক্তপোষে উপবিষ্ট। নীচে সরোজিনী মা বসে ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অরুণ একেবারে মা-সর্ব্বস্ব, মা ছাড়া কিছু জানে না।

মা-সর্ব্বস্ব হওয়া ভাল, কিন্তু মা-সর্ব্বস্ব দেখলে ভয় ভয় করে, তার আমার মতো কণ্ট পেতে হ'তে পারে।

সরোজিনী মা—মা-সর্ব্বস্ব হ'য়ে লাভ কী? ঠাকুর-সর্ব্বস্ব হওয়াই তো ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মা-সর্ব্বস্ব হ'লে তো ঠাকুর-সর্ব্বস্ব হবে।

ননীমা কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নীলুরও মুশকিল আছে। ননী দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে, তাহ'লে ও জীবনে একটু উপভোগ ক'রে যেতে পারে।

এরপর ননীমা সাপ-সাপ করে উঠলেন। তখনই কাছে যে টর্চটা ছিল, সেটা দিয়ে দেখার চেষ্টা করা হ'ল। তাতে আলো কম ছিল বলে বনের মধ্যে দেখা গেল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই মুহূর্ত্তে ভাল টর্চ আনতে বললেন। খুঁজে আনতে একটু দেরী হ'য়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাগত কণ্ঠে বললেন—এরা এমন ম্যাদা, যে তাড়াতাড়ি কিছুই করতে পারে না। আমিও যেমন, এরাও হয়েছে তেমন।

১২ই আষাঢ় ১৩৫৬, রবিবার (ইং ২৬। ৬। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে এসে যতি-আশ্রমে বসেছেন। যতি-আশ্রমের সামনে একটা কুকুর অসুস্থ অবস্থায় শুয়ে আছে। তার মলদ্বারে একটা ঘা হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কাশীদাকে ডেকে বললেন—দ্যাখ্, ওর ঘা কিন্তু দিন-দিন বেড়েই চলেছে, তাড়াতাড়ি সারিয়ে তোল।

বড়দা আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কুত্তাটাকে সারায়ে তোলার একটা ব্যবস্থা কর। দ্যাখ কী অবস্থা হয়েছে। ননী এর মধ্যে ফিনাইল দিয়েছিল, এখন কী করবি দ্যাখ্।

এমন সময় হরেনদা (বসু) আসলেন।

পূজনীয় বড়দা তাকে বললেন—পশুর ডাক্তার এনে কুকুরটাকে দেখাবার ব্যবস্থা করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়দা, সুধাংশুদা প্রভৃতির সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—বৈষম্য আছে ব'লেই becoming (বিবর্দ্ধন) আছে। দুনিয়ায় একটার মত আর একটা নয়। প্রত্যেকে যা'-কিছুই সাড়া দেয় তার মতো। রকমারি আছে। রকমারির দ্বন্দ্বের মধ্যে-দিয়েও একটা কেন্দ্রায়িত ঐক্যের যখন সৃষ্টি হচ্ছে, তখনই বিবর্ত্তন এগিয়ে যাচ্ছে। সব একরকম হ'লে গুলিয়ে যেত, একঘেয়ে হ'ত।

শরৎদা—পার্থক্য না থাকলে, স্তর ভেদ না থাকলে সমীচীন সংঘাত হয় না, উন্নতিও হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একাকার করতে গেলে কোন জানাই সংহত হয় না।

শরৎদা—সংহতি না হ'লে সংশ্লেষণও হয় না। মারাত্মক হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যে নানা জিনিস খাই, সবই যদি শরীরের পরিপোষক না হয় এবং যথাযথভাবে শরীরে যদি বিন্যস্ত না হয়, তা হ'লে আমাদের শরীরও বাড়ে না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর আলোচনা-প্রসঙ্গে বললেন—সাধারণ মানুষ যে ভাল হ'তে চায়, তার পিছনে নানা রকম প্রবৃত্তি থাকে। অনেকের মধ্যে হামবড়াই ভাব থাকে, অন্যকে খাটো ক'রে নিজে বড় হ'তে চায়। তা'তে চলনে গোলমাল হয়। কারণ, আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব তাদের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করে। যারা ভালবাসা থেকে ভাল হ'তে চায়, তাদের ভাল করার বুদ্ধি হয়। অনেকে আবার লোকের খাতির পাওয়ার জন্য ভক্ত হ'তে চায়। এই যে চাহিদা, এই যে গতি এ-ও আবিল। উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ, তাঁকে প্রীত করা, অর্থাৎ সমস্ত করাকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে, তাঁকে প্রীত ক'রে, প্রীত দেখে প্রীত হওয়া।

প্রফুল্ল—অজ্ঞতার জীবন আমার মোটেই ভাল লাগে না। প্রবৃত্তি-মুক্ত জীবন ছাড়া সুখ নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্ট-সর্ব্বস্ব না হ'লে, মানুষ মুক্ত হ'তে পারে না। মুক্তি-বাঞ্ছা, ব্রহ্মলাভের আকাঙ্ক্ষা—তার মধ্যেও প্রবৃত্তির খেলা থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—বৈষ্ণব দর্শনটা আমার স্বাভাবিকভাবে ভাল লাগে। মনের ঝোঁকই ঐ। জ্ঞানসন্ধিৎসাকে আমি অবজ্ঞা করি না, তা' আমার অপ্রীতি উৎপাদন করে না। কিন্তু ঐটেই প্রীতি উৎপাদন করে।

প্রফুল্ল—আমার মনোভাব আমি এড়াতে পারি না, কতখানি আমি বন্ধনমুক্ত হ'লাম সেই দিক দিয়েই ভাবি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কথা—তোমার যাই থাক, সবটার উপরে তিনি থাকলেই হ'লো।

ননীদা (চক্রবর্ত্তী)—গতির মধ্যে যে বিরতি থাকে বলছিলেন, সেটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত বেগই থাক, তার মধ্যে একটা থামা আছে। যেমন গাড়ী চলে যাচ্ছে, তুমি ছবি তুললে, এক সেকেণ্ডের এক লাখ ভাগের এক ভাগের জন্য গাড়ীটা হয়তো থেমে ছিল। তুমি তারই ফটো তুললে।

কাশীদা বললেন—এক মা টাকা নেবেন। কিন্তু খাতায় লিখে নিতে নারাজ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক-একটা ছোট ব্যাপারের থেকে এক-এক জনের সমগ্র মনোভাবটা বোঝা যায়। বুঝেও শক্ত ক'রে বলি না, কঠোর হই না, কারণ, তা' করলে টেকে না।

শরৎদা—কওয়াই তো ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কওয়া ভাল, কিন্তু মানুষ হীনম্মন্যতা ছেড়ে তো আসে না, হীনম্মন্যতার ঘোমটা দিয়ে আসে। সেইটে নিয়ে বেশী টানা-হেঁচড়া হ'লে, আমার কাছে খোলাখুলিভাবে আসতে পারে না। তখন তার বিপদের সময়, আমি হয়তো তার কোন কাজে লাগতে পারি না। সেইটে ভেবে-বুঝেও অনেক সময় কোন কড়া ব্যবহার করি না। তা' করলে দু'চার জন ছাড়া ক'জন যে টিকবে বলতে পারি না। এরা যারা এমনভাবে চলে, তারা যে ভাগ্যবান, তা' নয়।

কাশীদা—লোকসংসর্গে থাকা ভাল, না নির্জ্জনে থাকা ভাল—বিশেষতঃ সাধকের পক্ষে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নির্জ্জন বাস, প্রিয়পরমের সঙ্গে থাকা, প্রিয়জনের সঙ্গে থাকা, জনসাধারণের মধ্যে জনসাধারণের জন্য জীবনযাপন করা—এই ক'টা রকম ঠিক রাখা লাগে। তাতে কোনটা চাপা পড়ে না। কেউ যদি প্রকৃত প্রিয়পরম হ'ন, তাঁর সঙ্গ যে কি চমৎকার বলে শেষ করা যায় না। তা' যেন জীবনের অমৃত। আজকাল আমার শুধু জনসাধারণের মধ্যেই জীবন কাটে। বাড়ীর লোকের কাছে একটা কথা বলতে চাইলেও পারি না।

কাশীদা—নির্জ্জনে থাকাই তো ভাল। বহুরকমের লোকের মধ্যে প'ড়ে তো ভিতরের খারাপটা জেগে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাইরের সংস্পর্শে ও সংঘাতে না গেলে, ভিতরে কি-কি প্রবৃত্তি গুঁড়ি মেরে আছে, তা' ঠিক পাওয়া যায় না। যেমন এক স্তূপ কাগজে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে যদি উস্কে-উস্কে উল্টে-পাল্টে না দেওয়া যায়, তবে বাইরে থেকে মনে হবে, কাগজগুলি পুড়ে গেছে কিন্তু আদতে পোড়ে না। মানুষের সংস্পর্শে তেমনি না গেলে, ভিতরের প্রবৃত্তিগুলি ধরা পড়ে না। মানুষের কাছে যাওয়া লাগে, তবে সবসময় আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মশুদ্ধির চেষ্টায় থাকা লাগে। আবার, নিজের কাছে নিজের দোষ সবসময় ধরা পড়ে না, কিন্তু অন্যের কাছে ধরা পড়ে। তাই আমি এদের বলেছি—নিজেকে নিজে যতই ভাল মনে কর, তোমার কোন ব্যবহারে মানুষ কী মনে করে, অন্যের কাছে তা' কেমন লাগে—সেইটে হ'লো মাপকাঠি, যে তোমার ব্যবহার ঠিক কিনা। তাই অন্য কেউ যদি দোষ ধরিয়ে দেয়, তা'তে লাভ হয়। তা'তে চটতে নেই, সেই অনুযায়ী নিজেকে সংশোধন করতে হয়। মানুষ ইচ্ছা করলেই তার চলনার মোড় ফিরিয়ে দিতে পারে।

হঠাৎ দেবেন সরকারের কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঐ তো প্রথমে ঠাকুর নাম রটায়। আমাকে খুব ভালবাসত। পাবনা স্কুলে একসঙ্গে যখন পড়তাম, তখন আমার শিক্ষক একদিন আমাকে ক্লাশে খুব মারেন। কি কারণে ঠিক মনে পড়ছে না। হয় কনজ্যুগেশান শেখার উপলক্ষে, না হয় অঙ্কের ক্লাশে যেদিন বলেছিলাম—এক আর এক-এ দুই হয় কি ক'রে? একটার মত আর একটা তো দেখি না ইত্যাদি। মাস্টারমশাই যখন আমাকে খুব মারছিলেন, দেবেন তখন কাঁদতে-কাঁদতে হাত জোড় করে মাস্টার মশাইকে বলে—প্রভুকে মারবেন না! প্রভুকে মারবেন না! আমাকে মারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিছু সময় নীরব থাকার পরে বললেন—আমার সবসময়ই বুকের মধ্যে একটা emptiness (শূন্যতাবোধ) লেগেই থাকে। মা'র কথা, বাবার কথা মনে হয়। চব্বিশ ঘণ্টা মনে হয়। মা থাকতে বাবার কথা অত মনে হ'ত না। তারপর সাধনা, ভেঙ্কু ও গোপালের কথা মনে হয়। সেইসঙ্গে কিশোরীদের কথাও

মনে পড়ে। প্রীতি-প্রত্যাশা ব্যাহত হ'লে, সে-সব কথা এবং শোকের কথা একসঙ্গে মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদাকে বললেন—কঞ্জুসের মত ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠাপন্ন হ'য়ে যদি এই মুহূর্ত্তে আমার কথার উপর দাঁড়ান, তাহ'লে এক লহমায় কিন্তু সব ঠিক হ'য়ে যায়। তবে প্রবৃত্তিগুলিকে অক্ষত রেখে আমার পথে যদি চলতে চান, তাহ'লে কিন্তু বঞ্চিত হবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার প্রাক্কালে মাঠে তক্তপোষের উপর ব'সে বললেন—প্রীতি প্রকৃত হলেই মানুষ active (সক্রিয়) হ'য়ে ওঠে। তখন প্রিয়ই হয় স্বার্থ। ভালবাসার জ্বালাটাও মিষ্টি লাগে, বিরহটাও ভাল লাগে। কিন্তু শোকের বিরহ বিপজ্জনক।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি দেখি শাণ্ডিল্যের ধাঁজ যেন আমার মধ্যে আছে। যেখানে-সেখানে যাওরে মাকু, চরকি ছাড়া নয়।

প্রসঙ্গতঃ সরোজিনীমা বললেন—আমি কখনও চাই না, যে খোকা কামাই ক'রে দিক, আমি তা' খাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তুমি খরচ করতেই পারবে না, প্রত্যেক মায়েরই অমন হয়, ছেলেরটা নিজের জন্য বিশেষ খরচই করতে পারে না। বড়বৌকে বড় খোকা যতগুলি টাকা দিয়েছে, প্রাণে ধরে সে তা' খরচ করতে পারে না। আর একটা জিনিস আছে। ছেলের বিয়ে হয়ে গেলে, মা ভাবে আমাকে ভালবাসে বেশী না বৌকে ভালবাসে বেশী। বউ-এর দিকে বেশী ঝোঁক দেখলে মায়েরা ক্ষুব্ধ হয়। অবশ্য বউ-এর দিকে নজর না দিলে, তখন আবার ছেলেকে বকে। কিন্তু সেদিকে তেমন একটু নজর দিতে গেলে, তার মনে-মনে আবার সংশয় জাগে। ভালবাসার বিচিত্র গতি।

কাজলভাই খেলাধুলো ক'রে সদলবলে ফিরছিলেন।

তাই দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ছেলেবেলায় কত ছেলে যে আমার সঙ্গে ঘুরত, তার ঠিক ছিল না। বিরাট দল ঘুরত। কাজলেরও সেইরকম দেখি। ওকে বলে traditional trait (ঐতিহ্যগত লক্ষণ) শিখিয়ে পারা যায় না, পারা যায় না যে তা নয়, ধস্তা-ধস্তি ক'রতে হয়—trait (গুণ) থাকলে সহজে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোয় ফিরে আসলেন। এসে আশ্রম-প্রাঙ্গণে বসলেন।

পূজনীয় বড়দার ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওরা খুব ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে কথাচ্ছলে বললেন—আমার যেদিন ক্ষিদে লাগে, সেদিন খাওয়া জোটে না ভাল। আর যেদিন ক্ষিদে পায় না, সেদিন খুব খাওয়া জোটে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কতিপয় মাকে বললেন—তোরা ভাবিস, লেখা-পড়া, সেলাই-ফোঁড়াই, রান্না, গান-বাজনা জানলেই বিদ্যা হ'য়ে গেল। তা' কিন্তু না। অনুসন্ধিৎসু সেবা একটা প্রধান জিনিস। 'না বলিতে কাজ বুঝিয়া করিবে, সেই যে সেবক নাম। সেবক

হইয়া কহিলে না করে, তাহার করম বাম।' পরিরক্ষণ, পরিপোষণ, পরিপূরণ—এর নাম সেবা। এছাড়া যাই কর তা' সেবা নয়।

প্যারীদা (নন্দী) আসলে, শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোর সেই সন্দেশ কি পাওয়া যায় না?

প্যারীদা—দিতে বললে দেবে ময়রা। আপনি আজ খাবেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ পেলে খেতাম পেটভরে।

প্যারীদা চলে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সাবধানে যাস্, সাপ্-টাপ্ দেখে যাস।

পাবনা আশ্রমের আনন্দবাজারের কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর তারকদা (ব্যানার্জী)-কে জিজ্ঞাসা করলেন—তুই খেয়েছিস তো?

তারকদা—হ্যাঁ! একটা পোড়ালংকা পেলে ফিস্ট খাওয়ার মতো লাগত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন সবার স্বাস্থ্যও ছিল সুন্দর।

১৩ই আষাঢ় ১৩৫৬, সোমবার (ইং ২৭।৬।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। হাউজারম্যানদা এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—কারও চিঠি এসেছে?

হাউজারম্যানদা—ডুভ্যাল-এর চিঠি এসেছে, ওর বিয়ে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিয়ে করা খুব কঠিন ব্যাপার।

হাউজারম্যানদা—কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Compatible (সঙ্গতিশীল) না হ'লে মুশকিল।

হাউজারম্যানদা—কী ক'রে বোঝা যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরীক্ষা করতে হয়। মানুষ মেশে নীতিগত শিষ্টতা নিয়ে। তাই অসতর্ক মুহূর্ত্তের ব্যবহার কেমন তা' দেখতে হয়। তা'তে চরিত্র বোঝা যায়। দেখতে হয়, উভয়ের পারিবারিক লক্ষণ এবং ব্যক্তিগত প্রকৃতি compatible (সঙ্গতিশীল) কিনা। আমরা যাকে শিক্ষা বলি, তা' প্রকৃত শিক্ষা নয়। সেটা বরং শিক্ষার অন্তরায়। এটা মানুষকে শিখিয়ে দেয়, কেমন ক'রে একটা খোলস প'রে চলা লাগে।

শরৎদা (হালদার)—মহাপুরুষদের মন-মুখ এক। তাঁদের ভিতরে একরকম, বাইরে আর-একরকম—এমন নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁরাই মানুষের স্বাভাবিক আদর্শ।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—স্বামীর প্রতি স্ত্রীর গভীর শ্রদ্ধা থাকলে তার সম্বন্ধে একটা গর্ব্ববোধ থাকে। এটা সতীত্বের একটা লক্ষণ। স্বামীর উপর গভীর টান না থাকলে স্ত্রীর বুদ্ধি হয়, স্বামীকে দিয়ে নিজের প্রবৃত্তি চাহিদা পূরণ করার। তেমন টান থাকলে স্ত্রী স্বামীকে সর্ব্বতোভাবে পোষণ দিতে চেষ্টা করে। সে দেখে কিভাবে স্বামী শরীরে, মনে ও আত্মায় সুস্থ থাকে ও সমৃদ্ধিশালী হ'য়ে ওঠে, আর

তা'তেই সে নিজেকে সুস্থ ও সমৃদ্ধিশালী ব'লে বোধ করে। বাইবেলে আছে—স্বামী এবং স্ত্রী যেন same flesh অর্থাৎ একদেহ, একমন, একপ্রাণ।

পূজ্যপাদ বড়দা উপস্থিত আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—শরীরটা এত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে, যে, একটা টর্চ হাতে ক'রে যেতে হ'লেও যেন ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি। আগে টুক-টাক এটা করছি, ওটা করছি—একটা কিছু করতাম—হয়তো ঘড়িটা ঠিক করছি, নয় টর্চটা, না হয় হারমনিয়ামটা ঠিক করছি। আশ্রমে ইঞ্জিনটা বসাতে পারে না, নিজে যেয়ে বসে ব'লে-ব'লে ঠিক ক'রে দিলাম। এখন যেন কিছুই করতে ভাল লাগে না। মা যেয়ে আজ আকূতিই নেই। শরীরও খারাপ, আর করার অভ্যাস নেই। এখন যেন কিছুই পারি না।

পূজ্যপাদ বড়দা—কয়েকদিনের মধ্যেই ঠিক হ'য়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালই লাগে না, ইচ্ছাই করে না। মা'র অসুখের থেকে শুরু ক'রে urge (আকূতি)-ই যেন কমে গেছে। মা যাওয়ার পর থেকে ভাবি—এটা ক'রে কী হবে, ওটা ক'রে কী হবে ?

কিরণদা (মুখোপাধ্যায়)—মা'র অসুখের সময় থেকেই নাকি, আপনার রঙ ময়লা হয়ে গেছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ ! মা'র অসুখের থেকেই রঙ ময়লা হ'য়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু পরে বললেন—আগে শঙ্কা বলে কিছু ছিল না, এখন যেন শঙ্কা লেগেই আছে।

কিরণদা—মানুষের মা চিরকাল বেঁচে থাকবেন, সে তো একটা কথা না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা একটা কথা নয় বটে, আর সব সময় মাকে বেঁচে থাকতে দেখাও যায় না। কিন্তু মানুষের একটা গাঁট থাকে কিনা—একটা গাঁট ধ'রে অন্য গাঁট পার হয়—আমার একটা গাঁট ছিল।

মা'র কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মা মানুষকে ভালও যেমন বাসতেন, শাসনও তেমন করতেন। মানুষ ভয়ও করত খুব। আমি কিন্তু অমন শাসন করতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে নূতন তাঁবুতে উপবিষ্ট।

মুর্শিদাবাদ থেকে এক দাদা এসেছেন। তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা হচ্ছে।

উক্ত দাদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মানুষের যদি আত্মপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধি থাকে এবং কৃতিত্বজনক কাজের জন্য মানুষের কাছ থেকে প্রভুত প্রশংসা পায়, তখন তো তার স্বভাবতই প্রলোভন হয়। এক্ষেত্রে তার করণীয় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন বলতে হয়—ভাই, এ কি আমি করেছি ? পরমপিতার দয়া করেছে। আমার মাথায় কি এ গজায়, অন্তর্নিহিত তিনিই গজিয়ে দিয়েছেন। সেই মনোভাব নিয়ে ভাবতে হয়, বলতে হয়।

উক্ত দাদা—অনেক সময় যে লোভ হয়, তখন কী করা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই লোভের প্রশ্রয় দিলে আমার সত্তার বা প্রেষ্ঠের সুবিধা কী হবে, ভাবতে হয়।

উক্ত দাদা—এই বিচারই যে আসে না। প্রবৃত্তিকে প্রবৃত্তি ব'লে যে ঠিকই পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাঁধা থাকলে বিচার না এসে পারে না। ঠিক পাইয়ে দেয়। বাঁধা থাকলে টান পড়ে, হিসাব আসে, conscious (সচেতন) ক'রেই তোলে।

এর খানিকটা পরে বৃষ্টির দরুন শ্রীশ্রীঠাকুর গোল তাঁবুতে উঠে আসলেন। সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বিছানায় শুয়ে আছেন। বাইরে টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টি হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রান্না-বাড়া সম্বন্ধে টুক্-টাক্ কথা বললেন। এমন সময় স্পেন্সারদা আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে দেখে বললেন—স্পেন্সারের আর-একটু Fatty (মোটা) হওয়া লাগে। ভজন-টজন করলে Fat (মেদ) কমে, nervepower (স্নায়ুশক্তি) বাড়ে। এই সময় milk (দুধ), plantain (কলা), butter (মাখন), sesamum (তিল), almond (কাঠবাদাম), ground nuts (চিনেবাদাম) ইত্যাদি খাওয়া ভাল।

অরুণ (জোয়ারদার) বলল—স্পেন্সারের কুকুরটা, স্পেন্সারকে খুব ভালবাসে।

সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভালবাসা মানুষকে inquisitive (অনুসন্ধিৎসু) করে, concentric (সুকেন্দ্রিক) করে, servicable (সেবাপরায়ণ) করে। সেবা মানে, যা' পরিপোষণ, পরিপালন ও পরিপূরণ করে।

নির্ব্বিকার ভাব সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ইষ্টের উপর হাড়ভাঙ্গা নেশা থাকলে, তা' থেকে মানুষের বিকারের ভাব কমে। তখন মানুষ যে-কোন অবস্থার মধ্যেই পড়ুক না কেন, তাকেই ইষ্ট-স্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠার দিকে নিয়ন্ত্রিত করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্পেন্সারদাকে একটা গান গাইতে বললেন।

স্পেন্সারদা একটি স্বরচিত ইংরেজী গান গাইলেন।

কিরণদার সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রকৃত ভক্তের কাছে ভগবান কখনও-কখনও দাসের দাস হ'য়ে যান। ভক্তির মত এমন জিনিস আর হয় না। ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান উভয়ের কাছে পরম উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

প্যারীদা বললেন—রবিদা একবার এখানে ছিলেন। তখন কলকাতায় তার রোগীরা দেখছে, তিনি সেখানে ব'সে ওষুধ দিচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই কথা শুনে বললেন—There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy, Horatio. (হে

হোরেসিও, তোমার দর্শনশাস্ত্র যা'র স্বপ্ন দেখতে পারে না, এমন বহু জিনিস স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে আছে।)

পরে তিনি বললেন—ধন-দৌলতে মানুষের প্রয়োজনীয় ক্ষুধা মেটাতে পারে, কিন্তু মানুষের বুকের ক্ষুধা মেটে সক্রিয় ভালবাসায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বাংলায় কথাটা ব'লে, ইংরাজীতে আবার স্পেন্সারকে বুঝিয়ে বললেন। বলার পর শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, —ঠিক না?

এমন সময় একটা টিক্-টিকি ডাকল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—টিক্-টিকি যেন বলছে—ঠিক্-ঠিক।

প্রফুল্ল—মানুষের নিরাশী হওয়াই তো ভাল। প্রীতি-প্রত্যাশা তো ঠিক নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' কি যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর গান ধরলেন—'ভালোবাসার নিদানে পালিয়ে যাওয়ার বিধান বঁধু আছে কোন্খানে?' গান গাইতে-গাইতে শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে ফেললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোমাকে আশ্রয় ক'রেই আমার আমি চিরন্তন। তোমার সেবার জন্যই আমি। ভক্ত-ভগবানের সম্পর্ক আমাদের চিরন্তন আমিত্বের ভিত্তি।

'পিছু-পিছু ছুটে যত যাব আমি
আরো-আরো-আরো দূরে রবে তুমি
ফুরাবে না তুমি, ফুরাব না আমি
তোমাতে-আমাতে রব একাকার।'

হরিদা (গোস্বামী) এসে বাইরে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—গোঁসাইদার জামাটা ইস্ত্রি করে দিতে পারিস না? গোঁসাইকে যদি ফুল-ফুলে ক'রে না রাখতে পারিস, তাহ'লে কি করলি! তুইও করবি, তোর বউরাও করবে। গোঁসাই-এর শরীরটা ভাল ক'রে দে। আগে কেমন নটবরের মত ছিল। তুই আর গোঁসাই যদি একসঙ্গে পাশাপাশি ব'সে খাস, তাহ'লে গোঁসাই হয়ত দু'টো পেট ভরে খায়। ও যে খেতেই চায় না। উপোস দিয়ে-দিয়ে কাম সারল। পারবি তো গোঁসাইকে মোটা-সোটা, সুস্থ-সবল, ফুল-ফুলে ক'রে দিতে? কাপড়খানা হয়ত নিজে নিলি—কেচে-টেচে দিলি। পারবি না?

হরিদা—হ্যাঁ, চেষ্টা করব।

২৮শে আষাঢ় ১৩৫৬, মঙ্গলবার (ইং ১২।৭।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। শরৎদা (হালদার), চুনীদা (রায়চৌধুরী), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রভৃতি উপস্থিত।

ননীদা সাহিত্য-সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেকে লেখে প্রবৃত্তি থেকে। তাদের লেখায় সত্তার খোরাক থাকে কম। কিন্তু যারা সত্যিকারের সাহিত্যিক, তারা যাই লিখুক তা' সত্তা-সম্বর্দ্ধনী হ'য়ে ওঠে।

ননীদা—নীতিবোধ যদি সৌন্দর্য্য-বোধের চাইতে বেশী প্রাধান্য পায়, তাহ'লে তো সাহিত্য হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাগল! মানুষ সংগ্রহ করে তো তার ঝোঁক দিয়ে। ঝোঁক মাফিক লেখে। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, গিরীশ ঘোষ এঁদের প্রত্যেকের ভিতর দেখতে পাবে—তাঁরা নিজেদের interest (অনুরাগ) মাফিক জিনিসগুলি সংগ্রহ ক'রে ফুটিয়ে তুলেছেন—নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। এইরকম প্রত্যেকে। মানুষের ভালবাসা ও ভাললাগা যেখানে থাকে, সে জিনিস ফোটাতে গেলে তার মধ্যে সৌন্দর্য্য-বোধ এসেই পড়ে।

পূর্ব্বকথার সূত্র ধ'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোমার সম্মুখে কত কী ঘটছে, কিন্তু তুমি সেইগুলির দিকে নজর দাও, যে-গুলিতে তুমি interested (অন্তরাসী)। তোমার যদি কামানতি থাকে, তাহ'লে তেমন জিনিস বেছে নেবে, আর যদি অন্যদিকে ঝোঁক থাকে, তবে সেদিকেই নজর দেবে। তুমি যদি কামের ঊর্ধ্বে থাক, তবে কাম সম্বন্ধে লিখলেও, তখন তার সুষ্ঠু পরিণতি দেখাতে পারবে। লেখা ধ্বংসাত্মক না হ'য়ে, গঠনাত্মক হওয়াই ভাল।

এরপর বাস্তববাদ ও আদর্শবাদের দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকৃতপক্ষে বাস্তববাদের সঙ্গে আদর্শবাদ জড়ান। আদর্শবাদের সঙ্গেও বাস্তববাদ জড়ান। কোনটা ছেড়ে কোনটা নয়। মানুষ যা' দেখে শুধু তাই লেখে না, তার সঙ্গে তার মনের ভাবও থাকে। আবার, মনের ভাবটাকেই বড় ক'রে ধরল, বাস্তবের সাথে তার মিল রইল না, ব্যক্তি ও সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী, তা উদ্‌ঘাটিত হ'ল না—এই রকম হ'লে কিন্তু ঠিক হয় না।

চুনীদা প্রবৃত্তিপ্রসূত লেখা-সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তিগুলির ভিতর-দিয়ে libido (সুরত) enjoy (উপভোগ) করে। কিন্তু real enjoyment (প্রকৃত উপভোগ) হয় যদি concentric way-তে (সুকেন্দ্রিকভাবে) complex-এর (প্রবৃত্তির) meaningful adjustment (সার্থক নিয়ন্ত্রণ) হয়। তাই-ই আমরা চাই। এ যদি না হয়, তা হ'লে তা' সত্তা-পোষণী হয় না। বৈষ্ণব কবিরা শ্রীরাধার সুকেন্দ্রিক রকমটা সুষ্ঠুভাবে এঁকে দেখিয়েছেন, তাই তা' অত মধুর। যত complex-এর (প্রবৃত্তির) কথাই হোক, তার concentric adjustment (সুকেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণ)-এর চিত্র সাহিত্যিক যদি ফুটিয়ে তুলতে পারেন, তা'তেই লোকের কল্যাণ হয়।

দিনটা মেঘলা। খানিকটা আগে বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর খোলা তাঁবুতে বিছানায় ব'সে আছেন। চারিদিকে বহু মা এবং দাদা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন। খানিকটা আগে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) কলকাতা থেকে অনুশ্রুতি, Magnadicta, পথের কড়ি প্রভৃতি কতকগুলি বই ছাপিয়ে নিয়ে এসেছেন। সেইসঙ্গে পূজনীয় খেপুদাও এসেছেন।

কেষ্টদা নূতন ছাপান বইগুলি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে দিয়ে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বইগুলি এক-এক খানা ক'রে হাতে নিয়ে, পাতা উল্টিয়ে-উল্টিয়ে দেখতে লাগলেন এবং পরে বললেন—ভাল।

সন্ধ্যাবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের বারান্দায় এসে বসেছেন। কেষ্টদা, শরৎদা (হালদার), সুরেনদা (বিশ্বাস), কাশীদা (রায়চৌধুরী) প্রভৃতি অনেকে আছেন।

সত্যদা (দে) ও কানাইদা (গাঙ্গুলী) আসলেন।

সত্যদা ও কানাইদার ডায়বেটিস্। এতে কতকগুলি কোষ নাকি ম'রে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মনে হয়, কোষ মরেও যেমন, গজায়ও তেমন।

কেষ্টদা বললেন—কালিদাসদা আসামে ভাল কাজ করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—তিলক প'রেই এই, কপ্নি আঁটলে যে কী হবে, তা' তো বুঝতেই পারেন।

কেষ্টদা গল্পচ্ছলে বললেন—ঘুরে-ফিরে মনে হ'ল, লোকের মধ্যে ধর্ম্মভাব এখনও বেশ জাগ্রত আছে। আমাদের জিনিস যদি ভালভাবে চারান যায়, তাহ'লে বহু লোক পাওয়া যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই তো করা লাগে।

২৯শে আষাঢ় ১৩৫৬, বুধবার (ইং ১৩।৭।১৯৪৯)

দুপুরে ভোগের পর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে বিছানায় ব'সে আছেন। পাঁচুদা (চক্রবর্ত্তী) কলকাতা থেকে এসে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কাজকর্ম্মের খবর জিজ্ঞাসা করলেন। পাঁচুদা কাজের খবর দিতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পরমপিতার দয়ায় successful (কৃতকার্য) হ'য়ে দেশটাকে বাঁচাতে পার, তাহ'লে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাঠে গিয়ে বসেছেন। খেপুদা, কেষ্টদা, শরৎদা প্রভৃতি আছেন।

আশ্রমের জন্য একটা জমি নেওয়ার কথা হ'চ্ছে, সেখানে নাকি আজাদ হিন্দ বাহিনীর দেড়শ' সৈন্যকে গুলি ক'রে মারা হ'য়ে ছিল।

খেপুদা বললেন—দেশপ্রেমীর রক্তের একটা মূল্য আছে।

কেষ্টদা—অমন জায়গায় থাকলে মনটা কিছুতেই শান্ত থাকতে দেয় না।

খেপুদা—মন শান্ত থাকলে কি movement (আন্দোলন) হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনকে শান্ত না রাখলে, কিন্তু movement (আন্দোলন) করা যায় না। মন যত balanced (সমতাদীপ্ত) হয়, ততই কাজ করা যায়। মন ঠাণ্ডা মেরে

গেলেও movement (আন্দোলন) হয় না, আবার শান্ত না থাকলেও movement (আন্দোলন) হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—অনেক রাজনৈতিক আন্দোলনের রকম দেখে মনে হয়, নেতারা ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার জন্য অনেক কিছু করে। প্রকৃত লোক-কল্যাণের বুদ্ধি সাধারণতঃ কমই দেখা যায়। ইষ্টে উৎসর্গীকৃত প্রাণ না হ'লে, ঐ ভাবটা ঠিক্-ঠিক্ আসে না।

৩০শে আষাঢ় ১৩৫৬, বৃহস্পতিবার (ইং ১৪।৭।১৯৪৯)

কাল থেকে ঋত্বিক-অধিবেশন শুরু হবে। আজ অনেক লোকজন এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে সামনের খোলা তাঁবুতে ব'সে আছেন। তাঁর মনে আজ খুব আনন্দ। কোলকাতা থেকে যোগেনদা (ব্যানার্জ্জী) এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সঙ্গে দেশের পরিস্থিতি-সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে বললেন—ধর্ম্ম হ'ল গিয়ে মাথা, আর কৃষ্টি হ'ল গিয়ে মেরুদণ্ড। মাথা আর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিলে কি থাকে! Sentiment (ভাবানুকম্পিতা) বাদ দিলে জাতি united (ঐক্যবদ্ধ) হয় কী ক'রে?

একটু পরে হাতে একখানা লাঠি নিয়ে কাজল আসলেন। তিনি বললেন—সেই দিন একটা বিড়াল একটা পাখীকে মেরে ফেলে ছিল। তাই লাঠি দিয়ে বিড়ালটাকে বেশ লাগিয়ে দিয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে ওর ব্যথা লাগে তো!

কাজল—ও পাখিকে মারল কেন? তার তো লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও তা বোঝে না। ও মারে অথচ ভুলে যায় যে ওরও ব্যথা আছে, ওকে মারলে ওর লাগে। ও অন্যের কথা ভাববার শিক্ষা পায়নি।

কাজল—সেইদিন লাঠি নিয়ে খেলা করতে-করতে একজনের গায়ে লেগেছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন সাহসীও হওয়া ভাল, তেমনি বুদ্ধিমান-বিবেচক হওয়া ভাল, তা না হ'লে অনেক অপকর্ম্ম করা হয়ে যায়।

কিছু সময় পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষ united (ঐক্যবদ্ধ) হয়, কিন্তু স্বার্থের খাতিরে মিলিত হ'লে, তা টেকে না। অনেক সময় মানুষ টাকা, ব্যবসা, স্বার্থ ইত্যাদি নিয়ে মিলিত হ'তে চেষ্টা করে, কিন্তু তাতে কৃতকার্য্য হয় কমই। মানুষ integrated (সংহত) হয় সেখানে, যেখানে প্রত্যাশা থাকে না, দিয়ে খুশী হয় যেখানে। এক সঙ্গে ব্যবসা করতে গিয়ে প্রায়ই গোলমাল হয়। চোর-ডাকাতের দলেরও অমনি অবস্থা হয়। প্রবৃত্তির স্বার্থে integrated (সংহত) হয় না। প্রবৃত্তির ঊর্দ্ধে যেখানে, প্রেয়-অনুরাগ যেখানে, ত্যাগ যেখানে, সেবা যেখানে সেখানেই মানুষ concentric (সুকেন্দ্রিক) ও united (ঐক্যবদ্ধ) হয়। আমরা যদি দেশের-দশের মঙ্গল চাই তাহ'লে মানুষের ভিতর ইষ্টপ্রাণতা সঞ্চারিত করা ছাড়া পথ নেই। আর,

এই কাজে কৃতকার্য্য হ'তে গেলে, যা আমরা সঞ্চারিত করতে চাই, তা' আমাদের চরিত্রে প্রথমে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে হবে। ধর্ম্ম জিনিসটা চারায় সুগঠিত চরিত্র থেকে।

যোগেনদা—স্বার্থের চাইতে পরার্থ-পরতাই তো বড়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখনও মারাঠীরা রামদাস, শিবাজীর কথায় যতখানি মাতে, কবীর-পন্থীরা কবীরের কথায় যতখানি উদ্দীপ্ত হয়, বৈষ্ণবরা গৌরাঙ্গদেবের কথায় যতখানি সংহত হয়, ততখানি কি আর কিছুতে হয়? এই প্রেরণায় যারা সাড়া দেয়, তাদের মধ্যে লুচ্চা, চোরও হয়ত কত আছে, তবু তাদেরও ঐ আবেগ আছে। একই পিতা-মাতার সন্তান সেই sentiment (ভাবানুকম্পিতা), ignore (উপেক্ষা) ক'রে পাঁচ ভাইও স্বার্থের খাতিরে পৃথক হ'তে পারে, কিন্তু তাদের উপরও ধর্ম্মের প্রভাব কিছু না কিছু থাকেই, সে sentiment (ভাবানুকম্পিতা) একেবারে ignore (উপেক্ষা) করতে পারে না। তারা ভাবে এই আমাদের পরম পুরুষার্থ,—যা নাকি তাদের সব complex (প্রবৃত্তি) ছাপিয়ে তাদের সত্তায় গাঁথা থাকে। আর, সেইটেই কৃষ্টি-অনুরাগ। এ বিষয়ে লোকের কাছে বললে তারা বোঝে। বাম্মীজরা যাই হোক, তাদের কাছে বুদ্ধদেবের কথা ব'লে দেখেন, তারা হয়ত রাস্তায় দাঁড়িয়েই আপনার কথা শুনতে থাকবে। প্রবৃত্তি-প্রলোভনের থেকে যে integration (সংহতি), তা' ক্ষণস্থায়ী, স্বার্থে আঘাত পড়লেই তা' ভেঙ্গে যায়। তাই ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যানুগ চলন যত অবদলিত হ'বে, ভেদ তত তাড়াতাড়ি আসবে—ততখানি পৈশাচিক মূর্ত্তি নিয়ে। ধর্ম্ম হ'লো মাথা। আদর্শ ছাড়া আবার ধর্ম্ম টেকে না। তাই, চাই আদর্শ-অনুসৃত ধর্ম্ম। আর, মেরু হ'ল কৃষ্টি। মেরুর প্রত্যেকটি গাঁট হ'লো বৈশিষ্ট্যমাফিক সমন্বয়ী সংস্থিতি। আদর্শ বাদ দিয়ে ধর্ম্মের কথা যত কব, ধর্ম্ম কিছুতেই আর দানা বাঁধবে না। আর এই আছে ব'লে, আছে সত্তাপোষণী সমাহার। আমি ভাত খাই, ডাল খাই, তরকারী খাই, রুটি খাই, মিষ্টি খাই যা' খাই—তা' খাই আমার সত্তাকে পুষ্ট ক'রে তোলার জন্য। খাদ্য যদি পোষণী ক'রে না নিতে পারি, তা' হ'লে ক্ষতির কারণ হ'য়ে ওঠে। খাওয়া, বিয়ে করা, আহরণ সব বেলাতেই এটা দেখতে হয়। বিয়ে যদি সঙ্গতিশীল না হয়, তা'তে সত্তা বিধ্বস্ত হ'য়ে ওঠে। তা'তে স্বামী-স্ত্রীর শরীর-মনের খোরাক হয় না। তখন স্বাভাবিকভাবেই উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেধে যায়। পরস্পর সঙ্গতিশীল হ'লে, স্বামীর সত্তাকে পুষ্ট করা স্ত্রীর স্বার্থ হ'য়ে ওঠে এবং স্বামীরও স্বার্থ হয় স্ত্রীর সত্তাকে পূরণ করা।

যোগেনদা—সবাই বুঝতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বোঝাবার একটা ধারা আছে, একটা পথ আছে। যেমন ধরেন, আমের কথা তুললেন—বললেন বিভিন্ন রকমের আম আছে—ন্যাংড়া, ফজলি, বোম্বাই ইত্যাদি। এর প্রত্যেকের একটা ধরন আছে, রকম আছে। কে বড় কে ছোট কথা নয়। প্রত্যেক রকমেরই বিশিষ্টতা আছে, আর বিশিষ্ট প্রয়োজনও আছে। এর

সত্তাপোষণী nurture (পোষণ) চাই। চাষ চাই। একটা বৈশিষ্ট্য নষ্ট ক'রে দিলে, তার প্রয়োজন হ'লে আর পাব না।

যোগেনদা—আমাদের মাথাটা লম্বা হয়েছে, কর্ম্ম ও প্রেম তেমন হয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাথাটা লম্বা হয়েছে, কিন্তু সেই অনুযায়ী তো কাজ করেন না, তাহ'লে adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হ'ত, co-ordinated (সমন্বিত) হ'ত। ভাবা-করার যদি সময়ের সাথে সহযোগিতা না থাকে তবে দেখা যায়, সময়মত যখন যেটা মনে হওয়ার, তা' হয় না। সময় চ'লে গেলে তখন হয়ত মনে হ'ল। গোড়ায় অসঙ্গতির দরুন এমনটা হয়। ধরেন, ওকে পাঁচটা পয়সা দেবেন ভাবলেন, তখনই দেওয়া লাগে। তা' না দিয়ে ভাবলেন কাল দেব। এই রকম একটা দীর্ঘসূত্রতার দরুন নিজের ভিতর একটা অসহযোগ আসে। যখন যা' মনে পড়ার, যখন যা' করার, যখন যা' বলার তখনই তা' মনে পড়া, করা বা বলার অভ্যাসটা ভাঙ্গার পথে চলে। যখনই মনে আসল কিছু করা উচিত, তখনই তা' করা উচিত। এটা যদি না করেন, তাহ'লে দেখতে পাবেন যে কোর্টে গিয়ে মামলা-করার সময় যখন যে কথাটা বলার তা' বলতে পারছেন না। পরে হয়ত আপসোস হবে ঐ কথাটা বলা হ'ল না। সময়ের সাথে মাথার tune (একতানতা) না থাকায় এমনটা হয়। একটা অন্যায় বা অসঙ্গতি ডিম পাড়তে-পাড়তে চলে। একটার ফলে সেই chain-এ (শৃঙ্খলে) আরো পাঁচটা দোষ এসে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গত বললেন—আমি আমার ঠাকুরকে কতখানি ভালবাসি, আমার চরিত্রে তিনি কতখানি জীবন্ত, তার একটা মোক্তা বুঝ হ'লো—আমার চরিত্রে কতখানি জলুস, আমি যা'ই কই, যা'ই করি তা' প্রতি-প্রত্যেকের সত্তা-সম্বর্ধনী কিনা—সুকেন্দ্রিকভাবে। মধু খ্যাপা, বামা খ্যাপা কত স্থূল ভাষাও বলতেন। কিন্তু তাদের প্রত্যেকটি কথা এতখানি সুকেন্দ্রিক ও সত্তা-সম্বর্ধনী ছিল—ব্যষ্টি ও সমষ্টির দিক দিয়ে—যে প্রত্যেকেই ঐ কথা শুনে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠত। এমনতর চরিত্র নিয়ে চল, বল, কর দেখবে তোমার চরিত্র কত জীবন্ত হ'য়ে উঠবে। আর, তোমার জীবন্ত চরিত্র কতজনের জীবনীয় হ'য়ে উঠবে। এইভাবে তুমি দেশের, দশের, জাতির স্বার্থ হ'য়ে উঠবে।, এটা প্রাধান্যের লোভে না, তারা তৃপ্ত হবে, দীপ্ত হবে, সম্বর্দ্ধিত হবে, তাদের চরিত্রের জলুস বেড়ে যাবে। এটা ক্ষমতাপ্রিয়তা নয়, এটা হ'ল ক্ষেমপ্রিয়তা।

৩১শে আষাঢ় ১৩৫৬, শুক্রবার (ইং ১৫। ৭। ১৯৪৯)

আজ ঋত্বিক-অধিবেশন আরম্ভ। সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর খোলা তাঁবুতে, চৌকিতে বিছানায় পূর্ব্বাস্য হ'য়ে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় আছেন। বহুলোক চারিদিকে ঘিরে ব'সে আছেন।

মনোহরদা (ব্যানার্জ্জী) বললেন—আমি রবার-কেমিষ্ট, একটা রবার ফ্যাক্টরী খুলেছি। তা'তে যেন কৃতকার্য্য হতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটাত তোমারও স্বার্থ, আমারও স্বার্থ।

যাজনকাজ সম্বন্ধে কথা উঠল।

মনোহরদা—শক্তি দেন যেন ক'রতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—করাই শক্তি দেবে। 'তোমার পতাকা যা'রে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি।' পতাকা যখন পেয়েছ, তখন শক্তিও পেয়েছ। দেরী ক'রো না, কাজ কর।

মনোহরদা—কাজ করাকে বাড়ান যায় কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অভ্যাস করতে হয়। ব্যায়ামের মতো ভার তোলা। যেমন, প্রথমে হয়ত এক মন ভার তুলতে পারে না, কিন্তু ধীরে-ধীরে অভ্যাস করতে-করতে তখন হয়ত সহজেই পাঁচ মন ভার তোলে। ভিতরে উদ্যম থাকা চাই—অদম্য উদ্যম।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—দীক্ষা যত বাড়াবে, unity (ঐক্য) তত spontaneous (স্বতঃ) হবে।

মনোহরদা—আমি যেন আমার ফ্যাক্টরীতে বহুলোককে কাজ দিতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদত কাজ হ'ল, মানুষকে ইষ্টে যুক্ত ক'রে তোলা। সেইটে প্রধান কাজ। ওটা যদি ক'রতে পার, তখন আপনা-থেকে কত ফ্যাক্টরী গজিয়ে উঠবে।

যোগেন হালদারদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সাধারণ জ্ঞান আছে এমনতর কতকগুলি tactful (কৌশলী), intelligent (বুদ্ধিমান), un-repelling adherence (অচ্যুত নিষ্ঠাওয়ালা) worker (কর্ম্মী) যোগাড় ক'রতে হয়। তারা সাধারণতঃ unmarried (অবিবাহিত) হ'লে ভাল হয়। Married (বিবাহিত) হ'লে, পাছায় লোহার শিল বাঁধা থাকে, ইচ্ছা ক'রলেও ছুটতে পারে না। এইসব কর্ম্মী সর্ব্বত্র ছড়িয়ে দিয়ে, প্রত্যেক জায়গার লোক initiate (দীক্ষিত) ক'রে ফেলে দাবা কুমীরের মত থাকা লাগে। তখন যখন যে-অবস্থা আসে, সে-অবস্থায় চলতে হয়। Worker (কর্ম্মী) সৃষ্টি না করলে, নিজে যেই থাকতে পারলেন না, অমনি কাজ বন্ধ হ'য়ে গেল। মানুষকে দীক্ষিত করা লাগে। নচেৎ কংগ্রেসের মেম্বারের মত মেম্বার হ'লে হবে না। যত লোক দীক্ষিত হবে, তত তারা পারস্পরিকভাবে স্বার্থান্বিত হবে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ তখন আপনিই আসবে।

জনৈক দাদা—ইষ্টভৃতি ক'রা সত্ত্বেও যজন-যাজনটা আসে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক'রতে-ক'রতেই আসে। যাজন-মানে তো ভাল কথা কওয়া। মানুষকে সুখ, সুবিধা, শান্তির কথা কয়ে, সেই পথ ধরান। যজন মানে তো তাই পালন করা নিজে। এই তো!

আর এক দাদা বললেন—আমার সব সময় এই কাজ নিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। নিজের প্রয়োজন থাকায় সব সময় পেরে উঠি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সংসারের প্রতি কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে ধর্ম্মকে পরিপালন করা চাই। সাংসারিক কাজ-কর্ম্ম বাদ দিয়ে, ধর্ম্ম তো একটা আলাদা কিছু নয়। আর, বাস্তব জীবনকে বাদ দিয়ে ধর্ম্ম যদি আলাদা কিছু হয়, সে ধর্ম্ম টেকে না।

কেষ্টদার কাল খুব শরীর খারাপ গেছে। আজ অনেকটা ভাল আছেন, ঋত্বিক-অধিবেশনে যেতে চান। তাই শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে অনুমতি নিতে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আপনি যদি পারেন এবং মিটিং ক'রেও ভাল থাকেন, তাহ'লে আমি খুব আনন্দ পাব, ভাল লাগবে। কিন্তু শরীর যদি আবার খারাপ হ'য়ে পড়ে, তাহ'লে কিন্তু ঘাবড়ে যাব—তাই বুঝে যা হয় করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে যোগেন ব্যানার্জ্জীদাকে বললেন—আমরা সময়মত করিনি, খুব দেরী করে ফেলেছি। তা' খেটে পূরণ করা লাগবে। শরীরকে তেমন তাজা রাখা লাগবে, যাতে সর্ব্বদা খাটা যায়।

প্রিয়নাথদা (বসু)—সাপে যদি ব্যাঙ ধরে এবং তখন ঐ ব্যাঙ যদি আর্তস্বরে চীৎকার করে, তখন চেষ্টা ক'রে তাকে বাঁচান কি ঠিক নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ছোটকাল থেকেই ঐ চেষ্টা করতাম। বাঁচানই আমার বুদ্ধি। এ-কথা আমার মনে হত না—ও খেয়ে বাঁচুক। একজনের প্রাণের ডাকের থেকে এক জনের ক্ষুধা আমার কাছে বড় নয়। আমার মনে হয়, আমি ঐ রকম অবস্থায় পড়েছি। আমি আছি, আমাকে যদি কেউ গিলতে চায়, তখন কেমন হয়? নিজের প্রাণের দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে অপরের প্রাণ রক্ষা করাই আমাদের ধর্ম্ম।

৩২শে আষাঢ় ১৩৫৬, শনিবার (ইং ১৬।৭।১৯৪৯)

আজ পঁয়তাল্লিশতম ঋত্বিক-অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে খোলা তাঁবুতে ব'সে আছেন।

মনোহরদা (ব্যানার্জী) জিজ্ঞাসা করলেন—ভাল-মন্দের মানদণ্ড কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখতে হবে তা' সপরিবেশ তোমার সত্তা-সম্বর্দ্ধনী কিনা। আর একটা আছে বেকুবের মত বুদ্ধি—যাই কর, যাই ভাব, যেভাবেই চল, তাতে ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠা হয় কিনা। এই মাপকাঠিকে মেপে-মেপে চললে, এটা কঠিন কিছু না, একটা মেয়েছেলেও বোঝে।

মনোহরদা—আমাদের কি স্বাধীনতা আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বাধীনতা না থাকলে চলি কি ক'রে।

এক দাদা বললেন—সব কিছুই তো অনেকখানি নির্দ্ধারিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তি চলনের দরুন মানুষের ভাগ্য যেমনভাবেই নির্দ্ধারিত হয়ে থাকুক না কেন, তা' অনেকখানি পরিবর্ত্তিত হতে পারে, সক্রিয়, শ্রেয় অনুরাগের ভিতর-দিয়ে।

মনোহরদা তাঁর দাদামহাশয়ের মানসিক দ্বন্দ্বের কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার অনুরাগ এতখানি সুকেন্দ্রিক ও তীব্র হয়ে ওঠা চাই, যাতে প্রবৃত্তি তাকে অবরুদ্ধ করতে না পারে। সবটা ভেদ ক'রে সেটা ফুটে ওঠা চাই।

কেউ যদি বিল্বমঙ্গল, বাল্মীকি, সুরদাসের মতো অনুরাগসম্পন্ন হয়, তার চরিত্রে আবোল-তাবোল যাই থাক, কিছুতেই তাকে আটকাতে পারে না।

মনোহরদা—ঠিক মতো চলতে না পারলে, একটা বেদনা তো মানুষের মনে লেগেই থাকে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেদনাই তো অনুরাগ জাগায়।

মনোহরদা—অবদমন থাকলে তো এ পথে এগোতে দেয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালবাসা থাকলে মানুষ যেমন ভাবে, বলে ও করে অন্তরের আকুতি নিয়ে, তেমনি ইষ্টের জন্য ভাবতে, বলতে ও করতে থাকলেও ইষ্টানুরাগ পেয়ে বসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে বললেন—গুরুর প্রয়োজন খুব। শিবাজী রামদাসের প্রতি ভক্তি থেকে যা' করে গেলেন, তার তুলনা হয় না। সেইদিনকার মূর্খ বামুন পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে ব'সে থাকতেন, মা-মা ক'রে ডাকতেন, নাচতেন, গাইতেন। পাগল মানুষ আনন্দে বিভোর। বিবেকানন্দ তাঁর স্পর্শের অধিকার পেয়ে যা' ক'রে গেলেন, তা'কি কল্পনায় নাগাল পাও?

মনোহরদা—মানুষ ধর্ম্মের ব্যাপারে সাড়া দেয় না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার চরিত্র, চলন যতই উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, মানুষ তোমার সংস্পর্শে ততই ভালর আকর্ষণ অনুভব করবে। মানুষ যে সাড়া দেয় না, তার কারণ সত্তা-সম্বর্দ্ধনী আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টি বহুদিন আমাদের দেশে উপেক্ষিত।

যোগেনদা—যাজন করতে গেলে প্রায়ই দেখা যায় যে, এতই ভুল ধারণা যে তার নিরসন করাই দায়। গোড়া থেকে আরম্ভ ক'রে নতুন ক'রে বোঝাতে হয়। তাও কি বোঝে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কত কাল করিনি। তাই মানুষকে শেখান লাগবে। তাদের পেছনে লেগে থাকতে হবে। এছাড়া উপায় কী?

মনোহরদা বললেন—জাপানে কুটির শিল্প হিসাবে রবার শিল্পের বিশেষ স্থান আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারিবারিক শিল্প যত হয় তত ভাল। তা'তে educated (শিক্ষিত) হবার একটা interest (নেশা) হয়। Otherwise (অন্যথা) mechanical (যান্ত্রিক) হয়ে যায়। কোন-একটা কাজের সামান্য একটু অংশ নিয়ে যদি সারাজীবন ব্যাপৃত থাকে এবং অন্য কিছু না শেখে, না জানে, তাহলে কোন-কিছু সম্বন্ধেই জ্ঞান হয় না। বাড়ীতে কিন্তু তা' চলে না, সবটুকুই শেখে। এখানে কিন্তু যে-ই শ্রমিক, সেই মালিক। এতে বহুসমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তাই আমাদের শাস্ত্রে মহাযন্ত্র প্রবর্ত্তন নিষিদ্ধ করেছে। শিল্পকে যত পারিবারিক স্তরে নিয়ে আসা যায়, ততই মঙ্গল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হ'য়ে মাঠে উপবিষ্ট। মতিবাবু

(ব্যানার্জী) নামক স্থানীয় এক ভদ্রলোক এসে বসলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—মানুষের মন স্থির হয় কী করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টে অনুরাগ যার যত বেশী, তার মন তত কেন্দ্রায়িত ও স্থির।

মতিবাবু—এটা তো আর তাড়াতাড়ি হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার আগ্রহ যত বেশী, তার তত তাড়াতাড়ি হয়। চিত্তস্থির হওয়া মানে concentric (সুকেন্দ্রিক) হওয়া। সমাধি হওয়া মানেও তাই—সবদিক দিয়ে ধারণ করা।

মতিবাবু—চিত্তস্থির হওয়া আর সমাধি কি এক জিনিস ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চিত্ত যত স্থির হয়, তত সমাধি হয়। চিত্তস্থিরতার ফল সমাধি।

মতিবাবু—সমাধির পরের অবস্থা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিক সমাধি যখন হয়, তা' থেকে যখন নেবে আসে, অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার নিয়ে আসে। সমাধি যেন চেতন ঘুম—একটা জিনিসের চেতনায় নিরন্তর হ'য়ে তাকে সম্যক ধারণ করা। সমাধিতে ব্যাপারগুলিকে তীব্র ও সমগ্রভাবে ধারণা করা হয়।

মতিবাবু—সব কি জানতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে যেমন practice (অনুশীলন) করে, সে তেমন পারে।

মতিবাবু—কিসে সব জানা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবানে অনুরাগ যত হয়, ততটা সমাহিত হয়। জানার পথও ততটা খুলে যায়। সমাধি কারও আবার টাকায় হয়, স্ত্রীতে হয়। যার যাতে সমাধি হয় তার ফলও তেমন হয়।

মতিবাবু—সবটা জানার মধ্যে আসে কি করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাথার এমনতর tune (একতানতা) হয় যে, জানতে পারে। রেডিওর মত passive (নিষ্ক্রিয়) হ'য়ে ধরতে পারলে ধরা পড়ে।

মতিবাবু—ভবিষ্যতেরটা কিভাবে জানা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাও ঠিক পায়। কোন্ জিনিসটা দেশকালপাত্রভেদে গড়িয়ে কী দাঁড়াবে, তাও ধরা যায়। এটা একটা অযৌক্তিক বা আজগবী ব্যাপার নয়।

মতিবাবু—সাধন-তপস্যা তো করতে হয়। কিন্তু সিদ্ধি তো কঠিন কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে যদি ধর্ম্মকে প্রতিপালন করি, concentric (সুকেন্দ্রিক) হই, ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠাপন্ন হই, তবে ভিতরে একটা meaningful adjustment (সার্থক বিন্যাস) হয়, প্রত্যেকটা aspect-এর (দিকের)। তখন একটা proper impression (যথাযথ ধারণা) হয়। সেই impression (ধারণা)-ই তো জ্ঞান।

মতিবাবু—নাম করায় কি রক্তের 'পর ছাপ পড়ে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুনিয়ার প্রত্যেকটা সাড়া আমাদের মাথার উপর ছাপ রেখে যায়।

নামের সাথে কোন ভাব আস্‌লে নামের সাড়াও তার সঙ্গে থাকে, channels of association (অনুষঙ্গের ধারা)-ও বেড়ে যায়। এইভাবে মেধা নাড়ীর উদ্ভব হয়। যার আকুলতা যত বেশী, তার তত হয়।

মতিবাবু জন্ম-মৃত্যু, জীবাত্মা ইত্যাদি সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইঞ্জিনের ভিতর বাষ্প ক্রিয়া করে। ইঞ্জিনটা নষ্ট হ'য়ে গেল। ইঞ্জিনটা যেন শরীর আর জীবাত্মা হলো ঐ বাষ্প। জীবাত্মা নানারূপ নেয় প্রবৃত্তি-অনুযায়ী। এর পিছনে থাকে cohesive urge (সংসক্তির আকৃতি)। তার থেকে হয় cell-division (কোষ বিভাজন)। সেই urge ও cell-division (আকৃতি ও কোষ বিভাজন)-অনুযায়ী জীবাত্মা রূপ পরিগ্রহ করে।

মতিবাবু—তার পাপ কর্ম্ম কি যাবে সাথে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মৃত্যুর সময় যে-চিন্তা নিয়ে যায়, সেই ভাব নিয়ে আসে।

মতিবাবু—অন্যায় ক'রেও যদি কেউ তাঁকে স্মরণ ক'রে মরতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁকে যে মরণের সময় স্মরণ করতে পারে পাপ তার সত্তাকে অভিভূত করতে পারেনি। যে-বৃত্তি স্মরণ করে যাব, সেইটেই হ'লো জীবনের গভীরতম বৃত্তি। তাইই পরজন্ম নির্দ্ধারণ করবে।

কথাপ্রসঙ্গে মতিবাবু বললেন—টান জিনিসটা সহজ নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' নিয়ে নাড়াচাড়া করি, চর্চ্চা করি, সেবা করি, তার 'পরে টান পড়ে। বদমাইসি করেছি, ছেলে হয়েছে। তার 'পর হয়ত টান নেই। কিন্তু যে-ছেলেটাকে মানুষ করেছি, খাইয়েছি, পরিয়েছি, তার 'পর কিন্তু সহজে টান হয়।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর খোলা তাঁবুতে চৌকীর উপর ব'সে আছেন। আশ্রমের অনেকেই উপস্থিত। দুজন ভদ্রলোক বাইরে থেকে আসলেন। কথাপ্রসঙ্গে একজন জিজ্ঞাসা করলেন—দীক্ষা না নিলেও তো হতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের ভিতর প্রবৃত্তি-অভিভূতি থাকে। এই অভিভূতি যত বাড়ে, তত আমাদের সত্তা ক্ষুণ্ণ হয়। এই অভিভূতি যত কমে, তত বাঁচাবাড়ার দিকে যাই। দীক্ষার অনুশীলনে সেই পথ খোলে।

প্রশ্ন—মঙ্গল হলেই তো হ'লো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মঙ্গল কী ?

উক্ত ভদ্রলোক—খাওয়া-দাওয়া, সুখে থাকা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—থাকা আর খাওয়াটা বাঁচার জন্য। আর আমরা চাই এটা ব্যাহত না হয়। শুধু ভালভাবে খাওয়া-থাকায় সুখ হয় না। এর পিছনে চাই আনন্দ, ফুল্লতা, বিকশিত হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া। একটা static (নিথর) থাকায় সুখ নেই, তাতে বিরক্তি আসে। Dynamic (গতিশীল) হওয়া চাই। চলা চাই আদর্শাভিমুখে। এটা বাঁচাবাড়ার পরিপোষক হওয়া চাই। ফুল্ল হওয়া যাকে বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে যতি-আশ্রমে আসলেন। শরৎদা (হালদার) একজনের সম্বন্ধে বললেন—তিনি বলেন—ধর্ম্মটর্ম্ম বুঝি না। তবে দেশের ঐক্য চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মটর্ম্ম বুঝি না কথাটা মানুষ কয় যেন গৌরবের সঙ্গে। অথচ ধারণাটা বিশ্রী। মনে হয়—the whole trouble lies concentrated there (সমস্ত গোলমাল এখানে কেন্দ্রীভূত)।

১লা শ্রাবণ ১৩৫৬, রবিবার (ইং ১৭।৭।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে খোলা তাঁবুতে উপবিষ্ট। অনেকেই উপস্থিত। কেষ্টদা বললেন—একটা বইয়ে পড়েছি মাঝে-মাঝে উপবাস পাগলামির প্রতিষেধক।

প্রফুল্ল—শুনেছি নির্জ্জলা উপবাস খারাপ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেক সময় শরীরে যে বেশী জলীয় অংশ ও রস থাকে, নির্জ্জলা উপবাসে তাই নিষ্কাশিত ক'রে দেয়। তাই নির্জ্জলা উপবাস যে সব সময় খারাপ তা' নয়।

ঢাকার একজন হিন্দুকে মুসলমান করা হয়। ভদ্রলোক দিনাজপুরে নজরবন্দী অবস্থায় ছিলেন। সেখান থেকে কোনভাবে চ'লে এসেছেন। এখানে এসে শুদ্ধি ও নাম গ্রহণ করেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—যখন তোকে কলমা পড়ালো, যখন ওখানে ওদের মধ্যে ছিলি, কেমন লাগতো ?

উক্ত দাদা—তখন আমার মনে হতো যে, আমার বুকের মধ্যে যেন একটা পাথর চাপা পড়েছে, জেলের চাইতে বেশী যন্ত্রণা হতো। কী কষ্ট কেউ বুঝবে না। ভিতরে এত কষ্ট, কিন্তু মুখে কিছু বলার জো নেই। এখন শরীরটা মনে হয় শোলার মত হালকা।

এক দাদা পোল্ট্রি করা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তরকারী, ফল ইত্যাদির বাগান করা ভাল। পোল্ট্রিতে পরিশ্রম নাই তেমন। পরিশ্রম না করলে জীবনের বিস্তার ক'মে যায়। তাতে যোগ্যতা কমতে থাকে। পরিশ্রমহীন পাওয়া জীবনকে সংকুচিত করতে থাকে। পোল্ট্রি ক'রে সেইটি আবার বিক্রী করবে তাকে কেটে ফেলার জন্য—যার জীবন আছে, বোধ আছে তোমার মতো। আহার, নিদ্রা, ভয়, সুখ, দুঃখ বোধ যার তোমার থেকে তফাৎ নয়। এটাও বিস্তারের অনুকূল নয়। তোমার পক্ষে সবচেয়ে ভাল পছন্দমত কৃষি। এতে প্রীতি ও আত্মপ্রসাদ আছে।

পরে জনৈক দাদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষ concentric (সুকেন্দ্রিক) না হলে তৃপ্ত থাকে না। সন্তুষ্ট থাকে না, ফুল্লভাব থাকে না, আনন্দ থাকে না, তার সন্তোষ বলে জিনিস থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর মনোহর ব্যানার্জ্জীদাকে বললেন—পঞ্চবর্হি ও সপ্তার্চ্চি এমন ক'রে গেড়ে দেওয়া চাই যাতে সত্তায় সংবিদ্ধ হ'য়ে যায়।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে বললেন—লোকের যদি দোষও থাকে, তাদের ঘৃণা করো না। নিজে ইষ্টে অটুট থেকে, তাদের সঙ্গে প্রীতি ও ভালবাসা নিয়ে মিশতে হয়। তাদের জবরদস্তি ক'রে লাভ হয় না। তোমার আচরণ যদি ঠিক থাকে এবং তাদের শ্রদ্ধার্হ যদি হ'তে পার, তোমার আকর্ষণ যদি বোধ করে, তবে তোমার প্রতি অনুরাগে তাদের দোষ ছেড়ে যাবে। দোষের প্রতি আকর্ষণ তাদের শিথিল হ'তে থাকবে। খ'সে পড়তে থাকবে। আর, এর ভিতর-দিয়ে পরখ হবে—ভালটা তোমার মধ্যে কতখানি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তুমি কতখানি প্রকৃত হয়েছ।

যাজনের মধ্যে তর্কের অবতারণা করা সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের বোঝার একটা channel (ধারা) আছে, attitude (ভাব) আছে, সেটা ভেঙ্গে দিলে ভাল হয় না।

জনৈক দাদা—বিবাহ-নীতি কেমন হওয়া উচিত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা চাই মানুষগুলি সুষ্ঠু জৈবী সংস্থিতি নিয়ে আসুক। কোন খাঁকতি চাই না। সেইজন্য এ সম্বন্ধে সর্বাঙ্গীণ সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। নইলে স্বামী, স্ত্রী ও সন্তান উভয়ের পক্ষে খারাপ হয়।

উক্ত দাদা—স্ত্রীর বহু বিবাহে দোষ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে সুপ্রজননের দিক থেকে ভাল হয় না। স্ত্রী যদি concentric (সুকেন্দ্রিক) না হয়, তবে তার secretion (ক্ষরণ) ঠিক হয় না। সে proper nurture (যথাযথ পোষণ) দিতে পারে না। সে যত একনিষ্ঠ স্বামীভক্তিপরায়ণ হয়, ততই সন্তানকে উপযুক্ত পোষণ দিতে পারে। মেয়েদের বহুবিবাহের অধিকার নেই। তাই ব'লে যে তাদের শক্তি কিছু কম, তা' নয়। তাদের স্নায়ুর তুলনা হয় না। তাদের প্রত্যেকটি কোষ কতখানি সহনশীল। পুরুষের সেদিক থেকে তাদের সঙ্গে তুলনাই হয় না। সন্তানপালনের ধকল তারা যেমন ক'রে নিতে পারে, পুরুষের পক্ষে তা' অসম্ভব। তাদের বহুবিবাহ যে নিষিদ্ধ সে law of nature (প্রকৃতির বিধি) অনুযায়ী। এর মানে এ নয় যে তারা পুরুষের থেকে নিকৃষ্ট।

দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুপ্রজননের দিক দিয়ে তার ফল ভাল হয়নি। আমরা চাই—একের জন্য অর্থাৎ একের পরিপূরণার্থে সবাইকে ভালবাসতে। নচেৎ বিচ্ছিন্নতা ও বিকেন্দ্রিকতা এসে পড়ে।

এক মা বিদায় নিতে এসে বললেন—খুব আনন্দে ছিলাম, আজ যেতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে বললেন—মঙ্গলের পথে চলবি, মঙ্গল যাতে হয়, তাই করবি।

বহিরাগত এক দাদা জিজ্ঞাসা করলেন—এখন আমার করণীয় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঝাঁপিয়ে পড়। মাহিষ্য বীর্য্য আবার জাগিয়ে তোল।

উক্ত দাদা—আমি চাই যাতে পূর্ণ জ্ঞান হয়। কেমন ক'রে হবে বলুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টানুরাগযুক্ত কর্ম্মের ভিতর-দিয়েই জ্ঞান হয়। দেশের আজ বড় দুর্দ্দিন, দেশকে বাঁচাও…তুমি দীক্ষা নিয়েছ ?

উক্ত দাদা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দীক্ষা নাও, নাম কর। ধর্ম্মকে প্রতিপালন কর প্রতিপদক্ষেপে। ধর্ম্ম জীবন্ত হয়ে উঠুক তোমাতে। সেই জীবন নিয়ে সকলের কাছে যাও। সকলকে জীবন্ত ক'রে তোল। মাহিষ্যের বীর্য্য আবার ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠুক তোমাতে।

উক্ত দাদা—আপনার পূর্ণ আশীর্ব্বাদ আছে তো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার আকুল প্রার্থনা পরমপিতার চরণে। বলি, এই মুহূর্ত্তে ঝাঁপ দাও। এরমধ্যে এম-এ-টা পাশ করে নাও।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু পরে বললেন—মা যে আমাকে মারতেন এত। তবু তার মধ্য-দিয়েও মার স্নেহ যেন অনুভব করতাম। বাবা আমাকে জীবনে একটা চড়ও দেননি। কিন্তু তবু আমার মা'র 'পরেই নেশা ছিল খুব। বাবা যখন মারা গেলেন, তখন আমার লেগেছিল খুব। তবু মা ছিলেন তাই যেন তত বোধ করতে পারিনি। মা যাবার পর মা-বাবা দুজনের অভাবই একসঙ্গে যেন উগ্র হয়ে উঠলো।

এরপর কেষ্টদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মনোহরের (সরকার) conception (বোধ) ভাল। কোন বিষয় বললে তার নানাদিক তাড়াতাড়ি ধরতে পারে।

২রা শ্রাবণ ১৩৫৬, সোমবার (ইং ১৮।৭।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় এসে বসেছেন। যামিনীদা (রায়-চৌধুরী) একজনকে পাঞ্জা দেবার কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেকদিক হিসাব ক'রে পাঞ্জা দিতে হয়। পাঞ্জা দিলে সব সময় ভাল হয় না। অনেক সময় খারাপ হয়। Nerve (স্নায়ু) দেখে না দিলে কাজের barrier (বাধা) মত হ'য়ে দাঁড়ায়।

যামিনীদা—স্ত্রীকে কি স্বামীর পোষণ করাই লাগবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! স্বামীর স্ত্রীকে পোষণ করা লাগবে। কিন্তু স্ত্রীর যে স্বামীকে পোষণ করা লাগবে না, তা' নয়। কর্ত্তব্যটা কেবল স্বামীর নয়। স্ত্রীরও আছে। সাধারণতঃ স্ত্রী যদি কায়মনোবাক্যে পোষণী ও সহনশীল হয়, স্বামীপূরণী হয়ই। স্ত্রী স্বামীকে পোষণ না দিলে স্বামীর পূরণপ্রবৃত্তি ও পূরণক্ষমতা শিথিল হ'য়ে যায়। তবু সাধ্যমত তার কর্ত্তব্য তার করাই ভাল।

একটুবাদে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যামিনী খুব বুদ্ধির কাজ করেছে। ওকে বিয়ে দেবার কত চেষ্টা করেছে, কিন্তু বরাবর ও বুদ্ধি ক'রে এড়িয়ে গেছে, বেশ করেছে। দেখলাম, কর্ম্মীদের মধ্যে যতগুলি বিয়ে করল, তাদের প্রায়গুলিকেই আগে যতটুকু পাওয়া যাচ্ছিল, তা' আর পাওয়া যায় না। তারা যে গৃহীদের উদ্দীপ্ত করবে, আদর্শ

দেখাবে, তা' পারে না। তেমন nerve (স্নায়ু) যদি থাকে, আর ঠিক-ঠিক বিয়ে যদি হয়, তাতে ভাল হবারই কথা। কিন্তু বেশীর ভাগের এমন nerve (স্নায়ু) যে বিয়ে ক'রে দেবে যায়।

হীরালালদা (চক্রবর্ত্তী) পুত্র হিতাংশু সহ আসলেন। হিতাংশু ভাল বক্তৃতা করতে পারে সেই কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভাল orator (বাগ্মী) হওয়ার চেষ্টা করা লাগে। বার্ক যে-সময় বক্তৃতা করতেন, মানুষ নাকি অজ্ঞান হ'য়ে পড়ত। সেইরকম হওয়া লাগে।

হীরালালদা কলকাতার উৎসব সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উৎসব করতে গেলে সমস্ত দলকে উৎসাহী ক'রে, তাদের সক্রিয় সমর্থন নিয়ে করতে হয়, তা' হ'লে অযথা বিরোধ কমে।

সুরেশ রায় বাড়ীর লোকের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ জানাচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—তুই যে কবীরের কথা ভুলে গেলি—

'সবসে রসিয়ে সবসে বসিয়ে
সবকো লীজিয়ে নাম
হাঁজী ! হাঁজী করতে রহো
বৈঠা আপনা ঠাম।'

—এই কথাটুকু মনে রেখে চলতে পারিস্ না ? মানুষের inferiority (হীনম্মন্যতা) আছে তো ? ভাল কথাই কি সব সময় নিতে পারে ? ভাবে, তাতে ছোট হ'য়ে যেতে হবে। সেইজন্য ভালকথা নিয়েও বাড়াবাড়ি করলে মানুষ সয় না, উল্টে খাটো করতে চায়। যে যা' বলুক—ঝগড়া বিরোধ এড়িয়ে চলতে হয়।

৩রা শ্রাবণ ১৩৫৬, মঙ্গলবার (ইং ১৯।৭।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। যতিদের সঙ্গে কথা বলছেন। এমন সময় লালমোহনদা (দাস) ও বৈদ্যনাথদা (শীল) এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের সর্ব্বগুণসম্পন্ন নিষ্ঠাবান কর্ম্মী সংগ্রহের কথা বললেন। এই প্রসঙ্গে একটি বাণীও প'ড়ে শোনান হলো।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নিজেদের বৈশিষ্ট্য অটুটভাবে ধ'রে না থাকলে জাতি বাঁচবে না।

মণি (কর)-দাকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যত মহাপুরুষ এসে গেছেন সবাই প্রকারান্তরে একই কথা ব'লে গেছেন। আমরাই তা' বিকৃতভাবে পরিবেষণ ক'রে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছি। ধর্ম্ম নিয়ে বিরোধের কোন কারণ নেই। উন্নতির পথ সবার জন্যই উন্মুক্ত।

মণিদা—আমাদের এ অবস্থাটা আসলো কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সমাজের শ্রেষ্ঠ ও পদস্থ যারা, তারা যদি স্বার্থবশে পরস্পর বিদ্বেষ-

পরায়ণ হয় এবং জাতীয় স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ ক'রে নিজেদের স্বার্থ সাধন করতে চায়, তাহ'লে হয় মহতী বিনষ্টি। পৃথ্বীরাজ জয়চাঁদের ব্যাপারটাই ভেবে দেখ না। আর একটা কারণ হয়েছে মহাপুরুষে মহাপুরুষে ভেদ ক'রে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছি। পূর্ব্বতন ও পরবর্ত্তীকে শ্রদ্ধা করার কথা শেখাইনি। আমরা সাত্বত আভিজাত্যকে বাদ দিয়ে হীনম্মন্য অহংকারকে প্রশ্রয় দিয়েছি। আমাদের movement (আন্দোলন)-গুলি হয়েছে suicidal (আত্মঘাতী)। মানুষের sentiment (ভাবানুকম্পিতা) হ'লো তার মাথা। কৃষ্টি হ'লো spine (মেরুদণ্ড)। এই দুটোকে থেঁতলে দিয়ে কি বাঁচে ? একবার লেগে যদি দেখাতিস, তোদের মাথার জোর, চোখের জোর, চরিত্রের জোর মানুষ দেখে নিত। তোদের রক্ত এখনও যায়নি। একটা মানুষ দেখেছিলাম সেই সি. আর. দাস। অমন মানুষ আর দেখিনি। কপালে টিকল না। আমি তখন তো ভাল ক'রে কথাও বলতে পারতাম না। তাই থেকেই সব ধরত। ছাত্রের মত শুনতো, বুঝতো, করতো। আর, অনুলোম অসবর্ণ বিবাহটা বন্ধ করা ভাল হয়নি। আমরা চাই বিহিত বিবাহের ভিতর-দিয়ে ঘরে-ঘরে নারায়ণ জন্মাক, ভগবান জন্মাক। আমরা যদি বাংলা-টাকে বৈশিষ্ট্যমাফিক গ'ড়ে তুলতে পারি, সারা ভারত, সারা জগৎ তা' থেকে পথ পেতে পারে। আদর্শ, কৃষ্টি, বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আমরা মানি। যে বাদই হোক এর পরিপোষক যে তাকে আমরা মানি। পঞ্চবর্হি যারা মানে তাদেরও আমরা স্বীকার করি। সপ্তার্চ্চি ওরই বিস্তার। আর, দু-আনা চার-আনার মেম্বার করলে হবে না। দীক্ষা চাই, যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি চাই। ভালমন্দ সবরকম লোক থাকা সত্ত্বেও ওর ভিতর-দিয়ে material ও spiritual unity (ভৌতিক ও আত্মিক ঐক্য) আসে। পরস্পরের জন্য একটা বোধ আছে ব'লেই এই দুর্দ্দিনে টিকে আছি। তথাকথিত নেতার মূল্য কী ? আজ যাকে রাজা করছে, কালই তাকে ঘাড় ধ'রে নাবাচ্ছে।

জনৈক দাদা—বড়-ছোট ভেঙ্গে দিতে পারলে বোধহয় হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাঙ্গব কি ? নাবাব কি ? সকলকে উপরে তুলব। সেই তো কাজ। গৌরবের জীবন যদি না হ'লো, জয়ের জীবন যদি না হ'লো, কৃতিত্বের জীবন যদি না হ'লো, তবে কি হ'লো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জ্ঞানদা (চক্রবর্ত্তী)-কে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—বামুনের ছিল উঞ্ছ-বৃত্তি। মানুষ খুশী হ'য়ে যা' দিত তাতেই চালাত। যজমানের প্রতি কতখানি মমতা ছিল। কিভাবে রক্ষা করত। বলির গুরু শুক্রাচার্য্য বলিকে বাঁচাতে গিয়ে, গাড়ুর নলের মুখ আটকে বসেছিলেন। চোখ বিঁধিয়ে কানা ক'রে দিল। তবু বাঁচাবার চেষ্টা ছাড়েননি। যজমানের জন্য করেন, যজমানকে বাঁচান, যজমানের 'পর দাঁড়ান। আমাকে যে দেয়, না নিলে দুঃখিত হয়। এটাকে কী বলবেন ? আপনাদের মঙ্গল ছাড়া আমার তো কোন চাহিদাই নেই। এই নিয়েই লেগে থাকি।

জ্ঞানদা— আমাদের বেলায় বলবে, লোককে শোষণ করছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' কেন ? এই কাজ না ক'রে যা' করছেন, তাতে অন্যায় করছেন। ভগবান আপনাকে লোকবর্দ্ধনের জন্যই পাঠিয়েছেন।

মণিদা—যুবকদের মধ্যে কৃষ্টির প্রতি নিষ্ঠা ক'মে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজেরা নিষ্ঠাবান হ'য়ে যাজনমুখর হ'য়ে সে-স্রোত ফেরান লাগে। কোন্‌টা কেন করণীয়, কোনটা কেন করণীয় নয়, সেটা যুক্তি-বিচারসহ মাথায় ধরিয়ে দেওয়া লাগে। শুধু জবরদস্তি করলে হয় না।

Politics (রাজনীতি বা পূর্ত্তনীতি) সম্পর্কে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এর পিছনে আছে পূরণ, পোষণ। সত্তা-সম্বর্দ্ধনাকে যা' পূরণ করে, পোষণ করে, তাই পলিটিকস। সে কথা কে শোনে, কে বোঝে, কেই বা করে ? ভগবত্তার পথে চলা ছাড়া মানুষের মঙ্গল নেই। তোমার মধ্যে ভগবত্তাও আছে, বৃত্তিবত্তাও আছে। তোমার ভগবত্তা যত বাড়বে, বৃত্তিদাস্য তত কমবে। বৃত্তিবত্তা যত বাড়বে, ভগবত্তাও তত কম পড়বে। তোমার মধ্যে ভগবত্তা প্রবল হোক, তখন বৃত্তি তোমার সত্তাকে কাবু করতে পারবে না। তখন পলিটিক্স সার্থক হবে।

৫ই শ্রাবণ ১৩৫৬, বৃহস্পতিবার (ইং ২১।৭।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে গোল তাঁবুতে বিছানায় শুয়ে আছেন। মাঝে তাঁর শরীর খুব খারাপ করেছিল। পেটের অসুখ, মাথাধরা, গা-জ্বালা ইত্যাদিতে কষ্ট পাচ্ছিলেন। আজ অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), নিম্মর্লদা (দাশগুপ্ত), শৈলেশদা (ব্যানার্জ্জী), নিরাপদদা (পাণ্ডা), বঙ্কিমদা (রায়), প্রভাতদা, মণিদা প্রভৃতি আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর টুকটাক কথাবার্ত্তা বলছেন।

অজিতদা (গাঙ্গুলী) শ্রমণ হয়েছেন। অজিতদার গলায় কাল একটি মেয়ে তার অজ্ঞাতে পেছন দিক থেকে এসে মালা দেয়। অজিতদা তৎক্ষণাৎ মালা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে আসেন।

মতিদা (চ্যাটার্জ্জী) ব্যাপারটা জানতেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে প্রণাম করার পর শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে-হাসতে বললেন—কাল একটু রহস্য করলেন, স্ফূর্ত্তি করলেন, এপ্রিল ফুলের মত কাল কি ১লা এপ্রিল ছিল ? তাই না ?—এই ব'লে হাসতে লাগলেন।

মতিদা—কতকটা তাই।

একজন বললেন—সন্ন্যাসী, যতি বা শ্রমণকে তো মালা দিতে পারে না।

মতিদা—পারে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' পারবে কি ক'রে ? পাগল ? তাদের তো ও জগতের সঙ্গে কোন সম্পর্কই-নেই।

মণিদা—এ করতে গেলে সর্ব্বাগ্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে মত নিয়ে তা' করা দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই কস্ ভাল! করল মস্করা। মস্করা করার সময় কি ঠাকুরের কাছে জিজ্ঞাসা করতে যাবে ?

এই ব'লে ঠাকুর এমন হাসতে লাগলেন যে, সকলেরই মনে হল ওর কিছু মূল্য নেই। হেসে শ্রীশ্রীঠাকুর জিনিসটা উড়িয়ে দিলেন।

জনৈক দাদা বিমর্ষভাবে বললেন—ব্যবসায়ে কিছুতেই দাঁড়াতে পারছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠকেছিস ব'লে ভাবনা কী ? স্বভাবকে বাঁধ। ঠিকভাবে চল। আবার কর, ক'রে দাঁড়া। চরিত্রের যে ফুটোর জন্যে ঠকিস, সেই ফুটো বন্ধ কর। মানুষ কত ঠকে আবার দাঁড়ায়। ওতে কী হয়েছে ? পারে না তারা, যারা চরিত্রের ফুটো বন্ধ না করে।

প্রবৃত্তিমুখীবাদের সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার দরজা খুলে দিয়ে তার বিরুদ্ধে চেষ্টা করলে কী হবে ? ধর্ম্ম, কৃষ্টি, আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য ব'লে যদি কিছু না থাকে, প্রতিলোম যদি চলে, ছোটকে বড় না করে যদি বড়কে ছোট করা হয়, শ্রদ্ধা যদি না থাকে, সাত্বত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যদি না থাকে, কোন-কিছুর উপর ব্যক্তির অধিকার যদি না থাকে, সদাচারের বদলে যদি কদাচারের প্রশ্রয় পায়, অসৎকে যদি আস্কারা দেওয়া হয়, শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান যদি ভাঙ্গতে থাকে, তাহ'লে আর কী হবে ?

কেষ্টদা — গুরু ও পুরোহিতরাও অনেক জায়গায় ধর্ম্ম নিয়ে ব্যবসা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর —তা' ঠিক নয় মোটেই, তবে পেটের তাগিদে করে।

৬ই শ্রাবণ ১৩৫৬, শুক্রবার (ইং ২২।৭।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), নির্ম্মলদা (দাশগুপ্ত) প্রভৃতি উপস্থিত। শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—Divorce (বিবাহ বিচ্ছেদ) যদি কখনও প্রয়োগ করতে হয়, তবে প্রতিলোম যেখানে হয়েছে, সেখানে করতে হয়।

নির্ম্মলদা — সরকার কী কাজ করতে পারে যা' দিয়ে দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি আসতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টকৃষ্টিতে মানুষকে যদি সংহত ও সম্বৃদ্ধ করে তোলা না যায় তবে কিছুতে কিছু হবে না। স্কুল, কলেজ, থিয়েটার, যাত্রা, সিনেমা, আমোদ, উৎসব, অনুষ্ঠান, খবরের কাগজ, সিনেমা সব কিছুর ভিতর দিয়ে এই জিনিস চারাতে হবে, নচেৎ জায়গায়-জায়গায় এক-একটা রাজপ্রাসাদ ক'রে দিলেও কিছু হবে না।

নির্ম্মলদা—বিশিষ্ট মানুষ তো শোনে না, বোঝে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমন একটা রকম সৃষ্টি করার কথা বলেছিলাম, যাতে শোনে। সে জিনিসটা করলে না। এখন blow (আঘাত) দিলে হবে না। Character (চরিত্র) চাই, magnetic pull (চৌম্বক আকর্ষণ) চাই, loving touch (ভালবাসার

স্পর্শ) এমন থাকা চাই, যে মানুষ লোভলোলুপ হ'য়ে উঠবে। একবার কথা ব'লে আসার পর আবার পেতে চাইবে তোমাকে। তোমার সঙ্গ পাবার জন্য, তোমাকে খুশী করবার জন্য উদগ্রীব হ'য়ে থাকবে। জেম্‌স্‌ যেমন তাঁর গুরু সম্বন্ধে বলেছেন—তাঁকে সেবা না করাই অপরাধ। সমস্যা যা' আছে, তার চাইতে সেই নিয়ে ব'লে ব'লে অশান্তি গোলমাল করা হয়েছে বেশী। খাটবে না কেউ, খাটলে কত production (উৎপাদন) হ'তো, অভাব ঘুচে যেত। কতকগুলি লোক আছে, সরকারের উপর আধিপত্য চায়, যাদের সঙ্গে সত্তা-সম্বর্দ্ধনার কোন সম্পর্ক নেই। লোকের মধ্যে আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির উপর প্রবল ভাবানুকম্পিতা সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোনভাবে এই অবস্থার প্রতিকার করা যাবে না। কারণ, তাতে মানুষের অন্তর্নিহিত পরিপূরণী শক্তি এমনতর একটা স্বতঃস্ফূর্ত সেবা-সহযোগিতার পথে তুষ্টির উৎসারণা নিয়ে ফুটে ওঠে যে, সে ব'লে ওঠে—আমার সব কিছু নিয়ে আমি তোমারই সেবাভিক্ষু। তুমি বাঁচ, বাড়, আর তোমার সেবার ভিতর-দিয়ে আমিও অনন্তকাল তোমার সেবাপরায়ণ থাকি। মানুষ যখন এই আগ্রহ-আবেগে চলতে থাকে ঐ পথে, অন্তরের সেই মণ্ডটাই হচ্ছে—প্রতিমানবের ধর্ম্মমণ্ড—তা ব্যষ্টি, সমষ্টি ও রাষ্ট্রগত। এর মাথা ও মেরুটাকে যদি ভেঙ্গে দাও, ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তার প্রাণ-উৎসারণী সম্বেগ যা-কিছু। যদি ভয়ে শায়েস্তা ক'রে রাখতে চাও, পাবে একটা যান্ত্রিক মানুষ।

কেষ্টদা—ঐ জিনিসটা আনা যাবে কি ক'রে সাধারণের ভিতর ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম, কৃষ্টি, ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের পরিপোষণী আচরণ ও প্রচারণা ব্যাপকভাবে করতে হবে সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে। এটা আমাদের রক্তের মধ্যেই আছে। লাগলেই হবে।

নির্ম্মলদা—লোকের ধরণই বদলে গেছে, কথা মাথায় ঢোকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার কথা শুনবে, তোমার সেই character (চরিত্র) চাই, জাজ্বল্যমান conviction (প্রত্যয়) চাই, প্রতিটি কথায়, চাউনিতে, চলনে, অঙ্গ-ভঙ্গীতে যার চমক ঠিকরে বেরোয়। চরিত্র গড়তে খরচ কিছু নয়। দরকার একটু আন্তরিক চেষ্টা। তখন লোহার টুকরো যেমন চুম্বকে এসে কচকচ ক'রে লাগে, মানুষ তেমনিভাবে এসে integrated (সংহত) হয় তোমাতে। কারণ, সবাই চায় বাঁচতে, বাড়তে। আর, তার পোষণ যেখানে পায়—কথায়, বার্তায়, আচারে, ব্যবহারে, তাকেই তারা পেতে চায় প্রাণের মানুষ ব'লে।

নির্ম্মলদা—অনেকে জাতি-বৈষম্যের কথা বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জাতিবৈষম্য বল কেন ? জাতি-বৈশিষ্ট্য বরং বল—প্রতি বৈশিষ্ট্যের সাম্যসঙ্গত সমাবেশ যাতে হয়, তাই করা ভাল। আজকাল বরং incompatible (অসঙ্গতিপূর্ণ) মিল ঘটাতে গিয়ে সব বৈশিষ্ট্য ভেঙ্গে দিচ্ছে। আমরা আমের কলম দেই। বুনো আম ধ'রে নিয়ে আসি। তাকে বলি mother plant (মাতৃ বংশ), আর ভালটা father plant (পিতৃকুল)। এ দুটোর সঙ্গে বাহ্যত কোন সম্পর্ক নেই।

মনে হয় বিরুদ্ধ। কিন্তু তবু সংগতি আছে, ফলে খারাপটা হয় ভাল। তোমরা প্রতিলোম সংযোগ ঘটিয়ে ভালকে কর খারাপ। কোন্‌টা বৈষম্য? Compatible union (সংগতিশীল মিলন) যা, তা' সাম্য, detrimental union (ক্ষতিকর মিলন) যা সেইটে বৈষম্য। শুনেছি, প্রায় সমধর্ম্মী আগাছা যা' তাকে compatible wheat (সংগতিশীল গম)-এর সঙ্গে যোগ করে ভাল গম করেছে রাশিয়াতে।

শরৎদা—সব এক, আজকাল অনেকে সেই কথা বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব এক এ-কথা যে কতখানি বিষম, তা ব'লে শেষ করা যায় না। সাদা চোখেও এটা বুঝে নিতে দেরী হয় না।

চুনীদা—Equal opportunity (সমান সুযোগ) তো দেওয়া উচিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বুঝি equitable opportunity অর্থাৎ যার বিকাশের জন্য যা লাগে, তাকে তাই দেওয়া। কাস্তে যদি সকলের হাতে দেওয়া যায়, আর তোমার যদি সাহিত্যিক প্রতিভা থাকে, তাতে কি এগুবে?

কেষ্টদা—গণতন্ত্রের বিধান-অনুযায়ী তো প্রত্যেকের ভোট নিতে হয়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভোট নেবার বিধান আপনাদেরও থাকতে পারে। কিন্তু নিজের ভাল যে বোঝে না, সে ভোট দেবে কি করে? কিসে ভাল থাকি, কিসে বাঁচি, কিসে সত্তাসম্বর্দ্ধনা হয়, তা যদি কিছু না জানি, আমি ভোট দেব কি করে? ভোট দিতে গেলে অন্তত এতটুকু বোঝা লাগে—ভালটা কোথায় আর তা কাকে দিয়ে হতে পারে—তা নিজের ও দশের এবং তা প্রবৃত্তি-পোষণের দিক দিয়ে নয়কো—সত্তা-পোষণের দিক দিয়ে। ইংল্যাণ্ডের রাজতন্ত্র—সমন্বিত প্রজাতন্ত্র আমার ভাল লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে আমাদের সবাইকে নিয়মিতভাবে তক্র খাবার খেতে বললেন। ওতে নাকি মস্তিষ্ক, স্নায়ু ও হাড় খুব ভাল থাকে। নিয়মিত খেলে অসুখ-বিসুখ কম হয়। এ অমৃতের মত, দেবতাদের যেমন অমৃত, মানুষের পক্ষে তক্র তাই। তক্র করতে হয় তিন ভাগ দই ও একভাগ জল একত্র মিলিয়ে। ঘেঁটে ননীটা তুলে ফেলে দিতে হয়।

শরৎদা—হজরত রসুল যে সময় এসেছিলেন, তখন হিন্দুরা কি তাঁকে গ্রহণ করতে পারতেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' পারবেন না কেন? আমার মনে হয় পঞ্চবর্হি ও সপ্তার্চ্চির তাৎপর্য্য রসুলের মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায়।

কথাপ্রসংগে কেষ্টদা জিজ্ঞাসা করলেন—সাপেক্ষে এবং নিরপেক্ষভাবে জানা কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও কাম-ক্রোধ আছে, আপনারও কাম-ক্রোধ আছে। আমার আপনার কাম-ক্রোধের মধ্যে সমতা থেকেও বৈশিষ্ট্য আছে। দু'জনের একরকম নয়। রকম আলাদা, তার সংগে-সংগে structural difference (গঠনগত পার্থক্য)-ও আছে। যখন প্রত্যেককে অন্যের সংগে মিলিয়ে জানলেন ও তাকে আলাদা ক'রে

জানলেন, তখন তাকে সব দিক দিয়ে জানা হ'লো। সাধারণত এই জাতীয় উপলব্ধি কম মানুষের আছে। তারা আবার লোককে বিধান দেয় কেমন ক'রে কী করবে। কোন একটার একপেশে জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান নয়কো, বরং ব্রহ্মজ্ঞান হ'লো সর্ব্বসম্বর্দ্ধনী পরম জ্ঞান।

কেষ্টদা—এটা আসে কি ক'রে ? নেতি-নেতি জ্ঞানে আসে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতেও আসে, আর ভক্তিতে আপনিই আসে। আমি তাঁকে ভালবাসি, তাঁকে ছাড়া জানি না। সব-কিছু দিয়ে তাঁর তুষ্টি-তৃপ্তি চাই। আর-কিছুই আমার মনকে টলাতে পারে না। তখন দাঁড়ায়—

"শ্রীকৃষ্ণের যতেক লীলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাঁহার স্বরূপ,
গোপবেশ বেণুকর নব কিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ।"

সবই তাঁরই স্মৃতি বিচিত্র রকমে জাগিয়ে তোলে।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট। বাইরে বৃষ্টি হ'চ্ছে। যতিবৃন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঘিরে ব'সে আছেন।

শরৎদা জিজ্ঞাসা করলেন—যতি বা সন্ন্যাসীর বর্ণাশ্রম সম্পর্কে কী করণীয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে বর্ণাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করবে।

ব্রহ্মজ্ঞান সম্পর্কে কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এতে দুইয়ের মধ্যে ভেদ ও অভেদ কতখানি দুই-ই বোঝা যায়, এবং তাতেই কোন্‌টা কার সঙ্গে compatible ও incompatible (সঙ্গতিশীল ও অসঙ্গতিশীল) কতখানি তাও বোঝা যায়। ব্রহ্মজ্ঞান নেতি নেতি বিচারের দ্বারাও হয়, আবার নিরবচ্ছিন্ন ভক্তি-অনুরাগের ভিতর-দিয়েও হয়। একটা হয় বিচার-বিভূতিনিষ্যন্দী সন্ধিৎসা নিয়ে, আর একটা হয় লীলায়িত উপভোগের রকমারির ভিতর-দিয়ে বিরহ-মিলনে।

হেমদা (মুখাজ্জী) এসে জানালেন—মেয়ের বিয়ে হ'য়ে গেল ভালভাবে। আজ চলে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কী করলে ? তোমার তো টকাটক হ'য়ে গেল। আমার কী করলে ? আমার জমির একটা ব্যবস্থা ক'রে দেও। একটা দাঁড়াবার জায়গা ঠিক করে দেও।

আজ মন্মথদা (ব্যানাজ্জী) কলকাতা থেকে পুণ্যপুঁথি নিয়ে আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর পুণ্যপুঁথি বার-বার উলটে দেখতে লাগলেন। বললেন—এ পড়তে লাগলে বুকের মধ্যে কেমন যেন করে।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এতে যতদিনের কথা ছাপান হয়েছে তা সামান্য মাত্র। আরো বহু জিনিস ধরা হয়নি। যা' ধরা হয়েছিল তারও কিছু হারিয়ে

গেছে। সব থাকলে এই রকম আরো ক'খানা বই হ'তো। আগে তো ওরা বুঝতে পারেনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—এ জীবন নিশার স্বপন। আমার নিজের জীবনটার দিকে যখন চাই তখন মনে হয় যেন একটা miracle (অলৌকিক ব্যাপার)। প্রত্যেকেরই বোধহয় আমার মতো।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর গল্পচ্ছলে বললেন—তখন আমি কাজলের চাইতেও ছোট। আমি ও সুরেন সান্যাল একসঙ্গে রাত্রে শুয়ে আছি। মা প্রভৃতি ছিলেন। ভগবদ্দর্শনের কথা শুনেছি। আগ্রহমত্ত মন। হঠাৎ বেড়ার পাশে অপূর্ব আলো হয়ে গেল। চারহাত, সুন্দর চোখ! সাক্ষাৎ বিষ্ণুমূর্ত্তি, হাসিমুখে হাত নাড়ছেন। বিহ্বল হ'য়ে গেছি। বিবশ ভাব। আনন্দ, কী সুখ, কী দুঃখ বোঝার জো নেই। কেবল তন্ময় হ'য়ে অনুভব করছি শরীরের প্রত্যেকটি রেণু দিয়ে। হঠাৎ তখন তিনি অন্তর্হিত হলেন। বললাম, 'দয়াল ঠাকুর। তুমি যদি দয়া ক'রে এসে থাক, আর একবার দেখা দেও।' বলার সঙ্গে-সঙ্গে আবার সেই আলো, সেই হাত নাড়া। এবার চলে যাবার পর আবার সন্দেহ হ'লো। আবার প্রার্থনা জানালাম। আবার এসে হাত নেড়ে দেখিয়ে দিলেন। আমি বললাম—আমি যখনই ডাকব, তখনই আসবে তো? বললেন—হ্যাঁ। একবার মনে হ'লো—ভোরের আলো না তো? বেরিয়ে দেখি ঘোর অন্ধকার।

কিছু পরে শরৎদা বললেন—আমাদের বিয়ের মধ্যে কত ত্রুটিবিচ্যুতি আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার একটা সতর্ক অনুসন্ধিৎসা ছিল। ছেলেবেলা থেকে বড় বৌকে দেখে আসছি। বড় বৌয়ের মতো মানুষ দেখি না। ছেলেবেলা থেকে চিনতাম। তখন ওর মুকুলের মত বয়স। হিমায়েতপুর আসলে আমার পাছে-পাছে ঘুরতো। জামরুল পাড়তাম। আমার জন্য কুড়িয়ে রাখত। আমি নিয়ে যা' থাকত, তাই ও খেত। ডেউয়ো—টক-টক, তাই খেত। ভাটির ফল তিতো, যা' দিতাম তাই একটার পর একটা খেত। নাক থেকে পোঁটা পড়তো। কর্ত্তা মা এক সঙ্গে খেতে দিতে চাইলে খেতাম না! বিয়ের কথায় প্রথমটা কেমন যেন ভয় করতো, অস্বস্তি লাগতো। কিন্তু মা যখন ওকে দেখে এসে মত করলেন, তখন আর আপত্তি থাকলো না। বিয়ের আগে কতদিন বটগাছে উঠে বসে থাকতাম ওকে দেখবার জন্য। মনে ভয় হতো, মাস্টারমশায় (শ্রীশ্রীবড়মার পিতৃদেব শ্রীযুক্ত রামগোপাল ভট্টাচার্য্য) কী বলবেন। ওকে একদিন যা বলেছি পছন্দ করি না, তা' কখনও করেনি। একবার পরিবেশণ করবার সময় আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। আমি বললাম, তুমি প'ড়ে যাওয়াতে আমারই লজ্জা হলো। আর পড়তে দেখিনি ওকে। খেপুও ছেলেবেলায় আমাকে খুব ভাল-বাসত। পাবনায় যে অতকিছু গেল, একদিন একটা টুঁ শব্দও করেনি বড়-বৌ। অন্য মেয়ে-ছেলে হ'লে হা-হুতোশ ক'রে অস্থির করতো। কিরকম গম্ভীর! পাবনা থেকে আসার সময় আবার এক কথায় রাজী হ'য়ে সহজভাবে চলে আসল। কত সহনশক্তি।

সাধনা মারা যাবার পর কলকাতা থেকে যখন আসল, আমার সামনে কেমন শক্ত, অবিচলিত ছিল।

পরে বাণী দেওয়া সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন ভাবি এত কয়ে কী হবে? কলাম তো কম না। তবে মাঝে মাঝে ভাবি—হয়তো কোন কথা বিশেষ কারও কোন কামে লাগতে পারে।

৭ই শ্রাবণ ১৩৫৬, শনিবার (ইং ২৩।৭।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট। যতিবৃন্দ ও কেষ্টদা প্রভৃতি উপস্থিত আছেন।

একজনের উচ্ছৃঙ্খল বেপরোয়া চলন সত্ত্বেও পরিবেশের কেউ বাধা না দেওয়ায় শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—মানুষ চাপের মধ্যেই ঠিক থাকে। একটা বিরাট বায়ুর চাপ আমাদের চারিপাশে থাকে ব'লে আমাদের অজ্ঞাতসারে তা' প্রতিরোধ করতে গিয়ে, আমাদের অবস্থিতি যেন অনেকটা স্বস্থ অবস্থায় যথাস্থানে স্থিত থেকে বৃদ্ধির পথে চলে। মানুষও তেমনি পারিপার্শ্বিকের চাপে অনেকখানি ঠিক থাকে। পারিপার্শ্বিকের চাপ তাকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করে। পারিপার্শ্বিকের ভয় না থাকলে মানুষ যে আরো কত খারাপ হতে পারতো, তার ঠিক নেই। পারিপার্শ্বিকের বিহিত শাসন তাই কখনও শিথিল করতে নেই। পারিপার্শ্বিক যদি অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়, তবে মানুষের ক্রমিক অধোগতি এগিয়েই চলে। পারিপার্শ্বিকের এতখানি চাপ সত্ত্বেও যে মানুষ কখনও-কখনও অত্যন্ত খারাপের দিকে ছুটে যায়, তাতে বোঝা যায় যে, তার প্রকৃতির মধ্যে প্রকৃত গলদ আছে।

একজনের বিরুদ্ধে আর-একজন বিশ্রী নিন্দা করছিলেন। সেই সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কারও সম্বন্ধে কোন নিন্দা শুনে তখনই যদি তা' বিশ্বাস ক'রে নাও, তা' সকলের পক্ষেই খারাপ। আবার, কেউ যদি প্রকৃত অন্যায় করেছে বলে শোন এবং তা নির্দ্ধারণ ক'রে যদি বিহিত প্রতিরোধ না কর, তাতেও সবার ক্ষতি করা হবে। ভীরুতাবশতঃ অন্যের কুৎসিত অন্যায় সহ্য করা ঠিক নয়। যে অন্যায় আমাকে ধ্বংস করতে পারে, সে অন্যায় তোমাকেও ধ্বংস করতে পারে। যে-বাঘ আমাকে ধরতে পারে, সে-বাঘ তোমাকেও ধরতে পারে। তাকে যদি জায়গাছাড়া করতে পার, তাতে তোমারও ভাল, আমারও ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মন্মথ (ব্যানার্জ্জী)-র মত যদি সবাই খুব ব্যাপকভাবে যাজনে লাগে এবং সবার কাজ যদি বিরাটভাবে organised way-তে (সংগঠিত ভাবে) এগিয়ে যায়, তাহলে তারাই ভারতের উদ্ধাতা হ'য়ে উঠতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর জগদীশ শ্রীবাস্তবদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমরা বৈশিষ্ট্যকে মানি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মানি, সম্প্রদায়স্বাতন্ত্র্য মানি। আমরা slave (দাস) হ'তে চাই না। সহযোগী স্বাতন্ত্র্য চাই। এত সত্ত্বেও টিঁকে আছি এর ফলে। আমরা state slave

(রাষ্ট্র-দাস) নই। আমি যেমন আমার, তেমনি পরিবারের, সম্প্রদায়ের, সমাজের। আমি ক্রমান্বয়ে বড় হ'চ্ছি—পরিবারে, সম্প্রদায়ে, সমাজে, রাষ্ট্রে। আমার আমি বেড়ে চলেছে। এই ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুরণ ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। রামচন্দ্রকেও জবাবদিহি করতে হয়েছিল একজন ব্রাহ্মণের ছেলের অকালমৃত্যুতে। যে-বিধানে এ ব্যবস্থা নেই তা' আমরা পছন্দ করি না। বৈশিষ্ট্যমাফিক যে division (বিভাগ), তাই বর্ণাশ্রম। বড়-ছোট কথাটা প্রধান নয়কো, এক-একটা এক রকম। লাল কাঞ্চন, সাদা কাঞ্চন, দুটোরই প্রয়োজন। একটা নষ্ট ক'রে দিলে তা' পাব না। বিয়ে-সাদি তেমন ক'রে করতে চাই যাতে প্রয়োজনীয় সব গুচ্ছ বজায় থাকে।

শরৎদা—অনেক প্রজাতি তো আজকাল আর দেখা যায় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Extinct (বিলুপ্ত) হ'য়ে গেছে। তা' আমরা চাই না। যদি কোন প্রকৃতিজাত প্রয়োজনীয় বস্তুকে আমরা নষ্ট হ'য়ে যেতে দিই, সে দোষ আমাদের। তার ধারা যাতে বজায় থাকে, সে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সম্ভাব্যতা আমাদের ভিতর নিহিত আছে। চাই তার অনুশীলন। সবাই আমরা অমৃতত্ব চাই।

কুটিরশিল্প সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মূলধন, মস্তিষ্ক, শরীর, যন্ত্র, সরঞ্জাম ও শক্তির প্রয়োজনপূরণী স্বাধীন বিনিয়োগে কুটিরশিল্পের ভিতর-দিয়ে আমাদের অনেক কাজই মিটতে পারে এবং তা' বৃহৎ যন্ত্রের বিকেন্দ্রীকরণের সহায়ক হ'তে পারে। তাতে বেকার-সমস্যারও সমাধান হ'তে পারে।

সংহতি সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মহৎ আদর্শ ছাড়া সংহতি প্রবল ও স্থায়ী হয় না। স্বার্থ ও প্রবৃত্তির প্ররোচনায় তাতে সহজেই ভাঙ্গন ধরে।

পরে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের দেশে রাজা ছিলেন লোকরঞ্জক, লোকসেবক। একটা সাধারণ মানুষও কৈফিয়ৎ তলব করতে পারত।

শরৎদা—এমন লোকরঞ্জক রামেরও সীতাকে বনবাস দিতে হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে অসুবিধা আছে বটে, কিন্তু তবু লোককল্যাণের ওপরই জোর ছিল।

বিবর্ত্তন-সম্বন্ধে কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দু'রকম আছে। জন্মের পর জন্ম ধ'রে বিহিত চলনে মানুষের অসাধারণ আধ্যাত্মিক বিবর্ত্তন হয়। শারীর বিবর্ত্তনটা পরিবেশের প্রভাব ও তপস্যার ভিতর-দিয়ে হয়। একটা বৈশিষ্ট্য মানে জাইগটের সংস্থিতির বৈশিষ্ট্য।

শরৎদা—ব্যাঙ যে মানুষ হ'লো, তার বৈশিষ্ট্য থাকলো কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যাঙটা মানুষ হ'লো, তার মানে তার বৈশিষ্ট্যেরই উন্নতি হ'লো। ব্যাঙের মধ্যেও মানুষের প্রকৃতি অনুস্যূত ছিল। স্তর-পরম্পর্য্যায় তা' বিকশিত হ'লো।

শরৎদা ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণের কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কতকগুলি protoplasm (জীবনের মূলীভূত উপাদান) ছিল, নানা পরিবেশে প'ড়ে নানাভাবে বিবর্ত্তিত হ'লো। তাই ব'লে শালগাছকে বটগাছ করতে পারবে না। ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ, যেমন ভরতরাজা হরিণ হ'লো প্রবৃত্তির দরুন। ভাবাবিষ্ট হ'য়ে নানারকমে আকারিত হ'তে পারে পরজন্মে। আবার, বিকৃত চিন্তার ফলে এই জীবনেই কতরকমের অস্বাভাবিক মনোভাব, রোগ ও পাগলামি দেখা দেয়। একজন জ্যান্ত মানুষ হয়তো মনে করে সে ম'রে গেছে।

শরৎদা—জন্মজন্মান্তরের পরিবর্ত্তনের গোড়াটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত হই, সব শালাই আমি। সবের মধ্যে আমি চলায়মান। বহুরূপীর মধ্যে একটা রূপ আমি। সেই আমির মূলে আছে বিশ্ব-আমি, যা' প্রকৃতি-পুরুষের মধ্য-দিয়ে বহু হয়েছে। যখন বিশ্ব-আমির প্রতি আকর্ষণ প্রবলতম হয়, তখন এই আমি ভূমায়িত হয়, সবাইকে নিজের বিভিন্ন মূর্ত্তি ব'লে বোধ হয়। প্রকৃতির মূলে আছে পরাপ্রকৃতি। বিশ্ব-আমি ও পরাপ্রকৃতির দিকে যে যত এগোয় সে তত স্বরূপের সন্ধান পায়।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সাংখ্যের বহুপুরুষবাদ সার্থক হয়েছে বেদান্তের একপুরুষে। আবার, বেদান্তের 'একমেবাদ্বিতীয়ং' সার্থক হয়েছে সাংখ্যের প্রতি-পুরুষের অদ্বৈতানুভূতিতে।